ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১৮:১৯

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা
ভাষা আন্দোলন সংগঠনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা
আনছার বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক কার্যক্রম (১৯৪৮-১৯৭১)
সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার ইতিহাস এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব
ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯০৮-২০০৮)
১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ: সমসাময়িক স্থানীয় নাটকে রংপুরের চিত্র
বগুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারে সুফি সাধকগণের অবদান
বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত কতিপয় পোড়ামাটির ফলক
সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র : সমকালীন প্রতিক্রিয়া
কালিদাসের নাটক : সৃজনকৌশল
নজরুল-সংগীতে রাগ-বৈচিত্র্য
লোক-ক্রীড়ায় বুড়ি-চরিত্র: সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা
সিডরোত্তর জীবনকৌশল: দক্ষিণ জনপদের অভিযোজন প্রেক্ষিত
বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজন কৌশল
নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক



রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
মো. মাহবুবর রহমান

সহযোগী সম্পাদক
স্বরোচিষ সরকার
জাকির হোসেন

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল, ঊনবিংশ সংখ্যা ১৪১৮
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১২

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক
মো. আবুল কালাম আজাদ
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫
ফোন: (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৫৮] ফ্যাক্স: (০৭২১) ৭৫০০৬৪

সম্পাদনা সহযোগী
মোঃ শাহজাহান রাঢ়ী
মো. মনিরুল হক লেনিন

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মুদ্রক
মেসার্স শাহপীর চিশতী প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

মূল্য
টাকা ১৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

নির্বাহী সম্পাদক	সদস্য
মো. মাহবুবর রহমান প্রফেসর ও পরিচালক, আইবিএস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	**এম. হাবিবুর রহমান** অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	এ.এইচ.এম. মোস্তাফিজুর রহমান অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সহযোগী সম্পাদক	
স্বরোচিষ সরকার সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	**এম. জয়নূল আবেদীন** অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	সনজীব কুমার সাহা অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জাকির হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	**এম. মোস্তাফা কামাল** সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	মোহাম্মদ নাজিমুল হক সহযোগী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	মো. কামরুজ্জামান সহকারী অধ্যাপক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগের ঠিকানা
নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী- ৬২০৫
বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-০৭২১-৭৫০৯৮৫
ই-মেইল: ibsru@yahoo.com

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-কোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালের সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে।
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা-পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে।
- বাংলা ও ইংরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় রচিত অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে।
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য রীতি অনুসরণ করতে হবে।
- প্রবন্ধের পরিসর অনূর্ধ্ব পাঁচ হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুই কপি পাণ্ডুলিপি সিডিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" এবং ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে MS Word-এ Times New Roman/Tahoma। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা অবশ্যই থাকতে হবে।

সূচিপত্র

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা ৭
মোসা. ছায়িদা আকতার

ভাষা আন্দোলন সংগঠনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা ২৯
মোঃ আঃ লতিফ ভূঁইয়া

আনছার বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক কার্যক্রম (১৯৪৮-১৯৭১) ৩৯
মীর ফেরদৌস হোসেন

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার ইতিহাস এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব ৫৫
মো: ইউসুফ

ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯০৮-২০০৮) ৭৩
মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম

১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ: সমসাময়িক স্থানীয় নাটকে রংপুরের চিত্র ৯৭
আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ

বগুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারে সুফি সাধকগণের অবদান ১১৫
মো. আখতার হোসেন ও আব্দুল খালেক

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত কতিপয় পোড়ামাটির ফলক ১৩১
মোসা. আশীয়ারা খাতুন

সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র : সমকালীন প্রতিক্রিয়া ১৪৫
অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিদাসের নাটক : সৃজনকৌশল ১৭১
হোসনে আরা আরজু

নজরুল-সংগীতে রাগ-বৈচিত্র্য ১৮৩
কৃষ্ণপদ মণ্ডল

লোক-ক্রীড়ায় বুড়ি-চরিত্র: সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা ১৯৭
মোবার্‌রা সিদ্দিকা

সিডরোত্তর জীবনকৌশল: দক্ষিণ জনপদের অভিযোজন প্রেক্ষিত ২০৭
মোঃ সামসুজ্জোহা ও আবদুল্যাহ আল-মারুফ

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজনকৌশল ২২৩
মু. ইব্রাহীম খলিল

নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক ২৩৩
সিরাজুম মুনীরা

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা

মোসা. ছায়িদা আকতার*

Abstract: The Awami League played a vital role towards the establishment of democracy in Pakistan. The main motive of this democratic movement was to free the people from economic exploitation, social oppression and other inequalities. From the very inception Awami League involved itself as a regional (East Bengal based) political organization, but later it was able to earn quick popularity in East Bengal by adopting different democratic oriented policies and programmes, viz., the language movement, twenty-one points programme in 1954, anti-constitutional movement in 1956, formation of the COP in 1964, six-points programme in 1966 and also by adopting democratic election manifesto in 1970 based on the six and eleven points. In this way, Awami League gradually developed itself through its organizational framework on the basis of democratic ideology.

পটভূমি

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় সম্প্রদায় নির্ভর দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে সৃষ্টি করা হয় ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্র। ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন কংগ্রেস নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ওরফে মহাত্মা গান্ধী। তিনি অতি দ্রুত দেশে একটি সংবিধান প্রদান করে ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল হন মুসলিম লীগের মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পাকিস্তানের দীর্ঘ ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে পাকিস্তানের কোন শাসকই পাকিস্তানে 'একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান' প্রণয়ন করতে সক্ষম হন নি। ১৯৫৬ সালে একটি নামমাত্র সংবিধান প্রদান করতে সক্ষম হলেও তা ছিলো কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ।

গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাশ্চাত্যপন্থী ছিলেন। তিনি নিজেকে কোন দিনই একজন ধর্মীয় নেতা কিংবা ধর্মানুরাগী ব্যক্তি বলে দাবি করেন নি। নামকরা সংবিধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি সংসদীয় সরকারের পক্ষে বক্তৃতায় যোগ্যতার পরিচয় দিলেও পরবর্তীতে সংবিধান ও পাকিস্তান সরকারকে নিজের কর্তৃত্বের অধীনস্থ করেন। এ কাজে তাঁকে মুসলিম লীগের সংবিধান বিশেষভাবে সহায়তা করে। ১৯৪৪ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। মুসলিম লীগের উক্ত কাউন্সিলে সংবিধানের ৩৩নং ধারায় বলা হয়:

* ড. মোসা. ছায়িদা আকতার, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

The President shall be the principal head of the whole organization, shall exercise all the powers inherent in his office and be responsible to see that all the authority's work inconsonance with the Constitution and Rules of the All-India Muslim League.[1]

তাছাড়া জিন্নাহর গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্তিপত্রে এমন কতগুলো অধিকার প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত হয়।[২] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেলের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে ছিলো। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় গভর্নর জেনারেলের নিয়োগের ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে থাকলেও তাকে অপসারণ কিংবা পরিচালনা বা পরামর্শ প্রদানের কোন সুযোগ থাকে না। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগসহ সকল ধরনের নিয়োগের অধিকার এসে যায় গভর্নর জেনারেলের হাতে। এমনকি গভর্নর জেনারেল প্রয়োজনে ১৯৩৫ সালের কোন ধারাকেও সংশোধন, বিয়োজন কিংবা সংযোজন করার অধিকার পায়। গভর্নর জেনারেল জরুরি আইন ঘোষণা করে পার্লামেন্ট ও সংবিধানকে বাতিল বা স্থগিত ঘোষণা করতে পারতেন। সারা দেশে জরুরি আইন ঘোষণা না করে প্রয়োজনে যাতে শুধুমাত্র একটি প্রদেশেও জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা যায় সে লক্ষ্যে জাতীয় নিরাপত্তার নামে ১৯৩৫ সালের আইনকে সংশোধন করে ৯২ক ধারা সংযোজন করা হয়।[3] পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রেসিডেন্ট বিপুল ক্ষমতা সংরক্ষণ করার কারণেই মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার পক্ষে সামরিক আইন ঘোষণা করে পার্লামেন্টকে ভেঙে দেয়া সম্ভব হয়।

যাহোক, বাঙালিরা আর্থ-সামাজিক মুক্তির প্রত্যাশায় পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও অচিরেই তারা উপলব্ধি করে যে এক ঔপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তারা অন্য শক্তির কবলে পড়েছে। পাকিস্তান জন্মের সময় পূর্ব বাংলায় যারা পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকায় ছিলেন তাদের কেউ কেউ জমিদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের প্রধান অংশ ছিল প্রজা-পারিবারিক পটভূমি থেকে আগত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। কিন্তু বাংলা বিভাগ প্রশ্নে মুসলিম মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃত্ব মুসলিম লীগের নেতৃত্বের সাথে থাকতে পারে নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে বাংলার মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বিজয় সম্ভব হয়েছিল এবং সোহরাওয়ার্দীই ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম লীগ দলের নেতা। স্বাভাবিকভাবে তারই পাকিস্তানের নবগঠিত প্রদেশ পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় লীগ নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রে বাংলার মুসলিম জমিদারদের প্রতিনিধি খাজা নাজিমুদ্দীন পূর্ব বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। সোহরাওয়ার্দীর পরিবর্তে হামিদুল হক চৌধুরীকে পার্টিশন কাউন্সিলে নিয়োগ করা হয় এবং কোলকাতা পূর্ব বাংলার হাতছাড়া হয়ে যায়। প্রজা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে বাংলায় পাকিস্তান আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ লাভ করলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার

---

[1] K.B. Sayeed, *Pakistan the Formative Phase 1857-1948* (London: Oxford University Press, 1968), p. 185.

[২] দেখুন, লেলিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৫। আরও দেখুন, Shamsul Huda Harun, *Parliamentary Behaviour in a Multi-National State 1947-58* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1984), pp. 2-3.

[3] Alen Gledhill, *Pakistan: The development of its Laws and Constitution* (London: Steven Sons Ltd., 1957), p. 64.

সময় কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন মুসলিম জমিদার ও তার সমর্থকগণ।[৪] মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছাড়া মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রায় সবই ছিল জমিদার।

আগেই বলা হয়েছে যে, মুসলিম লীগের দলীয় সংবিধান ছিল খুবই অগণতান্ত্রিক। সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর গভর্নর জেনারেল এবং মুসলিম লীগের সভাপতির পদ দুটি দু'জনের হাতে যায়। ফলে ভারসাম্যমূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়। লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এ ভারসাম্য অবস্থা আরো বিস্তৃতি পায়। তাঁর মৃত্যুর পর দুর্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী খাজা নাজিমুদ্দিন গভর্নর জেনারের পদ ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করায় প্রাক্তন আমলা গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল পদে নিয়োজিত হন। পাকিস্তানের ইতিহাসে এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন প্রাক্তন আমলার নিয়োজিত হবার ঘটনা এই প্রথম।[৫] ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভারসাম্য ভেঙে পড়ে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকারী কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পদে সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিয়োগ করা হয় এবং সামরিক শাসনের পথ প্রশস্ত হয়।

এতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্র অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনের চরিত্র এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হলো। এবারে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা আলোচনা করা হবে।

আওয়ামী লীগের প্রাথমিক দলিলে গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা

১৯৪৯ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।[৬] প্রতিষ্ঠালগ্নে আওয়ামী মুসলিম লীগ যে খসড়া মেনিফেস্টো গ্রহণ করে তার মুখবন্ধে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনা সম্পর্কে বলা হয় যে, আল্লাহতালার প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের হাতেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে।[৭] দেশের স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ত কায়েম হবার পর কোন ব্যক্তি, দল, জাতি বা শ্রেণী বিশেষের প্রাধান্য বা প্রভুত্ব কায়েম না হয়ে যাতে আল্লাহর নিয়ম এবং আল্লাহর প্রতিনিধি জনগণের সার্বভৌমত্ব কায়েম হয় তার জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে অবিরাম জেহাদ বা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে এবং আল্লাহর নিয়মের এবং জনগণের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব খর্ব করার প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।[৮] গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়ে উদাহরণ হিসেবে এতে বলা হয়, রসুল করিম ধর্ম পরিচালনার জন্য তাঁর সাহাবীদের মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করতেন। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভার মধ্যস্থতায় আইন প্রণয়নের কথাও এতে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু জনগণের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি যারা নন তাদের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করলে জনগণের সার্বভৌমত্ব ও অধিকার খর্ব হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৯] মেনিফেস্টোতে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীর ভোটাধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমতা,

---

[৪] বিস্তারিত দেখুন, Kamruddin Ahmad, *Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh* (Dacca: Inside Library, 1975), pp. 51-61.

[৫] লেলিন আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৯।

[৬] আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Shyamoli Ghosh: *The Awami League 1949-1971* (Dhaka: Academic Publishers, 1990), pp. 4-5. আরও দেখুন, Shamsul Huda Harun, *Op.cit.* p. 215.

[৭] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া মেনিফেস্টো দেখুন, আবুল কাশেম (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ: ঐতিহাসিক দলিল* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১), পৃ. ১৬; আরও দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৮৯), পৃ. ২৫৬।

[৮] আবুল কাশেম, *ঐ* পৃ. ১৬-১৭.

[৯] *ঐ*, পৃ. ১৭

সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার, মানুষের সমান অধিকার, কাজ করার অধিকার, শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের অধিকার, নারীর অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।[১০]

কর্মসূচিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর হাতে থাকলেও তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের হাতেই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ন্যস্ত করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে জনগণের অধিকার তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার কথা বলা হয়। মেনিফেস্টোতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যা সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

বাংলা ভাষা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ

পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন ছিল প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালির স্বাধীনতা অন্বেষনের যাত্রা শুরু। ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান জনগনের শতকরা যে হার তাতে বাংলা ভাষার জনসংখ্যা ৫৬.৪০ এবং উর্দু ভাষার ৩.২৭ ছিল।[১১] বাংলা ভাষার জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলে পূর্ব বাংলার জনগণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যদিও ভাষা আন্দোলনের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগের জন্ম হয়নি, তথাপি বেঙ্গল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের গণতান্ত্রিক কর্মীরা, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন– বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রলীগ প্রথম দিকে এবং পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আন্দোলন গতিবেগ সঞ্চার করে। ভাষা আন্দোলন প্রথমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও এর মূল কারণ ছিল আর্থ-সামাজিক বৈষম্য।[১২] পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিলে ভাষা আন্দোলনের সূচনা করেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক জন্মের আগে বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ লেখকগণ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আব্দুল হক, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং ড. মুহাম্মদ এনামুল হক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর ছাত্র আবদুল হকই প্রথম এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।[১৩] প্রখ্যাত ভাষা তত্ত্ববিদ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বিভিন্ন ভাষার সাথে বাংলার তুলনা করে প্রতিষ্ঠিতব্য পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাভাষার মর্যাদা তুলে ধরেন। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক বাংলার ভাষার সাথে বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।[১৪]

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে ছাত্রদের শিক্ষা সংক্রান্ত গণতান্ত্রিক দাবি ছাড়াও এরা পাকিস্তানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সৌহার্দ্য ও মিলনের পথ সুপ্রশস্থ করা, প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার দাবি প্রভৃতি উদার ও

---

[১০] শিক্ষার অধিকারে মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রস্তাব করা হয়। দেখুন, ঐ, পৃ. ২০।

[১১] ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানের জনগণের শতকরা হার দেখুন, মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১* (ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯), পৃ. ৭৬।

[১২] বিস্তারিত দেখুন, মোসাঃ ছায়িদা আকতার, "আওয়ামী লীগের ভাবদার্শিক বিকাশ ১৯৪৯-১৯৭২", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডিভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ৭৭-৭৯।

[১৩] বিস্তারিত দেখুন, আবদুল হক, *ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭৬) গ্রন্থটি। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান হায়দ্রাবাদের উর্দু সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে যে ঘোষণা দেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'– এই অগণতান্ত্রিক ঘোষণার জবাবে প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রবন্ধ লেখেন আবদুল হক। দেখুন, বশির আল হেলাল, 'ভাষা আন্দোলনের চরিত্র বিচার', *সুন্দরম*, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪০০-জৈষ্ঠ ১৪০১, পৃ. ৮।

[১৪] মো. আবুল কাশেম, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম: ভাষা আন্দোলন থেকে ৬-দফা', মো. আখতারুজ্জামান (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০০৯), পৃ. ১৭।

গণতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করে।[১৫] উল্লেখ্য যে এই সংগঠনের একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

ভাষা আন্দোলন তথা ভাষার দাবি সংবাদ-সাময়িকপত্রের পাতা থেকে গণপরিষদেও স্থান নেয়। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ভাষাবিষয়ক প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজীর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবি উত্থাপন করলে প্রস্তাবটির বিরোধীতা করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উর্দুকেই সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করেন, যা ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক।[১৬]

বাংলাভাষার দাবি নিয়ে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব বাংলার ছাত্ররা একদিনের ধর্মঘট ডাক দিলে একাদিক্রমে কয়েকদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট পালিত হয়। গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ব বাংলায় প্রথম সফরকে নির্বিঘ্ন করার জন্য পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন কৌশলে ছাত্রদের সকল দাবি মেনে নিয়ে রাজপথ পরিষ্কার করেন।[১৭] কিন্তু ঢাকায় জিন্নাহ একাধিক সমাবেশে উর্দুর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন এবং পূর্ব বাংলার ভাষা নির্ধারণের দায়িত্ব পূর্ব বাংলার জনপ্রতিনিধিদের ওপর ছেড়ে দিলেও একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যা ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা হতাশ হয়ে যায়।[১৮]

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন শুধু উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জিন্নাহর উক্তি পুণর্ঘোষণা দিলে ব্যাপক গণপ্রতিক্রিয়ার মুখে আন্দোলনকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার জন্য ৩০ জানুয়ারি ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরীতে আওয়ামী লীগের মওলানা আদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে গঠিত হয় "সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ"। এই সর্বদলীয় সভার কার্যক্রম ও অংশগ্রহণকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় নিরীক্ষণ করলে এতে দেখা যায় আওয়ামী লীগের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি।[১৯] ১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন শেখ মুজিবকে জেলে পাঠানো হলে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও বন্দীমুক্তির দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি এবং মহিউদ্দিন আহমদ জেলের ভেতরে অমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। চারিদিকে বিষয়টি জানাজানি হলে বাইরে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তাকে স্থানান্তরিত করে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়।[২০]

---

[১৫] বিস্তারিত দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ৪৭ (এরপর থেকে দলিলপত্র ১ম খণ্ড লেখা হবে)।

[১৬] প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বক্তব্য দেখুন, *Constituent Assembly of Pakistan Debates*, Vol. II, 25 February 1948, pp. 18-23.

[১৭] ১১ মার্চে ধর্মঘটের দিন ঢাকায় যে কজন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ তাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান অন্যতম। কারামুক্ত হয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের সাথে ছাত্রদের যে আট দফা চুক্তি হয়েছিল তাতে যে অস্পষ্টতা ছিল তা দূর করার জন্য একটি সভা আহবান করেন। তিনি সভায় সভাপতি করেন এবং পূর্বোল্লিখিত ৮ দফা চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনেন। বিস্তারিত দেখুন, আবুল কাশেম, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান প্রসঙ্গে দু'একটি বিষয়ে কিঞ্চিত অবতারনা', *মাতৃভূমি*, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ১৭ মার্চ জাতির জনকের জন্মদিন জাতীয় শিশু কিশোর দিবস ২০০৪, পৃ. ৯২-৯৩।

[১৮] ভাষা আন্দোলনের ১৯৪৮ পর্ব বিস্তারিত দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-১৫৯।

[১৯] এই সংগ্রাম পরিষদের সকল সদস্যের নাম পাওয়া যায় না। তবে অলি আহাদ তার গ্রন্থে যে ২৮ জনের নাম লিখেছেন তার মধ্যে ৮/৯ জন আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। দেখুন, অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি* (ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৭), পৃ. ১০৫-১০৬।

[২০] শেখ মুজিবুর রহমানের অনশন সম্পর্কে সরকারী গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট দেখুন, মোনায়েম সরকার, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি, প্রথম খন্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ: ১৭১-১৭৩ ; আরও দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

শেখ মুজিবের এই অনশন থেকে বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষার মর্যাদা নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দৃঢ়সংকল্প ছিল, এমনকি প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে এই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আনোয়ারা খাতুনসহ কয়েকজন অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন। ফেব্রুয়ারির ঘটনা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র পূর্ববাংলা ক্রোধে ফেটে পড়ে। বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন বাংলাকে অন্যতম জাতীয় ভাষা করার সুপারিশ সংবলিত একটি প্রস্তাব প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপন করেন।[২১] প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এর পর থেকে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ভাষা আন্দোলনের সম্মুখ সারিতে থাকা ছাত্রলীগ এবং যুবলীগ নেতৃবৃন্দের অনেকেই পরবর্তীতে আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে যোগ দেয়।

মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের উদ্যোগে গণপরিষদে যে আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে পাকিস্তানের জন্য একটি ইসলামী সংবিধান রচনাই লক্ষ্য ছিল। তাছাড়া রিপোর্টে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়।[২২] আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী তখন জেলে থাকা সত্ত্বেও এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য দলীয় নেতা-কর্মীদের আহবান জানিয়ে রিপোর্টটি বাতিলের দাবি জানান। ১৯৫০ সালের ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় রিপোর্টটির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ নোট দেয়া হয়।[২৩] এ সময় গণতান্ত্রিক কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা কর্মপরিষদ নামক সংগঠনের আহ্বানে উক্ত সুপারিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কর্মপরিষদের জনসভায় বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সমাবেশ ঘটে। সমাবেশ উদ্বোধন করেন কামরুদ্দীন আহমদ।[২৪] নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের[২৫] মতো প্রতিক্রিয়াশীল এবং সরকারের দালাল

---

[২১] *East Bengal Legislative Assembly Proceedings*, Vol. II, 22 February 1952, p. 5.

[২২] মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র* ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮-২০৩।

[২৩] N.B. Nair, *Politics in Bangladesh, A Study of Awami League 1949-58* (New Delhi: Northern Book Centre, 1990), pp. 64-65.

[২৪] আতিউর রহমান, লেলিন আজাদ, *ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০), পৃ. ১১৬।

[২৫] ১৯৩৬ সালে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' (All India Student Federation) নামে একটি ছাত্র-সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এ সালেরই অক্টোবর মাসে All India Student Federation এর বাংলা শাখা Bengal Provincial Student Federation গঠিত হয়। কিন্তু এ সংগঠনের কর্মসূচীতে খুশি হতে না পেরে বাংলার কম্যুনিষ্ট মনোভাবাপন্ন ছাত্রবৃন্দ ১৯৩৬ সালেই Bengal Provincial Student League গঠন করে। ছাত্র ফেডারেশন কিংবা ছাত্রলীগ বাংলার মুসলমান সমাজকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তারা বাংলায় All Bengal Muslim Student Association (ABMSA) নামে ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যাশা নিয়ে মুসলিম লীগের অঙ্গসংগঠন হিসেবে All India Muslim Student Federation (AIMSF) গঠনে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এরই বাংলা শাখা হিসেবে All Bengal Muslim Student Federation (ABMSF) গঠিত হয়। ফলে বাংলার মুসলমান ছাত্রবৃন্দ পৃথক দুটি ছাত্রসংগঠনে দ্বিধাবিভক্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। এ বিভক্তি মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষতির কারণ ভেবে সমসাময়িক রাজনীতিবিদগণের প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালে ABMSA এবং ABMSF সংগঠন দুটিকে একীভূত করে All Bengal Muslim Student League (ABMSL) গঠিত হয়। সিদ্ধান্ত হয় ABMSL, AIMSF-এর বঙ্গীয় শাখা হিসেবে

ছাত্রসংগঠনও এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে এবং তাতে আওয়ামী লীগের শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ, তাজউদ্দীন আহমদ, মানিক মিয়া, মোস্তাক আহমদ প্রমুখ শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকেন।[২৬]

সারা পাকিস্তান বিশেষত পূর্ব বাংলার ওপর একটি অগণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয় তাকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ রূপদানের জন্য মুসলিম লীগ ছাড়া সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা হয় তাতে কামরুদ্দীন আহমদকে কনভেনর করে কমিটি অব একশন ফর ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন' নামে কমিটি গঠিত হয়।[২৭] শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন বিবেচনার জন্য ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন একটি জাতীয় মহাসম্মেলন গঠনের লক্ষ্যে ১৭ থেকে ২৮ অক্টোবর প্রতিদিন শাসনতান্ত্রিক কমিটির বৈঠক করেন তাতে আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান, তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, আব্দুস সালাম, সাখাওয়াৎ হোসেন নিয়মিত উপস্থিত থাকেন। ৪ নভেম্বর ঢাকার বার লাইব্রেরী হলে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে জাতীয় মহাসম্মেলন হয়। সম্মেলনে তিনি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক চেতনা সংবলিত ভাষণ দেন।[২৮] যাহোক, আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত গণপরিষদে রিপোর্টটির উপর আলোচনা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করা হয়।[২৯] ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর গণপরিষদে ২য় সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয় তাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য নীতির সংযোজন করা হয়। রিপোর্টটি পূর্ব বাংলায় নয় বরং পশ্চিম পাকিস্তানেও সমালোচিত হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের সহসভাপতি এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে এটাকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করেন।[৩০] বিরোধীতার মুখে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় রিপোর্টটিও বাতিল হয়ে যায়।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্ট গঠন আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক বিকাশকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাফল্যকে রাজনৈতিক বিজয়ে পরিণত করার জন্য মুসলিম লীগ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী মোর্চা গঠন করে। যুক্তফ্রন্ট

কাজ করবে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পরে মুসলিম লীগে অন্তর্কলহ শুরু হলে ABMSLএর উপরও এর প্রভাব পড়ে। এ সংগঠনে ২টি গ্রুপ বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে হাশিম-সোহরাওয়ার্দী অনুসারীরা ছিল উদারনৈতিক, অন্যপক্ষে নাজিম উদ্দিন-আকরাম খা-এর অনুসারীরা ছিল রক্ষণশীল। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি 'পূর্ব বাংলা মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ' দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং নঈমুদ্দিন আহমদকে আহবায়ক করে East Pakistan Muslim Student League (EPMSL) গঠিত হয়। সরকার সমর্থিত অংশের নামকরণ হয় All East Pakistan Muslim Student League (AEPMSL)। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে যেখানে EPMSL অগ্রণী ভূমিকা রাখে সেখানে AEPMSL সরকারের গুণ্ডাবাহিনীতে পরিণত হয়। দেখুন, মো. মাহবুবর রহমান। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭-২৬০। আরও বিস্তারিত দেখুন, Md. Abul Kashem, *Muslim Student Politics in Pre-Partition Bengal*, Institute of Bangladesh Studies, Vol. XVIII, 1995, pp. 147-163.

[২৬] *তাজউদ্দিন আহমদের ডায়েরী ১৯৪৯-১৯৫০* (ঢাকা: প্রতিভাস, ২০০০), ২৭-১০-৫০।

[২৭] কামরুদ্দীন আহমদ, *বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ ২য় খণ্ড* (ঢাকা: জহিরুদ্দীন মাহমুদ, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৩৩।

[২৮] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, আশ্বিন ১৩৮২), পৃ. ৩৯৪-৩৯৮।

[২৯] *নওবেলাল*, ৩০ নভেম্বর ১৯৫০।

[৩০] বিবৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *The Pakistan Times*, 29 December 1952.

নামে এই নির্বাচনী মোর্চা আওয়ামী লীগ, কৃষকশ্রমিক পার্টি, গণতন্ত্রী দল এবং নেজামে ইসলামী পার্টির সমন্বয়ে গঠিত হয়।[৩১] ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে এই যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই অধিবেশনেই শামসুল হকের পরিবর্তে শেখ মুজিবুর রহমানকে দলের সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের আবেগকে ধারণ করে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে যে ২১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে তাতে বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিসহ পূর্ববাংলার সকল শ্রেণীর পেশার মানুষের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিমণ্ডলে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৩২] এই ২১-দফা কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো ছিল বিগত ৭ বছরে পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের চরম অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। নির্বাচনে মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করে। যুক্তফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক বিজয়কে দেশে বিদেশে ব্যালট বাক্সে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৩৩] কিন্তু যুক্তফ্রন্টের দলীয় ২২৩ জন সদস্যর[৩৪] মধ্যে ১৪০ জনই[৩৫] আওয়ামী লীগের হওয়া সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট সাংগঠনিকভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কোপানল, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র এবং যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতার কারণে শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যায়।

এদিকে ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর এক অধ্যাদেশ বলে গভর্নর জেনারেল গণপরিষদ ভেঙে দেন। পূর্ব বাংলায় ৯২ক ধারার শাসন চলতে থাকায় ও গণপরিষদ বাতিল করার ফলে দেশ এক শাসনতান্ত্রিক সংকটের মধ্যে পড়ে। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ কয়েকটি বিষয়ে কর্মসম্পাদনের জন্য নিজের হাতে দায়িত্বভার গ্রহণের ঘোষণা দেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাকিস্তানের জন্য একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন, পূর্ব বাংলার নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' করা ইত্যাদি।[৩৬] এই অধ্যাদেশের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান থেকে চল্লিশ জন ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চল্লিশজন পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৮০ জন সদস্য নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করা হয়।

খসড়া সংবিধানে 'পূর্ব বাংলার' নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' করার প্রতিবাদে ১৯৫৫ সালের ২৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে ভাষণ দেন। গণপরিষদে বক্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেন:

> ... Sir, you will see that they want to place the words 'East Pakistan' instead of 'East Bengal.' ... you can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we will have to go back to Bengal and ask them whether they acccept it, what about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy?

---

[৩১] যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রেক্ষাপট বিস্তারিত দেখুন, Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh* (Dhaka: The University Press Limited, 1986), pp. 118-140.

[৩২] ২১-দফা কর্মসূচী বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ১ম খণ্ড*, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪।

[৩৩] আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৫), পৃ. ২৫৮।

[৩৪] মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

[৩৫] Rangalal Sen, *Op.cit.*, p. 125.

[৩৬] প্রফেসর নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮*; সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৬৩-৬৪।

> The people of East Benagl will be prepared to consider one limit with this entire thing. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.[37]

আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং যুক্ত নির্বাচন- যা সংবিধানে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। খসড়া সংবিধান সম্পর্কে গণপরিষদে আলোচনায় স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মনসুর আহমদ গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।[৩৮] শেখ মুজিবুর রহমান এ সংবিধানকে 'treachery'এবং 'bluff' বলে আখ্যায়িত করেন। সংবিধানে প্রেসিডেন্টের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দেয়া এবং রাষ্ট্রের নামকরণে 'Republic' ব্যবহারের সমালোচনা করে তিনি বক্তব্য প্রদান করেন।[৩৯] খসড়া শাসনতন্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতে গিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, এ শাসনতন্ত্রে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পার্লামেন্ট গঠন না করে পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।[৪০]

প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে পূর্ব বাংলার স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে দেখে আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালের ১৫ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভার আয়োজন করে। সভায় মওলানা ভাসানী,আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। আওয়ামী লীগ ২১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি জানায়।[৪১] যাহোক, আওয়ামী লীগ নেতাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ জারিকৃত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রত্যাহার এবং পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান' করা হয়।[৪২]

১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব বাংলায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে এবং ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথমটি পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব পাস এবং দ্বিতীয়টি যুক্ত নির্বাচনের আইন পাশ।[৪৩] এ ছাড়াও মাত্র দুই বছরেরও কম সময়ের শাসনামলে আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত ও সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে।[৪৪]

মৌলিক গণতন্ত্র ও সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ

---

[৩৭] শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ বিস্তারিত দেখুন, Shahryar Iqbal (ed.), *Sheikh Mujib in Parliament 1955-58* (Dhaka: Agamee Prokashani, 1997), pp. 1-13.

[৩৮] বিস্তারিত দেখুন, *CAP Debates*, Vol. I, N-52, 17 January 1956, p. 1861.

[৩৯] বিস্তারিত দেখুন, *Ibid*, pp. 1856-1857.

[৪০] গণপরিষদে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *Ibid*, Vol. I, No. 60, 31 January 1956, pp. 2227-2253.

[৪১] *দৈনিক আজাদ*, ১৬ জানুয়ারী ১৯৫৬।

[৪২] অবশ্য সংবিধানে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পায়। এর ২১৪(১) অনুচ্ছেদে ঘোষিত হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা। দেখুন *দলিলপত্র* ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৭।

[৪৩] ১৯৫৭ সালের ১ ও ২ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের সভায় ১৫৯-১ ভোটে স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব এর ১০ ও ১১ অক্টোবর পাকিস্তান গণপরিষদে ৪৮-৪৯ ভোটে যুক্ত-নির্বাচনের আইন পাশ হয়। দেখুন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০; আরও দেখুন, আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩), পৃ. ১০৬।

[৪৪] কর্মসূচীগুলো বিস্তারিত দেখুন, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার প্রতি গণতান্ত্রিক মানষিকতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। প্রেসিডেন্ট আইউব খান ব্রিটিশ পদ্ধতির গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানের ভূমি উর্বর নয়- এই তত্ত্বের ভিত্তিতে নিজস্ব ধরনের গণতন্ত্র চালু করেন যা মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত। এই গণতন্ত্রে সার্বজনীন ভোটাধিকার অস্বীকৃত হয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার করে ইউনিয়ন পরিষদ ও টাউন কমিটির সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় যারা পরবর্তী সকল নির্বাচনে যথা জাতীয় নির্বাচন ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইলেকটোরাল কলেজ হিসেবে কাজ করে। বলা হয়ে থাকে স্থানীয় জনগণ স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ভিত্তিক নেতা নির্বাচন করবে এই পদ্ধতিতে কিন্তু তারা agent for development না হয়ে fool of appression হিসেবে কাজ করে।[৪৫] বাস্তবে আইউব খান নিজের চিন্তা-চেতনা প্রসূত সমাজ সরকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হন। তারই corver stone হলো মৌলিক গণতন্ত্র। মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার পর তিনি রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছা অভিপ্রায় ও চেতনাকে প্রাতিষ্ঠনিকতা দান করার জন্য বহুসংখ্যক সংস্কার কমিশন গঠন করেন।

আইউব খানের সংস্কার কমিশনগুলোর মধ্যে একমাত্র জাতীয় শিক্ষা কমিশিনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণঅসন্তোষ সংগঠিত হয়। ১৯৬২ সালে সমগ্র বছরব্যাপী ছাত্র-সম্প্রদায় সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করে। তবে এই আন্দোলন অপরিকল্পিত ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক ও চাকুরিগত ব্যাপক বৈষম্য এবং পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে ক্রমান্বয়ে শোষণের ফলে সিভিল, নৌ, পদাতিক ও বিমান বাহিনীর বাঙালি অফিসার ও কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ন্যায়সঙ্গত প্রমোশন, চাকুরি প্রাপ্যের সুবিধাদির ব্যাপারে বঞ্চিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহের আয়োজন ত্বরান্বিত করে তোলে। বৈষম্য ও সমস্যাদির সমাধানের পথ না পেয়ে তারা স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখে। মধ্যষাট পর্যন্ত এই বিদ্রোহের আয়োজনের সাথে কোন রাজনৈতিক নেতা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবর্তীতে কৌশলগত কারণে শেখ মুজিবুর রহমানসহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের সাথে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমানও ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাকিস্তানের সাথে থাকতে হলে ওদের বশংবদ হয়েই থাকতে হবে। বাঙালিরা যদি জগতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় তবে তাদেরকে পৃথক হতেই হবে। এ ব্যাপারে তৃতীয় রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সাহায্য প্রয়োজন বলেও তিনি মনে করেন। এই বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন। কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম নতুন রাষ্ট্রের শোষণহীন সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে একটি শাসনতন্ত্রও রচনা করেছিলেন এবং পরিকল্পনার মধ্যে রাষ্ট্রের নাম, পতাকা ও প্রতীক পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছিল।[৪৬] যাহোক, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মারফত স্বৈরাচারী আইউব খানের উৎখাত সম্ভব নয়-- এই বিবেচনায় শেখ মুজিব স্থির করেন যে, প্রথমে তিনি ভারত, তারপর সেখান থেকে লণ্ডন গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবেন। এই অন্তর্ধান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তিনজন-- রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি এবং মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী নামে সিলেটের একজন চা বাগান মালিক। এ ব্যাপারে ভারতীয় দূতাবাসের সাথেও যোগাযোগ করা হয়। পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের

---

[৪৫] বিস্তরিত দেখুন, আবুল কাশেম, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ভাষা আন্দোলন থেকে ৬-দফা* মো. আখতারুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

[৪৬] দেখুন, ফয়েজ আহমেদ, *আগরতলা মামলা, শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৪), পৃ. ১৭-১৮।

রাজধানী আগরতলা যান, কিন্তু লণ্ডনে যাওয়া হয়নি।[৪৭] যাহোক, বাঙালি সাংস্কৃতিক এলিটদের সহায়তায় রাজনীতির দুই প্রতিনিধি শেখ মুজিবুর রহমান ও কম্যুনিস্ট পার্টির মনি সিংহ গোপন বৈঠকে মিলিত হয়ে সামাজিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। এই বৈঠকেই শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পাকিস্তানের সাথে বাঙালিদের থাকা সম্ভব নয় বলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের ইস্যুটিকে কর্মসূচিতে রাখার কথা প্রস্তাব করেন।[৪৮] কিন্তু বৈঠকে প্রবীণ নেতা মনি সিংহ শেখ মুজিবকে স্বাধীনতা প্রস্তাবের তাৎক্ষণিক সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে আন্দোলনের কর্মসূচি থেকে তা বাদ দিতে সম্মত করেন। ফলে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতা সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তনের দাবি জানিয়ে বিবৃতি প্রদান এবং ১৯৬২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে আওয়ামী লীগ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্ট যথাক্রমে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে আকস্মিক গ্রেফতারের ঘটনায় নির্ধারিত সময়ের আগেই ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে।[৪৯] ১৯৬২ সালের আন্দোলনটি জনপ্রিয়ভাবে শিক্ষা আন্দোলন নামে খ্যাত। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আন্দোলন ছিল কর্তৃত্ববাদী সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন।[৫০]

এদিকে আইউব খান অগণতান্ত্রিক সংবিধান জারি করে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সমন্বিতভাবে এনডিএফ[৫১] গঠন করে সংবিধানের গণতন্ত্রায়নের জন্য সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর সমন্বিত বিরোধীদলের নেতৃত্বশূন্যতার কারণে স্বতন্ত্রভাবে দলগুলো পুনরুজ্জীবিত হলে রাজনীতির গতিসঞ্চারিত হয়। দীর্ঘ রাজনৈতিক শূন্যতার পর নতুন পরিবেশে নতুনভাবে ও স্পষ্টতর বক্তব্যসহ বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রধান প্রতিনিধি আওয়ামী লীগ সংগঠিত হয়। ফলে নতুন প্রজন্মের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভাসহ নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান নেন।

১৯৬৪ সালের কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ পুনরুজ্জীবিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়। অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের রিপোর্টে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। রিপোর্টে যতদিন পাকিস্তানকে কল্যাণকর এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা না হয় ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।[৫২] সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের দাবি জানান হয়। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ১৯৬৪ সালের

---

[৪৭] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, মমিনুল হক খোকা, *অন্তরাগে স্মৃতি সমুজ্জল* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৮১-৮৭।

[৪৮] বিস্তারিত দেখুন, খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১৮২-১৮৩।

[৪৯] বিস্তারিত দেখুন, আবুল কাশেম, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ভাষা আন্দোলন থেকে ৬-দফা*, মো. আখতারুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

[৫০] *ঐ*।

[৫১] ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মুক্তি পেয়ে ঢাকায় এলে তাকে এক সংবর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত সমাবেশে সোহরাওয়ার্দী দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে সকল দলের সমন্বয়ে একটি ফ্রন্ট গঠনের আহবান জানান। এ আহবানে সাড়া দিয়ে আওয়ামী লীগ জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নুরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগের অংশ মিলে সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ৪ অক্টোবর (১৯৬২) 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট' (এনডিএফ নামে পরিচিত) নামে একটি ফ্রন্ট গঠিত হয়। মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬।

[৫২] দেখুন, ১৯৬৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের পেশকৃত রিপোর্ট, আবুল কাশেম, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, ঐতিহাসিক দলিলপত্র*, পৃ. ১৯৫।

সম্মেলনে প্রথমবারের মত একটি অসাম্প্রদায়িক, অনেকটা বামঘেষা ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে যা ছিল পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একটি অনন্য দলিল। ঘোষণাপত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে এবং দেশের সব প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে কোন সংবিধান গঠিত না হলে তা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করা হয়।[৫৩]

পুনরুজ্জীবিত হবার পর আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র রাজনীতি নিয়ে মাঠে নামে এবং এই সময় থেকেই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি কর্মসূচিতে প্রাধান্য পায়। এদিকে ১৯৬৪ সালের জুন মাসেই ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট, মার্চে জাতীয় পরিষদ এবং এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কনভেনশন মুসলিম লীগ আইউব খানকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দেয়। নির্বাচনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিরোধী দলগুলো একলা চলার নীতি পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত চিন্তা করতে থাকে।

COP গঠন

১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় এনডিএফ এর সম্মেলন নুরুল আমিনকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে সমস্ত মতাদর্শগত বিভিন্নতার উর্ধ্বে উঠে এক মঞ্চে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। বিরোধী দলগুলো উপলব্ধি করে যে, তারা যদি তাদের মর্যাদা, আদর্শগত পার্থক্য এবং ব্যক্তিত্বের সংঘাত ভুলে এক হতে না পারে, তবে আইউবের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে পারবে না।[৫৪] এমতাবস্থায় ১৯৬৪ সালের ২১ জুলাই পাঁচটি বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের একটি প্রস্তাব সমর্থন করে এবং সম্মিলিত বিরোধী দল (Combined Opposition Party সংক্ষেপে COP) নামে একটি জোট গঠন করে।[৫৫] জোটের পক্ষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রার্থী মনোনয়ন এবং ৯-দফা নির্বাচনী কর্মসূচি ঘোষণা করে জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন তথা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কপের প্রোগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল আইউবকে হটিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রদেশব্যাপী ৫০টি জনসভা করেন। আওয়ামী লীগের এ প্রচারণার ফলে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তারা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক এবং সংগঠিতভাবে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।[৫৬] পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনী প্রচারাভিযানে ব্যাপক অংশগ্রহণ করে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত করে।[৫৭] শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হন– আইউব খান জয়লাভ করেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ফলে কপের মনোবল ভেঙে যায় ও অনৈক্য প্রকট হয়। পরে জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারে নি। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের প্রভাবে কপ শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও কপের অন্তর্গত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা মওলানা ভাসানী অসুস্থতার অজুহাতে নির্বাচনে সক্রিয় অংমগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। আসলে তিনি তখন পুরোপুরি

---

[৫৩] দেখুন, Full text of the Post-Revival Draft of EPAL Manifesto of 1964, Shyamoli Ghosh, *op.cit.*, p. 289.

[৫৪] Rounaq Jahan, *Pakistan Failure in National Integration* (Dhaka: The University Press Limited, 1994), p. 150.

[৫৫] *Ibid*, pp. 150-151; Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League* (Dhaka: The University Press Limited, 1982), p. 72.

[৫৬] বিস্তারিত দেখুন, Shyamoli Ghosh, *op.cit.*, p. 98.

[৫৭] Rangalal Sen, *op.cit.*, p. 193.

আইউবের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যখন ১৯৬২ সালে এনডিএফ গঠন করা হয়েছিলো তখনও মওলানা ভাসানী একে Nothing Doing Front (NDF) বলে বিদ্রুপ করেন। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি সরকারী দলের নেতারূপে কম্যুনিষ্ট চীনের বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগ দেন।[৫৮] এমনকি সংখ্যায় কম হলেও জাতীয় সংসদের বিরোধী সদস্যরা নুরুল আমিনের নেতৃত্বে একটি ইউনাইটেড পার্লামেন্টারি পার্টি বা সংযুক্ত সংসদীয় দল গঠন করেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংসদরা ঐ গ্রুপে যোগ দিতে অস্বীকার করেন।

৬-দফা কর্মসূচি

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার ফলে কপের মনোবল ভেঙে যায় ও অনৈক্য প্রকট হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারে নির্লিপ্ততা বাঙালি জনগণ্ঠীকে শঙ্কিত করে তোলে। তাছাড়া অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারে পূর্ব পাকিস্তানের নগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং এ অবস্থা থেকে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করে। ঠিক সে মূহুর্তে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ৬-দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।[৫৯] কিন্তু সম্মেলনে ৬-দফা কোন আলোচনা না হওয়াতে শেখ মুজিব তার ছোট প্রতিনিধি দল নিয়ে সম্মেলন ত্যাগ করেন। এমনকি বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতেও উপস্থাপিত হয়নি। কেবল তাই নয়, ওয়ার্কিং কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি র ৬-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়।[৬০] মওলানা ভাসানীসহ আরো কিছু প্রবীণ নেতা এবং ইসলামপন্থী দলগুলো কর্মসূচির বিরোধিতা করে। ১৯৬৬ সালের ১৮ ও ১৯ মার্চ অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬-দফার বিরোধীতা করে সভাস্থল ত্যাগ করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। মওলানা ভাসানী ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে এক বিবৃতি দিয়ে ৬-দফা কর্মসূচিকে পশ্চিমা-সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বর্ণনা করে একে অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম্পূর্ণ বলে প্রত্যাখান করেন। পরিবর্তে জুন মাসে তার দল ১৪-দফার কর্মসূচি ঘোষণা করে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে চলতে বা তার বিরোধিতা করতে থাকেন। ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক এম.এইচ. উসমানীর মতে, '৬-দফা নিশ্চিতভাবে দেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে।' পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সেক্রেটারী শফিকুল ইসলাম এই ৬-দফায় পাকিস্তান ভাঙ্গার পরিকল্পনা দেখতে পান। আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য আরশাদ চৌধুরী একে দেশ ও দল ভাঙ্গনের এক অশুভ কর্মসূচি বলে অভিহিত করেন। প্রেসিডেন্ট আইউব কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা যারা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের শ্লোগান তুলছে তাঁদের বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা সম্পর্কে জাতিকে হুঁশিয়ার করে দেন।[৬১] ৬-দফার মূল বক্তব্য ছিলো পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বাদ দিয়ে আর সব ব্যাপারে পূর্ব বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও পূর্ববঙ্গের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা।[৬২] ৬-দফার প্রথম দফাটি ছিল

---

[৫৮] এ ব্যাপারেবিস্তারিত দেখুন, প্রীতি কুমার মিত্র, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬*, সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪-১০৫।

[৫৯] Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *op.cit*, pp. 99-180.

[৬০] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ২৫৯-৬৯ (এরপর থেকে দলিলপত্র ২য় খণ্ড লেখা হবে)।

[৬১] এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন, Shyamoli Ghosh, *op.cit.*, pp. 120-124.

[৬২] মোঃ হাফিজুর রহমান খান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ৫৮।

সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক। এ দফায় লাহোর প্রস্তাবের এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত পার্লামেন্টারী পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবিক অর্থে একটি ফেডারেল গঠনের সুপারিশ করা হয়।[৬৩]

প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব সে সময় চেয়েছিলো পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে জনগণের অধিকার আদায় করতে। ৬-দফার কোথাও প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও সত্যিকার অর্থেই তা ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তির সনদ বা Magna Carta।[৬৪] ভাষা আন্দোলন ছিল স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম সোপান, একই ধারাবাহিকতায় ৬-দফা ছিল স্বাধিকার আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায়। প্রয়াত সাংবাদিক ওবায়দুল হকের ভাষায় ৬-দফা হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অগ্রিম জন্মসনদ। ৬-দফা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ নূরুল ইসলাম যথার্থই এই কর্মসূচিকে 'only a short step away from complete independence' বলে অভিহিত করেছেন।[৬৫]

১৯৬৬ সালের মধ্যে ফেব্রুয়ারি থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচির পক্ষে গণসমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে গণসংযোগ শুরু করেন। ফলে ৬-দফার পক্ষে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি হয় যা সত্যিই অকল্পনীয় ব্যাপার।[৬৬] এতে ভীত হয়ে আইউব সরকার পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে যেখানেই জনসভা করতে যান সেখানেই শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। কেবল শেখ মুজিবই নন, ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে দলের প্রায় ৩৫০০ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন।[৬৭] শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন গোটা প্রদেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। দেশের শ্রমিক শ্রেণী প্রথমবারের মত একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

৬-দফা কর্মসূচি পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানে। জেনারেল আইউব শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের এক নম্বর দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করে ৬-দফা পন্থীদের দমনে 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকি দেন।[৬৮] শুধু তাই নয়, ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে আইউব সরকার শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় এক নম্বর আসামি করে একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করেন, যা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে পরিচিত।[৬৯] আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভায়

---

[৬৩] *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ২৬০।

[৬৪] Obaidul Huq, *Bangabandhu Sheikh Mujib: A Leader with A Difference* (Original, Voice of Thunder, 1973), Second Edition (Dhaka: Radical Asia Publications, 1996), p. 57.

[৬৫] Nurul Islam, *Making of a Nation: An Economist's Taler* (Dhaka: UPL, 2003), p. 94.

[৬৬] আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ১৩৯।

[৬৭] *ঐ*, পৃ. ১৪২।

[৬৮] এম.আর. আখতার মুকুল, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করে আইউব খান পদত্যাগে বাধ্য হলেন, *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২০ মার্চ ২০০৪।

[৬৯] এ মামলার আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। উল্লেখ্য যে শেখ মুজিব ছাড়াও এ মামলায় আরো ৩৪ জন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তি অভিযুক্ত ছিলেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, এক নম্বর আসামি ভারতের সাহায্যে সশস্ত্র পন্থায় পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন করার লক্ষ্যে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আরো বলা হয় যে, মুজিব ও তার সহযোগীরা এ ব্যাপারে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। এমনকি, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এরা গোপন বৈঠকেও মিলিন হন। দেখুন, হারুন অর রশিদ, 'ছেষট্টি থেকে একাত্তর', মো. আখতারুজ্জামান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্য বিচার দাবি করা হয়।[৭০] শেখ মুজিব জেল থেকেই ঘোষণা করেন যে, কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানবাসীর স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে বানচাল করার উদ্দেশ্যেই এই ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়েছে।

ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি সংক্ষেপে 'ডাক' গঠনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে বেগবান করে। একদিকে ১৯৬৬ সালের ৭ জুনের পরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অসংখ্য কর্মী কারারুদ্ধ হওয়ায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাবার মত নেতাকর্মীর অভাব ঘটে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হবার পরে গণআন্দোলন ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৬৯ এর শুরুতে তা তীব্র আকার ধারণ করে। তাই সমগ্র দেশব্যাপী গণআন্দোলন পরিচালনার তাগিদে ৭ ও ৮ জানুয়ারি ঢাকায় দুইদিনব্যাপী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি (১৯৬৯) আওয়ামী লীগসহ আটটি বিরোধী দল ৮-দফা কর্মসূচি ভিত্তিক Democratic Action Committee সংক্ষেপে 'DAC' গঠন করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিকভাবে দেশ পরিচালনা করা।[৭১] ন্যাপ ভাসানী এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি এতে যোগ দেয় নি। তবে DAC এর পক্ষে আইউব বিরোধী গণআন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এদিকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রাত্যহিক কার্যবিবরণী যতই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হতে থাকে বাঙালিরা ততই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই ক্রান্তিকালে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিল, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং আইউবের পদত্যাগের দাবিতে ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলে। নির্যাতিত জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য এই পরিষদ ১১-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।[৭২] এই ১১-দফা দাবির মধ্যে আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবি অন্তর্ভুক্ত করে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ৬-দফা কর্মসূচি, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে নবশক্তি দান করে। একই সময় পাশ্চিম পাকিস্তানের আইউব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার আপামর জনতা ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন, কার্ফু ভাঙ্গা, পুলিশ, ই.পি.আর., সেনাবাহিনী উপেক্ষা করে রাস্তায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৯৬৯ সালের ২০ জানয়ারী পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানের মৃত্যু, ২৪ জানুয়ারি পুলিশের বুলেটে নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র মতিউরের মৃত্যু, ১৫ ফেব্রুয়ারি বন্দী অবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হকের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া, ১৮ ফেব্রুয়ারি ই.পি.আর. এর গুলিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহার শহীদ হওয়া ইত্যাদি মর্মান্তিক ঘটনা সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দেয়। আইউব শাসন-বিরোধী উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান চূড়ান্ত রূপ পায়। ২২ ফেব্রুয়ারি জেনারেল আইউব মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দান এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে লাখো জনতার পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়। এ পর্যায়ে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এক মহানায়কের ভাবমূর্তি অর্জন করেন। তিনি ছাত্রদের ১১-দফার প্রতি সমর্থন জানান। কারণ এই ১১-দফার মধ্যে আওয়ামী লীগের ৬-দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ্য করা যায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে বিকল্প উপায়গুলো হাতে রাখে। তাঁরা মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, ছাত্রদের কর্মসূচির প্রতি সমর্থনও জানাচ্ছিলেন, আবার DAC এর সাথেও যোগ দিয়েছিলেন। DAC এর কর্মসূচিতে আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের দাবি না থাকলেও তাতে রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি ছিল।

---

[৭০] দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ৩০১।

[৭১] কর্মসূচীগুলো দেখুন, নুরুল হুদা (সম্পা.), *আবদুল হক, লেখকের রোজনামচায় চার দশকের রাজনীতি পরিক্রমা প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৯৫৩-৯৩* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬), পৃ. ১৩২; আরও দেখুন *দৈনিক আজাদ*, ৯ জানুয়ারী ১৯৬৯।

[৭২] ১১-দফা কর্মসূচী বিস্তারিত দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ৪০৫-৪০৮।

আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য প্রেসিডেন্ট আইউবের ওপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যাপক সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া অতিমাত্রায় বামপন্থীকরণ ঠেকানোর এটিই ছিল একমাত্র পন্থা। এটি তাদের নিজ অবস্থান বজায় রাখা নিশ্চিত করতেও দরকার ছিল। এই পন্থা ছাত্র উদ্যোগ ও উদ্যমের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা থেকে তাদের রক্ষাও করে। ১০ থেকে ১৩ মার্চ ১৯৬৯ লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট আইউব আহুত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিব ৬-দফা কর্মসূচিতে অটল থাকেন এবং পরে ডাক ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য যে, মওলানা ভাসানীই সেই ব্যক্তি যিনি প্রয়োজনে জেলের দেয়াল ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করার আহবান জানিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী যুবক-তরুণদের মনে বিপ্লবী চেতনার আগুন জ্বালিয়েছিলেন।[৭৩] পরবর্তীতে তার এই অবস্থান তিনি ধরে রাখতে পারেননি। লাহোরে "ঢাকায়, মওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনায় শেখ মুজিব সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা প্রশ্ন করা হলে শেখ মুজিব বলেন, তা হলে তো মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকেই আসতেন।"[৭৪] পরে মওলানা ভাসানীর ঘোলাটে ভূমিকা আরও বিভ্রান্তকর হয়ে ওঠে।

১৯৬৯ সালের কাউন্সিল অধিবেশন

১৯৬৯ সালের কাউন্সিল অধিবেশনের নীতি ও কর্মসূচিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয় যে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান কায়েম করা হয় এ উদ্দেশ্যে যে, এখানে সুবিচার ও ন্যায়নীতি ভিত্তিক এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যেখানে জনগণের জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গীণ মানোন্নয়নের মাধ্যমে এক সুখী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং জনগণের নির্দেশেই সকল ব্যবস্থার উৎস্য বলে ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়।[৭৫] আওয়ামী লীগ হিন্দু-মুসলিম বাঙালি-অবাঙালি প্রভৃতি সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বিভেদ ও বিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী বলেও ঘোষণাপত্রে বলা হয়।[৭৬] এতে ঘোষণা করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সর্বস্তরে বাংলা ভাষাকে যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রচলন করতে হবে এবং পাকিস্তানের সরকারী ও বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও ব্যবহারিক জীবনে বাংলাভাষার ব্যাপক প্রসারের চেষ্টা করতে হবে।[৭৭]

যাহোক, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে প্রেসিডেন্ট আইউব খান যে পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন তাতে বোঝা যায়, পাকিস্তান তখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে "প্রেসিডেন্টের, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ও প্রেসিডেন্টের জন্য সরকার" গোটা জনসমষ্টির রাজনীতি সম্পর্কিত সাধারণ মানুষের কাছে আর মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। রাজনৈতিক দল হিসেবে অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি খাপ খাওয়ানোর প্রবণতা ও চালিকাশক্তি সম্পন্ন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ তথা শেখ মুজিবই সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবিদার হতে পেরেছিল। ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটেছিলো বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তা উত্তপ্ত লোহার মত অবস্থায় উপনীত হয়। এরপর সেই উত্তপ্ত লোহারূপী জাতীয়তাবোধকে সঠিক ও প্রয়োজনীয় আকার প্রদান করে ব্যবহাররোপযোগী করে গড়ে তুলতে দক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। আর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আওয়ামী লীগ। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এতদঞ্চলের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের মনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনা পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি

---

[৭৩] Shyamoli Ghosh, *op.cit.*, pp. 151-152.

[৭৪] সৈয়দ আবুল মকসুদ, *মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৩২৪।

[৭৫] পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচী দেখুন, আবুল কাশেম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৩।

[৭৬] *ঐ*, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

[৭৭] ঘোষণাপত্রটি বিস্তারিত দেখুন, *ঐ*, পৃ. ২৩২-৪০; আরও দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, পৃ. ৪৬৭-৭০।

জাতীয়তা চেতনা গ্রহণে সহায়তা করে। মাত্র দু'বছরের মধ্যে বাঙালির এই চেতনাকে আওয়ামী লীগ নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে একটি জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচন

এদিকে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইউব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৮ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, যতশীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা।এ ঘোষণার পর সমগ্র দেশব্যাপী যখন সাধারণ জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে একটি সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষিত নির্বাচন সংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক আইন কাঠামো আদেশ (Legal Framework Oder - LFO) সমগ্র রাজনীতিবিদ তথা আপামর জনগণকে আলোড়িত করে। LFO এর ২৫ ও ২৭ অনুচ্ছেদ দুটি পাকিস্তানীদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক নীতিমালা নির্বাচন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আইন প্রণয়ন ইত্যাদি প্রচারের পরও এই অনুচ্ছেদ দুটিতে প্রেসিডেন্টের হাতে স্বেচ্ছাচারী কিছু ক্ষমতা রেখে দিয়ো হয়, যা ছিল সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং শাসনতন্ত্র প্রনেতাদের ব্লাকমেইল করার নামান্তর।[৭৮] আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান শাসনতন্ত্র গঠনকর পরিষদকে সার্বভৌম করার জন্য LFO-এর রিভিশন দাবি করেন।[৭৯] এমনকি ১৯৭০ সালের জুনে আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনেও তিনি LFO-এর ২৫ ও ২৭নং অনুচ্ছেদের বাতিলের দাবি জানান। তিনি বলেন যে, জনগণই সর্বময় ক্ষমতার উৎস এবং দেশে জনগণের ওপর আর কোন ক্ষমতা থাকতে পারে না।[৮০] LFO-দ্বারা সৃষ্ট গণতন্ত্রের পথে প্রতি বন্ধকতার জন্য মওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমদ, আতাউর রহমান খানও এর সমালোচনা করেন।[৮১]

LFO-এর সমালোচনা করলেও আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ ৬-দফা ও ১১-দফা কর্মসূচি ভিত্তিক দীর্ঘ নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়মত প্রকাশ করে ইশতেহারে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ এমন একটি বাস্তব গণতন্ত্র প্রবতর্নের আশ্বাস দেয় যাতে করে জনগণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে পারে এবং সেখানে সাম্য ও সুবিচার বিরাজ করবে। জনগণকে বড় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করে ইশতেহারে বলা হয় যে, জনগণকে যদি ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজে সর্বত্র কাজে লাগানো যায় তবেই প্রাতিষ্ঠানিক এবং কাঠামোগতভাবে সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।[৮২] আওয়ামী লীগ কোটি কোটি মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষভাবে পরিপুষ্ঠ করার সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করে ন্যায় পরায়নতার আলোকে মানুষে মানুষে এবং অঞ্চলে অঞ্চলে সাম্য-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নয়া শাসনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও সমাজব্যবস্থা কায়েম করে গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি

---

[৭৮] ২৫ ও ২৭ নং অনুচ্ছেদ বিস্তারিত দেখুন, Moudud Ahmad, *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy 1950-1971* (Dhaka: University Press Limited, 1979), p. 196; আরও দেখুন, *The Pakistan Observer*, 30 March 1970.

[৭৯] *জনতা*, ১২ এপ্রিল ১৯৭০।

[৮০] বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৫ জুন ১৯৭০।

[৮১] মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খানের সমালোচনা দেখুন, *দৈনিক সংবাদ*, ২৭ এপ্রিল, ৩ ও ১০ জুন ১৯৭০।

[৮২] Shyamali Ghosh, *op.cit.*, p. 186; আরও দেখুন, *Bangladesh Documents* (New Delhi, Ministry of External Affairs, 1971), p. 67.

দেয়।[৮৩] এতে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করবে বলা হয়। ইশতেহারে বলা হয় যে, দেশের সরকার হবে ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার দেয়া, শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধাসহ সকল সরকারী চাকুরীতে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। বাংলা এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এবং সর্বক্ষেত্রে ইংরেজী চালুর কথাও এতে বলা হয়।[৮৪] আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচন উপলক্ষ্যে বেতার ও টেলিভিশনে যে ভাষণ দেন তা ছিল গণতন্ত্রের আদর্শে উজ্জীবিত।[৮৫]

যাহোক, নির্বাচনে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত আশা ধূলিসাৎ করে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৮৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন লাভ করে।[৮৬] আওয়ামী লীগের প্রতি এই বিপুল রায় ছিল পাকিস্তানের গণতন্ত্র তথা ৬-দফারই বিজয়। এই ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচিকে প্রত্যাখান করে। ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দলীয় নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে সদস্যবৃন্দ ঐতিহাসিক ৬-দফা এবং ১১-দফার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার শপথ গ্রহণ করেন। নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের 'ভাবী প্রধানমন্ত্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করলেও[৮৭] ভেতরে ভেতরে নির্বাচনের রায় বানচালের ষড়যন্ত্র চলে। এর সাথে যুক্ত হন পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো। ক্ষমতার লোভে তিনি উন্মাদ হয়ে ওঠেন এবং নানা যুক্তি খাড়া করতে থাকেন। এমনকি ক্ষমতায় যাবার জন্য তিনি নতুন শ্লোগান তোলেন। 'ইধার হাম, উধার তুম' অর্থাৎ এখানে আমি ওখানে তুমি।[৮৮] কিন্তু ক্ষমতা ভাগাভাগির এ প্রস্তাবকে আওয়ামী লীগ প্রধান প্রত্যাখান করেন।

অসহযোগ আন্দোলন

ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আকস্মিকভাবে ১ মার্চ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। তাঁর এ আহবানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ পালিত হয়। ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনীর নির্বিচার আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানই হয়ে ওঠেন কার্যত সরকার প্রধান।

যাহোক, প্রবল জনতার চাপে ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ দিনই টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠালে হাইকোর্টের বিচারপতি বদরুদ্দিন বিএ সিদ্দিকী নবনিযুক্ত গভর্নর লে. জে. টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আওয়ামী লীগ পরিচালিত অসহযোগ

---

[৮৩] *Ibid.*

[৮৪] আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার বিস্তারিত দেখুন, *The Morning News*, 8 June 1970.

[৮৫] দেখুন *দৈনিক পাকিস্তান*, ২৯ অক্টোবর ১৯৭০। আরও দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক* ২৯ অক্টোবর ১৯৭০।

[৮৬] *The Dawn*, 18 December 1970.

[৮৭] *The Pakistan Observer*, 7 March 1971.

[৮৮] লে. জেনারেল গুলহাসান, *পাকিস্তান যখন ভাঙ্গলো* (এম শামসুদ্দিন অনুদিত) (ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৬), পৃ. ২১।

আন্দোলনে শরীক হন। সমগ্র পরিস্থিতির জন্য প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তিনি বরঞ্চ জোরের সাথে বলেন, æThe armed forces would maintain complete and obsolute integrity of the country."[৮৯]

৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান যে নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে তা মাইলফলক বিশেষ। স্বাধীনতার চেতনায় প্রদীপ্ত বাঙালি জাতির জন্য এ ভাষণ ছিল পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করে জাতীয় মুক্তি বা কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।[৯০] একই সঙ্গে তিনি চারটি দাবি[৯১] উপস্থাপন করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন। যদিও চূড়ান্ত লক্ষ্য স্বাধীনতা তবু ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত থাকেন। তবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়েও শেখ মুজিব জনগণের সমর্থন পেয়েছিলেন, তার প্রমাণ অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত না হয়ে বরঞ্চ আরও জোরদার হয়।

আলোচনার নামে প্রহসন

রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে ১৫ মার্চ কয়েকজন জেনারেলকে সাথে নিয়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়। এ সময় পরিপূর্ণ সংবিধান রচনার চাইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েই বেশী আলোচনা করা হয়। সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটিও ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়া ঐকমত্যে পৌঁছেন।[৯২]

কিন্তু পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হয়নি। পিপিপি এ ব্যবস্থাটিকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি একটি বড় বিশ্বাসঘাতকতা বলে উল্লেখ করে।[৯৩] এদিকে সমস্যার দ্রুত সমাধান, না হয় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য শেখ মুজিবের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল। ১৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও কর্নেল ওসমানী গোপনে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেন। ঐ দিনই জয়দেবপুরে স্থানীয় জনসাধারণ বাঙালি সৈনিকদের সাথে মিলিত হয়ে একযোগে পাকিস্তানী সৈনিকদের আক্রমণ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সরাসরি ও প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সূচনা করে। এতে বাঙালি সৈনিকসহ বহু সৈনিক গ্রামবাসীও নিহত হয়।[৯৪] ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলাকালীন সময়ে ভুট্টো এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং আলোচনাকে সন্তোষজনক বলে আখ্যায়িত করেন।

---

[৮৯] *The Pakistan Observer*, 7 March 1971.

[৯০] মওদুদ আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭।

[৯১] দাবি চারটি হলো: সামরিক আইন প্রত্যাহার, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, গণহত্যার তদন্ত করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। রেসকোর্স ময়দানে প্রদত্ত আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের ভাষণ দেখুন, *দলিলপত্র ২য় খণ্ড*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০০-৭০২; আরও দেখুন, মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *বাঙালির কণ্ঠ* (ঢাকা: বঙ্গবন্ধু পরিষদ; ১৯৯৮), পৃ. ২৪৫-৪৮।

[৯২] ঐকমত্য বিষয়ে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ দেখুন, উদ্ধৃত সিমিন হোসেন রিমি (সম্পা.), *তাজউদ্দীন আহমদ: ইতিহাসের পাতা থেকে* (ঢাকা: প্রতিভাস, ২০০০), পৃ. ১১৬।

[৯৩] *The Dawn*, 20 March 1971.

[৯৪] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ মার্চ ১৯৭১।

একদিকে যেমন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক উপায়ে সংকট নিরসনের জন্য দিনের পর দিন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার জেনারেলদের নিয়ে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। প্রেসিডেন্টের নির্দেশেই মেজর জেনারেল রাজা ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তৈরি করেন 'অপারেশন সার্চলাইট'– বাঙালি নিধনযজ্ঞের পরিকল্পনা। ২৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট এ পরিকল্পনা অনুমোদন করেন।[৯৫] প্রতিদিন ৬ থেকে ১৫টি পর্যন্ত পিআইএ-র ফ্লাইটে সৈন্য ও রসদ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে রাখা হয়।[৯৬]

২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলী ৬-দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে একটি খসড়া ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেন।[৯৭] ২৩ মার্চেই বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে নিজ হাতে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজ পতাকা উড়িয়ে দেন। আওয়ামী লীগ সব সময়ই গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী ছিল। তবে তিনি ৭ মার্চের ঘোষণায় "যদি একটি মাত্রও গুলি চলে অথবা আর একটি মাত্র বাঙালিকে হত্যা করা হয়, তবে প্রত্যক্ষ্য যুদ্ধ শুরু হবে এবং যুদ্ধ করেই স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর করে নিতে হবে" বলেন। আওয়ামী লীগ নেতারা ২৪ মার্চ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত না করে পরের দিন (২৫ মার্চ) খসড়া ঘোষণাটি চূড়ান্ত করার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদার সাথে কথা বলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আনুষ্ঠানিক আলোচনা ভেঙে না দিয়ে সংকটের সামরিক সমাধানের নির্দেশ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পথে পাড়ি জমান। অথচ ২৫ মার্চেও আওয়ামী লীগ নেতারা গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনারত ছিলেন। ঢাকা ত্যাগের আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সেনাবাহিনীকে বাঙালি হত্যার এক অবাধ লাইসেন্স দিয়ে যান। শুরু হয় বাংলাদেশের নিরস্ত্র, নিরপরাধ মানুষের ওপর মানব ইতিহাসের নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ গণহত্যা।

স্বাধীনতার ঘোষণা

আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রেসিডেন্টের ঢাকা ত্যাগের খবর শুনে রাত ৯টার পর তার বাসভবনে উপস্থিত দলীয় নেতা, কর্মী, সমর্থক, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমরা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অখণ্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি টানতে চলেছেন। তিনি আরো বলেন, আমাকে হয়ত ওরা হত্যা করতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, আমার সমাধির ওপর একদিন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করবেই।[৯৮] ২৫ মার্চ রাতেই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হবার পূর্ব মূহুর্তে ইপিআর-এর ওয়ারলেস যোগে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন।[৯৯] ঘোষণাটি ২৬ মার্চ পড়ে শুনানো হয়। ২৬ মার্চ সন্ধায় প্রেসিডেন্ট এক বেতার ভাষণে সমস্ত দোষ শেখ মুজিবের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বলেন, দেশের অখণ্ডতা অব্যাহত রাখার জন্যই পূর্ববঙ্গে দমন নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অবস্থার উন্নতি হলে আবারও

---

[৯৫] কামাল হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধ কেন অনিবার্য ছিল* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮), পৃ. ৭৫।

[৯৬] মণি সিংহ, *জীবন সংগ্রাম* (ঢাকা: বর্তমান সময় প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ২৭৪।

[৯৭] ৫ আগস্ট ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রের ৬১-৭৫ পৃষ্ঠায় 'ঙ' পরিশিষ্ঠে আওয়ামী লীগের ১৯৭১ সালের খসড়া মেনিফেস্টো আছে।

[৯৮] মাহমুদ হাসান, *ভাষা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ নেতাদের ভূমিকা* (ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২০০৩), পৃ. ৭৯।

[৯৯] বাণীটি হলো: This may be my last message. From today Bangladesh is independent- I call upon the people ever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on untill the last soldier of the Pakistan occupation army is exepelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved. দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ড* (ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২), পৃ. ১।

জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার চেষ্টা করা হবে।[১০০] এভাবেই বাঙালির অবসংবাদিত নেতারে হাতে শান্তিপূর্ণ পন্থায় গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক আগ্রাসনের পথ অবলম্বন করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানই অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বের মূলে আঘাত হানে।

এদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সরে পড়েন। তারা পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল কুষ্টিয়ার অন্তর্গত মেহেরপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে। সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে দেশবাসীকে একটি সংবিধান প্রদান করেন। সংবিধানে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[১০১]

উপসংহার

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তান সৃষ্টির পরে ধর্মভিত্তিক দর্শন যথার্থতা হারিয়ে ফেলে। মুসলিম লীগ জমিদার জোতদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হতে থাকলে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের মধ্যবিত্ত প্রভাবিত অংশ আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করে। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠালগ্নের ঘোষণাপত্রে গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে মুসলমানরা সকল সমস্যা আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করবে বলা হয়। জনগণের চিন্তার স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সংগঠন গড়ে তোলা সহ সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে। বাংলা ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হয়, তার প্রভাব ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনেও পরিলক্ষিত হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার জন্য গঠিত যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক নির্বাচনী ইশতেহারের নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে যে ভাবাদর্শ বিধৃত ছিল তার আধারও আওয়ামী লীগের প্রাথমিক ঘোষণাদি। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে আলোকে পাকিস্তানে গণতন্ত্রচর্চার সামান্যতম সুযোগ দেখা গেলেও ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট আইউব খান সামরিক শাসন জারি করে পাকিস্তানে রাজনীতি ও গণতন্ত্র চর্চার পথ বন্ধ করে দেন। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক শোষণের মাত্রাও এসময় তীব্রতর হয়। ফলে স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতে ছিল তা স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত করার চেষ্টাও এ সময় লক্ষ্য করা যায়। শত নির্যাতন সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় এনডিএফ গঠন করা হয়। ১৯৬৪ সালে পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে পাকিস্তানকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে ঘোষণাপত্রে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে বৈষম্য দূর করার নীতির ওপর জোর দেয়া হয়। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে সরকার বিরোধী 'সম্মিলিত বিরোধী দল' গঠিত হলেও নির্বাচনে আইউব খানই জয়লাভ করে। বাঙালি বুঝতে পারে মৌলিক গণতন্ত্রের অধীনে পূর্ববাংলায় স্বায়ত্তশাসন অর্জন ও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই ৬-দফার মাধ্যমে 'তুমিও বাঁচো আমাকেও বাঁচতে দাও' এই নীতি গ্রহণ করে শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগ। এই ৬-দফা দাবি র নিয়েই আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে একক প্রাধান্য বিস্তার করে– পরিণতিতে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান হয়। গণঅভ্যুত্থানের চাপে প্রেসিডেন্ট আইউব খান সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে অপসৃত হতে বাধ্য হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ ৬-দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনী ইশতেহার গ্রহণ করে এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠনের অধিকারী হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ

---

[১০০] আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি সংগ্রাম ও জয়*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯০), পৃ. ২৩৩-২৩৪।

[১০১] বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৮(১) অনুচ্ছেদে গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি করা হয়। দেখুন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ১২ অক্টোবর, ১৯৭২, পৃ. ২৫০৪।

অগণতান্ত্রিকভাবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয় আওয়ামী লীগ। গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে পরিণত হয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনিবার্য ধারায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ বিবর্তন বাদী প্রক্রিয়ায় নিজের কর্মসূচি ও ভাবাদর্শকে ইতিবাচক ধারায় পরিবর্তন ঘটায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে একটি সংবিধান দিতে সক্ষম হয়, যাতে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের প্রতিপলন লক্ষ্য করা যায় এবং গণতন্ত্রকে সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

ভাষা আন্দোলন সংগঠনে তমদ্দুন মজলিসের ভূমিকা

মো. আব্দুল লতিফ ভূঁইয়া*

Abstract: After the partition, the Language Movement was important event in the history of East Bengal. During this period, there was no organized party or association to represent the interests of the people of East Bengal. At first 'Tamaddun Majlish' (1947) was the only organized cultural association which inspired the people to involve themselves in the Language Movement. The Tamaddun Majlish took the initiative by forming an action committee in favour oi the National Language. The 'Weekly Sainik', the organ of 'Tamaddun Majlish' represents an important role to bring unity and solidarity of the people of East Bengal from 1947 to 1957.

ভূমিকা

'তমদ্দুন মজলিস' ভাষা আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামের আদর্শ ভিত্তিক একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হলেও ভাষা ও অন্য অনেক প্রশ্নে সংগঠনটির মতবাদ ছিল গণমুখী। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের সূচনা হলেও বাস্তবে তা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ও সংস্কৃতির বিশাল পার্থক্যের কারণে সূচনা লগ্নেই জটিলতা দেখা দেয়। পূর্ব বাংলায় ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়নে রাজনৈতিক চিন্তাবিদেরও শূন্যতা দেখা দেয়। এ শূন্যতা দূর করার ব্রত নিয়েই 'তমদ্দুন মজলিসে'র প্রতিষ্ঠা। সাপ্তাহিক মুখপত্র *'সৈনিক'* 'তমদ্দুন মজলিসে'র আদর্শ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বাংলায় আরবি হরফ প্রবর্তন প্রতিরোধে *'সৈনিক'* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পত্রিকাটি প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদের পাশাপাশি প্রতিরোধেও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। তমদ্দুন মজলিস এবং তাদের মুখপত্র *'সৈনিক'* বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় সমান্তরালভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে।

তমদ্দুন মজলিস'-এর অর্থ সংস্কৃতি সভা, সাংস্কৃতিক দল। এটি মূলত একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর এটি ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের তৎকালীন প্রভাষক (পরবর্তীতে অধ্যাপক) আবুল কাসেম। দেশ বিভাগের পর পূর্ব

---

* পিএইচ ডি গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিল পত্র* (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে (পৃ. ৪৯) ২ সেপ্টেম্বর উল্লেখ রয়েছে। তবে অধিকাংশ গ্রন্থে ১ সেপ্টেম্বর তারিখটি বেশি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ১ সেপ্টেম্বর তারিখটিই যথার্থ।

বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গোড়াতেই যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়, এই শূন্যতা পূরণ করার লক্ষ্যেই তমদ্দুন মজলিসের জন্ম। উক্ত সংগঠনের গঠনতন্ত্রে চারটি[২] উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়;

> ক) কুসংস্কার গতানুগতিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করে সুস্থ ও সুন্দর তমদ্দুন গড়ে তোলা। খ) যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম ভিত্তিক সাম্যবাদের দিকে মানব সমাজকে এগিয়ে নেওয়া। গ) মানবীয় মূল্যবোধের উপর সাহিত্য ও শিল্পের মারফত নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। ঘ) নিঁখুত চরিত্র গঠন করে গণজীবনের উন্নয়নে সহায়তা করা।

এর লক্ষ্য হলো খোলফায়ে রাশেদীনের আদর্শে একদল বলিষ্ঠ কর্মী বাহিনী গঠনের উপর জোর দেওয়া।[৩] সূচনা পর্ব থেকেই সংগঠনটি বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৪] যেমন:

> (ক) সংগঠন ও গঠনমূলক কাজের ভিতর দিয়ে নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করে গণজীবনের উন্নয়ন সাধন। (খ) আলোচনা ও প্রচারের ভিতর দিয়ে যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের আদর্শের দিকে সমাজকে এগিয়ে নেওয়া এবং ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা। (গ) সাহিত্য, পত্রিকা, আলোচনা ও সভা-সমিতি মারফত ইসলামের সত্যিকার রূপ জনসাধারণের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরা এবং বিভিন্ন অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষতিকর আদর্শ এবং মতবাদ সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করে দেওয়া। (ঘ) কবি-গায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সমাজকর্মীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করা। (ঙ) সম্ভাব্য সকল উপায়ে মানব কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা এবং জনতার সত্যিকার স্বার্থের জন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাংস্কৃতিক পর্যায়ে সংগ্রাম করা। (চ) সদস্যদের আদর্শগতভাবে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা। (ছ) শিক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমবায়িক জীবন চেতনা ও গণসংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যে কবি গায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক-চিন্তাবিদ ও কর্মীদের লইয়া মাঝে মাঝে তাবু জীবন এবং আত্ম সমালোচনার ক্লাশ মারফত নিজেদের দোষত্রুটি পর্যালোচনা করা।

তমদ্দুন মজলিসের এ সকল কর্মসূচি পরিচালনার জন্য কয়েকটি বিভাগ ছিল।[৫] যেমন-

ক. সাহিত্য ও শিল্প বিভাগ
খ. শিক্ষা ও পাঠাগার বিভাগ
গ. প্রকাশনা বিভাগ
ঘ. জনসেবা বিভাগ
ঙ. জনসংযোগ ও
চ. অর্থ বিভাগ

ভাষা আন্দোলন সংগঠনে ভূমিকা

তমদ্দুন মজলিসের সূচনা পর্বের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ১৯৪৮ সাল হতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের উত্তপ্ত দিন গুলোতে তমদ্দুন মজলিসের তৎপরতা ছিল দৃষ্টিনন্দন। রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে বিতর্কের পটভূমিতেই ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' বাংলা ভাষাকে উর্দুর পাশাপাশি পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা 'বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকায় তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম, সুসাহিত্যিক ও ঢাকা

---

[২] রেজোয়ান হোসেন সিদ্দীকি, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক উদ্যোগ: তমদ্দুন মজলিস* (ঢাকা: পাণ্ডুলিপি পঞ্চম খণ্ড ১৩৮২),পৃ.৫৫-৫৭।

[৩] তমদ্দুন মজলিস, *গঠন তন্ত্র* (ঢাকা: অধ্যক্ষ দেওয়ার মোহাম্মদ আজরফ, ১৯৮৫), পৃ. ৩।

[৪] *তদেব*, পৃ. ৩-৪।

[৫] *তদেব*, পৃ. ৪।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এবং *'দৈনিক ইত্তেহাদ'* পত্রিকার সম্পাদক আবুল মনসুর আহমেদের তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়, সাথে সাথে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস আদালতের ভাষা ও শিক্ষার বাহন করার দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়। এ প্রসঙ্গে সাঈদ-উর-রহমান বলেন, 'তারা ভাষা আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে অনেক পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের অনেক থানা পর্যন্ত আন্দোলনকে বিস্তৃত করে'।[৬] তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় সম্পাদক আবুল কাসেম বাংলা ভাষা সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পুস্তিকার মুখবন্ধে তুলে ধরেন। উক্ত প্রস্তাবের সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা বিশেষ করে আঞ্চলিক পত্র পত্রিকাগুলো ভাষা সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র সিলেটের *'আল ইসলাহ'* পত্রিকায় আবুল কাসেমের প্রস্তাবকে সমর্থন করে একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবন্ধকার মুহম্মদ মুসলিম চৌধুরী বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন–

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বেলুচী, পাঞ্জাবী, পস্তু ও বাংলা। লোক সংখ্যার দিক দিয়ে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাই প্রথমোক্ত চারটি ভাষা যত সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা এক বাংলা ভাষাই ইহাদের চেয়ে অধিক লোকের মাতৃভাষা.. বাংলা ভাষার পক্ষে সবচেয়ে প্রবল যুক্তি হইতেছে এই যে, সমৃদ্ধির দিক বিবেচনা করিলে অন্য কোন ভাষাই বাংলা ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কাবিল নহে।[৭]

ভাষা আন্দোলনকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে সাপ্তাহিক মুখপত্র *'সৈনিক'* প্রকাশ করা হয়। *'সৈনিক'* প্রকাশিত হয় ১৪ই নভেম্বর, ১৯৪৮ (২৮ শে কার্তিক, ১৩৫৫) ১৯ আজিমপুর রোড, ঢাকা হতে। সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন প্রথম শাহেদ আলী পরে আবদুল গফুর। ভাষা আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় *'সৈনিকে'*র ভূমিকা অত্যন্ত বেশি।[৮] শুধু ভাষার দাবিতেই নয়, স্বাধীনতার প্রথম দিন গুলোতে *'সৈনিক'* প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের স্বাধীনতা পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী যাবতীয় মুখোশ উন্মোচন করে তাদের গণবিরোধী ভূমিকার স্বরূপ উন্মোচিত করেছিল। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাবলিল ভাষায় বলা হয়:

> "...অনেক বাধা বিঘ্ন পার হইয়া সৈনিক আজ লড়াই এর ময়দানে আসিয়া হাজির হইল। পুরোনো দুনিয়ার ইমারত হইতে ইট খসিয়া পড়িতেছে। যে নীতিবোধ ও ধ্যান-ধারনার, উপর এতো দিনকার জগৎ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাতেও আজ ফাটল ধরিয়াছে। ...মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে হানাহানি থামানো দূরের কথা, আজ তাহা হাজার গুনে বাড়িয়া গিয়াছে। ...দুস্‌রা মহাসমরের পর দুনিয়া জোড়া মানুষের মনে নূতন করিয়া যে অশান্তির ঝড় উঠিয়াছে পাক জনগণও তাহা হইতে বাদ যায় নাই। বরং পাকিস্তানে এই হতাশা আর বিশৃঙ্খলা যেন সকল সীমা-সরহদ্দ ছাড়াইয়া যাইতে বসিয়াছে। সাধারণ মানুষের সামনে পাকিস্তান সম্বন্ধে একদিন এক রঙিন স্বপ্ন তুলিয়া ধরা হইয়াছিল কিন্তু কোন মজবুত আদর্শের বুনিয়াদ তাদের মধ্যে খাড়া করা হয় নাই। ...ক্ষমতা হাতে পাইয়া নেতারা নিজ নিজ স্বার্থ আদায় করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন আর দরিদ্র জন সাধারণ-ছাত্র, শিক্ষক, কিষাণ, শ্রমিক, যাদের ঐতিহাসিক কোরবানীর ফলে পাকিস্তান হাসিল হইয়াছে, নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আজ তারা শংকিত ও সন্ত্রস্ত। ...তাদের ভাত কাপড়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবি এতটুকু মিটে নাই। নিজেদের দাবি দাওয়া ও আশা আকাংখার জন্য লড়িবার মনোবৃত্তিও আজ তাদের উবিয়া যাইতেছে। যাকে

---

[৬] সাঈদ-উর-রহমান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*,(ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১৯৮৩), পৃ. ১৯।

[৭] মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদ পত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮), পৃ. ৫৩-৫৪।

[৮] মাহমুদ নুরুল হুদা, অনুলেখক: স্বরোচিষ সরকার, *আমার জীবন স্মৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯) পৃ. ২৪৬।

সামনে রাখিয়া তারা লড়িবে, ...তেমন কোন মজবুত আদর্শ তাদের সামনে না থাকায় তাদের নৈরাশ্য আজ চরমে পৌঁছিয়াছে এবং তারি ছিদ্র পথে পাকিস্তানি দুশমনেরা আমাদের মাঝে ঢুকিয়া পড়িতেছে।... এদেশের পুঁজিপতি ও জমিদার দিগকে কায়েদে আজম কি বলিয়াছিলেন, বড়ো বড়ো শিল্প জাতীয়করণ সম্বন্ধে তার কি ধারনা ছিল, সর্বোপরি কোন ন্যায় নীতির উপর পাকিস্তানের বুনিয়াদ তিনি খাড়া করিতে চাহিয়াছিলেন 'সৈনিক' তাহা ভুলিতে পারে না।[৯]

নবগঠিত সরকারের কর্মকাণ্ডে তমদ্দুন মজলিস বুঝতে পারেন, যে ইসলামী মূলনীতির আদর্শে পাকিস্তান পরিচালিত হবে বলে মনে করা হয়েছিল তা হচ্ছে না। ফলে তারা মুসলিম লীগ ও তার সরকারের বিরুদ্ধে তাদের মনোভাব ও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন। তারা বলেছিলেন, "বিচ্ছিন্ন গণশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে আলার খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথে বীর মোজাহীদগণ এগিয়ে যাবে"।[১০] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দর্শনটি লালন করতেন তমদ্দুন মজলিসের ভাবাদর্শও কাছাকাছি ছিল বিধায় *'সাপ্তাহিক সৈনিক'* পত্রিকায় মওলানা ভাসানিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো এবং তার লেখা যত্ন সহকারে ছাপানো হতো। তাছাড়া ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে টাঙ্গাইলে যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় সেখানে *'সাপ্তাহিক সৈনিক'* মাওলানা ভাসানীর সমর্থিত প্রার্থী শামসুল হককে অধিক গুরুত্ব দিয়ে সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে, কারণ তিনি মুসলিম লীগের বিরোধী প্রার্থী ছিলেন।[১১]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে যখন প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা চলছিল তখন তমদ্দুন মজলিস পূর্ব পাকিস্তানের সুধী সমাজের নিকট নিম্নরূপ প্রস্তাব পেশ করেন:[১২]

১। বাংলা ভাষাই হবে

ক. পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন

খ. পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা

গ. পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা

২। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্র ভাষা হবে দুটি – উর্দু ও বাংলা।

৩। ক. বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা বিভাগের প্রথম ভাষা। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা একশ জনই শিক্ষা করবেন।

খ. উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। যারা পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে চাকুরী ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হবেন তারাই শুধু এ ভাষা শিক্ষা করবেন। ইহা পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৫ হতে ১০ জন শিক্ষা করলেও চলবে। মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীতে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে শিক্ষা দেওয়া যাবে।

গ. ইংরেজী হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা। পাকিস্তানের কর্মচারী হিসাবে যারা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চাকুরী করবেন বা যারা উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত হবেন তারাই শুধু ইংরেজী শিক্ষা করবেন। তাদের সংখ্যা পূর্ব পাকিস্তানের হাজারে ১ জনের চেয়ে কখনো বেশী হবে না। ঠিক একই নীতি হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ গুলিতে ওখানের স্থানীয় ভাষা বা উর্দু প্রথম ভাষা, বাংলা দ্বিতীয় ভাষা, আর ইংরেজী তৃতীয় ভাষার স্থান অধিকার করবে।

---

[৯] *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ঢাকা, ১৪ নভেম্বর ১৯৪৮, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

[১০] *'সৈনিক'*, ঢাকা, ১৬ই মার্চ, ১৯৫২, ৪র্থ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, পৃ: ১১৩।

[১১] মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬; বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একডেমী ১৯৮৫), পৃ. ১৩৫।

[১২] তমদ্দুন মজলিস, *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু*,(ঢাকা: ১৯৪৮), পৃ. ১১৪।

৪। শাসন কার্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বৎসরের জন্য ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসন কার্য চলবে। ইতি মধ্যে প্রয়োজনীয় বাংলা ভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

যে ভাষায় জনগণ সহজে ও অল্প সময়ে লিখতে ও শিখতে পারে সে ভাষাই হবে রাষ্ট্র ভাষা। এর ব্যত্যয় ঘটলে একে সর্ব প্রকারে বাধা দিতে হবে। এর বিরুদ্ধে বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই সূচনা হিসাবে আমরা কয়েজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের প্রবন্ধ প্রকাশ করছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেককে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি।"

তাছাড়াও প্রত্যেক স্কুল, কলেজ এবং শহরে সভা করে বাংলা ভাষার উপর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে কায়েদে আজম জিন্নাহ ও অন্যান্য নেতার নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করা এবং লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে যে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেওয়া হয়েছে সে মোতাবেক প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে এ মর্মে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করার ব্যাপারে তমদ্দুন মজলিস তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমাজ প্রগতির দৃষ্টিতে যারা প্রতিক্রিয়াশীল তারা পর্যন্ত মাতৃভাষার প্রশ্নে সেদিন কতদূর অনমনীয়, আপোসহীন ও বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তার একটি বিশ্বস্ত দলিল এই প্রস্তাব।

১৯৪৭ সালের ২৬শে মে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে কার্জন হলে নজরুল জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় রুগ্ন কবির সাহায্যার্থে 'মৃত্যুক্ষুধা' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয় এবং সে সঙ্গে বিচিত্রানুষ্ঠানে সাদেক নবী ও তার সঙ্গীদের জারিগান পরিবেশন করা হয়। মূলত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা ভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রশিদ বিল্ডিংয়ে তমদ্দুন মজলিসের অফিস কক্ষে একটি সভা হয়। ছাত্র, প্রফেসর এবং বুদ্ধিজীবীরা এ সভায় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় 'রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন তমদ্দুন মজলিসের একজন সক্রিয় কর্মী অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া। অন্যান্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম, মোহাম্মদ তোয়াহা, নঈমুদ্দীন আহমেদ, ফরিদ আহমদ, আবদুল মতিন খান চৌধুরী, আজিজ আহমদ, শওকত প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের প্রভোষ্ট অফিসের পশ্চিম দিকের বারান্দাকে রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের অফিস করা হয়। চট্টগ্রামেও তমদ্দুন মজলিসের সদস্য আজিজুর রহমান এবং জেলা আওয়ামী মুসলিম লীগের সদস্য এম এ আজিজ এর উদ্যোগে 'সর্ব দলীয় ভাষা কমিটি' গঠিত হয়। বাংলা ভাষা রক্ষার আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কমিটির প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান অনুষদের যৌথ উদ্যোগে একটি অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি হলো,"নিম্ন পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হবে এবং মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে চালু করা হবে ১৯৫০-৫১ সালের পর থেকেই।"[১৩]

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে জারিকৃত কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিসের পরীক্ষার বিষয় তালিকায় লক্ষ্য করা যায় যে, সেখানে ইংরেজি হতে শুরু করে উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা স্থান পেয়েছে, কিন্তু বাংলা ভাষার স্থান নেই। তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক এর প্রতিবাদে যে বিবৃতি দেন তা কলকাতার 'দৈনিক ইত্তেহাদে' প্রকাশিত হয় এবং ঐ সংখ্যাতে এই বিষয়ে একটি কড়া সম্পাদকীয়ও প্রকাশিত হয়।[১৪] ১৯৪৭ সালের ১৩ই নভেম্বর তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক আয়োজিত ফজলুল হক মোছলেম হলে এক জনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক

---

[১৩] বশীর আল হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯।

[১৪] *দৈনিক ইত্তেহাদ*, কলকাতা, ১১ নভেম্বর ১৯৪৭।

সরবরাহ সচিব জনাব নুরুল আমিন নিম্নোক্ত উক্তি তুলে ধরেন। উলেখ্য, সে সময়ে মন্ত্রীদের পূর্ব বাংলায় সচিব বলা হত।

> যদি রাষ্ট্রের জন সাধারণের মাতৃভাষার মধ্যস্থতায় রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা না হয় তবে নাগরিকদের সহিত সে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অতিশীঘ্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের উপর বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা চাপান যুক্তি যুক্ত নহে, বাংলা ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা রূপে ঘোষণা করার কোন প্রতিবন্ধক নাই বলিয়াই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।[১৫]

জনসভার দুদিন পরেই তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক অধ্যাপক এম. এ. কাসেম এবং এস. আহসান পূর্ব বঙ্গের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক, আইন ব্যবসায়ীদের স্বাক্ষর সংবলিত একটি স্বারকলিপি দাখিল করেন। পাশাপাশি এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয় যে, "রাষ্ট্র ভাষা সম্পর্কে পূর্ববঙ্গকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।"[১৬]

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য করাচি যাত্রার পূর্বে পূর্ব বাংলার মন্ত্রীদ্বয় হবিবুল্লাহ বাহার ও নুরুল আমিন এবং গিয়াস উদ্দিন পাঠানের সঙ্গে ২০শে ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিসের রাষ্ট্র ভাষা সাব কমিটি এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল এবং কয়েকজন সাংবাদিক সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তানের মুদ্রা, টিকিট, মানি অর্ডার ফরমে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগে নিয়োগের পরীক্ষা ইত্যাদিতে বাংলাকে বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এসবের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রতিনিধি দল এ বিষয়ে খাজা নাজিমুদ্দিন ও ড. মাহমুদ হাসানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। অধ্যাপক আবুল কাসেম জানান যে, "গণপরিষদের পূর্ববঙ্গের সদস্যরা প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়েছেন, তারা এ বিষয়ে যথাসাধ্য করবেন।"[১৭]

বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি অগ্রাহ্য হলে তা পূর্ববাংলার সর্ব মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৪৮ সালের ২৬ শে ফ্রেবুয়ারি ঢাকার সর্বস্তরের ছাত্ররা ধর্মঘটন পালন করে। বিকেলে তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি সভা হয়, অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব–পাকিস্তানের মুসলিম ছাত্রলীগের আহবায়ক নঈমুদ্দীন আহমদ, ফজলুল হক হল ইউনিটের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা। তারা গণপরিষদের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এবং গণপরিষদের বাঙালি মুসলিম লীগ সদস্যদের আচরণ ও উক্তিসমূহের তীব্র নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাতে নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ এবং বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম সরকারি ভাষা করার উদ্দেশ্যে সংশোধন প্রস্তাব আনার জন্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে অভিনন্দন এবং ঢাকা বেতারের মিথ্যা, পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রচারের প্রতিবাদ জানানো হয়।

অপর দিকে সিলেট তমদ্দুন মজলিস এবং সিলেট জেলা মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ৮ই মার্চ ১৯৪৮ গোবিন্দ পার্কে জনসভার আয়োজন করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণ করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া এবং অবিলম্বে তা বাস্তবায়ন করা। কিন্তু একটি কুচক্রী মহলের চক্রান্তে সভায় গণ্ডগোল দেখা দেয়। পুলিশ উপস্থিত থাকলেও মারামারি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হওয়ায় তাড়াতাড়ি কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণের পর সভা সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এ সময়ে গণপরিষদের অধিবেশনে সরকারি ভাষা তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়া এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমউদ্দিনের বাংলা ভাষা

---

[১৫] বশীর আল্ হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।

[১৬] আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*,(ঢাকা:আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৭৮), পৃ. ৪৭।

[১৭] *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮।

সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিমলীগ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ সর্মঘট আহ্বান করে।[১৮] ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকায় 'নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগে'র অধিবেশনে খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা করেন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।" নাজিমউদ্দিনের ভাষা সংক্রান্ত এই বক্তব্যের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক শাহাবুদ্দিন খালেদ এবং পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের ঢাকা শহর কেন্দ্রের আহ্বায়ক মাহফুজুল হক সংবাদপত্রে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেন।[১৯] উক্ত বিবৃতির মাধ্যমে খাজা নাজিমউদ্দিনের সমালোচনা এবং বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১৬ সদস্য বিশিষ্ট সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[২০] উক্ত সম্মেলনে তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক আবদুল গফুর এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম বক্তব্য রাখেন।

১৯৫২ সালের ১৭ থেকে ২০ শে অক্টোবর ঢাকা কার্জন হলে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাবের পাশাপাশি বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবি জানানো হয়। অপর দিকে চট্টগ্রাম তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান খাজা নাজিমউদ্দিনের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বার্মা ওয়েল কোম্পানী (বিওসি) নামে চট্টগ্রামে একটি তৈল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছিল। সেখানে বিওসি শ্রমিক ইউনিয়নের ন্যায্য দাবি পূরণে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় শ্রমিক অসন্তোষ বাড়তে থাকে। তারা তাদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালের ১৫ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের ডবল মুরিং ময়দানে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করে।[২১] সভায় চট্টগ্রাম তমদ্দুন মজলিসের দুজন কর্মী মকছুদুর রহমান ও আজিজুর রহমান বি ও সি শ্রমিকদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন এবং ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে তমদ্দুন মজলিসের সর্ব প্রকার সম্ভাব্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র সমাজের উপর যে পুলিশি নির্যাতন চালানো হয়েছে তার প্রতিবাদে ২২ শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিসের কেন্দ্রীয় দপ্তর এক বিবৃতি প্রদান করে। বিবৃতিতে বলেন–

> ২১ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ছাত্র–সমাবেশের উপর যে নৃশংস পুলিশী জুলুম চালানো হইয়াছে তার নিন্দা করিবার ভাষা আমাদের নাই। আমরা এই দুষ্কার্যের সাথে জড়িত প্রতিটি অপরাধীর আশু তদন্ত ও শাস্তির দাবি জানাইতেছি, শহীদানের শোক সন্তপ্ত পরিজন বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ জন সাধারণকে শুধু এই শপথই নিতে হইবে বাংলা ভাষার দাবীর পূর্ণ স্বীকৃতি এবং পুলিশী নৃশংসতায় প্রতিবিধান না হওয়া পর্যন্ত আজকের এই সংগ্রামের বিরাম নাই।[২২]

পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, তমদ্দুন মজলিস প্রতিটি জেলা এমনকি অনেক থানা পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভাষা আন্দোলন গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃতির কৃতিত্ব অনেকটা তাদের এবং সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত সাপ্তাহিক মুখপত্র '*সৈনিকে*'র। সৈনিক তার যাত্রা শুরু করার পর থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত

---

[১৮] অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫*,(দ্বিতীয় সংস্করণ, তা.বি), পৃ. ৪১-৪২; মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৫৮।

[১৯] বশীর আল্ হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০।

[২০] এম. আর. আখতার মুকুল, *আমাকে অতীতের কথা বলতে দিন*,(ঢাকা: সাগর পাবলিকেশন্স, ১৯৮৩), পৃ. ৯৭।

[২১] বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*; ৩য় খণ্ড,(চট্টগ্রাম: বই ঘর, ১৯৮৫), পৃ. ৬২।

[২২] বশীর আল্ হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২।

নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং ভাষা আন্দোলন সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে। সৈনিক ছাড়াও তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় পাঁচশয়ের মত পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে।[২৩] ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গ্রামে ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পরিচয় মিলে ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ কলেজের অধ্যাপক যতীন সরকারের সাক্ষাৎকার থেকে। তিনি বলেন–

> ১৯৫২ সালে আমি কেন্দুয়া থানার আশুরিয়া হাই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র। ২১শে ফেব্রুয়ারি দু'এক দিনের মধ্যে ঢাকার ঘটনার খবর আমাদের গ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে আমরা ক্লাশ ছেড়ে বেরিয়ে আসি। বসুর বাজার, রামপুর বাজার, বীরগঞ্জ বাজার বেথৈরহাটি বাজারে হাটবারে মিছিল করে, মুখে টিনের চোঙা লাগিয়ে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলন ও ঢাকার ছাত্র হত্যার বর্ণনা দিতে থাকি। হরতালের আবেদন জানালে সকলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয় সে দিন আর হাট বসে না। আমরা সে সময় সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পড়তাম। 'সৈনিক' এর আহ্বানেই আমরা ৫ই মার্চের শহীদ দিবস পালন করি। আমাদের এলাকায় ভাষা আন্দোলনের বানীকে বিস্তৃতি করে দেয়ার জন্য যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি তমদ্দুন মজলিসের সদস্য কবি খান মোহাম্মদ আবদুল হাকিম খান। তিনি নিজের গ্রাম সিংহের গাওয়ে তমদ্দুন মজলিসের শাখা খুলেছিলেন এবং আমাদের মতো তরুণ ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন। সে সময়ে গ্রামের মাদ্রাসা গুলিতে ভাষা আন্দোলনের বিরোধী স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু আবদুল হাকিম খানের বলিষ্ঠ ভূমিকায় এবং এলাকার সচেতন ছাত্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতিরোধে তা ভেস্তে যায়।[২৪]

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলকারীদের অনেককেই আটক করা হয়েছিল। "প্রায় ৭৮ জনকে সতর্ক করে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল"।[২৫] কিন্তু সমস্ত প্রদেশে ব্যাপক ভাবে ধরপাকড় চলছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরাও গ্রেপ্তারের শিকার হয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে *সাপ্তাহিক সৈনিক* ২১ ফেব্রুয়ারি বিকালে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। বিশেষ সংখ্যার প্রধান শিরোনাম ছিল **'মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে পুলিশের নির্বিচারে গুলি বর্ষণ এবং শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত'**। উপরোক্ত বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরপরই সরকারি নির্দেশে পুলিশ ঢাকায় তমদ্দুন মজলিশের অফিসে এবং ৪৮ কাপ্তান বাজারে অবস্থিত *'সৈনিক'* অফিসে তল্লাশি চালায় এবং কাগজ পত্র তছনছ করে। এ সময়ে অধ্যাপক আবুল কাসেম, আবদুল গফুর প্রমুখ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকেন।[২৬]

১৯৫২ সালের ২৯শে মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যপরিষদ একটি সভা আহ্বান করে। উক্ত সভায় ২৫ শে মার্চ শহীদ আবুল বারাকাত হত্যা এবং ২৮শে মার্চ রফিক উদ্দিন আহমদকে গুলি করে হত্যার তদন্ত কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সভায় তমদ্দুন মজলিস, আওয়ামী লীগ, যুব লীগ, ইসলামী ভাতৃ সংঘ, ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।[২৭]

২৭ শে এপ্রিল, ১৯৫২ ঢাকা বার এসোসিয়েশন হলে 'পূর্ব-পাকিস্তান সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ এর উদ্যোগে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে কর্মপরিষদ ছাড়াও প্রদেশের বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় পাঁচশত প্রতিনিধি যোগদান করেন। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অনেকেই বক্তব্য রাখেন। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিনিধি ফখরুজ্জামান সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, "উর্দুর সঙ্গে

---

[২৩] রেজোয়ান হোসেন সিদ্দীকি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।
[২৪] বশীর আল্ হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৬।
[২৫] *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২।
[২৬] মোঃ এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫। ।
[২৭] বশীর আল্ হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০০।

আমাদের কোন বিরোধ নাই, উর্দু আমরা শিখতে চাই, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে কি আমাদের প্রাণের ভাষা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে"? এভাবে যুক্তির নিরিখে তিনি বাংলা ভাষার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

১১ই মার্চ, ১৯৫২ সালের ঘটনা বাঙালি জনতা ভুলতে পারেনি। দিনটিকে স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য পরের বছর ১৯৫৩ সালে এ দিনটিকে রাষ্ট্রভাষা দিবস রূপে পালন করা হয়। এ দিন ঢাকার বার এসোসিয়েশন হলে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদ' আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সভায় একাধিক বক্তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। এদের মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম বলেন–

> "উর্দু ভাষা ইসলামের ধারক ও বাহক এ কথা যেমন সম্পূর্ণ মিথ্যা, তেমনি বাংলা ভাষা হিন্দুত্বের ধারক ও বাহক এ কথাও নির্জলা মিথ্যা। প্রকৃত পক্ষে বাংলাও উর্দু দুই ভাষায়ই যেমন হিন্দুত্বের ও হিন্দু দর্শনের আলোচনা হয়েছে। তেমনি ইসলামের বিকাশও হয়েছে এই দুই ভাষার মাধ্যমে, কাজেই যে সব কায়েমী স্বার্থের দালালরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে ইসলামের দোহাই পাড়েন, তারা সমগ্র জাতির শত্রু"।[২৮]

সভা শেষে কর্ম-পরিষদ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায়ের জন্য কঠোর শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে প্রথমবারের মতো উদযাপিত একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি সংবাদপত্রও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। '*সাপ্তাহিক সৈনিক*' এবং '*সাপ্তাহিক নও বেলাল*'এ দিন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। *সাপ্তাহিক সৈনিক* ১৬ পৃষ্ঠাব্যপী একুশের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। আব্দুল গফুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত সংখ্যাটিকে 'ভাষা আন্দোলন ও শহীদ সংখ্যা' নামকরণ করা হয়।[২৯]

১৯৫৬ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে শহীদ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এ দিন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে বেলা ২টায় সভা আরম্ভ হয়। অন্যান্যের মধ্যে তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে হাসান ইকবাল বক্তৃতা করেন। সভায় বেশ কিছু প্রস্তাব আনা হয়। এর মধ্যে "১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্র–জনতার উপর পুলিশি নির্যাতন ও গুলি বর্ষণের মাধ্যমে হত্যার নতুন ভাবে তদন্তের দাবি করা হয়"।[৩০]

বাংলা বর্ণের পরিবর্তে আরবি হরফ প্রবর্তনের যে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল তার বিরুদ্ধেও তমদ্দুন মজলিস সোচ্চার ছিল। ১৯৪৯ সালের ১০ই ডিসেম্বর ফজলুল হক হল সাহিত্য মজলিসের উদ্যোগে হল মিলনায়তনে হরফ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান আবদুল হালিম। সভায় তমদ্দুন মজলিসের কর্মী আবদুল গফুর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল– "বাংলা হরফের উপর কোন শয়তানী হামলা বরদাশত করা হইবে না"।[৩১] সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাংলা বর্ণে বাংলা ভাষা লিখতে হবে।

১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালের শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় লেখনির মাধ্যমে বাংলায় আরবি হরফ প্রবর্তন প্রয়াসের বিরুদ্ধে 'তমদ্দুন মজলিস' নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে যে বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়, তার পিছনেও তমদ্দুন মজলিসের অবদান ছিল। যে সকল ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে বাংলা একাডেমীকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের অনেকেই তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন, অধ্যাপক

---

[২৮] বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

[২৯] *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩।

[৩০] বশীর আল্ হেলাল, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৫৬৮;সাপ্তাহিক 'নতুন খবর',২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।

[৩১] *দৈনিক আজাদ*, ঢাকা, ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৯।

আবুল কাসেম, ইব্রাহীম খাঁ, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ফররুখ আহমদ, আসকার ইবনে শাইখ, তালিম হোসেন, এম. এ. সাত্তার, হাসান জামান প্রমুখ।

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হলে তমদ্দুন মজলিসের দু'জন সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের সভায় অধ্যাপক আবুল কাসেম বাংলা ভাষা সংক্রান্ত যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক আবুল কাসেম তার সহযোগীদের নিয়ে ১৯৬২ সালে বাংলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বাংলা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেন।

উপসংহার

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, তমদ্দুন মজলিস একটি ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছিল বলা যায়, তমদ্দুন মজলিসের প্রাথমিক উদ্যোগেই ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন বিশেষ গতি লাভ করেছিল। মোহাম্মদ তোয়াহা ও কমরুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রথম দিকে কোন সংগঠন ছিল না। তমদ্দুন মজলিস ছিল তখন ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু। সর্বস্তরের জনগণের নিকট ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এ সংগঠনের বাংলা ভাষা সম্পর্কিত লক্ষ্য। একথা সত্য যে, শুধুমাত্র তমদ্দুন মজলিস'ই নয়– ছাত্র, বুদ্ধিজীবীরাও ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে জোরালো ভূমিকা পালন করেছিল । আওয়ামী মুসলিম লীগ,যুব লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের ভূমিকাও প্রশংসনীয় । তবে পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনে এদেশের কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতি জনগণের ভূমিকাই ছিল প্রধান। ভাষা আন্দোলন যদি কেবল শহরের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থাকত, গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে না পড়ত, তাহলে এ আন্দোলন সফল হওয়া অসম্ভব ছিল। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্র–জনতার অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তমদ্দুন মজলিসের উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

আনসার বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক কার্যক্রম (১৯৪৮-১৯৭১)

মীর ফেরদৌস হোসেন*

Abstract: During the Second World War the British Government was aware of keeping stability in this region by creating a voluntary force named 'Home Guard'. In post-partition era the Government of East Pakistan (present Bangladesh) formed a voluntary force named 'East Pakistan Asnar' in the same formation on 12 February, 1948. It was a very important step in the backdrop of 1948 when the Ansar was formed. It becomes evident in the discussion on the initial activities of the Ansar Force.

আনসার বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট

আনসার একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ সাহায্যকারি আনসার মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের নিকট একটি পবিত্র ও গুরুত্ববহ শব্দ। হযরত মুহাম্মদের (স:) নবুয়াত প্রাপ্তির পরই প্রকৃতঅর্থে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেন। প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করলে মক্কার পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীরা তাঁর ঘোর বিরোধী হয়ে ওঠে এবং ক্রমে তাদের বিরোধিতা চরম শত্রুতায় পরিণত হয়। পৌত্তলিকরা হযরত মুহাম্মদ (স:) ও তাঁর অনুসারীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার ও নিপীড়ন করতে থাকে এবং তাঁদের জীবননাশের চক্রান্তও শুরু করে। মক্কার পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদের এহেন আচরণে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ব্যথিত হন এবং মক্কা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ অবস্থায় ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কাবা শরীফে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ৬ জন মদিনাবাসী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর কথা শুনে এবং তাঁর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা এবং ইসলাম প্রচারে হযরত মোহাম্মদ (স:)-কে সর্বোতভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং তাঁরা মদিনায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। এই ৬ জন ব্যক্তিই ইতিহাসে প্রথম আনসার বা সাহায্যকারী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১]

পরবর্তীতে আনসারদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। এর পরই হযরত মুহাম্মদ (স:) তাঁর কিছু বিশ্বস্ত অনুসারীসহ ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য মদিনায় গমন করেন। ঐ সময় তাঁদের যাঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন তাঁরা পরিচিত হয়ে ওঠেন 'আনসার' নামে। এটা ছিল তাদের উপাধি। তাঁদের অনেক সময় 'আনসার-আল-নবী' বা নবীর সাহায্যকারীও বলা হতো।[২] ইসলাম প্রচারে ঘোর দুর্যোগ মুহূর্তে এরা হযরত মুহাম্মদ (স:)-এর সহায়ক শক্তি হিসেবে তাঁর পাশে থেকে সর্বস্ব উৎসর্গ করে কাজ করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে এদের অবদান অতুলনীয়। পরবর্তীকালে এ আনসারদের নামানুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত হয় আনসার বাহিনী।

আনসার বাহিনী গঠনের সূচনা ঘটে ভারত উপ-মহাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর। ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৩] সমাপ্তি ঘটে ১৯০ বছরের ইংরেজ শাসনের। এই বিভক্তির ফলে তদানীন্তন বঙ্গ প্রদেশের পশ্চিম অংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পূর্ব অঞ্চল (আসাম প্রদেশের সিলেট জেলাসহ) পূর্ব পাকিস্তান নাম নিয়ে গঠিত

* ড. মীর ফেরদৌস হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

হয় পাকিস্তানের একটি প্রদেশ।[৪] দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দুইটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম লাভ করার ফলে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠির ধ্যান-ধারণায় গড়ে ওঠা সমাজ বিধান ভেঙে পড়ে এবং দেশ বিভক্তির ফলে অনেকে বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে থাকে। ফলে স্বাভাবিক ভাবে লুটতরাজ, হত্যা, ব্যাভিচারের ভয়াবহতা নেমে আসে সারা উপ-মহাদেশে। সম্পদ ও জীবনহানি ঘটে ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে।[৫] তাই জনগণের জান ও মাল রক্ষার্থে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পাকিস্তান সরকার যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল 'পূর্ব পাকিস্তান আনসার' গঠন তার মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতঅর্থে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্বাংশে (পূর্ব পাকিস্তানে যা বর্তমানে বাংলাদেশ) দেখা দেয় নানা রকম সমস্যা। এর মধ্যে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা সমস্যাই ছিল প্রধান। উপরন্ত ভারত থেকে আসা মুহাজিরদের পুনর্বাসন করাও একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।[৬]

এ সব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দেশে নিয়মিত আইন রক্ষাকারী বাহিনীসমূহের সাথে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। উল্লেখ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালে এ অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা স্থিতিশীল রক্ষার্থে বৃটিশ সরকার 'হোম গার্ড' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে হোম গার্ডের কার্যক্রমেরও সমাপ্তি ঘটে।[৭] যুদ্ধ পরবর্তীতে ঐ হোম গার্ডের কর্মকর্তাদের নিয়েই 'ন্যাশনাল ভলানটিয়ার ক্যাডেট কোর' নামে আরেকটি ভিন্ন স্বেচ্ছাসেবীদল গঠন করা হয় ১৯৪৭ সালে কলকাতায়।[৮] ন্যাশনাল ভলানটিয়ার ক্যাডেট কোরের প্রশিক্ষণ চলাকালেই (১৯৪৭ সালের ৭ জুন) ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্তির ঘোষণা দেন। সঙ্গত কারণেই প্রশিক্ষণ শেষে সকল কর্মকর্তা নিজ নিজ দেশে ফিরে যান।

১৪ আগস্ট ১৯৪৭ পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পর নতুন রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের যারা ইতিপূর্বে হোম গার্ডে চাকুরী করতেন তারা দেশ বিভাগ উত্তরকালে সরকারি তত্ত্বাবধানে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, গ্রাম উন্নয়ন, চোরাচালান নিরোধ, সীমান্ত রক্ষা প্রভৃতি কাজে দেশের জনগণকে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের জন্য সরকারের নিকট এক প্রস্তাব উত্থাপন করে। অতঃপর হোমগার্ডের পূর্বতন কর্মকর্তারা 'হোম গার্ড' সমিতি গঠন করে ব্যাপক গণ-সমর্থন সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি প্রচারপত্র বিলি করে।[৯] এতে কোন সাড়া না মেলায় হোমগার্ড সমিতির নেতৃবৃন্দ[১০] তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সাথে দেখা করে হোমগার্ড সমিতির কর্মসূচী এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতঃপর হোমগার্ড সমিতির নেতা মোজাম্মেল হোসেনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সাথে তাঁর সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসে (বর্তমানে বাংলা একাডেমী) দেখা করেন। প্রধানমন্ত্রী সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হয়ে এদেশে একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং তাৎক্ষণীকভাবে তাঁর সচিব এস এন বাকের (আইসিএস)-কে নির্দেশ প্রদান করেন।[১১] সচিব এস এন বাকের তৎকালীন হোম গার্ডের পূর্ব বাংলার শরীর চর্চা বিভাগের পরিচালক জেমস বুকাননকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠনের বিস্তারিত রূপ-রেখা তৈরির দায়িত্ব দেন। জেমস বুকানন[১২] অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সময় অধুনালুপ্ত 'হোম গার্ড' বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য সর্ব মহলে ব্যাপক জনসংযোগ চালাতে থাকেন। এ সময় খাজা নাজিমউদ্দিন তাঁর মন্ত্রীবর্গ এবং কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বিশেষ সম্প্রসারিত সভা ডাকেন। এ সভাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মুসলিম লীগ নেতা আকরাম খাঁও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সভায় আলোচনান্তে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের ব্যাপারে একমত পোষণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, পূর্বতন হোম গার্ডের ন্যায় প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সরাসরি সরকারের হুকুমে না হয়ে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে গঠিত হওয়া উচিত বলে জেমস বুকানন সুপারিশ করেন।[১৩]

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের বিষয়টি যখন চূড়ান্ত তখন এ প্রস্তাবিত বাহিনীর নামকরণ নিয়ে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। বহু প্রস্তাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন শিক্ষা সচিব এফ এ করিম প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম 'আনসার' রাখার সুপারিশ করেন। এ জন্য তিনি মদিনার আনসারদের আত্ম-ত্যাগ ও আত্ম উৎসর্গের ঘটনাবলী বিবৃত করে বলেন যে, আনসার নামের একটি মাহাত্য আছে, এর একটি গুরুত্ব আছে, আছে মর্যাদা। সুতরাং প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম যদি 'আনসার' রাখা হয় তবে পূর্ব-পাকিস্তানের সমাজকে সংগঠিত করা সহজ হবে এবং এর ফলাফল হবে সুদূরপ্রসারী।[১৪] শিক্ষা সচিব এফ এ করিমের সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন সরকার প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আনসার' রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'পূর্ব পাকিস্তান আনসার' বিল তৈরি করা হয় এবং তা প্রাদেশিক সংসদে উত্থাপিত হয়।

বিলটির নামকরণের ব্যাপারে আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কামিনী রায় এবং বরিশালের সত্যেন রায় প্রমূখ যে সমস্ত হিন্দু সংসদ সদস্য ছিলেন তাঁরা আপত্তি তোলেন। আপত্তির পিছনে তাঁরা যে যুক্তি দেখান তা হলো যেহেতু সেচ্ছাসেবী সংগঠনটি হবে বাঙালিদের জন্য সেহেতু সে সংগঠনের নাম হতে পারতো বাংলায়। যেমন-- সেবা দল, গৃহ-রক্ষীদল, শান্তি সেনা ইত্যাদি। কিন্তু আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পাস হয়। বিরোধী মতবাদী সংসদ সদস্যরা তদানীন্তন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারেরও সদস্য ছিলেন বলে তাঁরা বিষয়টি কেন্দ্রীয় সংসদেও উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রাদেশিক সংসদের সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে। ফলশ্রুতিতে ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পূর্ব পাকিস্তান আনসার এ্যাক্ট তথা আনসার রুল প্রকাশিত হয়। যা প্রথম ১৭ জুন ১৯৪৮ 'ঢাকা গেজেট' (অতিরক্তি সংখ্যা হিসেবে) এ প্রকাশিত হয়।[১৫] পরবর্তীতে এই তারিখটিই আনসার প্রতিষ্ঠানের জন্মদিন হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এই আইনের বলে জেমস বুকাননকেই প্রথম পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন এবং আনসার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেন।[১৬]

উল্লেখ্য, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অব্যবহিতপর পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে তৎপর হন। কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে বৃটিশদের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেছিল। ফলে তারা বৃটিশদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। এ প্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা বৃটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়ার সুযোগ লাভ করেছিল। ফলে তারা নিজেদেরকে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে এবং নিজ মাতৃভূমি রক্ষায় যথেষ্ট সক্ষম হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে বাঙালিদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৃটিশ শাসনের শুরু থেকেই তাদের বৃটিশ বিরোধী মনোভাবের কারণে তারা বৃটিশ সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারেনি।

তাই ইংরেজদের অধীনে কোন বাঙালি বাহিনী তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি।[১৭] ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা খানিকটা দুর্বল ভেবে পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার কথা অনুভব করে। ফলে তারা মনে করে পাকিস্তানের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সাথে একটি সাহায্যকারী বাহিনী থাকা প্রয়োজন। অধিকন্ত পাকিস্তান যদি কখনো বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তার মোকাবেলা করার মত সেনাশক্তি তাদের ছিল না এমনকি এ জন্য বৃহৎ একটি সেনাবাহিনী পালন করাও সম্ভব ছিল না। তাই দেশের বৃহত্তর অসামরিক জনগণকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দেবার কথা তারা ভাবতে থাকে। এছাড়া তারা চিন্তা করে যে, এভাবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে সামরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করতে পারলে সরকার দেশের যে কোন সংকটের মোকাবিলা করতে পারবে।

আরো বলা প্রয়োজন যে, দেশ বিভাগ উত্তরকালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দিকটি ছিল পুলিশ বাহিনীর উপর। কিন্তু এদের জনবল ছিল খুবই কম। কাজের তুলনায় পুলিশের সংখ্যা কম হওয়ায় তারা নানা সমস্যায় নিপতিত হয়। অধিকন্ত মোহাজেরদের পুনর্বাসন করা একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দেশ বিভাগের ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। এর মধ্যে বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল খুবই ভয়াবহ। এতে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষ প্রাণ হারায়। এর ফলে বিপুল সংখ্যক মুসলমান শরণার্থী হিসেবে পাকিস্তানে চলে আসতে থাকে।[১৮]

এদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করাও সরকারকে কঠিন সমস্যায় নিপতিত করে। এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান 'আনসার বাহিনীর' মত একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। অধিকন্তু দেশ বিভাগ উত্তর নতুন রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও পুনর্গঠন কাজেও তাদেরকে ব্যাপক অংশগ্রহণের নিমিত্তে এ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট তৈরিতে সহায়তা করে।[১৯]

'পূর্ব পাকিস্তান আনসার' বাহিনীর কার্যালয় স্থাপন ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ

নব-নিযুক্ত পরিচালক জেমস বুকানন দায়িত্ব প্রাপ্তির অব্যবহিত পর থেকেই আনসার বাহিনীর সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। শেষ অবধি ঢাকার শাহবাগ এলাকাকে (বর্তমানে যেখানে যাদুঘর স্থাপিত হয়েছে) তিনি বেছে নেন আনসার সদর দপ্তর স্থাপনের জন্য। অতঃপর সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে সেখানে পাঁচ-ছয়টি ছোট বড় ঘর তুলে দপ্তর স্থাপন করেন। ঘর গুলো ছিল তল্লা বাঁশের (বাশেঁর মধ্যে যে কোন একটি জাত) ছাউনি এবং বাশেঁরই দেওয়া বেড়া। তবে ঘরের মেঝে পাকা করা হয়েছিল।[২০]

এই ক্ষুদ্র বাঁশের ঘরে বসে জেমস বুকানন আনসার বাহিনীকে ঢেলে সাজাতে নানা পরিকল্পনা করেন এবং সে মতে বিভিন্ন আইন-কানুন তৈরি করতে উদ্যোগী হন। নতুন অফিস চালু করতে তিনি প্রথমেই ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ করে অফিসের কাজ শুরু করেন।[২১] বলা বাহুল্য, শুরুতে আনসার বাহিনীর ক্ষুদ্র আকারের বাজেট দ্বারা আনসার বাহিনী গড়ে তুলতে অনেকটাই সমস্যা হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আনসার এ্যাক্ট প্রকাশিত হওয়ার পর জেমস বুকানন অধুনালুপ্ত হোম গার্ডের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের এই বাহিনীতে যোগদানের বিষয়টি গভীর ভাবে অনুধাবন করেন এবং কোন রকম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছাড়া তাদের নিকট নিয়োগপত্র (Appointment Letter) প্রেরণ করেন। নিয়োগপত্র পেয়ে ২৭ জন কর্মকর্তা ঢাকার শাহবাগে আনসার অধিদপ্তরে যোগদান করেন।[২২]

অতঃপর পরিচালক জেমস বুকানন আগত কর্মকর্তাদের আনসার বাহিনী গড়ে তোলার সরকারি পরিকল্পনা এবং এ বাহিনী গড়ে তুলতে আশু পরিকল্পিত পদক্ষেপসমূহ তাদেরকে অবহিত করেন। এ জন্য তাদেরকে সেখানে ৭ দিন অবস্থান করতে হয়। ইতোমধ্যে আনসার অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে হাজার হাজার আবেদনকারী প্রার্থীত পদে আবেদন করে। তদানীন্তন ৬৩টি মহকুমায় ও ৪০০ টি থানার জন্য দুই শতাধিক সাব ডিভিশনাল অ্যাডজুট্যান্ট ও সহকারী অ্যাডজুট্যান্টকে সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে এই বোর্ডের সভাপতি করে বোর্ড গঠিত হয়েছিল।[২৩] নির্বাচিত প্রার্থীদের বিভিন্ন জেলা ও মহকুমায় পদায়ন করা হয়। বলা প্রয়োজন যে, আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এ সংগঠনটি জাতীয় সার্ভিস বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ উন্নয়নের চাবিকাঠি। প্রশিক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তাকে শাণিত করে। তাই জেমস বুকানন শুরুতেই নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন। এই প্রশিক্ষণ শুরু হয় জেমস বুকাননের তত্ত্বাবধানে এবং ১ এপ্রিল ১৯৪৮ থেকে এবং ১৫ মে ১৯৪৮ পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ চলে। জেমস বুকাননকে এই প্রশিক্ষণে সহায়তা করার জন্য আনসারের ৪ জন ইনস্ট্রাক্টরকে আহবান করা হয়। এরা হলেন--

১। এম এ কুদ্দুস ভূঁইয়া,
২। সলিম নেওয়াজ খাঁন,
৩। গোলাম রব্বানী চৌধুরী ও
৪। মোঃ শরিফুল হক।

এরা সাফল্যজনকভাবে ৪৫ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শেষ করান। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতি মহকুমায় ১ জন করে মহকুমা অ্যাড্জুট্যান্ট এবং ২ জন করে সহকারী অ্যাড্জুট্যান্ট নিয়োগ করা হয়।

নব নিযুক্ত উক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আনসার কর্মকর্তাদের উপর প্রাথমিক দায়িত্ব বর্তায় আনসার সংগ্রহের। এরা প্রাথমিকভাবে প্রতি ইউনিয়ন থেকে ১ জন কমান্ডার ও ১ জন সহকারী কমান্ডার বাছাইয়ে সিদ্ধান্ত নেন। কমান্ডার, সহকারী কমান্ডার বাছাইয়ে প্রধানত শিক্ষিত, সৎ, সচ্ছল, জনগণের আস্থাভাজন ও ভদ্র পরিবারের ছেলেদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। এরূপ যোগ্যতার অধিকারীদের প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হতো। অতঃপর পুলিশ কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে তাদের সাময়িকভাবে নির্বাচন করে ২১ দিনের সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। প্রশিক্ষণ শেষে মহকুমা প্রশাসক বা তাঁর নিয়োজিত কোন প্রথম শ্রেণীর হাকিমের সামনে নির্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা[২৪] পাঠ পূর্বক তাতে দস্তখত করতে হতো। এর পরই তারা আনসার হিসেবে গণ্য হতেন। আনসার কমান্ডার বা সহকারী কমান্ডার হবার পর তাঁর উপর যে দায়িত্ব দেয়া হয় তা হলো আনসার প্লাটুন গঠন করা।[২৫]

প্লাটুনে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য কমান্ডার ও সহকারী কমান্ডারদের যোগ্যতার প্রায় অনুরূপ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক ছিল আনসার হওয়ার জন্যও। ইউনিয়ন আনসার কমান্ডার ও সহকারী কমান্ডার নিয়োগ দানের পরই সারা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আকারে আনসার সংগ্রহ শুরু হয় এবং তাতে বেশ সাড়া মেলে। তবে ১১ নভেম্বর ১৯৪৮ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর অব্যবহিত পর সরকার পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা জোরদার করতে তৎপর হয়। ফলে দেশের জনসাধারণকে ব্যাপক আকারে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায়। অতঃপর সরকার প্রতি মহকুমা থেকে ১ হাজার আনসারকে জরুরী ভিত্তিতে রাইফেল প্রশিক্ষণ (আগ্নেয়াস্ত্র চালনা) দেবার নির্দেশ দেয়।[২৬] সে মতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সদ্য প্রতিষ্ঠিত এই স্বেচ্ছসেবক বাহিনীর রাইফেল প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে নানা সমস্যা ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল অর্থের। তদানীন্তন আনসারদের বাজেট ছিল মাত্র ১৪ লক্ষ টাকা, যা কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দিতে নিঃশেষ হয়ে যেত। ফলে প্রশিক্ষণ নিতে আসা ৬০ সহস্রাধিক আনসারের ১০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির চালানো প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে বিধায় প্রশিক্ষণার্থী আনসারদেরকে নিজ খরচে এক বারের খোরাকি জোগাড় করতে বলা হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সরকার এই খরচ বহন করতে রাজি হয়।[২৭] এই প্রশিক্ষণে প্রধানত পুলিশ, ইপিআর ও আর্মি ইউনিটের দক্ষ প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেন। তখন আনসারদের নিজস্ব কোন রাইফেল বা আগ্নেয়াস্ত্র না থাকায় পুলিশের এবং পাকিস্তান ন্যাশনাল গার্ডের রাইফেল আনসাররা ব্যবহার করতো। ১৯৪৮ সনের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্য প্রায় ৬০ হাজার বাঙালি আনসার সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। ফলে অত্র অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একটা সামরিক চেতনা গড়ে ওঠে এবং নিজেদেরকে আরো ব্যাপকভাবে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

তাই উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে দেখা যায় যে, প্রাদেশিক সচিবালয়, সমস্ত জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, স্কুল, কলেজ, কল-কারখানা, প্রতি শহরে, গ্রামে-গঞ্জে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বত্র জনগণের মধ্যে আনসারে যোগদান ও প্রশিক্ষণ নেয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, তখন খুব সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক, খুব ভাল পরিবারের লোক আনসারে আসতো। কারণ একজন আনসার কমান্ডার যে কোন অফিসে গেলে তাঁকে চেয়ারে বসতে দিতো, সমাদর করতো এবং বন্দুকের লাইসেন্স পেতে তার কষ্ট হতো না। তা ছাড়া ডিসি, এসডিও সাহেবরা গ্রামে গেলে আনসারদের ডাকতো বা তাদের সহায়তা নিতো। ফলে সমাজের সর্বস্তরের লোকজন তাদের সমীহ করতো। তাই তখন আনসার হওয়ার জন্য মানুষ উদ্‌গ্রীব ছিল।[২৮]

আর একটি কারণে মানুষ আনসারে আসতে আগ্রহী হয় এবং তা হলো আনসারের বার্ষিক কুচকাওয়াজ। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ হবার পর আনসার কর্তৃপক্ষ তাদের ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ঢাকায় এক বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ প্রদর্শনের আয়োজন করে। এতে প্রতি মহকুমা থেকে বাছাই করা ৩২ জন আনসারের ১টি করে প্লাটুন নিয়ে তারা ঢাকায় শাহ্‌বাগের আনসার সদর দপ্তরে হাজির হয়। এখানেও তারা বেশ কয়েক দিন মহড়া দেয়। অতঃপর ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ ১ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

তারা তাদের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন তৎকালীন গভর্নর জেনারেল খাজা নাজিমউদ্দিন। আনসারের কুচকাওয়াজ তাঁকে আকৃষ্ট করে। শুধু গভর্নর জেনারেলের নয় দেশের সর্বস্তরের জনগণেরও প্রশংসা কুঁড়ায় তাঁরা। ফলে আনসার বাহিনীতে মানুষের অংশগ্রহণের ব্যাপকতা লক্ষ করা যায়।[২৯]

একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল যে, এ সময় আনসারদের সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বন সংরক্ষণ, মৎস চাষ, হাঁস-মুরগির খামার, কলেরা বসন্তের টীকা দান, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষাদান, স্থানীয়ভাবে আনসার ক্লাব সংগঠন ও তার মাধ্যমে স্থানীয় যুবকদের নানাবিধ খেলাধুলার ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজে ন্যস্ত করে তাদেরকে নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সাহায্য করে।[৩০] এ ছাড়া রেডক্রসের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ তখন আনসারদের দেয়া হতো যাতে করে তারা জাতীয় দুর্যোগ মুহূর্তে (যেমন : ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) তাঁরা জনসেবা করতে পারে। এভাবে বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণ আনসার বাহিনীকে যথেষ্ট স্বাবলম্বী করে তোলে।

প্রাথমিক কার্যক্রম (১৯৪৮-১৯৭০)

প্রাসঙ্গিকভাবে একটি বিষয় বলা প্রয়োজন যে, আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠালগ্নে জেমস বুকাননকে যখন পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তখন এ বাহিনীতে মহাপরিচাকের কোন পদ ছিল না। পরবর্তীতে (১৯৪৮ সালের অক্টোবর) এ বাহিনীকে ঢেলে সাজাতে মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সরকার আলী আজগর শাহ (সিএসপি) কে প্রথম আনসার মহাপরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেন। মহাপরিচালক নিযুক্তির অব্যবহিত পর তদানীন্তন ১৬টি জেলায় ১৬ জন জেলা অ্যাডজুটেন্ট নিয়োগ করে আনসার বাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়। তবে আনসারদের তখনো নিজস্ব সম্পদ (যেমন : রাইফেল, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রশিক্ষণ, আবাসন, উচ্চতর পদ সৃষ্টি ইত্যাদি) বলে তেমন কিছু ছিল না বিধায় কাজের গতিকে তরান্বিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই নিজস্ব সম্পদগুলো পেতে আনসাররা বিভিন্ন সময় তাদের অফিসার এসোসিয়েশনের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে।[৩১] এরই ফলে তৎকালীন মহাপরিচালক এ এইচ এম এস দোহা (পিএসসি) আনসারের জন্য ৪২ হাজার রাইফেল সরকার থেকে অনুমোদন করান।[৩২]

এখানে বলা প্রয়োজন যে এ. এইচ. এম. এস দোহা ছিলেন একজন বাঙালি অফিসার। তাই তাঁর অধীনে ৪২ হাজার রাইফেল দিয়ে পাকিস্তান সরকার নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। ফলে কিছু দিন পরে ৪২ হাজার নতুন শক্তিশালী রাইফেল তুলে নিয়ে তার পরিবর্তে অন্যান্য বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত পুরানো ৩.৩ (থ্রি নট থ্রি) রাইফেল দেন। শুধু তাই নয় বাঙালি অফিসার দোহাকে পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য উগ্র মেজাজী পাঞ্জাবি অফিসার নওশেরওয়ান খানকে অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়। তিনি এবং অপর পাঞ্জাবী পরিচালক (আনসার) খুরশিদ দু'জনে মিলে মহাপরিচালক দোহা'র কাজে নানান সমস্যার সৃষ্টি করেন। এতে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় তা হলো পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানিদের উন্নতি চায় না। এ বিষয়টি আনসার বাহিনীতে বাঙালি অফিসাররা আঁচ করতে পেরেছিল। তদুপরি মহাপরিচালক দোহা পাঞ্জাবি অফিসারদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে আনসারদের জন্য একজন উপ-পরিচালক ও ৫ জন সহকারী পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে তাতে লোক নিয়োগ করেন। সেই সাথে আনসারদের বেতন বৃদ্ধিসহ তাদের পোশাক পরিচ্ছদের দাবি পূরণ করেন। এ সময় (১৯৫১ সাল) ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের অবনতি হলে মহাপরিচালক দোহা দেশ রক্ষার জন্য আনসারদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেন। বলা যায় খুব তরিঘড়ি করে চার লাখ আনসারের বাহিনীকে প্রায় চৌদ্দ লাখে উন্নীত করান এবং তাদেরকে নিয়মানুয়ায়ী প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন।

অতঃপর পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো (পয়েন্ট) সংরক্ষণের জন্য স্ব-স্ব পয়েন্ট এলাকার ১ জন করে আনসার কমান্ডারকে দেড় মাসের প্রশিক্ষণের জন্য আনসার সদর দপ্তরে এনে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণ শেষে এই প্রশিক্ষিত আনসার কমান্ডারগণ নিজ নিজ এলাকায়

গিয়ে ১ জন সহকারী কমান্ডারসহ আরো আট জন আনসারকে প্রশিক্ষণ দেন। যাতে তারা ঐ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানসমূহ (Vital Installation) সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ এবং প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে এবং কখনো যাতে কোন বহিঃশত্রু বা অভ্যন্তরীণ শত্রু ঐ সকল স্থান সমূহের ক্ষতিসাধন করে জাতীয় জীবনে বিপর্যয় না আনতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রশিক্ষণকে V.P.P.Training (Vital Point Protection Training) নামে আখ্যায়িত করা হয়।[৩৩] সমগ্র পূর্বপাকিস্তান থেকে প্রায় ২ হাজার আনসার কমান্ডারকে একত্রিত করে পাকিস্তান আর্মির বিভিন্ন ইউনিট থেকে সুদক্ষ এক কোম্পানি[৩৪] প্রশিক্ষক লেঃ মজুমদার এবং লেঃ নেওয়াজীর অধীনে পাঠানো হয়। এই প্রশিক্ষণ ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে শুরু হয়। এ সময়েই শুরু হয় ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) মানুষের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ চক্রের আক্রমণ ছিল মূলত বাঙালি জাতির আবহমান ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, হাজার বছরের ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের উপর চরম আঘাত। এই আক্রমণ পাকিস্তানিদের পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে শাসন, শোষণ ও লুণ্ঠনের ধারাবাহিকতারই অংশ।[৩৫] প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যেসব রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিল, সে সবের মধ্যে ভাষা আন্দোলনই ছিল সবচেয়ে ব্যাপক, তীব্র ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার জনগণের পৃথক অস্তিত্বের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে।[৩৬] বাঙালি জাতীয়তাবাদ উন্মেষের আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হলো দেশ বিভাগে পর পাকিস্তানিরা সবময় ক্ষমতা দখলের পায়তারা করে। মূলত শাসক চক্রের অধিকাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। তারা এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে নিজেদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখত এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলামের নাম ব্যবহার করত। এই সময়কাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হয়েছে। ফলে বাঙালিদের মধ্যে একটি বঞ্চনা ও নৈরাশ্যের মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে। এই মনোভাবই কালক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়।[৩৭]

যাহোক, বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলনের তীব্রতা দিন দিন বাড়তে থাকে। অপর দিকে শাসক চক্রও তাদের নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে থাকে। অবশেষে আসে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। সে দিন ঢাকা ছিল উত্তাল জনসমুদ্র। বিশেষ করে ছাত্র ও যুব সমাজের সংখ্যা ছিল বেশি। ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত হয়। ভাষার দাবিতে তারা মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও অন্যান্যের বুকের তাজা রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। গুলিতে ২২ ফেব্রুয়ারিতেও নিহত ও আহত হয় অনেকে। পাক সরকারের গুলি কয়েকটি নিষ্পাপ প্রাণকে স্তব্ধ করতে পারলেও ভাষা আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারেনি। পূর্ব বাংলার মানুষের বুকে একুশে ফেব্রুয়ারির তারিখটি রক্তের অক্ষরে আজও অম্লান।[৩৮]

এই ভাষা আন্দোলনে আনসারদের ভূমিকা প্রাসঙ্গিকভাবেই আলোচনার দাবি রাখে। ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার ও অন্যান্যরা শহীদ হলে সারা ঢাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানে এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আন্দোলনের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তখন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন সরকার তার সরকারি বাসভবনে সন্ধ্যায় এক জরুরি সভা আহ্বান করেন। এ সভায় ঢাকার গণ্য-মান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক এ. এইচ. এম. এস দোহাকেও ডাকা হয়। দোহা তাঁর একজন অফিসারকে সাথে নিয়ে (মোঃ জহুরুল হককে সাথে নিয়ে, মোঃ জহুরুল হককে পরবর্তীতে আনসার বাহিনীর মহাপরিচালক হয়েছিলেন) সভাতে উপস্থিত হন। মুখ্যমন্ত্রী দেশের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে সকলের মতামত নেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় নিয়োজিত প্রায় ১০ হাজার আনসারকে এই উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হবে এবং সে মোতাবেক কাজ করা হয়। ফলে কোথাও কোথাও আনসারদের সাথে সাধারণ জনগণের বৈরিতা শুরু হয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে আনসার সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি হয়।

এ প্রেক্ষাপটে আনসাররা বুঝতে পারে যে, তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার তাদেরকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। যেহেতু তারা সরকারের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং দল প্রতিষ্ঠা লগ্নে তারা দেশ রক্ষায় সামরিক বাহিনীর সহায়ক বাহিনী হিসেবে কাজ করার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীর সহায়ক বাহিনী হিসেবে কাজ করার এবং নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন ও উন্নতিতে স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে কাজ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেহেতু সরকারের নির্দেশ পালন করা ছিল তাদের পবিত্র দায়িত্ব। তাই তাৎক্ষণিকভাবে তারা সরকারের নির্দেশ পালন করলেও এক পর্যায়ে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেরাই দল থেকে বেরিয়ে যেতে থাকে। এতে করে অল্প দিনের মধ্যে আনসারের সংখ্যা অনেক কমে যায়।[৩৯]

ভাষা আন্দোলন উত্তর এ. এইচ. এম. এস দোহার পরিবর্তে পাঞ্জাবি অফিসার কর্নেল আওরঙ্গজেব খানকে আনসার বাহিনীর নতুন মহাপরিচালক করা হয় (নভেম্বর ১৯৫২)। ফলশ্রুতিতে গোটা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব পাঞ্জাবিদের হাতে চলে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল শাসক চক্রের দুরভিসন্ধিমূলক পরিকল্পনা। কারণ পাঞ্জাবি অফিসার বলতেই ছিল কম-বেশি বাঙালি বিদ্বেষী। তাই নতুন পাঞ্জাবি মহাপরিচালক নিয়োগের পরই আনসার প্রতিষ্ঠানের কাজের গতি মন্থর হয়ে আসে। চলতে থাকে বাঙালি অফিসারদের উপর নানা রকম হয়রানি। মহাপরিচালক নিজে রাজবাড়ীর সাব ডিভিশনাল বাঙালি অ্যাডজুটান্ট আবুল হোসেনকে শারীরিকভাবে নির্যাতনসহ নানা ধরনের শাস্তি দেন।[৪০] এ বিষয়টি আনসার বাহিনীর জোয়ানদের মধ্যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে আনসার বাহিনীর কাজের গতি আরো ধীর হয়। এর পরেও আনসার বাহিনী নিয়ে শাসকচক্র নানা হীন চক্রান্তে মেতে ওঠার প্রয়াস পায়।

এ প্রসঙ্গে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের কথা উলেখ করা যায়। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ সরকার স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নির্লজ্জভাবে আনসারদের ব্যবহার করে। ৫২'র ভাষা আন্দোলনে বাঙালি তরুণদের আত্মদানের ফলে সুপ্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটার কারণে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে স্বৈরাচার ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে পরাজিত করার আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হতে থাকে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এ দেশের মাটি থেকে মুসলিম লীগকে চিরতরে উৎখাতের লক্ষ্যে সমস্ত বিরোধী দলের সমন্বয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রয়াসী হয়।[৪১] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কৃষক প্রজাপার্টি, আওয়ামী মুসলিম লীগ এবং নেজামে ইসলাম পার্টি ও গণতন্ত্রীদল এ তিন দল মিলে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্টের ঐক্যজোট। জোটের জয় সুনিশ্চিত করবার জন্য তিনটি দলের নেতৃবর্গ দেশবরেণ্য শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হককে নেতা মনোনীত করে এবং তাঁর নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করে ২১ দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ নেয়। যে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে ২১ দফার মধ্যে ১৯নং দফায় পূর্ব পাকিস্তান আনসারদের সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি ছিল।[৪২] নির্বাচনে জনগণ বিপুল ভোটে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীদের পক্ষে রায় ঘোষণা করে। ফলে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল এ কে ফজলুল হককে মুখ্যমন্ত্রী করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়।[৪৩] উল্লেখ্য, এই নির্বাচনে আনসারদের নেতিবাচক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল শাষকগোষ্ঠীর নির্দেশে তাদেরই হীন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে ক্ষমতাসীন সরকারের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। পাক সরকারের মন্ত্রীরা নির্বাচনী কাজে জনগণের কাছে গেলে জনগণের সাড়া মিলতো না। এই অবস্থায় ডি সি, এস পি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নির্দেশে নির্বাচনী জনসভায় সাধারণ পোষাকে আনসারদের উপস্থিত করানো হতো। এ জন্য আনসারদের মধ্যে বাড়তি টাকা পয়সাও ছড়ানো হতো।[৪৪] এ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়টির জন্য আনসাররা প্রস্তুত না থাকলেও বিষয়টি জানাজানি হওয়ার ফলে এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের মনে আনসার সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়।

তবে এটা সত্য যে, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী মেনিফেস্টুর ১৯নং দফায় আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় তার ফলে আনসাররা যে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ এ দফাতে তাদের বৈষয়িক উন্নতি ও পেশাগত স্বার্থ জড়িত ছিল। আর এ কারণে নির্বাচনে তারা বাহ্যত সরকারের পক্ষে কাজ করলেও মনে প্রাণে তারা যুক্তফ্রন্টের

বিজয় কামনা করেছিল। কিন্তু তারা যে মুসলিম লীগের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল তা ছিল নিতান্তই হুকুম পালন করা। এই হুকুম পালন করতে গিয়ে তারা আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও অপমানিত করেছিল।[৪৫] আনসারদের এরূপ ব্যবহারে শহীদ সোহরাওয়ার্দী আনসারদের প্রতি রুষ্ট হয়ে তাদেরকে অবাঞ্ছিত ও দুষ্ট চরিত্রের লোক বলে অভিহিত করেছিলেন।[৪৬]

চাঁদপুরেও আনসারদের দিয়ে মুসলিম লীগ আরেকটি খারাপ ঘটনার অবতারণা করে। সেখানে মুসলিম লীগ আয়োজিত জনসভায় সাদা কাপড়ে (সিভিল ড্রেসে) বহু আনসারকে সমবেত করা হয়। চাঁদপুর কলেজের ছাত্ররা এ সংবাদ পেয়ে আনসারদের ধাওয়া করলে মিটিং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আনসাররা সশস্ত্র হয়ে ছাত্রদের পাল্টা ধাওয়া করে এবং ছাত্রদের মারধর করে। উক্ত ঘটনার পরের দিন ঘটনাচক্রে একই জায়গায় শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক এক সভায় বক্তৃতা দেন। এতে তিনি এক পর্যায়ে বলেন, '... আরে মিঞারা আনসাররা তো আমাগো পোলা, তোমরা এত বাড়াবাড়ি করছ কিয়ের লাইগ্যা, দ্যাইখ ভোট দেয়ার সময় ঠিকই ওরা নৌকায় ভোট দিবে। আসল ব্যাপারটা তোমরা বুজ্জ নাই ...।" তিনি এই বক্তৃতায় আনসারদের ব্যবহার করা সম্পর্কে শাসকচক্রকে হুশিয়ার করে দেন।

উক্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা গুলো এবং আরো কিছু ঘটনা জেনে শুনে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী সোচ্চার হয়ে বিভিন্ন স্থানে আনসারদেরকে এভাবে ব্যবহার করার জন্য সরকারকে দায়ী করেন। তবে আনসারদের উপরও বিরক্ত হন। ফলে আনসার প্রতিষ্ঠানের সর্বজনীন সুখ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা প্রায় নির্মূল হয়ে যায়।[৪৭] তখন আনসারদের পক্ষে কথা বলার মত লোক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এরূপ আস্থায় যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। ফলে পূর্বে উল্লিখিত ঘটনাবলির জন্য আনসার বাহিনীকে বিলুপ্ত করা হতে পারে বলে আনসার অফিসার ও জোয়ানদের মধ্যে ধারণার অবতারণা হয়। তৎকালে আনসার অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি মো: জহুরুল হক বিষয়টি আঁচ করতে পেরে মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী পরিষদের কতিপয় সদস্য ও সংসদ সদস্যদের সবাইকে একটা অনুষ্ঠানে দাওয়াত করে এনে অতীতের ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে কৈফিয়ত স্বরূপ একটা ব্যাখ্যা দিতে উদ্যোগী হন। সেই সাথে আনসারা যে দেশের ভাল কাজও করছে তাও তাদেরকে জানাতে তৎপর হন। কিন্তু তৎকালীন মহাপরিচালকসহ অন্যান্য পাঞ্জাবী কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কোন কর্ণপাত না করায় এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আনসারের উক্ত বিষয়গুলো এবং দাবি-দাওয়া সংবলিত একটি স্মারকলিপি তৈরি করে তা সংশ্লিষ্ট অফিস গুলোতে বিলি করা হয় এবং বাঙালি অফিসারেরা যার যতটুকু পরিচিতি ছিল তাই নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বুঝাতে তৎপর হয়।

এ সময় কুমিল্লার লাকসামে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে এলাকাবাসী মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের দেখতে মওলানা ভাসানী লাকসাম এলাকা পরিদর্শনে গেলে তিনি দেখতে পান যে, বহুলোক মানুষের ঘর-বাড়ি তৈরি করছে এবং সমস্ত এলাকার মৃত পশু- পাখি অপসারণ এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে। তিনি এই লোকগুলোর কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হন এবং বলেন, " ... এরা তো খুব ভাল লোক। দুঃস্থ মানুষের জন্য কি সুন্দর কাজ করছে। এরা কারা ? ...।" সুযোগ বুঝে পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ সদস্য ও হুইপ আবাদ মাহমুদ[৪৮] মাওলানা ভাসানীকে বুঝিয়ে বললেন " ... হুজুর এরা সব আনসার ...।" এক পর্যায়ে তিনি বললেন যে, হুজুর দেশে ১৪ লাখ আনসার আছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাদের জন্য বাজেট রেখেছে মাত্র ১৪ লাখ টাকা অর্থাৎ বছরে জন প্রতি আনসারের জন্য এরা খরচ ধরেছে মাত্র ১ টাকা। তাঁকে আরো বুঝালেন যে, আনসারদের একটু ভাল দেখা শোনার ব্যবস্থা করলে এরা সমাজের আরো উন্নতি করতে পারত। মাওলানা ভাসানীকে আরও অনুরোধ করা হলো যে, তিনি যেন সরকারকে আনসারদের উন্নতির ব্যাপারে কিছু বলেন।

অতঃপর আনসারদের উন্নতি কল্পে আবাদ মাহমুদ বহু ব্যাখ্যা দানের পর মাওলানা ভাসানী বলে উঠলেন, "তোমার এ কথা বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি এবং আজ বিকালের মিটিং এ আমি বাংলার মানুষকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আচরণ সম্বন্ধে বলবো এবং আনসারদের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য উভয় সরকারকে দায়ী করবো। আমি ব্যক্তিগতভাবে ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আতাউর রহমান

খান এবং শেখ মুজিবকে আনসারদের কাজ করার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার জন্য যা কিছু করণীয় তা করতে বলবো। তা না করলে তাদের আমি ছাড়বো না। তুমি (আবাদ মাহমুদ) আনসারদের সম্বন্ধে আরো কিছু তথ্য আমার কথা বলার আগে জোগাড় করে দাও।'[৪৯] আবাদ মাহমুদ হন্ত-দন্তভাবে এদিক সেদিক ঘোরা-ঘুরি করে এবং এসোসিয়েশনের সভাপতি মো: ফজলুল হকের সাথে কথা বলে বেশ কিছু তথ্য জোগাড় করে মাওলানা ভাসানীকে দিলেন।

যথারীতি কুমিল্লার টাউন হলে মিটিং শুরু হলে বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে মাওলানা ভাসানী বক্তৃতা শুরু করেন। তাঁর ভাষণের প্রায় অর্ধেকটাই বলেন আনসার প্রসঙ্গে। তার বক্তৃতার কতকগুলো কথা ছিল এরূপ :- " ... পূর্ব পাকিস্তানের ভায়েরা পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের কাছে জানতে চায় একটি গরু বা একটি ছাগল পুষতে এক বৎসরে কত টাকা খরচ হয় এবং তা কি এক টাকার কম না বেশী। যদি তা বেশী হয় তাহলে কি কারণে ১৪ লাখ পূর্ব পাকিস্তানী স্বেচ্ছাসেবক আনসার বাহিনীর জন্য মাত্র ১৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এটা কোন জাতীয় প্রশাসন ? এটা কোন জাতীয় বিচার বিধান ? অনতিবিলম্বে এর সমাধান না করলে ১৪ লাখ মানুষের বাহিনীকে আমি হুকুম দিব সবাই মিলে সরকারকে ভেঙে তছনছ করে ফেলতে। আমার হুকুমের ফলাফল ইংরেজ সরকার ভাল করে উপলব্ধি করেছেন। পাকিস্তান সরকার যদি সেই ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয় তাহলে তাদেরও ইংরেজদের মত শিক্ষা পেতে হবে। ১৪ লাখ মানুষের তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর তকদীর নিয়ে খেলা করার অধিকার কেউ কাউকে দেয় নাই। আমি সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে এর জন্য সতর্ক করে দিচ্ছি ...। "

এর কিছু দিন পর গভর্নর শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক আনসারের তদানীন্তন মহাপরিচালকে ডেকে একটা আধা সামরিক বাহিনী হিসেবে আনসারদের গড়ে তোলার জন্য একটা স্কিম পেশ করার নির্দেশ দেন। ইতোমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানও আনসারদের প্রতি নেক নজর দেন। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনিও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন যে, ইতিপূর্বে আনসাররা ব্যবহৃত হয়েছিল মাত্র। আনসারদের প্রতি তিনিও সুদৃষ্টি দেন। এর কিছু দিনের মধ্যে (১৯৫৫ সালে) এ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অফিসারদের পদ তথা আনসার প্রতিষ্ঠানকে সংসদীয় আইনের মধ্য দিয়ে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৫০] এটা ছিল এ সংগঠনের আনসারদের মধ্যে একটা মাইল ফলক। এতে আনসারবাহিনী বিলুপ্তির সম্ভাবনা দূর হয় এবং নতুন করে কাজ-কর্ম করার স্পৃহা জাগে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশের সামরিক আইন জারি হলে সমস্ত বিভাগেই কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। সেই পরিবর্তনের ধারায় কিছু আনসার কর্মকর্তা চাকুরী হারান এবং পাকিস্তানের সমস্ত বিভাগের চাকুরী পুনর্বিন্যাসকালে আনসার বাহিনীতেও আসে পরিবর্তনের ছোঁয়া। আনসার মহাপরিচালকের পদ ক্ষুণ্ন করে পরিচালকের পদে নামিয়ে দেয়া হয়। পরিচালককে করা হয় অতিরিক্ত পরিচালক আর আঞ্চলিক সহকারী পরিচালকদের বিভাগীয় কমিশনারের স্টাফ অফিসার করা হয়। এ ব্যাপারে আনসার এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টের কাছে আপিল করেও কোন ফল হয়নি।[৫১] তবে পরিবর্তনের ধারার ১৯৬০ সনে আনসার অফিসারদের জন্য রিক্রুটমেন্ট রুল তৈরি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিপূর্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার আনসার প্রতিষ্ঠানের বেতনভোগী অস্থায়ী পদগুলো স্থায়ী ঘোষণা করলেও রিক্রুটমেন্ট রুল না থাকায় ঐ সব পদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্থায়ী করা হচ্ছিল না। এ পর্যায়ে তা সম্ভব হয়।

১৯৬২ সালে আজম খানের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে আসেন মোনায়েম খান। মোনায়েম খান গভর্নর হয়ে আসার পরই তিনি চাইলেন যে, আনসাররা দেশের উন্নয়নমূলক কাজ করুক এবং এ ব্যাপারে তৎকালীন মহাপরিচালক কর্নেল এ. এস. এম. এ লতিফ (পিএসসি) কে নির্দেশ দিলেন। কর্নেল লতিফ নির্দেশিত হয়ে তাঁর কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে শহরতলীতে কচুরিপানা পরিষ্কার করা এবং একটা রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা নেন। তখন ঢাকার ডেমরা রোডের পাশে বিপুল পরিমাণ কচুরিপানার স্তূপ ছিল, যেখান থেকে প্রচুর মশা উৎপন্ন হতো। ফলে এখান থেকে কচুরিপানা সড়ানোর জন্য একটি নির্ধারিত

দিনে ৪/৫ শত আনসার একত্রিত হয়ে সমস্ত এলাকার কচুরিপানা পরিষ্কার করে। গভর্নর এবং এলাকার গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা এ কাজে আনসারদের প্রশংসা করে। অতঃপর আনসার প্রশাসন সারা দেশের বিভিন্ন খাল-বিল, নালা, ডোবা, মজাপুকুর এবং অন্যান্য এলাকার কচুরিপানার এবং আবর্জনা পরিষ্কার করতে তৎপর হয়। কচুরিপানা পরিষ্কারের পাশাপাশি ঢাকা-নারায়নগঞ্জ রোডের ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি থেকে ফতুলা রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত একটি মাটির কাঁচা রাস্তা তৈরিতেও তারা উদ্যোগী হয়।

শুধু রাস্তা নির্মাণ নয়, রাস্তা মেরামত, পতিত জমি আবাদ, কৃষি কাজে আত্মনিয়োগ, হাঁস-মুরগি ও গরু ছাগল পালন, টীকা দান, মাছ চাষ, মহামারী ও দুর্যোগের সময় ত্রাণ সেবা কাজ এবং নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে। মোট কথা, সামাজিক উন্নতিতে সহায়ক সব ধরনের উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে আনসারেরা আত্মনিয়োগ করে।[৫২] সমস্ত দেশব্যাপী এ ধরনের কাজ চলতে থাকায় আনসারেরা সর্বস্তরের জনগণের ভূয়সী প্রশংসা কুঁড়ায়।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ও আনসারদেরকে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। ১৯৬৪ সালের মে মাসে জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যু এবং সেখানকার শাসক দলের মধ্যে বিভেদ পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে উৎসাহিত করে। ৬৫'র নির্বাচনে জয়ের পর তিনি ইতিহাসে আরো তথাকথিত বড় ভূমিকা রাখার জন্য পরিকল্পনা করেন। ভারত রাষ্ট্রকে যুদ্ধে হারিয়ে কাশ্মীর জয় করে নেয়ার লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করেন। কিন্তু জওহরলাল নেহেরুর উত্তরসুরি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়ে কাশ্মীরের ব্যাপারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মীরের যে বিশেষ স্থান ছিল ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে শাস্ত্রীর সরকার সংবিধান সংশোধন করে তা তুলে দেয় এবং কাশ্মীরকে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অঙ্গীভূত করে নেয়। ফলে কাশ্মীর সর্ম্পকে পাকিস্তানের নতুন আবেগ সৃষ্টি হয়। মূলত এর পরই শুরু হয় 'কচ্ছের রান' নিয়ে ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্ব।[৫৩] দ্বন্দ্ব অবশেষে যুদ্ধে রূপ নেয় ৬ সেপ্টম্বর ১৯৬৫তে, যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কাশ্মীরের ভারতীয় অংশ আক্রমণ করে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ণ যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানি সৈন্যদেরকেও যুদ্ধের জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে পড়ে। জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ মূহূর্তে সীমান্ত এলাকা পাহাড়ার জন্য সীমান্ত চৌকি[৫৪] গুলোতে আনসার মোতায়েন করা হয়।[৫৫] এবং তারা সাফল্যজনকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে। যুদ্ধ শুরুর ১৭ দিনের মাথায় (২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে যুদ্ধ বন্ধ হয়। এর কিছুদিন পর ১৯৬৬ সালের ১০ জানুযারি তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এভাবেই আইয়ুব খানের ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান মনে প্রাণে চেয়েছিলেন কাশ্মীর জয় করতে। কারণ কাশ্মীর বিজিত হলে কাশ্মীরের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং তাতে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নস্যাৎ করা সম্ভব হবে। ফলে বলা যায় যে, ১৯৬৫'র যুদ্ধ ভারতের বিরুদ্ধে হলেও যুগপৎ তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও।[৫৬] ভারতের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়ে মানসিকভাবে আহত আইয়ুব-শাহী কাশ্মীরের পরিবর্তে পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান জয়ের নেশায় উদ্বেলিত হয় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর নগ্ন আক্রমণ চালায়।

১৯৬৫ পরবর্তী আনসারদের কার্যক্রম প্রধানত গ্রাম উন্নয়নে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করা ও দেশ রক্ষায় সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার কাজে নিয়োজিত থাকে। তবে ১৯৪৮ সালের 'আনসার আইনে' আনসার বাহিনীর মূল বৈশিষ্ট্য ছিল যে, আনসার একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী এবং উক্ত আইনে আনসার অঙ্গীভূত করার বিধানও ছিল।[৫৭] অর্থাৎ পুলিশ বাহিনী কর্তৃক আনসার অঙ্গীভূত করা হলে, উক্ত অঙ্গীভূত আনসার পুলিশ বাহিনীর সদস্য হিসেবে গণ্য হতো। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, একজন আনসার পুলিশ বাহিনীতে অঙ্গীভূত হবার সাথে সাথে আনসারের মর্যাদা হারিয়ে সে একজন পুলিশের

মর্যাদা লাভ করতো। অথচ আদর্শগত দিক দিয়ে আনসার বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির।[৫৮]

পুলিশ বাহিনী ছাড়াও মিল, কল-কারখানা, ব্যাংক, বীমা বা অন্য যে কোন সরকারি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নিজ প্রয়োজনে যথাযথ নিয়ম-নীতি মেনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আনসার চাইতে পারতো। সাধারণত চাহিদা অনুযায়ী আনসার দেয়া হতো এবং ঐ সকল আনসার তখন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হারে বেতন-ভাতা পেতেন। অর্থাৎ আনসারগণ যখন কোন বাহিনী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োজিত হবেন শুধু তখনই তারা বেতন ও ভাতাদি নিয়োগকারী বাহিনী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাপ্য হবেন। তাদের অঙ্গীভূত কাল শেষ হলে তারা পুনরায় স্বেচ্ছাসেবক আনসার হয়ে যান এবং পুনরায় অঙ্গীভূত না হওয়া পর্যন্ত তারা নিজের ও গ্রাম উন্নয়ন মূলক কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখেন।[৫৯]

১৯৬৫ পরবর্তী ১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে আনসাররা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৯ সালে দেশে যখন পাক-সরকারের বিরুদ্ধে গণরোষ দেখা দেয় তখন আনসারেরা জনগণের কাঁতারে এসে দাঁড়ায়। তাঁরা যখন বুঝতে পারে যে, পাকিস্তানী স্বৈরসরকার এদেশের মানুষের মঙ্গল চায় না, তারা শোষণ করে বাঙালি জাতিকে দাবিয়ে রাখতে চায়। তখন তারা জনগণের সাথে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে গণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে ৭০'র নির্বাচনে স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।[৬০]

১৯৭০ সালে ভয়াবহ ও প্রলয়ংকরী এক ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস হয়। এতে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। গৃহহীন হয় ততোধিক। উপকূলীয় অঞ্চলের বাড়ীঘর প্রাণীকূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দেশের এই চরম বিপর্যয় মুহূর্তে আনসাররা যে ভূমিকা রাখে তা উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে এত লোক ও প্রাণীকূল মারা যায় যে, তাদের সৎকার বা অপসারণ করার মত জনবল সরকারের ছিল না। অধিকন্তু আনসাররা ছিল একটি প্রশিক্ষিত বাহিনী বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলের আনসারদের ছিল রেডক্রসের প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণকে তারা সে সময় কাজে লাগায় এবং শব দেহের সৎকার, মৃত পশু-পাখী অপসারণ, ঘর-বাড়ি পুনর্নির্মাণ এবং ত্রাণ তৎপরতার কাজে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

৭০'র ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী আনসারদের ব্যাপক আকারে রেডক্রসের প্রশিক্ষণের বিষয়টি সরকারের চিন্তায় আসে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের রেডক্রসের চেয়ারম্যান ছিলেন চিফ জাস্টিস বি. এ সিদ্দিকী এবং সেক্রেটারি ছিলেন ফখরুল হোসেন। এঁরা রেডক্রস ট্রেনিং এর আবশ্যকীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

অতঃপর উপকূলীয় অঞ্চল থেকে আনসার কমান্ডার এবং অফিসারদের এনে ব্যাপক আকারে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ এমনভাবে দেয়া হয় যেন ঝড়ের সংকেত এলে তাঁরা সকলকে সর্তক করতে পারে এবং নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে পারে। আর বিপর্যয় উত্তরকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সুষ্ঠুভাবে ত্রাণের কাজ ত্বরান্বিত করতে পারে। এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণের যন্ত্রপাতি এবং আবশ্যকীয় খরচ যেটা ছিল তা ছিল বিরাট অংকের টাকা। তবে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সদস্য সুইডেনের প্রতিনিধি মিঃ সোয়েব ল্যান্ডের সহযোগিতায় তা সম্ভব হয়েছিল।[৬১] এরূপ প্রশিক্ষণ পেয়ে আনসাররা যেমন নিজেদেরকে জনগণের সেবক ভাবতে গর্ববোধ করতো ঠিক তেমনি জনগণও তাদের নিকট থেকে উপকার পেয়ে আশান্বিত হতো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠা লগ্নে আনসাররা আসতো ভাল ভাল পরিবার থেকে, শিক্ষিত পরিবার থেকে, যাদের সমাজে ভাল অবস্থান ছিল। আনসার কমান্ডাররা ছিলেন অনেক উঁচু পরিবারের লোক। সমাজে তাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ১৯৬০ পরবর্তীকালে এ সকল পরিবারের লোকের আনসারে আগমন ধীরে ধীরে কমে আসে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো তাদের প্রতি সরকারের যথাযথ মূল্যায়নের অভাব। দেশ বিভাগের পর তারা যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে দেশ গড়ার কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আনসারে আসতো সরকারি উদাসীনতার কারণে তাদের সে উৎসাহে ভাটা পড়ে। ফলে আনসারে ভাল পরিবারের লোকের অভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ অভাব

ও শূন্যতা পূরণে সরকারকে বাধ্য হয়ে নিচু ও অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবারের লোক আনসারে ভর্তি করতে হয়। এসব পরিবারে লোকেরা সাধারণত আনসারে আসতো জীবন ধারণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির আশায়। বর্তমানেও এ ধারা অব্যাহত আছে।[৬২]

সময়ের আবর্তে এসে যায় ১৯৭১। তৎপূর্বে ১৯৭০ সালের ৫ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগ ছিল ক্ষমতার দাবিদার। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার ভুট্টোর যোগসাজসে আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি শাসকচক্র আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা অর্পণ না করে বা জাতীয় পরিষদের বৈঠক বা আপোসের পথে না গিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের উপর নিষ্ঠুর সামরিক হামলা শুরু করে ২৫ মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাত থেকে। এ দেশের মানুষ এই সুপরিকল্পিত হামলা প্রতিরোধের প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এর পর শুরু হয় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামে দেশের অন্যান্য বাহিনীর সাথে আনসার বাহিনীও একাত্ম হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

উপসংহার

১৯৪৮ সালে যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয় তা অনেকাংশেই বাধাগ্রস্ত করে তৎকালীন পাক-সরকার। পাক-সরকারের হীন চক্রান্তের জালে তারা আটকা পড়ে। ফলে দেশে চলমান সরকার বিরোধী আন্দোলনগুলোতে আনসার সদস্যদের সাধারণ জনগণের মুখো-মুখি করে দাঁড় করায়। তারা দেশের উন্নয়নের পরিবর্তে সরকারের হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়। এরই প্রেক্ষিতে জনগণের বিভিন্ন সভা-মিছিলে আনসার বাহিনীর সদস্যরা বির্তকিত ভূমিকা রাখে। জনগণের বিরুদ্ধে আনসাররা ব্যবহৃত হচ্ছে বিষয়টি আনসাররা বুঝতে পেরে ক্রমেই জনগণের কাতারে আসতে থাকে। ফলে ১৯৬৯ অবধি আনসারের সংখ্যা কমতে কমতে অর্ধেকের নিচে নেমে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আনসার বাহিনী জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আনসার বাহিনী তাদের দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার দ্বারা তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। ১৯৪৮-১৯৭১ সময়কালে তাদের কার্যাদি পর্যালোচনা এটাই প্রমাণ করে।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

১. হায়দার আলী খান, *আনসার* (ঢাকা : গণ উন্নয়ন প্রকাশনী, অক্টোবর ১৯৯০), পৃ. ৭।

২. শেখ গাউস মিঞা, *মুক্তিযুদ্ধে আনসার বাহিনী* (ঢাকা : অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, অক্টোবর ২০০৩), পৃ. ২১।

৩. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* (ঢাকা : ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২), পৃ. ৪।

৪. মো: জহুরুল হক, *আমার স্মৃতিতে আনসার* (ঢাকা : সোনারগাঁও প্রিন্টিং এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ডিসেম্বর ১৯৯৩), পৃ. অনুল্লেখিত।

৫. তদেব।

৬. তদেব।

৭. *সাক্ষাৎকার*, মো: শরিফুল হক, প্রাক্তন পরিচালক, আনসার ভিডিপি অধিদপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা। মো: শরিফুল হক অবিভক্ত বাংলার হোমগার্ডের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। হোম গার্ডের কার্যক্রম শেষ হলে এ দেশে যখন আনসার বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন তাদের মত কয়েকজন হোম গার্ডের কর্মকর্তা দ্বারা এ বাহিনীর কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। শরিফুল হক ১৯৮১ সালে চাকুরী থেকে অবসর নেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।

৮. মো: শরিফুল হক, *স্মৃতি অমলিন* (ঢাকা : সঞ্চিতা প্রকাশনী, জুলাই ১৯৯৮), পৃ. ১৬।

৯. তদেব, পৃ. ১৬। সহদ্রষ্টব্য, *সাক্ষাৎকার*, মো: শরিফুল হক।

১০. পূর্ব পাকিস্তানের হোমগার্ড নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন, মোজাম্মেল হোসেন (অবসর প্রাপ্ত যুগ্ম সচিব, মন্ত্রণালয়ের নাম জানা যায়নি) আবু বকর, ও মো: শরিফুল হক (হোমগার্ডের প্রাক্তন কর্মকর্তা)।

১১. মো: শরিফুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

১২. জেমস বুকানন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জনার জন্য দ্রষ্টব্য, মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২-১৪।

১৩. মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

১৪. মো: শরিফুল হকের *সাক্ষাৎকার* ।

১৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ১৯৪৮ সলের '*আনসার এ্যাক্ট দেখুন*'।

১৬. মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪। সহদ্রষ্টব্য, মেজর জেনারেল এম ওয়াজহিউল্লাহ পিএসসি (অবঃ) মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি, "এক নজরে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল" জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ্ (সম্পা.) *প্রতিরোধ*, ১০ম বর্ষ, ১১ সংখ্যা, (ঢাকা: অনসার বাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত, ১ মার্চ ১৯৮৬), পৃ. ৭।

১৭. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

১৮. তদেব, পৃ. ২২।

১৯. মুহাম্মদ তোজাম্মেল হক, (উপ-পরিচালক, অনসার ভিডিপি, খুলনা রেঞ্জ) "আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল", জাহাঙ্গীর হাবীব উল্লাহ্ (সম্পা.) *প্রতিরোধ*, ২০ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, (ঢাকা : অনসার বাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ৭৩।

২০. মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫। সহদ্রষ্টব্য, মো: শরিফুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭।

২১. এই ৪ জন কর্মচারীর পদবী ছিল ঃ- ১ জন ষ্টেনোগ্রাফার, ১ জন পিয়ন, ১ জন মালী ও ১ জন দারোয়ান। সূত্র : শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২। সহদ্রষ্টব্য, মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫।

২২. ২৭ জন কর্মকর্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন :-

২৩. এম এ কুদ্দুস ভূঁইয়া, (২) মোজাম্মেল হক (মঞ্জু), (৩) আবু তালেব, (৪) জোহা, (৫) এম এ মতিন, (৬) সেরাজুল হক, (৭) এম, ই, মৃধা, (৮) এম, এ ফাত্তাহ, (৯) মো: শরীফুল হক, (১০) সলীম নেওয়াজ খাঁন, (১১) ওয়াসীম উদ্দিন, (১২) গোলাম রব্বানী চৌধুরী, (১৩) জহুরুল হক, (১৪) জয়নাল উদ্দীন, (১৫) আলী, (১৬) এম এ গফুর, (১৭) হাফিজ, (১৮) মফিজ উদ্দীন, (১৯) বখতিয়ার, (২০) আহমেদুর রহমান চৌধুরী, (২১) রওশন আলী, (২২) মাহাতাফ, প্রমুখ। সূত্র : মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

২৪. পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচনী বোর্ডের কাঠামো ছিল নিম্নরূপ ঃ-

২৫. মহাপরিচালক, চেয়ারম্যান (২) তদানিন্তন ১৪ ডিভিশনের একজন প্রতিনিধি সদস্য। (৩) পুলিশের একজন ডিআইজি, সদস্য (৪) ডেপুটি সেক্রেটারি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সদস্য (৫) পরিচালক, আনসার, সদস্য সচিব। সূত্র: মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬ ও ২০।

২৬. প্রতিজ্ঞায় হুবহু কি ছিল তা জানা সম্ভব হয়নি তবে যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা হলো ঃ- ''আমি সর্বদা দেশের কাজ করবো। দেশের যেখানে যে কাজে লাগে এবং সরকার যখন খুশী ডাকেন আমি সে কাজ করতে সদা প্রস্তুত থাকবো। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করবো।" সূত্র : *সাক্ষাৎকার*, মোঃ শরিফুল হক, পূর্বোক্ত।

২৭. ৩২ জন সদস্য সমন্বয়ে ১টি প্লাটুন গঠিত হয়। এর মধ্যে থাকেন ১ জন প্লাটুন কমান্ডার, ১ জন সহকারী প্লাটুন কমান্ডার এবং বাকি ৩০ জন আনসার। এই ৩০ জনকে ৩টি সেকশনে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেকশনে থাকে ১ জন সেকশন কমান্ডার, ১ জন সহকারী সেকশন কমান্ডার ও বাকি ৮ জন আনসার।

২৮. নির্দেশ অনুযায়ী সারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জেলাতেই প্রশিক্ষণ শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণকে কেন্দ্র করে দিনাজপুর জেলার একটি ঘটনা উল্লেখ্য। দিনাজপুরের এক প্রশিক্ষণ শিবির উদ্বোধনকালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাসান তরাফ আলী (আইসিএস) প্যারেড মাঠে অবস্থানরত ৫ শতাধিক আনসারের সম্মুখে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রিত অতিথি পূর্ব বাংলার সংসদ সদস্য আব্দুলাহ্ আল বাকীকে অনুরোধ জানান। আব্দুলাহ আল বাকী একটি রাইফেল উত্তোলন করে আকাশের দিকে চেয়ে আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, ''.. হে আলাহ তোমার দান, দয়া অপরিসীম। যে রাইফেলের অধিকার বলে ইংরেজরা এদেশকে প্রায় দুইশত বছর শাসন করে গেছে সেই রাইফেল আজ তুমি এ দেশবাসীর হাতে তুলে দেয়ার সৌভাগ্য আমাদের দান করেছ। প্রার্থণা করি তুমি এই অস্ত্রের সম্মান এবং সদব্যবহারের সুযোগ আনসারদের প্রদান কর..।" এই বলে তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে আনসারদের হাতে রাইফেল তুলে দেন। এভাবে দিনাজপুরে আনসারদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। সূত্রঃ মোঃ জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

২৯. তদেব, পৃ. ১৭-১৮।

৩০. *সাক্ষাৎকার*, মো: শরিফুল হক।

৩১. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩।

৩২. মো: শরিফুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯।

৩৩. আনসার অফিসার্স এসোসিয়েশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৮।

৩৪. এই ৪২ হাজার রাইফেল ভারতের হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রধানমন্ত্রী লায়েক আলী ভারত হায়দ্রাবাদ সংগ্রামে ব্যবহারের জন্য চেকশ্লোভাকিয়া থেকে ক্রয় করেছিলেন। রাইফেলবাহী জাহাজ করাচি হয়ে হায়দ্রাবাদ পৌঁছার পূর্বেই হায়দ্রাবাদের পতন হয় এবং লায়েক আলী করাচিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে রাইফেলগুলো পাকিস্তানের হস্তগত হয়। এ সময় আনসারের মহাপরিচালক এ. এইচ. এম. এস দোহা করাচিতে থাকায় তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে বুঝিয়ে রাইফেলগুলো পূর্ব পাকিস্তানের আনসারের জন্য পাঠান। সূত্র : শেখ গাউস মিঞা,পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪। সহদ্রষ্টব্য, মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯।

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১।

৩৬. ১০০ জন সদস্য সমন্বয়ে ১টি কোম্পানী হয়। ১টি কোম্পানীতে থাকে ১ জন কোম্পানী কমান্ডার ও ১ জন সহকারী কোম্পানি কমান্ডার। বাকি ৯৮ জন আনসারকে ৩টি প্লাটুনে ভাগ করা হয়। এবং সেখানেও ১ জন প্লাটুন কমান্ডার ও ১জন সহকারী প্লাটুন কমন্ডার থাকে।

৩৭. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৮৪৭-৭১* (ঢাকা : সময় প্রকাশন, আগস্ট ২০০৩), পৃ. ৯৬। সহদ্রস্টব্য, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮", প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ৩৫।

৩৮. বদরউদ্দিন উমর, *ভাষা আন্দোলন: প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ২০০০), পৃ. ৪২৭।

৩৯. সালাহউদ্দীন আহমদ, "বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি", সৈয়দ আলী আহসান ও অন্যান্য (সম্পা.) *বাংলাদেশ* (ঢাকা : প্রকাশনীর নাম পাওয়া যায়নি, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২), এ এস প্রথম বিজয় দিবস বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ২১।

৪০. অভীক সরকার (সম্পা.), *বাংলা নামে দেশ* (কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি:), ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ১৪।

৪১. মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩।

৪২. তদেব, পৃ. ৩৫-৩৭।

৪৩. মেজর রফিকুল ইসলাম (পিএসসি), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ* (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৩), পৃ. ২১।
৪৪. যুক্তফ্রন্টের ১৯নং দফাটি ছিল নিম্নরূপ:- "...লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ও সার্বভৌমিক করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্বক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ণ করা হইবে এবং দেশ রক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণ করতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ং সম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে ... "। সূত্র : এম আর আখতার মুকুল, *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর, ভাসানী মুজিবের রাজনীতি* (ঢাকা : সিটি পাবলিশিং হাউজ, এপ্রিল ১৯৯৬), পৃ. ৯৫।
৪৫. রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা : অনন্যা প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৮৯), পৃ. ৩৯।
৪৬. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭।
৪৭. প্রসঙ্গত বিষয়টি এখানে বলা প্রয়োজন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক সভায় যাবার জন্য রেলের একটি কম্পার্টমন্টে পূর্ব থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। সরকার বিষয়টি জানতে পেরে সোহরাওয়ার্দী যাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে যেতে না পারেন সেই লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে উক্ত কম্পার্টমেন্ট আনসার দিয়ে ভরে রাখে। যথা সময়ে সোহরাওয়ার্দী ট্রেনের পূর্ব নির্ধারিত কম্পার্টমেন্ট গেলে তাঁকে আনসাররা বাঁধা দেয়। শেষ পর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়ে নিম্ন শ্রেণীর একটি কামরায় চড়ে গন্তব্যে পৌছান। সূত্র: মোঃ জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৪৮. তদেব।
৪৯. তদেব, পৃ. ৪০।
৫০. আবাদ মাহমুদ পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ সদস্য ও হুইপ ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল কুমিল্লায়। মাওলানা ভাসানী কুমিলল্লার লাকসামে ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে গেলে উক্ত আবাদ মাহমুদের বাড়ির আতিথিয়েতা গ্রহণ করেছিলেন।
৫১. মোঃ জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।
৫২. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৭।
৫৩. শেখ গাউস মিঞা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৫৪. হায়দার আলী খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬।
৫৫. 'কচ্ছের রান' নিয়ে ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, প্রীতিকুমার মিত্র, "বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬", প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯-১৩২।
৫৬. 'সীমান্ত চৌকি' হলো সীমান্ত এলাকা পাহাড়ার জন্য তথা দেশ রক্ষার জন্য সীমান্ত প্রহড়ায় নিয়োজিত আনসার বা ইপিআর এর চেক পোস্ট (একটি নির্ধারিত জায়গা)। এই পোস্ট থেকে আনরসার ও ইপিআর এর সদস্যরা নির্ধারিত এলাকা পর্যন্ত সীমান্ত প্রহড়ায় নিয়োজিত থাকে।
৫৭. সিরাজুল ইসলাম (সম্মা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১।
৫৮. প্রীতিকুমার মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩২।
৫৯. 'অঙ্গীভূত' হলো সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবক আনসারদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আনসারদের সার্বক্ষণিক ভাবে কোন কাজে নিয়োগ করা। যার বিনিময়ে উক্ত অংগীভূত আনসাররা একটি নির্ধারিত পরিমাণ বেতন-ভাতাদি পাবেন। এবং যে সময় পর্যন্ত তারা অংগীভূত হন উক্ত সময় শেষে তারা অ-অংগীভূত হন।
৬০. মোঃ শফিকুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ.১-২।
৬১. *সাক্ষাৎকার*, মো: হায়দার আলী খান, গণসংযোগ কর্মকর্তা, আনসার ভিডিপি সদর দপ্তর, খিলগাঁও, ঢাকা।
৬২. তদেব।
৬৩. মো: জহুরুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯।
৬৪. *সাক্ষাৎকার*, হায়দার আলী খান।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার ইতিহাস এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব

মো: ইউসুফ*

Abstract: Saidpur Railway workshop was founded in 1870. It is the biggest and oldest workshop in Bangladesh. At present, there are 28 shop-units in this workshop. During the reign of British, the British and Hindu employees were more in number in this workshop. The Biharis were employed in this workshop after 1947. At that time more than 10,000 labours worked here. But the number has gradually come down to 1,500. And this labour crisis pertains to the reduction of production. This workshop has exerted much influence on the social condition of Saidpur. The officers and executives of the workshop build schools, colleges, markets and clubs to promote education, economy and culture in this area.

ভূমিকা

বাংলাদেশে রেল কারখানার সংখ্যা ৬টি। এগুলোর মধ্যে ১টি সৈয়দপুরে, ২টি পাহাড়তলীতে, ২টি পার্বতীপুরে এবং ১টি ঢাকাতে অবস্থিত। এ ৬টি কারখানার মধ্যে ক্যারেজ মেরামত সম্পর্কিত ওয়ার্কসপ বাংলাদেশে দুটি রয়েছে এর মধ্যে একটি সৈয়দপুরে ও অপরটি পাহাড়তলীতে। এগুলোর মধ্যে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাটি সর্ব বৃহত ও প্রাচীনতম। সৈয়দপুর[১] রেলকারখানা গড়ার ইতিহাস শুরু ১৮৭০ সনে।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী

[১] রংপুর জেলার অধীনে একটি মহকুমা ছিল নীলফামারী। নীলফামারীতে মহকুমা সদর স্থাপন করা হয় ১৮৭৫ সালে। সৈয়দপুরকে প্রাথমিক ভাবে মহকুমার জন্য নির্বাচন করা হলেও সুপেয় পানির সহজলভ্যতার কারণে তৎকালীন সিভিল সার্জন মি.কে.ডি. ঘোষাল নীলফামারীকে মহকুমা সদরের স্থান হিসেবে নির্বাচন করেন। নীলফামারীকে মহকুমা থেকে পূর্নাঙ্গ জেলায় উন্নীত করা হয় ১৯৮৪ সালে। নীলফামারী জেলা কর্কট ক্রান্তির সামান্য উপরে অবস্থিত। ভারতের জলপাইগুড়ি ও কোচ বিহার জেলা এজেলার উত্তরে, রংপুর সদর দক্ষিনে, পূর্বে রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলা পশ্চিমে অবস্থিত। নীলফামারী জেলা ২৫.৪৪´ থেকে ২৬.১৯´ উত্তর ও ৮৮. ৪৬´ থেকে ৮৯.১২´ পূর্বে অবস্থিত। জেলার আয়তন ১৮২১.৭ বর্গ কিলোমিটার। নীলফামারী জেলা ৬ টি উপজেলা নিয়ে গঠিত। ডোমার, ডিমলা, নীলফামারী সদর, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও সৈয়দপুর। এই ৬ টি উপজেলার মধ্যে সৈয়দপুর হলো সবচেয়ে ছোট উপজেলা। সৈয়দপুরে থানা সদর প্রতষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। এই উপজেলার আয়তন ১২১.৬৮ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ২,২৮,৮৬০ জন। এ উপজেলার উত্তরে নীলফামারী সদর ও কিশোরগঞ্জ থানা, দক্ষিনে দিনাজপুর জেলার পাবর্তীপুর থানা, পূর্বে রংপুর জেলার তারাগঞ্জ থানা, পশ্চিমে দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর ও খানসামা থানা। এই উপজেলা শহরে ১৫ টি ওয়ার্ড ও ৪৩ টি মহল্লা, ৫ টি ইউনিয়ন ৭২ টি মৌজা, ৪০ টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। জানা যায় সৈয়দ পরিবরের নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম করন হয়েছে সৈয়দপুর। ভারতের কুচবিহার থেকে এই সৈয়দ পরিবার এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং এলাকার জনসাধারনের মাঝে ইসলামের মহান বানী প্রচার করেন। এই সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারের নামানুসারে সৈয়দপুরের নামকরন হয়েছে । মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, *বাংলাদেশের জেলা উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য,ঢাকা:আহমেদ মাহমুদুল হক, মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ ২০০৭*

বর্তমান 'বয়লার' শপের পাশেই ষ্টীম ইঞ্জিন মেরামতের জন্য ছোট একটি লোকোসেড[২] স্থাপন করে বৃটিশ কোম্পানি। মোট ১১০.২৯ একর জমির উপর এটি অবস্থিত, আবৃত এলাকা ১৮ একর। মোট প্রাচীর ৩০২৫ মিটার। আমরা এ প্রবন্ধে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, এর বিকাশ এবং অবক্ষয়ের ইতিহাস ও অত্র অঞ্চলে এই কারখানার আর্থ-সামাজিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচনা করব।

বাংলাদেশে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

এদেশে আধুনিক সভ্যতার বাহন রেলওয়ে স্থাপনের কাজ শুরু করে 'দি গ্রেট ইন্ডিয়ান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' ও 'দি গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিন সুলার কোম্পানি'। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রিটিশ সরকার তাদের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও কৌশলগত সুবিধার জন্য ১৮৬২ সনে ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে দর্শনা থেকে জগতী (কুষ্টিয়া জেলা) পর্যন্ত ৫৩.১১ কিলোমিটার ব্রডগেজ লাইন শাখা স্থাপন করে।[৩] এই লাইনটি ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (EBR) নামে পরিচিত ছিল। এই লাইনটি কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্পমূল্যে পূর্ববাংলা থেকে কৃষি এবং চামড়া সম্পদ রপ্তানির ক্ষেত্রে এর ভূমিকা বেশি লক্ষ্য করা গেছে। এই কোম্পানি গঠনের উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে রেলওয়ে ব্যবস্থা গড়ে তেলা। ১৮৬৭ সালে গড়াই ও চন্দনা নদীর উপর সেতু নির্মান হলে চাড়াইকোল, কুমার খালী, খোকশা ও পাংশা পযর্ন্ত রেল লাইন স্থাপিত হয়।[৪] ১৮৭১ সনে এই লাইন গোয়ালন্দ পর্যন্ত প্রসার ঘটানো হয়। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে (EBR) ছাড়া যে সকল কোম্পানি পূর্ব বাংলায় রেল লাইন স্থাপনের দায়িত্বে ছিল সেগুলো হলঃ নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে (NBR) ১৮৭৮, বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলওয়ে ১৮৮৪ এবং আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে (ABR) ১৮৯২। এই তিনটি কোম্পানি ছাড়াও কিছু ছোট ছোট রেল কোম্পানি এ অঞ্চলে রেল লাইন স্থাপনের কাজ করেছিল যেমনঃ সাড়া-সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ-ভৈরব বাজার, যশোর-ঝিনাইদহ, খুলনা-বাগেরহাট রেল কোম্পানি।[৫] নর্দান বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের অধীনে ব্রড গেজ ও মিটার গেজ লাইন স্থাপনে দায়িত্ব ছিল। ১৮৭৪-১৮৭৯ এর মধ্যে পাকশীর সাড়া থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত মিটার গেজ লাইন স্থাপিত হয়। দার্জিলিং এর সাথে জলপাইগুড়ি হয়ে সৈয়দপুর এর রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় একই সময়ে। ১৮৭৮ সালে পার্বতীপুর জংশন থেকে রংপুর অভিমুখে শ্যামপুর পর্যন্ত ১৫.৭৭ মাইল মিটার গেজ লাইন স্থাপন করা হয়। ১৮৮৩ সালে ৯.৮৯ মাইল রেল লাইন পার্বতীপুর থেকে চিরিরবন্দর ১৮৮৪ সালে এই লাইন পশ্চিমে ৮.৭৫ মাইল অগ্রসর হয়ে দিনাজপুর পর্যন্ত পৌছে।[৬] ১৮৮৫ সালে ১০.২৫ মাইল মিটার গেজ রেল লাইন নারায়নগঞ্জ থেকে ঢাকা পর্যন্ত স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ সালে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত পন্য পরিবহনের জন্য ৭৫.৭৫ মাইল রেল লাইন স্থাপন করা হয়। একই বছরের ২৯ আগষ্ট ৩৫.৫ মাইল গফরগাঁও-ময়মনসিংহ, ১২ ডিসেম্বর ২০ মাইল ঢাকা-জয়দেবপুর, ১৮৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী ৩২ মাইল রেল লাইন জয়দেবপুর-গফরগাঁও পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের জন্য রেল চালু করা হয়।[৭] ১৮৯৫ সালে ৯৩.১৪ মাইল চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত এবং ৩৭.৬২

পৃঃ৫৮; মনি খন্দকার (সম্পাদিত), *নীলফামারী জেলার ইতিহাস,প্রথম খন্ড, নীলফামারী জেলার ইতিহাস প্রকাশনা ও প্রণয়ন কমিটি, অক্টোবর ২০০২* পৃঃ ১০; মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, প্রাগুক্ত,পৃঃ ৫৯; সিরাজুল ইসলাম , (সম্পাদিত) *বাংলা পিডিয়া, ৯ম খন্ড, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি*, পৃঃ ১২৭।

[২] লোকোসেড হলো ইঞ্জিনের সিডুল অর্থাৎ নিধারিত সময়ে মেরামতের স্থান। এখানে ইঞ্জিনের ছোট খাট ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করন, যন্ত্রাংশের মেরামত ও পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী ইঞ্জিনের রি-ফুয়েলিং করা হয়। এক সময়ে প্রতিটি জংশনে লোকোসেড ছিল, ৯০ এর দশকে বেশ কিছু জংশনের লোকোসেড বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহঃ সিনিয়র সাব এসেন্টেন ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মোজাহেদ আলী, বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক কারখানা বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর।

[৩] ব্রুসিয়ার, বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক কারখানা বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর ডিসেম্বর ২০০৬।

[৪] দিনাক সোহানী কবির, *পূর্ব বাংলায় রেল ওয়ের আগমন এবং এই অঞ্চলের আর্থ- সামাজিক জীবনের উপর এর প্রভাব ১৮৬২-১৯৪*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃঃ ২৫,২৯,৩৫।

[৫] ঐ, পৃঃ২৯।

[৬] ঐ, পৃঃ৫০।

[৭] ঐ, পৃঃ৬৫।

মাইল লাকসাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত রেললাইন স্থাপন করা হয়। ৩ নভেম্বর ১৮৯৫ সালে চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে রেললাইন চালু করা হয়। ১৮৯৫ সালের ১ জুলাই লাকসাম জংশন থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত রেললাইন চালু করা হয়। ১৮৯৬ সালে কুমিল্লা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত রেল চালু হয়। ১৮৯৮ সালে ৩৪ মাইল দীর্ঘ ময়মনসিংহ থেকে জামালপুর পর্যন্ত রেল চালু হয়। জামালপুর থেকে বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ করা হয় ১৮ আগস্ট ১৯১২ সাল।[৮] ১৯১৪ সালে দৌলতকান্দী থেকে টঙ্গী পর্যন্ত রেল চালু হয়। ১৯১৬ সালে সিলেট থেকে ফেঞ্চুগঞ্জ, ১৯১৭ সালে ৩০.৫৯ মাইল ভৈরববাজার থেকে কিশোরগঞ্জ, ৩০.৫১ মাইল কিশোরগঞ্জ থেকে গৌরীপুর জংশন পর্যন্ত, ২৬.৪৯ মাইল ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা পর্যন্ত রেল লাইন চালু করা হয়। ১৯২০ সালের ১লা জানুয়ারী জামালপুর থেকে জগন্নাথগঞ্জ এবং জামালপুর থেকে বাহাদুরাবাদ পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করা হয়। ১৯২৮ সালে আখাউড়া-কুলাউড়া, শাহেস্থাগঞ্জ জংশন থেকে হবিগঞ্জ বাজার পর্যন্ত একটি শাখা লাইন নির্মাণ করা হয়। ১৯৩০ সালে ৮.৭৪ মাইল রেল লাইন হাটহাজারী থেকে নাজির হাট পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ১৯৩১ সালে চট্টগ্রাম থেকে দোহাজারী পর্যন্ত শাখা লাইন চালু করা হয়।[৯] ১৯২৬ সালে পার্বতীপুর থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত মিটার গেজ লাইনকে ব্রড গেজ লাইনে বর্ধিত করা হয়। ১৯৩৬-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ন্যাড়ো লাইন (NARROW GAUGE STEAM LOCOMOTIVE) চালু ছিল। ১৯৫১ সালে যশোর-দর্শনা রেল চলাচল শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে সিলেট-ছাতক রেল চালু হয়। ১৯৬০ এর দশকে ঢাকা-টঙ্গী ও চট্টগ্রামের মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাকের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭০ সালের মধ্যে এই ডাবল লাইন পর্যায়ক্রমে চালু করা হয়। ব্রিটিশ আমলে রেলওয়ে ছিল 'অসাম বেঙ্গল রেলওয়ের' অধীনে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে তা পাকিস্তান রেলওয়ের অধীনে চলে আসে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর এদেশের রেলওয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ রেলওয়ে। সে সময় রেল লাইন ছিল ২,৮৫৮.৭৩ কিলোমিটার এবং স্টেশন ছিল ৪৬৬ টি।[১০]

সৈয়দপুর কারখানা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

সৈয়দপুর রেল কারখানা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস শুরু হয় ১৮৭০ সালে লোকোসেড নির্মানের মাধ্যমে। সৈয়দপুরে প্রথমে যে লোকোসেড নির্মিত হয় সেটি ছিল মিটার গেজ। ১৮৭০ সালে লোকোসেডে ছোট ছোট কাজ করা হত। ১৮৯২ সাল পযর্ন্ত শুধু এই লোকোসেডে মেরামতের কাজ হত। পরবর্তীতে প্রয়োজনের তাগিদে ধাপে ধাপে মিটার গেজ যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ী এবং লোকোমোটিভ মেরামত কারখানা হিসাবে এর রূপান্তর ঘটে। ১৯২৪ সালে 'ইলেকট্রিক ও বয়লার শপ' চালু করা হয়। ১৯৩০ সালে এই ওয়ার্কসপ প্রসার লাভ করে। ১৯৪৪ সালে ব্রড গেজ গাড়ী মেরামতের পরিকল্পনা লওয়া হয় এবং ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এর সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৫৩ সালে কারখানার ব্যাপক প্রসার ঘটে। শুধু লোকোমোটিভ নয়, এর সাথে ক্যারেজ এবং ওয়াগন ও মেরামত শুরু হয়। সৈয়দপুর জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রকের গুদাম ও কার্যালয় প্রসারতা লাভ করে। ব্রিজ ওয়ার্কসপ স্থাপিত হয়। সেখানে পয়েন্টস এন্ড ক্রমিং তৈরির মত জটিল কাজসহ সমস্ত ব্রিজের মেরামত করা হত। ১৯৬৬ সালে যাত্রী বাহী কোচ ও মাল বাহী গাড়ী মেরামত শপ চালু করা হয়।[১১] ১৯৯২ সাল পযর্ন্ত এ কার্যক্রম চালু থাকে এবং নিজস্ব প্রযুক্তি ও জনশক্তি ব্যবহার করে বেশ কিছু সংখ্যক গাড়ী নির্মান করা হয়। এছাড়া এই কারখানায় গাড়ী মেরামত যোগ্য ৫০টি বি জি যাত্রীবাহী গাড়ীর পূণর্বাসন কল্পে জার্মান অর্থনৈতিক সহযোগিতায় ১৯৯১ সালে জি ও এইচ শপ স্থাপনের মাধ্যমে একটি প্রকল্প গ্রহন করা হয়। ১৯৯৪ সালে এর কাজ সমাপ্ত হয় এবং বর্তমানে এই শপটি মূল্যবান মেশিন পত্র সহ কর্মহীন অবস্থায় রয়েছে। ইতিমধ্যে শপের জনশক্তিকে বিভিন্ন শপে স্থান্তরিত করা হয়েছে। ১৯৮৫ সালে সমগ্র রেলওয়েতে ডিজেল লোকোমোটিভ প্রতিস্থাপনের ফলে এই কারখানায় ষ্টীম লোকোমোটিভ মেরামত প্রত্যাহৃত হয়।[১২] কারখানায় ব্রড গেজ মিটার গেজ যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ী এবং ষ্টীম ক্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন

---

[৮] ঐ, পৃ:৬৭, ৭০।

[৯] ঐ, পৃ:৬৮-৯২।

[১০] ব্রুসিয়ার, প্রাগুক্ত; নুরুল ইসলাম খান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার রংপুর, ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়*, ১৯৯০ পৃ: ১৮৩; সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), প্রাগুক্ত।

[১১] ব্রুসিয়ার, প্রাগুক্ত; নুরুল ইসলাম খান (সম্পা.), প্রাগুক্ত।

[১২] বাংলাদেশ রেলওয়ে এমপ্লয়ীজ লীগ, বুলেটিন, বর্ষ ১ম, সংখ্যা ১ম, সেপ্টেম্বর ১৯৯৪, পৃ: ১০।

করা হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন রেলওয়ে ডিভিশনের মেশিন এন্ড প্লান্ট মেরামত হয়। মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম এর সঙ্গে সঙ্গে কারখানার উৎপাদন বিভিন্ন বিভাগ রেলওয়ে ভান্ডারের কার্যাদেশের বিপরীতে প্রচুর সংখ্যক খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী করে থাকে অপর দিকে কারখানার মেরামত কার্যক্রমে ব্যবহার্য সিংহভাগ যন্ত্রাংশ তৈরী ছাড়াও কারখানার বাহিরের রেলওয়ে বিভাগ সমূহের এবং ডিজেল লোকোমোটিভ এর প্রচুর যন্ত্রাংশ তৈরী ও মেরামত করা হয়। রেল ছাড়াও সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ তৈরী এবং মেরামত এ কারখানায় করা হয়।[১৩] এই কারখানার বিভিন্ন শপ ইউনিটে মেরামতের জন্য গাড়ী নেওয়ার জন্য মিটার গেজ লাইন ২৮.৩১ কিলোমিটার, ব্রড গেজ লাইন ১১.২৫ কিলোমিটার ও ন্যাড়ো লাইন ২৭.০৮ কিলোমিটার আছে। এই লাইনের মাধ্যমে যাত্রী বাহী কোচ ও মাল বাহী গাড়ীর বগী বিভিন্ন শপে মেরামতের জন্য নেয়া হয়। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কারখানায় ২৮ টি শপ ইউনিট আছে। বর্তমানে এই ইউনিট গুলোতে মেরামতের কাজ চলছে।[১৪]

প্রশাসনিক কাঠামো

১৮৭০ সালে সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানাটি একটি ছোট মেরামত সেড হিসাবে যাত্রা করে এবং এ সময় প্রশাসনিক প্রধানের পদবী ছিল ওর্য়াকিস ম্যানেজার। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত এই পদটি ছিল। পরবর্তীতে কারখানা প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন উপ-প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী। ১৯৭১ সালের পর কারখানার প্রধানের পদ মর্যাদা উপ- প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী থেকে বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক (কারখানা) বা DS (W) Divisional Superintendent (Workshop) করা হয়। কারখানার প্রধান পরিচালক হচ্ছেন DS (W)। বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কের অধীনে আছেন WM (Works Manager), PE (Production Engineer), DEE (Divisional Electrical Engineer), DMO (Divisional Medical Officer), AEN (Asstt. Executive Engineer) I AC (Asstt. Commandant)। এ সকল নির্বাহী প্রধানদের অধীনে আবার কয়েকটি করে শপ ইউনিট রয়েছে। যেমন: WM এর অধীনে ১২ টি, PE এর অধীনে ১১ টি, DEE এর অধীনে ৫ টি। এ সকল নির্বাহী প্রধানদের অধীনেই নিয়ন্ত্রিত হয় শপ ইউনিট গুলি।[১৫] কারখানার কার্যকাল সকাল ৭.০০ থেকে বিকাল ৪.৩০ পর্যন্ত, মাঝে দুপুর ১১.৩০ থেকে ১২.৩০ পর্যন্ত খাবারের বিরতি। প্রশাসনিক অফিস সময় সকাল ৯.০০ মিনিট থেকে বিকেল ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত, মাঝে দুপুর ১.০০ থেকে ২.০০ পর্যন্ত বিরতি। শ্রমঘন্টা সাপ্তাহিক ৪৮ ঘন্টা, মাসিক কর্মঘন্টা ২০৮ ঘন্টা, বাৎসরিক গড় কর্মদিবস ২৮৫ দিন। নিম্নে কারখানার প্রধান পরিচালকের সাংগঠনিক কাঠামোর একটি চিত্র দেয়া হল।[১৬]

কারখানার শ্রমিকদের এই অফিস সময় সূচী নিয়ন্ত্রন করা হয় কারখানার সিটির মাধ্যমে (কারখানার প্রথম সিটি পড়ে সকাল ৬.৩০ মিনিটে পরবর্তীতে ৬.৫৫ ও ৭.০০ মিনিটে, দুপুরে খাবারের বিরতীর জন্য ১১.৩০ মিনিটে ১২.২৫ ও ১২.৩০ মিনিটে এবং বিকাল ৪.৩০ মিনিটে ছুটির সিটি পড়ে এই সিটির শব্দ সৈয়দপুরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শোনা যেত)।[১৭] ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে শ্রমিকদের সামান্য দেরীতে আসার শাস্তি ছিল বেতনের ষোলভাগের এক ভাগ কর্তন। ফোরম্যান, চার্জম্যান, টুলকিপার, স্টোর কিপার এবং কেরানীগন কার্ড পাঞ্চ করতেন। কার্ডে ঘড়ির সময় রেকর্ড হয়ে যেত (সে সব নিয়ম কানুন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এখন আর তত পালন করা হয় না)। সরকারী আইন অনুযায়ী সৈয়দপুর শহরের আশে পাশে কেনো লোহা ঢালাই কারখানা নির্মান নিষিদ্ধ ছিল (বর্তমানে সৈয়দপুর শহরের ওলি গলিতে লোহা কারখানা গড়ে উঠেছে)। আর্মগার্ড কারখানার নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে। ডি পি এম অফিসের সাথেই ছিল অস্ত্রাগার। আগুন নেভানের অটোমেটিক স্প্রিংলার ছিল শপের মধ্যে (এখন সেগুলি অচল)। রেলের নিজস্ব ফায়ার ব্রিগ্রেড ছিল (বর্তমানে মটর গ্যারেজের পাশে) সেখানে একজন ইন্সপেক্টরের অধীনে থাকত অগ্নি নির্বাপন বাহিনী। রেল শ্রমিক কর্মচারীগণ পুলিশের মতই ন্যায্য মূল্যে রেশনে সমস্ত

---

[১৩] ঐ।

[১৪] ব্রুসিয়ার, প্রাগুক্ত।

[১৫] প্রাগুক্ত- ঐ।

[১৬] বুলেটিন, প্রাগুক্ত।

[১৭] তথ্য সংগ্রহ, প্রাগুক্ত।

খাদ্য উপকরণ পেতেন। একবার ক্ষুদি চাল সরবরাহ করায় রেশনিং এর বিরুদ্ধে বিরাট শ্রমিক আন্দোলন হয় ফলে ১৯৫৪ সালে গ্রেইনশপ এলাউন্স দিয়ে রেশনিং বন্ধ করে দেওয়া হয়।[১৮]

এই কারখানার কর্মকান্ড এবং বিভিন্ন শাখার বিবরণ

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা বাংলাদেশের মধ্যে সর্ব বৃহত কারখানা। ১৮৭০ সালে কারখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইঞ্জিনের মেরামতের কাজ হয় এই কারখানায়। পাকিস্তান আমলে এ কারখানায় যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী গাড়ী তৈরী করা হত। ১৯৯২ সালের দিকে এই যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী গাড়ী উৎপাদনের শপটির উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে যাত্রীবাহী কোচ গুলো বেশি দামে চীন ও কোরিয়া থেকে আমদানী করা হয়।[১৯] রেলওয়ের যে সময় পর্যন্ত ষ্টীম ইঞ্জিন চলত সে সময় সৈয়দপুর কারখানায় ১৪ হাজার ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করা হত। তারমধ্যে ৬ হাজার ধরনের কাঁচামাল উৎপাদন করা হত এই কারখানায়। উৎপাদিত কাঁচামালগুলোর মধ্যে প্রধানত হল: ব্রেক ব্লকডিজেল, ব্রেক ব্লক বি জি ও এম জি কোচ, ব্রাশ বিয়ারিং বি জি ও এম জি, কাপলিং এম এস ইউনিভারসেল, সেন্টার পি ভোট, হুজ পাইপ ক্লিপ, হুক এম এস বাকার, সুইং হ্যাঙ্গার, স্ক্রু কাপলিং, হাইটেল মাইল, ব্রেক বীম বি জি ও এম জি, লাইনার এক্রেল বক্র সাপোর্ট বিয়ারিং, এক্রেল লাইনিং, ক্যারিয়ার প্লেট, উইক এফেল ক্যাপ লুব্রিডেন্ট, স্প্রিং, ওয়াসার, ড্রাফটলিং, ইয়োক নাট, কাপলিং ব্লক, আইবোল্ট, হিঞ্চু ইত্যাদি।[২০] বাকি কাঁচামাল আমদানী করা হত ভারত, চীন, কোরিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, পাকিস্তান, কানাডা, জার্মানী, চট্রগ্রাম সহ বেশ কিছু দেশ থেকে। ষ্টীম ইঞ্জিন চলাচল ১৯৮০'র দশকে বন্ধ হবার পর ডিজেল ইঞ্জিন ও অন্যান্য গাড়ীর জন্য বর্তমানে ২ হাজারের ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। এই কাঁচামাল গুলো আমদানী করা হয় চট্রগ্রাম প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, চট্রগ্রাম ও রাজশাহী প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী থেকে। বেশীর ভাগ কাঁচামাল চীন, ভারত, মালয়েশিয়া ও কোরিয়া থেকে বেশি আমদানী করে এই সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক দপ্তর গুলো। ২ হাজার কাঁচামালকে ৪২ টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আমদানী করা হয় তার মধ্যে ২৫ ধরনের কাঁচামাল আমদানী করা হয় চট্রগ্রাম প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক থেকে বাকি ১৭ ধরনের কাঁচামাল আমদানী করা হয় রাজশাহী প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক থেকে। কাঁচামালগুলোর মধ্যে প্রধানত এস এম প্লোট, এস এম চেঞ্জেন, পিক আয়রন, বিভিন্ন ধরনের বাল্ব, রেলার বিয়ারিং, বিভিন্ন ধরনের তেল ও গিরিজ, বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিস যন্ত্রাংশ, বিভিন্ন আকারের কপার ও তামার যন্ত্রাংশ, স্কুরু, বিভিন্ন ধরনের স্পিরিং, সিট, রং, বিভিন্ন ধরনের হোস বার, রাবার, হাট বোর্ড, পাথর, লোহা, ইত্যাদি আমদানী করা হয়।[২১] এ কারখানায় ৫০ বছরের উর্ধ্বে মিশিন আছে ৩৪৫ টি, ২১ বছর থেকে ৫০ বছরের মধ্যে মেশিন আছে ২৩৫ টি, ২০ বছরের কম সময়ের মেশিন আছে ১৪৫ টি। কিছু গুরুত্ব পূর্ণ মেশিন প্লান্টের নাম ও সংখ্যা দেওয়া হল।[২২]

-
- সেন্টার লেদ- ৬৪টি
- টারেট লেদ- ৩টি
- ক্যাপেষ্টান লেদ- ২০টি
- কথবিনেশন লেদ- ২০টি
- ভাটিক্যাল লেদ- ১৪টি
- হরাইজেন্টাল বোরিং- ৫টি
- মিলিং ভার্টিকেল- ৭টি

---

[১৮] ঐ; সাপ্তাহিক সাফ জবাব-সৈয়দপুর থেকে প্রকাশিত , ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০।

[১৯] তথ্য সংগ্রহ: বেলাল হোসেন, প্রশাসক, জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় , সৈয়দপুর।

[২০] বুলেটিন, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩।

[২১] তথ্য সংগ্রহ, প্রাগুক্ত।

[২২] বুলেটিন, প্রাগুক্ত।

- মিলিং হরাইজেন্টাল- ১৫টি
- সেপিং মেশিন- ১৮টি
- পেনার মেশিন- ৫টি
- স্লোটিং মেশিন- ১২টি
- টুল গ্রাইন্ডিং- ৪৫টি
- সার্ফেস গ্রাইন্ডিং- ৮টি
- পিলার ড্রিল- ১৫টি
- নিউমেটিক হ্যামার- ৬টি
- বোল্ট ও রিভেট কোজিং- ৭টি
- স্ক্রুয়িং মেশিন- ৫টি
- নাট টেপিং মেশিন- ৪টি
- হুইল লেদ- ৭টি
- ওয়েডিং প্লান্ট - ১৩১টি

কারখানায় এক বছরে মিটার গেজ যাত্রীবাহী কোচ মেরামতের সুযোগ আছে ২৩৫ টি, ব্রডগেজ যাত্রীবাহী কোচ ৩২৪ টি (তার মধ্যে ৫০ টি যাত্রীবাহি কোচ নতুন আমদানী করা হয়েছে)। মিটার গেজ মালবাহী গাড়ি ৮১৮২ টি, ব্রড গেজ মালবাহী গাড়ী ২০৫৪ টি, Steam Crane (ষ্টীম ক্রেন) ১৮ টি মেরামতের সুযোগ আছে (২০০৬ সালের ডিসেম্বরের হিসেব অনুযায়ী)।[২৩] সব ধরনের গাড়ীর চাকার মেরামতও করা হয় এই কারখানায়। এ সকল কাজের জন্য যাবতীয় যন্ত্রাংশ তৈরী করা হয় এই কারখানার বিভিন্ন শপে। কারখানায় LE (Lift Enamel)-এর অধীনে প্রতিটি আন্তঃ নগর কোচকে এক বছর পর, লোকাল এবং মেল গাড়ী গুলিকে দেড় বছর অন্তর মেরামত করা হয়। পরবর্তিতে LE এর অধীনে মেরামত কৃত কোচ গুলো চার বছর পর, ৩.৫ বছর পর মালবাহ গাড়ী ও ৫ বছর পর Steam Crane গুলো POH (Periodical Overhauling) এর অধীনে মেরামত করা হয়। ১২ বছর পর সব ধরনের কোচ GOH (General Overhauling) এর অধীনে পূনরায় পূর্নাঙ্গ মেরামতের জন্য নেয়া হয়।[২৪]

নিম্নে ব্রডগেজ ও মিটার গেজ যাত্রীবাহী গাড়ীর বিভিন্ন বছরের মেরামতের তালিকা তুলে ধরা হল।[২৫]

সারনি-১: যাত্রীবাহী গাড়ী মেরামতের তালিকা

বছর	ব্রডগেজ			মিটার গেজ			গড় ইউনিট/ দিন
	POH	LE	মোট	POH	LE	মোট	
১৯৯৬-৯৭	২৭ টি	১৪৮ টি	১৭৫ টি	৫৯টি	৯২টি	১৫১টি	২.৬২
১৯৯৭-৯৮	৩৯	১৩৮	১৭৯	৩৬	৯৫	১৩১	২.৪৭

[২৩] ব্রুসিয়ার, প্রাগুক্ত।
[২৪] ঐ।
[২৫] ঐ।

১৯৯৮-৯৯	৫৭	১০৫	১৬২	২৪	১১৪	১৩৮	২.৪২
১৯৯৯-২০০০	৪৬	১১৫	১৬১	৩৩	৯০	১২৩	২.৪০
২০০০-০১	৩০	১২৪	১৫৪	৪৬	৮৪	১৩০	২.২৯
২০০১-০২	১২	১৪০	১৫২	৪০	১০১	১৪১	২.৩১
২০০২-০৩	২৯	৯৬	১২৩	২৪	১০৪	১২৮	২.০৩
২০০৩-০৪	৫০	১০৪	১৫৪	২৯	৭৫	১০৪	২.১৬
২০০৪-০৫	১৬	১১৭	১৩৩	২৭	৮০	১০৭	১.৭৮
২০০৫-০৬	২৬	১২৯	১৫৫	২৩	১০৩	১২৬	২.০২

উৎস: বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক কারখান বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর।

নিম্নে মালবাহী গাড়ীর বিভিন্ন বছরের মেরামতের তালিকা দেওয়া হল।[২৬]

সারনি-২: মালবাহী গাড়ী মেরামতের তালিকা

বছর	মালবাহি গাড়ী মেরামত		গড় ইউনিট/ দিন
	POH	SPL(Special)	
১৯৯৬-৯৭	১৭৬৮ টি	৪২ টি	৭.৪৮
১৯৯৭-৯৮	১৭৭২	৪২	৭.৩১
১৯৯৮-১৯৯৯	১৩৩৫	৫২	৫.৯৬
১৯৯৯-২০০০	১৩৭৫	৫০	৬.৩৬
২০০০-০১	১৪৮৩	১০১	৬.২২
২০০১-০২	১৩৭৬	৯৩	৫.৯২
২০০২-০৩	১২৭৮	৫২	৫.৩৬
২০০৩-০৪	১২৫৮	৫২	৫.২৬
২০০৪-০৫	১১২১	৩২	৪.৬৯
২০০৫-২০০৬	১০৯৩	৫৩	৪.৫৮

উৎস: বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক কারখান বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর।

উৎপাদন শাখার বিভিন্ন বছরের মাসিক উৎপাদনের অবস্থানের বিবরন নিম্নে দেওয়া হল।[২৭]

সারনি-৩: উৎপাদনের বিবরণ

বছর	Foundry মে. টন	Smithly মে. টন	PM* Shop (Work order)	LM* Shop (Work order)
১৯৯৬-০৭	২২.৩১	৩৭.৬০	৪৭.১৬	১৯.৪২
১৯৯৭-৯৮	২৪.৯৫	৩৭.২০	৫৮.০০	১৮.৪২
১৯৯৮-৯৯	২৮.৪৭	৩৯.৫০	৫২.৭৫	২৬.৬৭

[২৬] ঐ।
[২৭] ঐ।

১৯৯৯-২০০০	৩৩.৩৩	৩৬.৪১	৫৬.১৭	২৫.০৮
২০০০-০১	২৭.৮৩	৩৬.০০	৫৫.৬৭	২০.৫৮
২০০১-০২	৩৯.৮৩	৩৬.০৮	৫৬.০০	১৮.৯২
২০০২-০৩	৫২.০৮	৩৬.৮৩	৫০.১৬	১৮.৬৬
২০০০৩-০৪	৪৩.২৮	৩৮.১৭	৫৫.৬৭	২০.০৮
২০০৪-২০০৫	৪০.৬২	৩৭.৫০	৫৫.৯১	২৬.৫০
২০০৫-২০০৬	৫৪.২৭	৩৪.০৪	৬০.৮৩	২০.১৬

উৎস: বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক কারখান বাংলাদেশ রেলওয়ে, সৈয়দপুর।

* Production Machine Shop
* Loco Machine Shop

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানায় ২০১১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যেসব পণ্য উৎপাদিত হত তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।[২৮]

- ব্রডগেজ যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ী মেরামত।
- মিটারগেজ যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ী মেরামত।
- ওভারহেড ক্রেন,ট্রাভেলিং ক্রেন ও অন্যান্য লিফটিং ট্যাফেল মেরামত।
- সমস্ত বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ রেলপথের মেশিন ও প্লান্টস মেরামত করন।
- বিভিন্ন রকম বয়লার মেরামতকরন।
- ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ যাত্রীবাহী গাড়ীর খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী।
- ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ ওয়াগনের খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী।
- মেশিন ও পস্নান্ট মেরামতের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী।

মিটার গেজ যাত্রীবাহী কোচ নির্মান ও ডিজেল লোকোমেটিভের আন্ডার ফ্রেস, টুলি ও চাকা মেরামত করা হত পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে। পার্বতীপুর লোকোমেটিভ কারখানা প্রতিষ্টিত হবার পর এই সকল কাজ সৈয়দপুর কারখানা থেকে পার্বতীপুর কারখানায় স্থানান্তর করা হয়।[২৯] এই কারখানার অধীনে ২৮ টি ইউনিট আছে। এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কর্মকান্ড নিম্নে তুলে ধরা হল। W M (Works Manager) এর অধীনে ১২ টি ইউনিট আছে।[৩০] যথা:

- Carriage shop: এর অধীনে মিটার ও ব্রড গেজ যাত্রী বাহী কোচ মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষন (এলই, পিওএইচ এবং স্পেশাল) করা হয়।
- Wagon shop: এ শপে মিটার ও ব্রড গেজ মালবাহী গাড়ীর যাবতীয় যন্ত্রপাতির মেরামত করা হয়।
- Paint shop: এ শপে মিটার ও ব্রড গেজ যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী গাড়ী সহ কারখানার বিভিন্ন শপের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সমস্ত জিনিসের রংয়ের কাজ করা হয়।
- GOH (General Overhauling) shop: ১২ বছর পর সব ধরনের কোচ গুলো এর অধীনে পূনরায় পূর্নাঙ্গ মেরামত করা হয়।
- CHR (Carriage Heavy Repairing) shop: এই শপের কাজ হল মিটার ও ব্রড গেজ যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী গাড়ীর বড় ধরনের মেরামত।
- Welding shop: এটি কারখানার গুরুত্বপূর্ণ শপ। এ শপে ক্যারেজ, ওয়াগন মেরামতের ওয়েল্ডিং এর কাজ সহ যাবতীয় ওয়েল্ডিং করন এবং কাটিং করা হয়।

---

[২৮] ঐ; নুরুল ইসলাম খান (সম্পা.) প্রাগুক্ত পৃ: ১৮৪।

[২৯] তথ্য সংগ্রহ, প্রাগুক্ত

[৩০] বুলেটিন, প্রাগুক্ত, পৃ: ১০।

- C & WM/C (Carriage and Wheel Machine) shop: এ শপে যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী গাড়ীর চাকা এক্লোনিং, ডি-এক্লোলিং , রোলার বিয়ারিং, রি-মেটালিং এবং ব্যাকুয়াম ফিটিংস মেরামত ও সংযোগ করা হয়।
- Yard shop: রানিং বিভাগ হতে মেরামতের জন্য যাত্রীবাহী ও মালবাহী গাড়ী গ্রহন, প্রেরণ এবং আভ্যন্তরীণ শাটিং এর কাজ এ শপ করে থাকে। এছাড়া কারখানায় উৎপাদিত এবং মেরামত যন্ত্রাংশ প্রেরণ, জ্বালানী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ এ শপের দায়িত্ব।
- Inspection shop: ক্যারেজ ওয়াগন মেরামত কাজে পরিদর্শন, কারখানার উৎপাদিত খুচরা যন্ত্রাংশ পরিদর্শন এবং উহাদের মান নিয়ন্ত্রন এই শপের দায়িত্ব।
- Training school: রেলওয়ের নিজস্ব দক্ষ কারীগর সৃষ্টি করার জন্য এই স্কুল প্রতিষ্টা করা হয়। ট্রেনিং স্কুল এর প্রধান হলেন W M (Works Manager)। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হলেন সিনিয়র সাব এসেন্টেন ইঞ্জিনিয়ার ও কারখানার প্রতিটি শপের প্রধানগন নিজ নিজ শপের উপর শিক্ষা দিয়ে থাকেন। রেলওয়ে কারখানায় যে সকল কর্মচারীগন সরকার কর্তৃক নিয়োগ করা হয় তাদের প্রত্যেককে এই মপে প্রশিক্ষন নিতে হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন অফিসারদের মাঠ পর্যায় প্রশিক্ষনও হয় এই ট্রেনিং স্কুলে। বাংলাদেশের অন্যান্য কারখানা থেকেও শিক্ষাথীরা এখানে প্রশিক্ষণ নিতে আসেন। তাছাড়া পলিটেকনিক্যাল ও প্রকৌশলি বিশ্ববিদ্যালয়েরক ছাত্ররা বাস্তব প্রশিক্ষন নেওয়ার জন্য এই সেন্টারে আসেন।
- Schedule office: সব ধরনের কাজের সময়সূচী তৈরী করা এই শপের দায়িত্ব। কোন কাজ কত দিন করা হবে, কত দিনে কাজ সমাপ্ত হবে তার তালিকা তৈরী করা হয় এ শপে।
- Drawing office: যাবতীয় নক্রা প্রণয়ন এবং সংরক্ষন এখানে করা হয়।

PE (Production Engineer) এর অধীনে ১১ টি ইউনিট আছে।[৩১] যথা:

- PCO (Production Controlling Office): কারখানায় খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন, যন্ত্রপাতি ও মেশিন প্লান্ট মেরামত ও সংগ্রহ এর প্লানিং ও অগ্রগতি বিষয়ক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এই ইউনিটে করা হয়ে থাকে।
- Loco M/C (Machine shop): এই শপে ডিজেল লোকোমোটিভের চাকা মেরামত এবং ক্যারেজ, ওয়াগন, ডিজেল, মেরিন এবং অন্যান্য ধরনের গুরুত্বপূর্ন খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী করা হয়ে থাকে।
- Boiler shop: রেল কারখানার আভ্যন্তরীণ এবং অন্যান্য ডিভিশনের ষ্টেশনারী বয়লার সহ রিলিফ ট্রেনের বয়লার মেরামত এবং লিড প্লাগ রিফিলিং এই শপে করা হয়। এ ছাড়া যাবতীয় প্রকার ফেব্রিকেটিং যন্ত্রাংশ এই শপে তৈরী হয়ে থাকে।
- Foundry shop: রেলওয়ের সকল প্রকার ফেরাস ও নন ফেরাস সম্পর্কিত খুচরা যন্ত্রাংশ ঢালাই এর কাজ এ শপে করা হয়। শপটিতে ৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি, ৩ টন একটি কিউপোলা ফার্ণেস এবং ২টি মরগেন ও ১টি রোটারী ফার্ণেস রয়েছে। এছাড়াও বিশেষ ধরনের নন ফেরাস এ্যালোয় ইনগট এ শপ উৎপাদন করে থাকে।
- Smithy shop: ড্রপ কোর্জিং, হেমার কোর্জিং, মেশিন কোর্জিং, পাঞ্চিং ও প্রেস কোর্জিং সম্পর্কিত যাবতীয় খুচরা যন্ত্রাংশ এই শপে উৎপাদন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের নাট-বোল্ট, পিন, ওয়াসার, স্প্রিং তৈরী ও মেরামত এ শপে করা হয়। শপের বিভিন্ন ধরনের চেইন এবং বিভিন্ন বিভাগের আগত চেইন মেরামত, তৈরী এবং টেষ্টিং এই শপের কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে। ভারী যন্ত্রপাতির হিট ট্রিটমেন্টও এ শপে করা হয়।
- Mill Wright shop: সৈয়দপুর কারখানার সকল প্রকার মেশিন প্লান্টস, যন্ত্রপাতি, মটরগাড়ী প্রভৃতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে নিয়োজিত। এছাড়া পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন সেড-ডিপোর মেশিন প্লান্ট ও যন্ত্রপাতি মেরামত করে থাকে।
- Tool room: শপের উৎপাদনের প্রয়োজনে যাবতীয় ধরনের কাটিং টুলস তৈরী এবং মজুদ করা হয়। নিউমেটিক টুলস মেরামত ও রক্ষণা বেক্ষণ এই শপের দায়িত্ব, এছাড়া বিভিন্ন প্রকার টুলস এর হিট

[৩১] ঐ, পৃ: ১১।

ট্রিটমেন্টও এখানে করা হয়। উৎপাদনের প্রয়োজনে যাবতীয় প্রকার ডাই, জিগ ফিকচার, টেমপ্লেট, গেইজ তৈরী ও এই শপের কর্মকান্ডের আওতাভূক্ত।

- Saw mill: কারখানার আভ্যন্তরীন এবং ডিভিশনের চাহিদানুযায়ী কাঠের মজুদ, চেরাই ও সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত। এছাড়া কাঠজাত বিভিন্ন ধরনের খুচরাংশ এ শপে উৎপাদ করা হয়।
- Production M/ C shop (প্রডাকশন মেশিন শপ): কারখানার যাবতীয় মেশিনিং সম্পর্কিত খুচরা যন্ত্রাংশ এই শপ তৈরী করে থাকে।
- Crane shop: কারখানার আভ্যন্তরীন এবং রেলওয়ের বিভিন্ন বিভাগের যাবতীয় ক্রেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন এই শপ করে থাকে।
- Laboratory: বিভিন্ন প্রকার মালামলের রসায়নিক ও ভৌত পরীক্ষা এখানে করা হয়। এছাড়া কারখানার উৎপাদিত যন্ত্রাংশের ধাতুগত মানের বিশ্লেণ করাও এ পরীক্ষাগারের দায়িত্ব।

DEE (Divisional Electrical Engineer) এর অধীনে ০৫ টি শাখা শপ আছে।[৩২] যথা:

- Power house: সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এ শপ।
- GER (General Electric Repairing) shop: কারখানার মটর, ফোন ইত্যাদি রিপিয়ারিং করা হয়।
- LC & W (Line Current and Wailder) shop: এ শপে ক্যারেজ, ওয়াগন গাড়ীর ওয়ারিং এর কাজ করা হয়।
- TL (Train Lighting) shop এ শপে ক্যারেজ, ওয়াগন গাড়ীর লাইট সংযোগ ও মেরামত করা হয়।
- Diesel shop এ ডিজেল জেনারেটর এর মেরামত ও সংরক্ষন করা হয়।

শ্রমিক কারা এদের সংখ্যা ও বেতন

সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা প্রতিষ্ঠার পর কারখানায় প্রধানত ব্রিটিশ ও ভারতীয় হিন্দু কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেশী ছিল। ব্রিটিশ আমলে অফিসার, ফোরম্যান, সুপার ভাইজার, সিনিয়র সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, টুল কিপার, স্টের কিপার, কেরানি, ড্রাইভার ছিলেন বৃটিশ গন ও ভারতীয়রা, ফিটার ম্যান-১,ফিটার ম্যান-২, খালাসী ও অন্যান্যপদে ছিল নেটিভ গন। ১৯৪৭ সালের পর কলকাতা কাচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপ থেকে বিহারীদের বদলি করা হয় সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে।[৩৩] সে সময় উচ্চ পদগুলো ব্রিটিশদের অধিনে থাকলেও শ্রমিক শ্রেণীতে ভারতীয় হিন্দুদের স্থানে পাকিস্তান রেলওয়ে বিহারীদের নিয়োগ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিহারী শ্রমিকের সংখ্যা কমে যায় এবং বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক শ্রমিকরা এই কারখানায় কাজ করছে। ১৯৫৩ সালে কারখানার শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭২ সালে এই কারখানার ২,৭৪১ জন শ্রমিক ছিল। সে সময় কারখানার মঞ্জুরীকৃত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৭,৩২৬ জন। ১৯৮৬-৮৭ সালে মঞ্জুরীকৃত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৬৬৪৫ জন কিন্তু কর্মরত শ্রমিক ছিল ৩৯৩৮ জন।[৩৪] ২০০৬ ডিসেম্বর পযর্ন্ত মঞ্জুরীকৃত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৩১১৭ জন কিন্তু শ্রমিক ছিল ২৪২৭ জন। ২০১১ সালের ডিসেম্বর পযর্ন্ত মঞ্জুরীকৃত শ্রমিক ৩১৮৪ জন কিন্তু কর্মরত আছে ১৪৬৫ জন।[৩৫] ব্রিটিশ আমলে রেল কারখানার কর্মকর্তা ও শ্রমিক গন ব্রিটিশ আইন অনুযায়ী বেতন, ভাতা পেতেন। পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান রেলওয়েরর নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকরা বেতন ভাতা ভোগ করতেন। ১৯৭১ সালের পর থেকে বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পে-স্কেল অনুযায়ী শ্রমিকরা বেতন পেয়ে থাকেন।

---

[৩২] ঐ

[৩৩] তথ্য সংগ্রহ, প্রাগুক্ত।

[৩৪] নুরুল ইসলাম খান (সম্পা.) প্রাগুক্ত ।

[৩৫] তথ্য সংগ্রহ প্রাগুক্ত ।

১৯৪৭ পর্যন্ত কারখানার উন্নয়ন

১৮৭০ সালে ব্রিটিশ সরকার যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী গাড়ীর ইঞ্জিন মেরামতের সুবিধার জন্য সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার সময় কারখানায় লোকোসেডের মাধ্যমে ইঞ্জিনের মেরামতের কাজ হত। ১৮৭১ সালে ব্রড গেজ লাইন স্থাপনের ফলে এই কারখানার প্রসার লাভ করে ও কারখানার আয়তন বৃদ্ধি করা হয়। ইলেকট্রিক ও বয়লার শপ চালু হয় ১৯২৪ সালে।[৩৬] ইলেকট্রিক শপ চালু হবার পর কারখানার শপ গুলোতে দিনে ও রাতে দুই শিফটে কাজ হত। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কাজ, যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী গাড়ীর মেরামত শুরু হয় ১৯৩০ সালের মধ্যে। সে সময় কারখানার অবকাঠামে উন্নয়ন হবার সাথে সাথে প্রশাসনিক দিক ও শক্তিশালী হয়, অনেক গুলো নতুন শপ চালু করা হয় (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। ১৮৭০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই কারখানার প্রধান প্রধান পদ গুলোর দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশগন। তারা এ সময়ের মধ্যে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে সৈয়দপুর কারখানাকে সর্ব বৃহৎ কারখানায় রূপান্তর করে। এই উন্নয়নের কাজ হয়েছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের অধীনে।

১৯৪৭-১৯৭১ সময় কাল

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে থেকে পাকিস্তান রেলওয়ের অধীনে চলে আসে সৈয়দপুর রেল কারখানাটি। দেশ বিভক্তির ফলে কারখানার বিভিন্ন শপে দায়িত্বরত হিন্দু কর্মকর্তা ও কর্মচারীগন বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যায়। ফলে কারখানার অনেক শপ বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটিশ আমলে কর্মরত কিছু ব্রিটিশ অফিসার সে সময়ও কর্মরত ছিলেন, তাদের প্রচেষ্টায় কলকাতা কাচরাপাড়া রেলওয়ে ওয়ার্কসপ থেকে যে সকল বিহারীদের বদলী করা হয়েছিল তাদের মাধ্যমে সৈয়দপুর কারখানার শপ গুলো চালু করা হয়। কিছু দিনের মধ্যে কারখানার পূর্নাঙ্গ উৎপাদন শুরু হয়। বিহারিরা অত্যান্ত দক্ষ ও শক্তিশালি কারিগর ছিল। ১৯৫৩ সালে এ কারখানায় ক্যারেজ, ওয়াগন এর পাশা পাশি পয়েন্ট এন্ড ক্রমিং তৈরী ও ব্রিজ মেরামতের কাজ করা হত। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে এই কারখানায় ২২ টি শপ চালু হয়। এই শপ গুলোতে ১০ হাজারের মত শ্রমিক কাজ করত।[৩৭]

১৯৭১ এর পর অবক্ষয়ের পর্যায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা অচল হয়ে যায়। যে সকল ব্রিটিশ অফিসার ছিলেন তারাও স্বদেশে ফিরে যান। কারখানার বাইশটি শপ অক্ষত কিন্তু নিস্তব্ধ। পেইন্ট শপের পাশে পুকুরটি ভর্তি ছিল পাক সেনাদের ফেলা দেওয়া টাকা, আধূলি, সিকি, আনি। স্থানীয় প্রশাসন যেমন বিপর্যস্ত তেমনি রেল প্রশাসনেও ছিল বেহাল অবস্থা। রেলকারখানা তখনও অচল। কিছু কিছু অবাঙালি শ্রমিক কর্মচারী কারখানায় নানা স্থানে বসে বসে আড্ডা দিত। তখন কারখানার প্রধান ডিএস ছিলেন না। ছিলেন একজন ডেপুটি চিপ ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ৭২ এর জানুয়ারিতে তিনি পাকশীতে একটি অস্থায়ী অফিস খুলে বসতে শুরু করেন। সেখানে গিয়ে বাঙালি রেলকর্মীগণ কাজে যোগদানের রিপোর্ট করেন। তখন যার যার সুবিধামত স্থানে আপাততঃ পদায়ন করা হয়। সৈয়দপুরকে বাদ দিয়ে কেউ পাবর্তীপুর, কেউ সান্তহার, কেউ লালমনিরহাট, কেউ ঈশ্বরদী, কেউ রাজবাড়ি এভাবে কাজ শুরু করেন।[৩৮] বেশির ভাগ বাঙালি রেলকর্মী পাবর্তীপুর থেকে সাটাল ট্রেনে এসে কাজ করে বিকেলে সাটেলেই ফিরে যেতেন। ধীরে ধীরে তারা বাসা নিয়ে সৈয়দপুরে আসতে শুরু করেন। প্রথম অবস্থায় কোন অবাঙালিকে চাকুরীতে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। যাদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যকলাপ ছিল না বলে জানা যায় তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকারে লিখিত পত্র দিয়ে যোগ দিতে দেয়া হয়। অবাঙালি শ্রমিক ছাড়া কারখানা

---

[৩৬] ঐ

[৩৭] ঐ

[৩৮] সাপ্তাহিক সাফ জবাব, প্রাগুক্ত, ১৪ নভেম্বর ২০১০

পূর্নাঙ্গভাবে চালু করা তখন ছিল একেবারে অসম্ভব।[৩৯] এরকম ঘটনা ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্থান বিভাগের সময়েও ঘটেছিল। স্টীম লোকোমোটিভ চালু রাখার জন্য অনেকগুলি লোকো ড্রাইভার ভারত থেকে আনা হয়েছিল। অন্যথায় তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্থানে ট্রেন চালানো সম্ভব হত না। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ সালের পরেও ইউরোপিয়ানরা বেশ কয়েক বছর সৈয়দপুরেই কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধ বিধবস্ত দেশে তখন পাকশীর হার্ডিঞ্চ ব্রিজ, ভৈরব ব্রিজ সহ দু শো ষাটটি ছোট বড় ব্রিজ ও কালভার্ট ধবংস অবস্থায়। যোগাযোগ নেই। কারখানা চালু হতে সময় লেগে গেল। ফুলবাড়ি রেল লাইন উপড়ে ফেলে পাক বাহিনী দুইটি ডিজেল লোকোমোটিভ মুখোমুখি সংঘর্ষ করিয়ে বিধবস্ত করে। স্বাধীনতার আগে কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১০ হাজার তা ১৯৭২ সালে এসে দারায় প্রায় ৩ হাজারের মত। এই বিশাল জনশক্তির অভাবে কারখানা পূর্নাঙ্গ রূপে চালু করা সম্ভব ছিল না। ১৯৭২সালে কারখানার এই অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য ১৭ জন বিহারিকে নিয়োগ করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে দক্ষ শ্রমিক ও কর্মকর্তা নিয়োগ করে কারখানার ২২ টি শপ চালু করা হয়। কারখানা পূর্নাঙ্গ ভাবে চালু করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যায়।[৪০]

বর্তমান অবস্থা

সৈয়দপুর রেলওয়ের কারখানার অতীত ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৫৩ সালে কারখানায় দশ হাজার শ্রমিক কাজ করত, ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত এই শ্রমিকরা কারখানার ২২ টি ইউনিট পরিচালনা করত। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ এই ২২ টি শপ সহ কারখানার সর্ব মোট শ্রমিক সংখ্যা ৩ হাজারে এসে দাঁড়ায়। রেল অলাভজনক হওয়ায় ১৯৮৪ সাল থেকে কারখানায় শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ ছিল। যার ফলে ২০০৬ সালে শ্রমিক সংখ্যা আড়াই হাজার ও ২০১১ সালে শ্রমিক সংখ্যা দেড় হাজারে এসে দাড়ায়। শ্রমিক সংখ্যার কমার ফলে ২২ টি শপে সঠিক ভাবে উৎপাদন সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এই কারখানায় যে হারে উৎপাদন ও মেরামতের কাজ হত তা শ্রমিক সংখ্যা কমার ফলে দ্বিগুন হারে কমে যায়। LE এর অধীনে ১ বছর পর কোচ ও দেড় বছর পর লোকাল গাড়ী মেরামতের যে সিডুল আছে তা সময় মত পালন করা সম্ভব হয় না লোকবলের অভাবে। কারখানার শপ গুলোতে যে যন্ত্রপাতি আছে তা প্রায় ধ্বংসের দিকে। আর যে সকল যন্ত্রপাতি আছে তা ব্রিটিশ আমলের হওয়ায় তা ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন। কারখানার টিন গুলো নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ষার মৌসুমে শপ গুলোতে পানি পরে। ফলে কাজ বন্ধ রাখতে হয়।[৪১] কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, সঠিক সময়ে গাড়ীর মেরামত ও কারখানাকে আধুনিকায়ন করবার জন্য ২০১১ সালে ১ শত ৪৭ কোটি টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। কারখানার টিন গুলো নতুন করে লাগানে হচ্ছে, কারখানার ভিতরের লাইন সংস্কার করা হচ্ছে। কারখানার উৎপাদন ও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৪২]

আর্থ- সামাজিক প্রভাব

আজকের আধুনিক সৈয়দপুরের শুরুটা ছিল আসাম বেঙ্গল রেলওয়েকে ঘিরে। এর আগে সৈয়দপুর ছিল সাধারণ গ্রাম। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হলে ব্রিটিশরা নিজেদের বানিজ্যিক স্বাথেই এ দেশে গড়ে তুলে রেলপথ। রেলপথ গড়ার এক পর্যায় সৈয়দপুর হয়ে ওঠে ব্রিটিশদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। একশ চল্লিশ বছর বা তারও আগের কথা সৈয়দপুর রেল ষ্টেশন গড়ে ওঠার পর এ অঞ্চলে লোকজনের আগমন বেড়ে যায়। বিস্তার হতে থাকে সৈয়দপুর শহরের। ইংরেজ

---

[৩৯] ঐ

[৪০] ঐ

[৪১] তথ্য সংগ্রহ, প্রাগুক্ত ।

[৪২] ঐ

বেনিয়ারা সৈয়দপুরে ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠা করে বিশাল রেল কারখানা যা আজও বাংলাদেশের প্রাচীন ও বৃহওম রেলকারখানা।[৪৩] সৈয়দপুর লোকোসেড নির্মিত ১৮৭০ সনে, ইউরোপিয়ান নাইট ক্লাব (বর্তমানে মুর্তুজা ইসস্টিটিউট) নির্মিত ১৮৮২ সালে, অফিসাস ক্লাব নির্মিত ১৯০১ সালে, সৈয়দপুর থানা স্থাপিত ১৯১৫ সালে। এখানে ১৯১২সালে যখন রেলওয়ের সাড়ে চার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হয় তখন উত্তরবঙ্গের জনপদ সর্বপ্রথম বিজলী বাতি দেখে। আধুনিক সভ্যতার বাহন বিদ্যুৎ আর রেল বৃটিশের অবদান। একমাত্র লাকসাম রেলওয়ে জংশন ছাড়া পূর্ববঙ্গের মানুষ তখন কোথাও বিজলী বাতি দেখেনি।[৪৪] বিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় দশকের মধ্যে সৈয়দপুর একটি মডেল টাউন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কারন এই শহরে তখনই বিজলী ছিল, ছিল রেলযোগাযোগ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অফিস ও বাঙালি সাংস্কৃতির বিনোদনের ক্লাব, পার্ক। ১৯১৪ সালে নির্মান কাজ শুরু হয় পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রীজের এবং শেষ হয় ১৯১৯ সালে। ১৯২৬ সালে যখন পার্বতীপুর-চিলাহাটি মিটার গেজ লাইন ব্রড গেজে রূপান্তর করা হয় তখন সরাসরি কলকাতা শহরের সাথে সৈয়দপুর শহরের যোগাযোগ স্থাপিত হয় রেলওয়ের মাধ্যমে। তখন সৈয়দপুর শহর ছিল এক তিলোত্তমা নগরী। বৃটিশের নীল নকশায় গড়া একটি গার্ডেন টাউন অর্থাৎ উদ্যান-নগরী। রেল কারখানার বাইরে শহরের একমাত্র জনগনের বাজার ছিল বর্তমানের মাছের বাজার ও আশেপাশের দোকানসমূহ। এই বাজারের নিয়ন্ত্রণ ছিল একজন রেলওয়ে মার্কেট ইন্সপেক্টরের অধীনে। তাকে নিয়োগ দিত রেল কর্তৃপক্ষ। তখন পৌরসভার কোন অস্তিত্ব ছিল না। আবাসিক এলাকাগুলি ছিল অত্যন্ত সুবিন্যস্ত অফিসার্স কলোনীতে অফিসার, সাহেবপাড়ায় ফোরম্যান, মুন্সীপাড়ায় মুন্সী, বাবুপাড়ায় কেরানী, খালাসী মহল্লায় খালাসী।[৪৫] খালাসী মোহল্লা অভিবাসীদের আচার আচরণ ও প্রকৃতি ছিল বিচিত্র। তাদের ভাষাগত দিক থেকে অন্যান্য অঞ্চলের ভাষাগত দিক অনেক অমিল ছিল। সৈয়দপুরের লোকজন তাদের ভাষা বুঝতে পারত না। এটি হয়েছিল এই অঞ্চলের শ্রমিকের অভাবে। সে সময় এ অঞ্চলের মানুষ চাকুরী করতে চাইত না। তাই ব্রিটিশরা রেলকারখানার শ্রমিকের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতের বিহার রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রাম হতে তাদের ধরে আনত। তাদের অনেকের এই অঞ্চল পছন্দ না হওয়ায় পালিয়ে যেত আবার অনেকে থেকে যেত। রেলকারখানার পার্শ্বে গোলাহাট এলাকায় যারা থেকে যেত তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো। সেই সময় থেকে এই মহল্লাটি খালাসী মহল্লা নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই মহল্লার অনেক মুসলিম পরিবারের মহিলা হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের মত সিঁদুর দিত। সারারাত ধরে চলত গানের আসর। সৈয়দপুর শহরে এখনও কাওয়ালী বিদ্যমান থাকলেও এ সকল কলোনীর সেই পুরাতন ঐতিহ্য এখন আর নেই (এই শ্রেণী ছিল বিহারী) এবং নটসেটেলমেন্টে নট নামক দুষ্ট প্রকৃতির মানুষের আবাস স্থল ছিল একই স্থানে।[৪৬] এছাড়াও ছিল সুইপার কলোনী। সাহেবপাড়া আর অফিসার কলোনীতে মূলতঃ বৃটিশ সাহেবরা বাস করতেন বিধায় সাধারণ মানুষের এসব এলাকায় প্রবেশ নিষেধ ছিল। প্রতিটি বাসায় ছিল সুন্দর ফুলের বাগান আর রাস্তার দু' ধারে ছিল রেইনট্রি, কাঠবাদাম আর দেবদারু গাছ (অফিসার কলোনী ও সাহেব পাড়ার বিশাল বিশাল বাংলোগুলো এখনও আছে কিন্তু বাংলোর সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান ও ঐতিহ্য এখন আর নেই)। খালাসীরা সাহেবদের ট্রলি লাইনের উপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে কারখানায় যাতায়াত করতেন। সে সময় অনেক সাহেব তাদের বিলাতী কুকুর সাথে নিয়ে অফিস করতেন। নেটিভ ওয়ার্কাররা কুকুর দেখেই সাহেবের অবস্থান বুঝতে পারতেন এবং সতর্ক হয়ে যেতেন। সাহেবদের সাথে এলেন ধর্মপ্রচারক পাদ্রীরা। তাঁরা খ্রিষ্টানদের মিশন হাউস তৈরি করলেন বর্তমান রেল হাসপাতালের পেছনে। একটি প্রটেষ্টাইন গীর্জা নির্মান করলেন হাসপাতালের সামনে। পরে আরো একটি ক্যাথলিক গীর্জা নির্মাণ করা হলো স্টেশনের পাশেই।[৪৭] ব্রিটিশরা ইউরোপীয় স্থাপত্যকলায় ১৮৯৩ খ্রি. রেলওয়ের চল্লিশ

---

[৪৩] মনি খন্দকার (সম্পা.), প্রাগুক্ত ।

[৪৪] সাপ্তাহিক সাফ জবাব, প্রাগুক্ত , ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১০

[৪৫] ঐ ৫ অক্টোবর ২০১০

[৪৬] মনি খন্দকার (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

[৪৭] সাপ্তাহিক সাফ জবাব, প্রাগুক্ত, ৫ অক্টোবর ২০১০।

শতাংশ জমির উপর একটি গীর্জা নির্মাণ করে। এটিই এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম ও প্রাচীনতম গীর্জা। কুমারী মারিয়ার নামে এই গীর্জাটি উৎসর্গ করা হয়। ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার গীর্জার পার্শ্বে ৩ বিঘা জমির উপর ১টি পুরোহিত ভবন নির্মাণ করে যা আজও অক্ষত আছে। সে সময় ফাদার ফ্রান্সেস রোক্কা পিমে মহামতি যীশুখৃষ্টের ভক্ত অনুরক্তদের আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্তির পর অনেক ইংরেজ ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেও কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এ দেশে থেকে যান। সৈয়দপুর খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোক ঢাকা, পাবনা, কুষ্টিয়া থেকে কারখানায় চাকুরীর জন্য এসে এখানে বসবাস শুরু করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত সৈয়দপুরে খ্রিষ্টযোগ লাতিন ও বাইবেল পাঠ, উপদেশ, প্রার্থনা ও গান পরিচালনা করতেন সিস্টার ও অ্যাংলো ইন্ডিয়াগণ। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনতা অর্জনের কিছুদিন পূর্বে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানগণ চট্টগ্রাম, ঢাকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যায়।[৪৮] ইউরোপিয়ান ছেলেমেয়েদের জন্য একটি ইংলিশ স্কুল নির্মাণ করা হল যা বর্তমান রেলওয়ে হাই স্কুল হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মূলতঃ ইউরোপিয়ান সিস্টারগন এই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। রেল হাসপাতালের নার্স ও ছিলেন তাদের অনেকে। ইতালিয়ান সিস্টার জোয়ানা, সিস্টার লেজারু, সিস্টার আন্না মারিয়া এই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন।

ইউরোপিয়ানদের পন্য সম্ভার ভর্তি একটি ট্রেন মাঝেমাঝে কলকাতা থেকে এসে দাঁড়াত সৈয়দপুর স্টেশনে। সেই বিশেষ ট্রেনটি কয়েকদিন অবস্থানের পর বেচাবিক্রি শেষ করে ফিরে যেত কলকাতায়। ইউরোপিয়ান ছাড়া কেউ সেই ট্রেনে ঢুকতে পারতনা। ইউরোপিয়ান নাইট ক্লাব বর্তমান মুর্তুজা ইনস্টিটিউটের নাচঘরে সন্ধ্যার পর পশ্চিমা সঙ্গীতের সাথে সাহেব মেমদের বলড্যান্স আর ড্রিংকস চলত। নেটিভরা সেখানে প্রবেশ করতে পারতেননা । নাচঘরের পাশেই বিলিয়ার্ড রুম, বার এবং অন্য পাশে লাইব্রেরী। পরবর্তীকালে এই ক্লাবের নাম হয় কার্লপেপার ইনস্টিটিউট। এখানেই একটি বিশাল পিয়ানো এবং রেফ্রিজারেটর ছিল। দীর্ঘদিন ব্যবহার না করায় সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। ইনস্টিটিউটের কাঠের আকর্ষণীয় মঞ্চটি গ্রীক স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত- যা এখনও অক্ষত আছে।[৪৯]

এদেশীয়দের চিত্তবিনোদনের জন্য বি আর সিং ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল রেল মাঠের পশ্চিমে যেখানে দ্বিমুখী পাইলট স্কুল ও কলেজ বর্তমানে রয়েছে। সেই বি আর সিং ইনস্টিটিউট পরবর্তীতে স্থানান্তরিত হয় (মর্তুজা ইনস্টিটিউটে) যখন ইউরোপিয়ানরা বৃটিশ শাসনের অবসানে এদেশ ছেড়ে চলে যায়। ১৯৪০ সালে স্থাপিত জেসলিন ইনস্টিটিউট ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য খালাসী মহল্লায় ফিদাআলী ইনস্টিটিউট নামে বিনোদন ক্লাব হিসেবে গড়ে ওঠে রেল কর্তৃপক্ষের সহায়তায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ব্রীজ ওয়ার্কসপের জায়গায় আমেরিকান সেনা ক্যাম্প স্থাপিত হয়। এছাড়া পুলিশ বাহিনীর রাজশাহী রেঞ্জের 'ডিআইজি' হেড কোয়ার্টার সৈয়দপুরেই স্থাপন করা হয়েছিল। রেলযোগাযোগের সুবিধার কারণে পাটের বাজার এবং টাটিয়া প্রেসের মত বৃহৎ একটি জুট প্রেস (বর্তমানে সৈয়দপুর প্লাজা) ছাড়াও কয়েকটি জুট প্রেস স্থাপিত হয়েছিল এ শহরে।[৫০] সৈয়দপুরের অর্থনীতি উন্নতিতে রেলকারখানা একটি বড় সহায়ক শিল্প হিসাবে চিহ্নিত। কাপড়ের কাঁচামাল, নীল, পাটের কাঁচামাল, পাটের ব্যাগ, ধান, পশুর চামড়া, তামাক ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য কলকাতায় রপ্তানি করা হত এ শহর থেকে। সৈয়দপুর থেকে পাটকল গুলিতে কাঁচাপাট সরবরাহ করা হত রেলওয়ের মাধ্যমে। পাটের দালালী, পাটের কেনাবেচা, পাট রেলিং করে রেল ওয়াগনে লোড করা তার পরে সেখান থেকে পাটকলে পৌছে দেওয়া ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মাদিতে উত্তরবঙ্গ পাট ব্যবসায় ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৯১১ সালে এ অঞ্চলে পাটের বানিজ্য বৃদ্ধি পায়। সে সময় এ অঞ্চলে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে ছিল তার বেশির ভাগই ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত হত। রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করে রেল ভিত্তিক ব্যবসায়িক পাড়া গড়ে

---

[৪৮] মনি খন্দকার (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।

[৪৯] সাপ্তাহিক সাফ জবাব, প্রাগুক্ত ।

[৫০] ঐ

ওঠে। তখন শহরে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যা ছিল বেশি। প্রত্যক পাড়ায় মন্দির ছিল যার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। যোগাযোগের সুবিধার কারণে ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে সৈয়দপুরের গুরুত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। কলকাতা থেকে দার্জিলিং মেইল সৈয়দপুর স্টেশন হয়ে জলপাইগুড়ি পৌঁছাত চিলাহাটির ভিতর দিয়ে। ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের। গ্রামের মানুষ তাদের কৃষি পণ্য এনে গুদামে দিয়ে যেত। নগদ টাকা না নিয়ে একখানা কাগজে লেখা টাকার পরিমাণ হাতে নিয়ে অনেক সময় ফিরে যেত। শহরে বাজার করার সময় ঐ কাগজটা দেখিয়ে টাকা নিয়ে বাজার করতো। পারস্পরিক বিশ্বাস ছিল গভীর, একদিকে শহরের বুকে সরকারি বড় বড় স্থাপনা অন্যদিকে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব, ব্যায়ামাগার, লাইব্রেরী এইসব মিলে একটা উন্নত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠেছিল তখনকার সৈয়দপুর শহরে।[৫১] সৈয়দপুর রেল কারখানার সম্প্রসারণের কারনে এ অঞ্চল নানা দিক থেকে উন্নতি লাভ করে। এই শহরে ব্যবসা-বানিজ্য, চাকরি, পড়ালেখার জন্য পাশ্ববর্তী স্থান থেকে অনেক লোক আসত। ফলে এ অঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ অঞ্চলের সমাজের উপর রেলওয়ে কারখানার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রেলকারখানা প্রতিষ্ঠার পর নতুন এক ব্যবসায়ী শ্রেনীর উদ্ভব হয়। অনেকে রেল কেন্দ্রিক ব্যবসা-বানিজ্য শুরু করে। তাই রেলওয়ের দ্বারা সামাজিক স্তর বিন্যাসে ও এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রেল কারখানার কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়েও আলাদা একটি সমাজিক স্তরের আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যে অভিজাত, মধ্যবৃত্ত এবং নিম্ন শ্রেনী এই তিনটি বিভাগ দেখা যায়। এ অঞ্চলের সমাজ জীবনে বড় রকমের সংযোজন ঘটায় রেল কলোনী গুলি। রেল কলোনী গুলিকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজ গড়ে ওঠে। এ সমস্ত কলোনীতে বসবাসকারী বিশাল রেল কর্ম চারীদের পরিবার মিলে একটা পৃথক সমাজ গড়ে ওঠে, যা অত্র অঞ্চনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নতিতে গুরুত্ব পূর্ণ অবদান রাখে। রেল কর্ম চারীদের বিশাল জনগোষ্ঠী দ্বারা কর্মচারী ইউনিয়ন, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন যেমন- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক, স্কাউট, সমবায় সমিতি, ক্যান্টিন, খেলাধূলা বিষয়ক ইত্যাদি পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে সৈয়দপুরের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। রেল কারখানার চাকরিজীবিরা একটা আলাদা মর্যাদা পেত। তাদেরকে রেলওয়ে ম্যান বলে ডাকা হত যাদের জীবিকা, আচার আচরন, পোশাক, পরিচ্ছেদ, শিক্ষাদীক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রেই এক ভিন্ন রূপ ছিল।[৫২]

১৯৪৭ এর পর পরিবর্তন

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভাগের সময় পর্যন্ত সৈয়দপুর একটি উন্নত নগরী হিসেবেই গড়ে উঠেছিল। গ্রীসের আলোঝলমল থিবি নগরীর মতই। ভারত বিভাগের কারণে সুশৃংখল সুসজ্জিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সেই নগরীর বুকে আসতে শুরু করল বাস্তহারা হাজার হাজার নারী-পুরুষ। বিপুল সংখ্যক বাঙালি, অবাঙালি মুহাজের কলকাতা কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে এই শহরে এসে ভিড় জমাতে থাকে। চলে যেতে থাকে হিন্দু সম্প্রদায় ভারত অভিমুখে, আর বৃটিশেরা ইংল্যান্ডে। শহরের ফাঁকা জায়গাগুলিতে গড়ে ওঠে ঘিঞ্জি বস্তি। পরিত্যক্ত ওয়াগনে ঘাসের চাপড়া দিয়ে তার মধ্যে বাস্তহারাদের সংসার গড়ে ওঠে।[৫৩] শহরে উর্দুভাষীর সংখ্যা বিপুলহারে বেড়ে যায়। রেলমাঠ হয়ে গেল জিন্নাহ ময়দান, বি আর সিং ইনস্টিটিউট হয়ে গেল উর্দু মাধ্যম গার্লস স্কুল। এর নাম হল কায়েদে আজম গার্লস স্কুল। কিছুদিন যেতে না যেতেই ষড়যন্ত্র হল সৈয়দপুর হাই স্কুল মাঠে উর্দু হাই স্কুল খোলা হবে। পাকিস্তানের রাজধানী তদানিন্তন করাচীর ইঙ্গিতে একটি বিল্ডিং তৈরির নির্দেশ পেয়ে হাইস্কুল মাঠেই ইট সিমেন্ট আনা শুরু হল। দু' এক বছরের মধ্যে শহরের ভাষা পরিবর্তন হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও। শহরে বাঙালির সংখ্যালঘু হওয়ার মত অবস্থা দেখা দেয়। কুচবিহার, উড়িষ্যা, পাটনা, কাটিহার, মুঙ্গের ইউটি, মাদ্রাজ নানা অঞ্চল থেকে

---

[৫১] ঐ

[৫২] ঐ

[৫৩] ঐ, ১২ অক্টোবর ২০১০

অবাঙালিরা আসতে থাকে।[৫৪] রেলওয়ের চাকুরি ছাড়াও অনেকে হলেন ফেরিওয়ালা, ভিস্তিওয়ালা, ধোপা, দোকানী ইত্যাদি। পাক সরকারের উস্কানিতে তারা বাঙালি সংস্কৃতিকে গ্রহন না করে বিরোধীতা করতে থাকে। শহরের ভাষা হয়ে যায় উর্দু আর তিলোত্তমা নগরী ঘিঞ্জি বস্তিময় নোংরা শহরে পরিণত হতে থাকে। স্টেশনের পাশের বর্তমান শহীদ স্মৃতি পার্কটিও বস্তিতে পরিণত হয় (বর্তমানে বস্তিটি নেই)। বস্তিময় নোংরা শহরে পরিণত হতে থাকে সৈয়দপুর।[৫৫] মুহাজেরদের আগমনে বাসস্থান সংকুলান না হওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে বর্তমান ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় একটি আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীকালে সেটি সেনা ছাউনিতে রূপান্তরিত হলে শহরের গুরুত্ব বেড়ে যায়। উর্দুভাষীদের প্রতি তদানিন্তন পাক সরকারের সুদৃষ্টি থাকায় অতি সহজেই ১৯৫৮ সালে পৌরসভা স্থাপিত হয়। শুধু তাই নয় পূর্ব পাকিস্তানে যে পাঁচটি শহরে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিরা সিটির এলাউন্স পেতেন তার মধ্যে একটিতে গণ্য হল এ শহর (সৈয়দপুর ছাড়া খুলনা, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, চট্রগ্রাম সিটি টাউন ছিল) অথ্যাৎ সিটির মর্যাদা পেল।[৫৬] শহরের ভাষা উর্দুর সাথে সাথে পাড়ায় পাড়ায় মুশায়রা কাওয়ালী শুরু হয়ে গেল। ' আর্ট সেন্টার' নামে বাংলা ও উর্দু মিলিত নাট্য ক্লাব গড়ে উঠেছিল। মুর্তজা ইনস্টিটিউটে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হলে সাথে সাথে একটি উর্দু নাটকও মঞ্চস্থ হত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কাওয়াল, শায়েরী, গজল বিশারদ এসে জিন্নাহ ময়দানে বিশাল বিশাল অনুষ্ঠান করে যেত, পৃষ্ঠপোষক ছিল উর্দুভাষীরা। ইউরোপিয়ানরা যে মুর্তজা ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীতে চুয়াল্লিশ খানা মরক্কো বাঁধাই বিশ্বকোষ, দশখানা 'বুক অব নলেজ' এবং প্রচুর দুস্প্রাপ্য ইংরেজী সাহিত্যের প্রবন্ধ গল্প, উপন্যাস, ভ্রমন কাহিনী ও পৌরানিক বই রেখে গিয়েছিলেন সেই সংগ্রহ শালা আরো সমৃদ্ধ হতে থাকলো উর্দু ভাষার নানা বইপত্রে। পৌরানিক হিন্দু ধর্মের বহু দুস্প্রাপ্য বাংলা বই ছিল ওই লাইব্রেরীতে। সংরক্ষণ আর পাঠকের অভাবে অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে অফিসার্স ক্লাবের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ইংরেজী বইগুলি। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে টাটিয়া প্রেস, রেলওয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র, বিশাল ডাক ও তার অফিসের কার্য্যক্রম, ডিআইজি হেড কোয়ার্টার ইত্যাদি। নট বা দুধর্ষ যাযাবর প্রকৃতির লোকদের শায়েস্তা করার জন্য তাদেরকে প্রাচীরবদ্ধ রেখে যেখানে হস্তশিল্প শেখান হত বৃটিশ আমলে তার কোন অস্তিত্ব নেই। ঠিক এমন করেই মুছে গেছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন বধ্যভূমি, বিদ্ধস্ত স্থাপনাগুলি।[৫৭]

পাকিস্তান আমলে রেলকারখানার ২২ টি শপের মধ্যে ২ জন মাত্র শপের ইনচার্জ ছিল বাঙালী। পৌরসভাতেও প্রাধান্য ছিল উর্দুভাষীদের। মুসলিম লীগ সমর্থিত সরকারের সব রকম পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অবাঙালি উর্দু ভাষীদের পক্ষে। এসব বৈষম্য কমার কোন লক্ষণ ছিল না। গ্রাম থেকে শাক-সবজি ফল-মূল নিয়ে যেসব বাঙালি রাস্তার ধারে টুকরি নিয়ে বিক্রির জন্য বেচতে বসত তারাও নাজেহাল হত। ন্যায্য মূল্য না দিয়ে ইচ্ছামত দাম ধরে ফেলে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হত অনেক ক্ষেত্রে । শহীদ মিনার গড়তে বাধা দেওয়া, ভেঙ্গে দেওয়া, সেখানে ময়লা ফেলা এসব ঘটনা ঘটেছে এ শহরে। চাকুরী নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের ক্ষেত্রে উর্দুভাষীরা ছিল অগ্রগণ্য।[৫৮] ছোট খাট এমনও ঘটনা ঘটেছে, কায়েদে আযম কলেজে (বর্তমানে সৈয়দপুর কলেজ) উর্দুভাষী আর বাঙালা ভাষী ছাত্রদের মধ্যে চরম উত্তেজনা। বিষয় জনৈক বাঙালি ছাত্রকে সামনের বেঞ্চে বসতে দেয়নি উর্দুভাষীরা এবং গায়ে হাত তুলেছে। তখনকার সময়ে শহরে প্রকাশ্যে বাংলা নববর্ষ পালন হত না।[৫৯] কেউ কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিজ বাড়িতে পালন করতেন। কিন্তু প্রতিবছর মহরম পালন হত মহাধুমধামে। বিরাট তাজিয়াসহ মিছিল তলোয়ারের খেলা, মার্সিয়া এসব দেখা যেত বেশ কয়েকদিন ধরে। এভাবেই 'হর কারবালা মেয়ে ইসলাম জিন্দা' হতে থাকল।

---

[৫৪] ঐ

[৫৫] ঐ

[৫৬] ঐ, ১৯ অক্টোবর ২০১০

[৫৭] ঐ

[৫৮] ঐ, ২৬ অক্টোবর ২০১০

[৫৯] ঐ

১৯৭১ এর পর পরিবর্তন

১৯৭১ এর এপ্রিল মাস ছিল এ শহরের হত্যাযজ্ঞের মাস। সবচেয়ে বেশি বাঙালিদের স্বপরিবারে নিধন করা হয়েছে এই মাসে। সৈয়দপুর রেলকারখানার 'কিউপোলা ফার্ণেস' ও 'বয়লার শপ' এ বহু বাঙালিকে উর্দুভাষীরা এই স্থানে ফেলে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শহরের আশেপাশে গ্রামগুলোতে ভিটে মাটি পুড়িয়ে দিয়েছিল। পাক বাহিনী দোসররা। 'লড়কে লেঙ্গা' পাকিস্থানকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব তারাই পালন করেছিল লুটপাট আর অগ্নি সংযোগ করে, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যতই আসন্ন হচ্ছিল ততই উর্দুভাষীরা মরিয়া হয়ে হত্যা ও লুট শুরু করেছিল। শেষ দিকে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চল এবং পার্বতীপুর থেকে অবাঙালিরা এসে সৈয়দপুর শহরে আশ্রয় নিতে থাকে। পাশেই সেনাছাউনির সহায়তায় তারা অনেকটা নিরাপদ বোধ করে। শহরের অবরুদ্ধ বাঙালিরা মৃত্যুর ঝুকি নিয়ে পালিয়ে প্রাণে বেচে যান, আবার অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। সে সময় সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ থেকে প্রায় দুইশ জন বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের অংশ গ্রহন করার জন্য ভারতে চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই কয়েকশত বাঙালিকে হাইস্কুলে (সৈয়দপুর হাইস্কুল) জড় করা হয়। সেখানে বন্দি শিবিরের মত তাদের আটক রেখে দিনের বেলা এয়ারপোর্ট তৈরির কাজে ইট, বালু, পাথর ইত্যাদি টানার কাজে লাগানো হত। কাজ দ্রুত করার জন্য পিঠে গরুঘোড়ার মত চাবুক মারা হত। এদের মাঝে রেলওয়ে কয়েকজন বাঙালি সুপারভাইজার ও অনেক সাধারণ শ্রমিক কর্মচারী ছিলেন। তাদের অনেকে এখনও জীবিত।[৬০] সৈয়দপুর শহরে বিপুল উর্দুভাষীদের সমাগমের ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়। বেকার মানুষ রিলিফ নির্ভর হয়ে পড়ে। তারা অমানবিক অবস্থার শিকার হন। অনিবন্ধিত যৌনকর্মীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে যৌনব্যাধি ছড়াতে থাকে। আর্ন্তজাতিক সাহায্য সংস্থা আসতে থাকে। ক্যাম্প খোলা হয় পাড়ায় পাড়ায়। বাঙালিরা পৌরসভা, রেল কারখানা, বিনোদন ক্লাব, স্কুল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।[৬১] কয়েক বছরের মধ্যে সৈয়দপরের দৃশ্য পট পালটাতে থাকে। কারখানার প্রভাবে ছোট বড় কুটির শিল্প গড়ে উঠতে থাকে শহরের সর্বত্র। বালতি, স্টীলের তৈজসপত্র, কাঠের আসবাবপত্র, টিভির এন্টিনা, গুল, বেনারসী ও বুটিক শাড়ী এমনকি বাই সাইকেলের অধিকাংশ সরঞ্জাম তৈরি হতে থাকে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরবরাহ হতে শুরু করে। পাড়ায় পাড়ায় গামেন্টর্স শিল্প গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে শহরটি শিল্প এবং ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে । গার্মেন্টস শিল্পের তৈরী করা সুইটার,প্যান্ট, সাট, গেঞ্জি সহ অনেক ধরনের কাপর সৈয়দপুর থেকে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায় নিয়ে বিক্রি করা হয়। অবস্থানগত কারণে রংপুর, দিনাজপুর, পাবর্তীপুর, নীলফামারী, ঠাঁকুরগাও ইত্যাদি শহরের সাথে যোগাযোগের কেন্দ্র বিন্দু থাকায় দ্রুত বিকাশ লাভ করে ব্যবসা বাণিজ্য। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের একমাত্র বিমানবন্দরটিও এই শহরেই গড়ে ওঠায় উত্তর বঙ্গের প্রবেশ দ্বার হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায় সৈয়দপুর শহরটি। বর্তমানে রেলওয়ে কারখানার প্রভাবে সৈয়দপুর একটি বাণিজ্যিক শহরে পরিণত হয়েছে।[৬২]

উপসংহার

সৈয়দপুরের জনগণের জীবন মান উন্নয়নে রেল কারখানাটির ভূমিকা অপরিসীম। সৈয়দপুর রেলকারখানার ইতিহাস এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব আলোচনার আলোকে বলা যেতে পারে যে, রেলওয়ের আগমণের ফলে যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় সেগুলি একটি আরেকটির সাথে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে উঠেছে। ১৮৭০ সালে এই কারখানা প্রতিষ্ঠার পর যে সকল ব্রিটিশ কর্মকর্তা আসেন তাদের মাধ্যমে সর্ব প্রথম এ অঞ্চল আধুনিকতার ছোঁয়া পায়। ব্রিটিশরা তাদের সাথে চিকিৎসক, নার্স, ধর্ম প্রচারক সহ বিভিন্ন

---

[৬০] ঐ, ২ নভেম্বর ২০১০

[৬১] ঐ

[৬২] ঐ

পেশাজীবি জনবল নিয়ে আসে। তারাই এই শহরকে আধুনিক করার জন্য কাজ করে। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা যে সকল পাড়ায় বাস করত যে সকল পাড়া বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠে। অফিসার্স পাড়ার বিশাল এলাকা জুড়ে থাকতে তাদের বাংলো। বাংলোতে বাহারি ধরনের ফুলের বাগান যা বাংলোগুলোকে অধিক আকর্ষণীয় করে তুলতো। চিকিৎসক, সিস্টার, ধর্ম প্রচারকের সহযোগিতায় রেল কর্মকর্তারা এ শহরে গড়ে তুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়েরাই লেখা-পড়া করত না এ শহর ও আশ-পাশের এলাকা থেকেও পড়া-লেখা করতে সৈয়দপুরে আসতো। যার ফলে এ শহরে শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাদের মাধ্যমে চলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কর্মকাণ্ড, যার প্রভাব পড়ে এ শহরের সাধারণ মানুষের উপর। ব্রিটিশ আমলেই এ শহরে গড়ে উঠে ছিল রেল বাজার। এই বাজারে সৈয়দপুরের আশ-পাশ অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে আসতো। তারা আস্তে আস্তে এশহরে বসতি গড়ে তুলে। ফলে এ শহরে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাছাড়া রেল সুবিধার কারণে এ শহরে খুব দ্রুত ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। কলকাতা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পণ্য বহনকারী মালগাড়ী সৈয়দপুর থেকে নিয়মিত যাতায়াত করত। ব্রিটিশ আমলে পাট শিল্প বিকাশ ঘটায় আর এ শহর থেকে রেল সুবিধা থাকায় জুট মিল গড়ে ওঠে ছিল সে সময়। ব্রিটিশদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈয়দপুরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিনোদন, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্ব ক্ষেত্রে একটি আধুনিক শহরে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর এই কারখানায় চাকরির সুবাদে বহু অবাঙালি এ শহরে আসে। তারা তাদের সাথে নিয়ে আসে এক ভিন্ন সমাজ এ সংস্কৃতি যা ব্রিটিশদের দেওয়া সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ছিল। তাদের সাথে এ শহরের অন্য মানুষের আচর-আচরণের মিল ছিল না। তাদের আগমণে সৈয়পুরে অপর একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাদের ধর্মীয় উৎসব পালনের রীতি সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন ছিল। তারা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতো না। অবাঙালিরা অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতিকে এ শহরে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে।

রেল কারখানার কর্মকর্তা, শ্রমিকগণ যে সকল পাড়ায় বাস করত সে সব পাড়ায় ভিন্ন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাদের পরিবার মিলে গড়ে তুলে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। এ সকল পরিবার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগমণ করতো। একেক অঞ্চলের রীতি-নীতি আচার-আচরণ প্রকাশ পেত এ সব পাড়ায়। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা এ শহরে গড়ে তুলে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা। রেল কারখানার নিম্ন শ্রেণীকে কেন্দ্র করে এ শহরের অনেকগুলো রেল কলোনী গড়ে ওঠে। কলোনীতে বসবাস কারীরা সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে রেল কর্মকর্তারা ও কলোনীর লোকজন সৈয়দপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য নিজস্ব বাড়ীঘর নির্মাণ করে। এ সকল রেল কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের বসবাসকারী পাড়ার নাম ও ভিন্ন হয়ে যায় তাদের পদবি অনুযায়ী। স্বাধীনতার পর থেকেই এই কারখানা তার পুরানো জৌলশ হারাতে থাকে এবং এর সাথে সৈয়দপুরের শহরেরও। কারখানার সপগুলোতে যে যন্ত্রপাতি আছে তা প্রায় ধ্বংসের দিকে। বর্তমানে যে যন্ত্রপাতিগুলো দেখা যায় তার প্রায় বেশিরভাগই ব্রিটিশ আমলের। নতুন করে এখানে তেমন কোন আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন না করার ফলে কারখানার কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ : ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯০৮-২০০৮)

মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম*

Abstract: Anandamohan College was an important institution among the few large colleges in Bengal which were established to spread of modern higher education during the British period. While Hindu-Muslim relation in Bengal was extremely cold continuously due to partition of Bengal (1905) and Swadeshi movement in the early twentieth century, in 1908, establishment of the Anandamohan College was a very exceptional endeavour. This college is a century-old witness of many remarkable events of our civilization. This paper has discussed the history of the establishment of this college and its contribution to the progress of higher education in Bangladesh from 1908 to 2008. The role of this college in the different national movements in the country is also discussed here briefly.

সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান নানা সময়ে মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভারত উপমহাদেশেও প্রাচীনকালের তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে মধ্যযুগে স্থাপিত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের ইতিহাসেও যেসব উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আধুনিক শিক্ষার বিকাশে নতুন যুগের সূচনা করেছিল ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ তার অন্যতম।

ব্রিটিশ আমলে ময়মনসিংহ ছিল অবিভক্ত বাংলার এক প্রধান ও সর্ববৃহৎ জেলা। ১৭৮৭ সালের ১মে এই জেলা স্থাপিত হয়।[১] ১৯০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর আয়তন ছিল ৬,৩৩২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ছিল ৩৯,১৫,০৬৮ জন। তার মধ্যে দেশের বৃহৎ দু'টি সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যানে ২৭,৯৫,৫৪৮ জন ছিল মুসলিম ও ১০,৮৮,৮৫৭ জন হিন্দু।[২] সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে আয়তনে ময়মনসিংহ জেলা ছিল দ্বিতীয় বৃহত্তর এবং জনসংখ্যার নিরিখে এটি তখন ভারতের বৃহত্তম জেলার দাবিদার।[৩] উপমহাদেশের এই বৃহৎ জেলার শিক্ষা পদ্ধতি আদিকাল থেকে কি ধরনের ছিল তা তথ্য-সূত্রের অভাবে বিস্তারিত জানা যায় না। অনেকের মতে, প্রাচীন কাল থেকেই এখানে এক ধরনের শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ময়মনসিংহ ইতিহাস বিষয়ক জনৈক গবেষকের ভাষায়, "উত্তর ভারতীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের আমলে আর্য সংস্কৃতির সংগে যোগাযোগের ফলে ময়মনসিংহ কামরূপ অঞ্চলে জীবন ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে এ অঞ্চলের সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটে এবং কালক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয়।"[৪] মধ্যযুগ তথা মুসলিম আমলে (১২০৪-১৭৫৭)

---

* ড. মো. আব্দুল্লাহ আল-মাসুম, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলার অন্যসব অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার ন্যায় ময়মনসিংহেও হিন্দু-মুসলিম সমাজে স্বতন্ত্র শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান ছাত্ররা প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদ কেন্দ্রিক মক্তবে ও উচ্চশিক্ষা মাদ্রাসায় গ্রহণ করত। অন্যদিকে, হিন্দু ছাত্রদেরকে পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা ও টোলে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হত। তবে মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার্স এর বিবরণে লক্ষণীয় যে, স্থানীয় ছাত্ররা ব্যতীত সিলেট ও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসাগুলোতে ভিড় জমাত। তাছাড়াও শিক্ষকগণ বেশিরভাগ চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা থেকে আগমন করতেন।[৫] সাধারণভাবে তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক এবং রাজভাষা হিসেবে ফারসি শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাছাড়াও বাংলা, সংস্কৃত, উর্দু ও আরবি ভাষা মধ্যযুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রচলিত ছিল।

১৭৫৭ সালে পলাশির পট পরিবর্তনের পর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহের অধিবাসীগণ তাদের প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে যথেষ্ট পিছিয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহের হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের শিক্ষা পরিস্থিতি ছিল খুবই হতাশাজনক। যেমন, স্কটিশ মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডাম (১৭৯৯-?) তাঁর রিপোর্টে ১৮৩৫ সালে ময়মনসিংহ জেলায় হিন্দুদের শিক্ষার জন্য ৫০ থেকে ৬০টি স্কুল ছিল বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের [illegible] এ ধরনের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, æThe alleged non-existence of Mahomedan Schools in a district in which the proportion of Mahomedans to Hindoos is as five to two is incredible."[৬] অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক সরকার প্রথম দিকে এদেশীয়দের শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার পরিচয় দেন। পরবর্তীকালে দেশীয় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সরকারি-বেসরকারিভাবে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তা ছিল মূলত বাংলার রাজধানী কলকাতাকেন্দ্রিক। নানা কারণে ব্রিটিশ সরকার কিংবা বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ববাংলার শিক্ষার প্রতি তেমন দৃষ্টিপাত করেন নি। তাছাড়াও পূর্ব বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কলকাতার সাথে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, কলকাতা শহরে আবাসন সমস্যা ও সমাজের সচেতনতার অভাবে বৃহত্তর ময়মনসিংহে আধুনিক শিক্ষার প্রসার তুলনামূলকভাবে বিলম্বে সংঘটিত হয়। পাশাপাশি এই অঞ্চলে বন্যা, খরা, ফসলহানি, দুর্ভিক্ষসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জনসাধারণের দরিদ্রতা শিক্ষা বিস্তারে অন্যতম প্রতিবন্ধক ছিল। উইলিয়াম অ্যাডাম বলেন, æThis district is intersected through its whole extent by the Brahmaputra and the innumerable streams flowing into it, and the surface of the country being low and flat it is during the height of the floods nearly submerged."[৭]

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও ব্রিটিশ সরকার উনিশ শতকের মধ্যভাগে ময়মনসিংহে জেলায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সরকার ১৮৪৬ সালে তৎকালীন নেত্রকোনা মহকুমায় সুসাং পরগণার নারায়ণডহরে একটি মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ময়মনসিংহে আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তন শুরু করেন। ঐ বছরের নভেম্বরে লর্ড হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনায় ময়মনসিংহ শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হার্ডিঞ্জ স্কুল'। ১৮৫৩ সালে 'ময়মনসিংহ জিলা স্কুল' স্থাপিত হয়। অনুরূপ ১৮৭০ সালে টাঙ্গাইলের জাহ্নবী (Janhabi) ও জামালপুরে Donough স্কুল স্থাপন করা হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ১৮৬৪ সালে জেলার প্রথম 'নর্মাল স্কুল' ময়মনসিংহ শহরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। এভাবে উনিশ শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ময়মনসিংহ শহর ও জেলার বিভিন্ন স্থানে বহু স্কুল গড়ে ওঠে।[৮] তবে তখনও পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলায় কোন কলেজ প্রতিষ্ঠালাভ করে নি। কিন্তু মাধ্যমিক স্কুল থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাশাপাশি সমাজের সচেতন শ্রেণীর মধ্যেও কলেজ স্থাপনের বিষয়টি তখন তীব্রভাবে অনুভূত হয়।

এই অবস্থায় ময়মনসিংহ জেলায় বেসরকারিভাবেই উচ্চ শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এর ফলে বিশ শতকের সূচনায় অর্থাৎ ১৯০০ সালে টাঙ্গাইল মহকুমায় স্থানীয় জমিদার সন্তোষ বাবুর প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রমথ-মন্মথ কলেজ (Pramatha Monmatha College)' নামে সর্বপ্রথম একটি

দ্বিতীয় গ্রেডের মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[৯] তখন ফার্স্ট আর্টস (F.A.) বা ইন্টারমিডিয়েট স্তরের কলেজগুলো দ্বিতীয় গ্রেডের এবং গ্রাজুয়েট ও পোস্ট গ্রাজুয়েট মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রথম গ্রেডের কলেজ হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে ময়মনসিংহ অঞ্চলে সরকারের শিক্ষা বিস্তার প্রচেষ্টার প্রায় অর্ধশতাব্দী পর কলেজ প্রতিষ্ঠা হলেও একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান জেলার উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ বা বিকাশে যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়াও জেলার কেন্দ্রস্থলে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি তখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এ প্রেক্ষিতে 'প্রমথ-মন্মথ কলেজ' স্থাপনের এক বছর পর ময়মনসিংহের একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক আনন্দমোহন বসু[১০] শহরের মধ্যস্থলে উচ্চশিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৯৯ সালে তিনি ময়মনসিংহ শহরে উপস্থিত হলে 'আঞ্জুমানে ইসলামি(১৮৭৫)' ও 'ময়মনসিংহ সভার (১৮৭৮)' নেতৃত্বে স্থানীয় উৎসাহী অধিবাসীগণ বসুর নিকট শহরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান।[১১] উল্লেখ্য যে, উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠন 'আঞ্জুমানে-ইসলামি' ১৮৫৫ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐ সমিতির যেসব শাখা গঠিত হয় এক্ষেত্রে ময়মনসিংহের আঞ্জুমানের স্থান ছিল তৃতীয়। মৌলবি হামিদ উদ্দীন আহমদ (১৮৪১-১৯১৫, উকিল, ময়মনসিংহ) প্রথমে এর সম্পাদক ও পরে সভাপতি নির্বাচিত হন।[১২] প্রধানত আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সভাপতি হামিদ উদ্দীনের আবেদন আনন্দমোহন বসুকে কলেজ প্রতিষ্ঠায় তখন যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে এমন এক সময়ে ময়মনসিংহে কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল যখন হিন্দু-মুসলিম সামাজিক বিভেদ, রাজনৈতিক বিরোধ এমনকি অনেকের মতে ব্রিটিশ সরকারের Divide and Rule Policy বাংলার সার্বিক পরিস্থিতিকে জটিল ও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তখন মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন একটি সংগঠনের তথা 'আঞ্জুমানে ইসলামি'র জেলা সভাপতি হয়ে হামিদ উদ্দিন কেন হিন্দু নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা করবেন? এর সদুত্তরে প্রথমে বলা যায়, আনন্দমোহন বসু ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হিসেবে অনেকটা উদারপন্থী ছিলেন। কলকাতা সিটি কলেজসহ তাঁর স্থাপিত সকল প্রতিষ্ঠান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। অন্যদিকে মৌলবি হামিদ উদ্দীন ছিলেন ব্রিটিশ আমলে উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'আঞ্জুমানে ইসলামি'র অন্যতম নেতা এবং ময়মনসিংহ জেলার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট হিসেবে অত্যন্ত আধুনিক মনস্ক ও সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তিনি পশ্চাৎপদ মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় উন্নতির জন্য প্রতিবেশি উদারপন্থী হিন্দু নেতা কিংবা জমিদারদের সাথে হাত মেলাতে কৃপণতা করেন নি। তাছাড়াও হামিদ উদ্দীন 'ময়ময়নসিংহ সভা'র মত হিন্দু নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত সমিতিটির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন এবং ১৮৯৯ সালে ময়মনসিংহ সভাকে নিয়ে সম্মিলিতভাবেই আনন্দমোহনের নিকট কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছিলেন। অন্যদিকে, আনন্দমোহন বসুর সাথে স্কুল জীবন থেকেই হামিদ উদ্দীনের ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল। তাঁরা উভয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন।[১৩] এ প্রেক্ষাপটটিও হামিদ উদ্দীনের পক্ষ থেকে আনন্দমোহন বসুকে কলেজ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছিল । তাছাড়াও এক্ষেত্রে ময়মনসিংহ সভার নেতৃবৃন্দ অনাথবন্ধু গুহ, ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তীর ভূমিকাও উল্লেখ্য। এভাবে স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম নেতৃত্বের দাবির ফলে ১৯০১ সালের জুলাই মাসে আনন্দমোহন বসু ময়মনসিংহের সিটি স্কুলকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে রূপান্তর করলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ময়মনসিংহ সিটি কলেজ'।[১৪] পাশাপাশি নব প্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে তিনি কলকাতার সিটি কলেজের সাথে সংযুক্ত করেন। যার ফলে এটি কলকাতার সিটি কলেজের শাখা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, আনন্দ-মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ও তাঁদের ন্যায় আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদ একটি কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বেসরকারিভাবে কলকাতার সিটি কলেজ ও স্কুল এবং ময়মনসিংহের সিটি স্কুল পরিচালনা করে আসছিলেন। সেই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন স্বয়ং আনন্দ-মোহন বসু।[১৫] ফলে প্রধানত কলকাতার সিটি কলেজ কাউন্সিলের তত্ত্বাবধান ও আর্থিক সহায়তায় 'ময়মনসিংহ সিটি কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০২ সালের এপ্রিলে এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[১৬]

এই সময়ে মহারাজা সূর্য্যকান্তকে সভাপতি করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি কলেজ পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।[১৭] তবে শুরুতে কলেজের শিক্ষক সংখ্যা ও শিক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। অর্থ তহবিল ও শিক্ষকের অভাবে কলেজ পাঠ্যক্রম শুধু ফার্স্ট আর্টস বিভাগের মধ্যে সীমিত ছিল। শিক্ষক স্টাফের মধ্যে প্রিন্সিপাল ব্যতীত দু'জন অধ্যাপক ছিলেন। তাছাড়াও সংস্কৃত, ফারসি ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য একজন করে মোট তিনজন প্রভাষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ছাত্রদের আবাসিক সুবিধার জন্য একটি ভাড়া বাড়িতে ছাত্রাবাস খোলা হয় যেখানে সিটি কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্ররাও থাকতে পারত এবং একজন স্কুল শিক্ষক হোস্টেল সুপারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গ্রন্থাগারও স্থাপিত হয় যেখানে ৬০০ গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। তাছাড়াও কলেজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি খেলার মাঠেরও ব্যবস্থা করা হয়।[১৮] এভাবে ব্রিটিশ যুগে ময়মনসিংহ শহরে সর্বপ্রথম একটি আধুনিক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।

তবে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ময়মনসিংহ সিটি কলেজের সার্বিক আয়োজনের পরিসর ততটা বৃহৎ ছিল না। অনেকটা ক্ষুদ্র ও সীমিত আকারেই কলেজটির আত্মপ্রকাশ করেছিল। এর পেছনে প্রধানত অর্থ সমস্যাই দায়ী ছিল। কারণ প্রথমে কলেজের নিজস্ব কোন তহবিল না থাকায় ছাত্রদের বেতনের উপরই এটি নির্ভরশীল ছিল। তবে কয়েক বছরের মধ্যে স্থানীয় জমিদার ও বিত্তশালীদের দ্বারা একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয় এবং কলেজের জন্য একটি ভবনও নির্মাণ করা হয়।[১৯] কিন্তু এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে সিটি কলেজ যখন তার প্রাথমিক সমস্যা উত্তরণ করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯০৪ সালে ব্রিটিশ সরকার 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯০৪' প্রবর্তন করলে প্রতিষ্ঠানটি নতুন সংকটের সম্মুখীন হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে একটি কলেজের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যক্রমের পরিসর ও শিক্ষামান বৃদ্ধি, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য গবেষণা চালুসহ নানারকম শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছিল।[২০] এর সকল শর্ত পূরণ করা ময়মনসিংহ সিটি কলেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে কলেজ পরিচালনায় যথেষ্ট ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, ভারতের উচ্চ শিক্ষার বিকাশে এ ধরনের সম্ভাব্য সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ঐ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু সরকার সেই বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়ান শিক্ষাবিদদের সমর্থনে ঐ আইন বাস্তবায়ন করেন।[২১] বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তনের পর সিটি কলেজ পরিচালনায় জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সরকার কলেজের জন্য প্রতিমাসে বিশ টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের কিছু নিয়মাবলী কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে অসম্মত হন।[২২] এ পরিস্থিতিতে ১৯০৬ সালে ময়মনসিংহ সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু হলে প্রতিষ্ঠানটি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। প্রথমত কলকাতা সিটি কলেজ কাউন্সিল অর্থনৈতিক সমস্যা এবং ১৯০৫ সালে ঐ কলেজ পরিচালনার সংবিধান পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহের সিটি কলেজকে কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বিযুক্তকরণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট দাবি পেশ করে। পাশাপাশি ১৯০৪ সালে প্রবর্তিত 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' অনুযায়ী একটি দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজের জন্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও শিক্ষামানের শর্তগুলো পূরণে অক্ষম হলে ১৯০৮ সালের ৩১ মার্চ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলকাতার সিটি কলেজ থেকে ময়মনসিংহ সিটি কলেজের সংযুক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।[২৩] ফলে কলেজের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

এ পরিস্থিতিতে ময়মনসিংহ সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী কলেজটির পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও উদ্যোমী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নতুন কমিটি গঠন করেন। প্রাথমিকভাবে এই কমিটি কলেজের পরিচালনা ও যাবতীয় খরচের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এর নাম পরিবর্তন করে ' ময়মনসিংহ কলেজ' হিসেবে নির্ধারণ করে। ময়মনসিংহ কলেজ কমিটির আবেদনের ফলে ১৯০৮ সালের ২৩ জুন পুনরায় এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।[২৪] প্রায় এই সময়ে উক্ত কমিটি সরকারের গ্রান্ট-ইন-এইড এর আওতায় অর্থ সাহায্য প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার রবার্ট নাথনের সাথে সাক্ষাৎ করে। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. ব্ল্যাক উড কমিটিকে সর্বাত্মক

সহযোগিতা প্রদান করেন। অতঃপর বিভাগীয় কমিশনার কলেজের যাবতীয় উন্নতির জন্য কমিটির দাবির সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং সরকারের নিকট থেকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। পাশাপশি নবগঠিত (১৯০৫) 'পূর্ববাংলা ও আসাম' সরকারের একটি প্রধান নীতি ছিল এতদঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়ন সাধন করা।[২৫] এ প্রেক্ষিতে সরকারের উদার নীতির ফলে কলেজের যাবতীয় উন্নতির জন্য ৮০,০০০ টাকা রাজকীয় বরাদ্দ দেয়া হয়। এর মধ্যে ২৫,০০০ টাকা শুধু কলেজের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ছিল। এর সাথে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন ভাতার জন্য Recurring grant হিসেবে প্রতি মাসে ৬০০ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে সরকারি সাহায্যের তুলনায় বেসরকারি অনুদান ছিল উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ জেলা গেজেটিয়ার্স (১৯১৭) থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কলেজের সার্বিক উন্নতির জন্য স্থানীয় কয়েকজন জমিদার ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগতভাবে ১,১৮,৩৯৫ টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করেন। এক্ষেত্রে রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (রামগোপালপুর), মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী (আলাপসিং পরগণা), রানী দিনামনি চৌধুরানী ও বাবু হেমচন্দ্র চৌধুরী বিশেষ অবদান রেখেছিলেন।[২৬] অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি ময়মনসিংহ কলেজের জন্য নতুন জমি অধিগ্রহণের প্রচেষ্টাও শুরু হয়। নতুন জমি না পাওয়া পর্যন্ত প্রাক্তন সিটি কলেজ ভবনেই মময়নসিংহ কলেজের কার্যক্রম চলতে থাকে। কলেজের নতুন স্থানের সন্ধানে প্রথমে কিষ্টপুর, মাসকান্দা, বড়বাজার এলাকায় চেষ্টা চালিয়েও জায়গা পাওয়া যায় নি। শহর ও শহরের উপকণ্ঠে জমিদারদের প্রচুর জায়গা থাকলেও প্রথমে কেউ কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিতে রাজি হন নি। তাঁরা এ সময়ে নগদ অর্থ বেশি প্রদান করে নিজ নিজ নামে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। এ অবস্থায় শেষ পর্যন্ত সে সময়কার একজন প্রভাবশালী উকিল ও আঞ্জুমানে ইসলামিয়ার সভাপতি মৌলবি হামিদ উদ্দীন আহমদ ময়মনসিংহ কলেজের জন্য জায়গা প্রদানের প্রস্তাব দেন। শহরের কাচিঝুলিতে তাঁর প্রচুর জমি ছিল। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কাচিঝুলিতে কলেজের জন্য স্থান নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেন। হামিদ উদ্দীনের পাশাপাশি তখন আরও কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি জমিদানের জন্য এগিয়ে আসেন। তাছাড়া, পরিকল্পিত নক্শা অনুসারে আরও দু' একজনের জমি এর আওতাভুক্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর মৌলবি হামিদ উদ্দীনসহ সকল জমিওয়ালা ক্ষতিপূরণ নিয়ে জমির দখলস্বত্ব কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট ত্যাগ করেন।[২৭] সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে কলেজের জন্য প্রদানকৃত ঐ জমির পরিমাণ ২৬ বিঘা ছিল বলে উল্লেখ করা হয়।[২৮] সমকালীন (১৯১৭) ভূমিসংক্রান্ত সরকারি রেকর্ড পত্রে হামিদ উদ্দীনসহ আরও কয়েকজন বিত্তশালী কর্তৃক জমি প্রদানের বিবরণ পাওয়া যায়। ভূমি রেকর্ডে রমজানী বেওয়া নামে জনৈক মুসলিম নারী জোতদার কর্তৃক জমি প্রদানের বিষয়টিও ছিল উল্লেখযোগ্য ।[২৯] এভাবে ময়মনসিংহ কলেজের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অতি অল্প সময়েই সম্পন্ন হয় এবং ১৯০৮ সালের শেষ দিকে কলেজের শিরোনাম পুনরায় পরিবর্তন করে সদ্য বিলুপ্ত সিটি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আনন্দমোহন বসুর নামানুসারে 'আনন্দমোহন কলেজ' রাখা হয়। অত:পর পরিবর্তিত নাম সংযুক্তির জন্য কলকতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আবেদন জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়:

The Registrar informed the Principal that the new college should, in all future official corrospondence, be properly designated by its correct name æThe Mymensingh College" since the government of India have accorded their sanction to the application for affiliation of the maymensingh under the name of æThe Anandamohan College, Mymensingh."[৩০]

কিন্তু আনন্দমোহন কলেজের নামকরণের ব্যাপারে প্রকৃত প্রস্তাবক কে ছিলেন সে ব্যাপারে দ্বিমত পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত সমকালীন *সৌরভ* (১৩২০ বাংলা) পত্রিকায় বলা হয় যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ও রাজা যোগেন্দ্র কিশোরের প্রস্তাবে এবং ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার রবার্ট নাথনের সম্মতিতে নতুন কলেজটি 'আনন্দমোহন কলেজ' নামে অভিহিত হয়।[৩১] অন্যদিক, ময়মনসিংহ ইতিহাস বিষয়ক গবেষক দরজি আব্দুল ওয়াহাব (জ. ১৯২৯) বলেন যে, মৌলবি হামিদ উদ্দীনই ছিলেন এ বিষয়ের প্রধান

প্রস্তাবক। তিনি তাঁর বন্ধুবর আনন্দমোহনের স্মৃতি রক্ষার্থে ঐ প্রস্তাব রেখেছিলেন এবং নিজের জমি প্রদানের ক্ষেত্রেও এটি মূল শর্ত হিসেবে প্রস্তাব করেছিলেন যা কলেজ কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন।[৩২]

তবে আনন্দমোহন কলেজ-এর নামকরণের প্রস্তাবক সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও এটি লক্ষণীয় যে, এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পেছনে হিন্দু শিক্ষাবিদ, জমিদার বা বিত্তশালীদের অবদানের পাশাপাশি মুসলিম শিক্ষাবিদ ও সমাজপতিদেরও ভূমিকা ছিল। এর ফলে ঐ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা ব্যতিক্রম পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা আমরা জানি ইতোমধ্যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের চরম অবনতি হয়েছিল। এমনকি ময়মনসিংহ জেলার কিছু অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠানেও যখন ঐসব ঘটনার কারণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বজায় ছিল।[৩৩] সে পরিস্থিতিতে আনন্দমোহন কলেজকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের একাংশ সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ময়মনসিংহ সিটি কলেজ বিলুপ্তির পর যখন এটি পুনর্জীবিত করার প্রচেষ্টা চলছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের এপ্রিলে ময়মনসিংহ শহরে 'পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রায় ৩০০০ লোকের সমাগম হয়েছিল যেখানে শিক্ষিত হিন্দুগণও যোগ দেন এবং সম্মেলন বাস্তাবায়নে সহযোগিতা করেন। স্থানীয় একজন বিখ্যাত জমিদার এবং ময়মনসিংহ কলেজ কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সূর্য্যকান্ত বাহাদুর তাঁর অতিথি ভবনে সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[৩৪] এভাবে ইতোমধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যে সংহতির সৃষ্টি হয়েছিল তার ইতিবাচক প্রভাব নিঃসন্দেহে আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠায়েও বিস্তার সাধন করেছিল।

আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠাকালীন বছরে নতুন স্থানান্তরিত জমিতে এর ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ১৯১২ সালের মধ্যেই তা সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি শিক্ষকদের আবাসনের জন্যও ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিশেষত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ইংরেজি শিক্ষকের জন্য পৃথক বাসভবন স্থাপন করা হয়। ছাত্রদের অধ্যয়ন মান বিকাশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয় যেখানে শুরুতে ১৭০০টি গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল। গ্রন্থাগারের উন্নয়নে ৫,০০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এছাড়াও ছাত্রদের জন্য একটি রসায়নাগার (Chemical laboratory) খোলা হয় যেখানে একই সঙ্গে ৫০ জন ছাত্রের গবেষণা করার ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রদের সাহিত্য এবং শরীর চর্চার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং ছাত্রদের শিক্ষা-সংস্কৃতির কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বার্ষিক বিবরণ সম্বলিত একটি সাময়িকীও প্রকাশ করা হয়।[৩৫]

১৯০৮ সালে আনন্দমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এর ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৭৮ জন এবং এ সময়ে মোট ৯ জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজে যোগদান করেন। এই নয়জন শিক্ষকের একজন ডক্টরেট (এডিনবার্গ) ও চারজন এম.এ. ডিগ্রিধারী ছিলেন। শুরুতে পঠিত বিষয়ের মধ্যে ছিল বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, উর্দু ও ফারসি। উর্দু ও ফারসির প্রচলন সমকালীন পশ্চাৎপদ মুসলিম ছাত্রদের মাঝে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার মুসলিম শিক্ষায় যে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল যার ফলে নব সরকার প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মুসলিম ক্লাসিক ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়াও মুসলিম সমাজের দাবি অনুযায়ী আনন্দমোহন কলেজে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের জন্য পৃথক ছাত্রাবাসও প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এটি সরকারি অনুদানের অন্যতম শর্ত হিসেবে যুক্ত ছিল।[৩৬] সরকার এজন্য ১২,০০০ টাকা অনুদান দিয়েছিলেন। পৃথক দু'টি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার শুরুতে ৩৩ জন হিন্দু-মুসলিম ছাত্রের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এভাবে কলেজের শিক্ষাকার্যক্রমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনুকূল পরিবেশ তৈরীর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সরকারি-বেসরকারি উপায়ে উপরোক্ত নানা ব্যবস্থা নেয়ার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই কলেজটির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয় এবং এর ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন, ১৯০৮ সাল থেকে পরবর্তী চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯১২ সালে ২৪২ জন ও ১৯১৫

সালে আনন্দমোহনের ছাত্রসংখ্যা ৫৩৭ জনে উন্নীত হয়। এর মধ্যে ৮৬ জন মুসলিম ও বাকিরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ঐ সময়ে সরকারের Recurring grant বার্ষিক ১০,৪৫০ টাকায় বৃদ্ধি পায় এবং কলেজের অন্যান্য ফি বাবদ বছরে ৩২,৩০৯ টাকা আয় হয়। এই অর্থের বেশিরভাগ শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বেতন বাবদ এবং ছাত্রদের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয়িত হয়। অন্যদিকে আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষাকার্যক্রমের নানা বিকাশের প্রেক্ষিতে ১৯১২ সাল থেকেই এটিকে প্রথম গ্রেডের কলেজে রূপান্তর করার দাবি ওঠে। ফলে ১৯১৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এটিকে প্রথম গ্রেডের কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৩৭]

১৯১৪ সালে আনন্দ মোহন কলেজ প্রথম গ্রেডের কলেজে উন্নীত হওয়ার পর এখানে বি.এ. ক্লাস চালু হয়। এ প্রেক্ষিতে বি.এ. শ্রেণীতে মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ও ফারসি কোর্স প্রবর্তিত হয়। সেই সাথে ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়কে বি. এ. পাস কোর্সে যুক্ত করা হয়। ১৯১৮ সালে ইংরেজি বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রচলন করা হয়। তাছাড়াও ইন্টারমিডিয়েট স্তরে গণিত ও রাসায়ন প্রচলনের মাধ্যমে আই.এস.সি. কোর্স খোলা হয়। এই সময়ে কলেজ ছাত্রদের মাসিক বেতন ছিল ৫.৮ টাকা। তবে যাদের রসায়ন ছিল তাদেরকে ৬.৮ টাকা মাসিক বেতন প্রদান করতে হত। কলেজের পাঠ্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি পেলে আরও নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। ফলে ১৯১৮-১৯ সালে তথা কলেজ প্রতিষ্ঠার ১০ বছরের মধ্যে শিক্ষকের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯ জনে দাঁড়ায়। তাছাড়াও দু'জন Demonstrator ও একজন গ্রন্থাগার সহকারী ছিলেন। সমকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার (১৯১৮-১৯১৯) থেকে জানা যায় যে, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র ফারসি শিক্ষকদের দু'জন ছিলেন মুসলিম।[৩৮] সুতরাং শিক্ষকতার পেশায় তৎকালীন মুসলিম সমাজ যে পশ্চাৎপদ ছিল তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার থেকে ঐ সময়ে আনন্দমোহন কলেজ পরিচালনা কমিটি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। কলেজ পরিচালনা কমিটির ৯ জন সদস্যদের মধ্যে দু'জন মুসলিম সমাজপতিও যুক্ত ছিলেন।[৩৯] অতএব আনন্দমোহন কলেজের উন্নয়নে সমাজের শিক্ষিত হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমগণও যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন এতে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

আনন্দমোহন কলেজে সহশিক্ষার প্রচলন ঠিক কখন শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে এটি প্রতীয়মান হয় যে, কলেজের যাত্রার শুরুতে কোন ছাত্রী ভর্তি হয় নি এবং ১৯১২ সাল পর্যন্ত সরকারের শিক্ষা বিবরণীগুলোতে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে কোন ছাত্রীর অধ্যয়ন করতে দেখা যায় না। অবশ্য মাধ্যমিক শিক্ষায় দেশের প্রধান দু'টি সম্প্রদায় তথা হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজের ছাত্রীদের অধ্যয়ন করতে দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে মুসলিম নারী সমাজের চেয়ে হিন্দু নারীগণ অগ্রসর ছিল। সরকারের শিক্ষা রিপোর্টে এজন্য সমাজের পর্দাপ্রথা, বাল্য বিবাহ ও নানাবিধ কুসংস্কারকে দায়ী করা হয়। তবে বঙ্গভঙ্গের পর সরকারের সহযোগিতা ও অন্যান্য উৎসাহের ফলে মুসলিম পরিবারগুলোও নারীশিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে। ময়মনসিংহ শহরে ইতোমধ্যে নারীশিক্ষার জন্য 'আলেকজান্ডার গার্লস স্কুল' নামে একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১২ সালে সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ঐ স্কুলে ১৭০ জন ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। স্কুলটিতে ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান, হিন্দু, মুসলিম তথা সব ধর্মের শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করত। তার মধ্যে পশ্চাৎপদ মুসলমান ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতি বিষয়ে ঐ রিপোর্টে প্রশংসা করা হয়। বঙ্গভঙ্গের পর স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সরকারি বেসরকারি সাহায্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেল স্থাপন করা হয়।[৪০] ফলে ময়মনসিংহের নারীদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ প্রেক্ষিতে নানা বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও সম্ভবত বিশের দশকে আনন্দমোহন কলেজে ছাত্রীদের ভর্তি হওয়া শুরু হয়। ১৯৩২-৩৩ সালের সরকারি শিক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ঐ সময়ে কলেজ ছাত্রীদের জন্য একটি কমনরুম স্থাপন করা হয় এবং তাদের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া

প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। তাছাড়াও ১৯৩২ সালে মফ:স্বলের ছাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। সুতরাং সহশিক্ষার বিকাশে ১৯৩২ সালটি আনন্দমোহন কলেজের জন্য ছিল একটি মাইলফলকস্বরূপ। এটিও লক্ষণীয় যে, ছাত্রীরা পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা বা শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও উৎসাহী ছিল। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষণকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে ছাত্রীদের পরিসংখ্যান পৃথকভাবে জানা না গেলেও তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।[৪১] ১৯৩৪ সালের সরকারি শিক্ষা রিপোর্টে আনন্দমোহন কলেজসহ অবিভক্ত বাংলার তিনটি কলেজে ছাত্রীদের অগ্রগতির প্রশংসা করে বলা হয় :

> There has been a notable increase in the number of women students, joining the Scottish Church College, Calcutta, the Brojomohan College, Barisal, and the Ananda Mohan College, Mymensingh.[৪২]

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা প্রদেশে তখন উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারি বেসরকারি মোট ৪৪টি কলেজের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল এবং এগুলোর মধ্যে দু'একটি ব্যতীত অন্য সবগুলোতে সহশিক্ষার জন্য উন্মুক্ত ব্যবস্থা ছিল।[৪৩] সুতরাং এক্ষেত্রে আনন্দমোহন কলেজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অন্যদিকে ১৯২৭-৩২ সালের মধ্যে আনন্দমোহন কলেজের আরও কিছু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানা যায়। এগুলোর মধ্যে ১৯২৭-২৮ সালে ছাত্রদের শরীরচর্চার ও খেলাধুলার অগ্রগতির জন্য ৬,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি জিমনেসিয়াম স্থাপন করা হয় এবং ১৯৩০ সালে একজন যোগ্য শরীরচর্চা প্রশিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়।[৪৪] ১৯৩২ সালে কলেজের ইন্টারমিডিয়েট স্তরের পাঠ্যক্রমে পৌরনীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ঐ বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একজন ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তকে কলেজের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।[৪৫] তাছাড়াও আমরা লক্ষ্য করেছি, কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়েও একজন ডক্টরেট ডিগ্রীধারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। সুতরাং, তৎকালীন সময়ে মোট দু'জন ডক্টরেট ডিগ্রিধারীর শিক্ষক হিসেবে যোগদান নিঃসন্দেহে আনন্দমোহন কলেজের সম্মান ও মর্যাদাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। ঐ সময়ে কলেজের গ্রাজুয়েট পরীক্ষার ফলাফলও ছিল সন্তোষজনক। যেমন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার থেকে জানা যায় যে, ১৯৩১ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে মোট ৫৪ জন ছাত্র-ছাত্রী বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার মধ্যে ১৩ জন ছিলেন মুসলিম, বাকিরা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।[৪৬] সুতরাং, উক্ত পরিসংখ্যানে আনন্দমোহন কলেজের আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় মুসলিম ছাত্রদের তুলনামূলক অগ্রসরতা সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়। পরবর্তী কয়েক বছরে কলেজের বি.এ. (পাস ও সম্মান) ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশের হার কেমন ছিল তা নিচের সারণিতে তা বুঝা যায়:

সারণি ১

আনন্দমোহন কলেজের ইন্টারমিডিয়েট এবং বি. এ. (পাস ও অনার্স) পরীক্ষার ফলাফল : ১৯৩২-১৯৩৭

সাল	উচ্চমাধ্যমিক কলা বিভাগ					
	মোট পরীক্ষার্থী	১ম বিভাগ	২য় বিভাগ	৩য় বিভাগ	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
১৯৩৩	১৫৪	২৪	৩৬	৪	৬৪	৪১.৫%
১৯৩৮	১৯৮	২৮	৪৮	২৪	১০০	৫১.০২%

	বি.এ. (পাস ও অনার্স)					
১৯৩৩	মোট পরীক্ষার্থী	সম্মান ১ম শ্রেণী	সম্মান ২য় শ্রেণী	পাস এবং ডিস্টিংশন	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
	১০৫	-	৪	৬২	৬৬	৬২.৯%
১৯৩৮	১৫৬	-	৭	৯৯	১০৬	৬৭.৯%

সূত্র: *Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal 1932-33,* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1935, p. 6,8. *Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal 1937-38,* Calcutta: Bengal Government Press, 1940, p. 6, 8.

উপরোক্ত তথ্যে আনন্দমোহন কলেজের ১৯৩৩ ও ১৯৩৮ সালের ইন্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল বিস্তারিত জানা যায়। সারণিতে লক্ষণীয় যে, ১৯৩৮ সালে উভয় পরীক্ষায় ছাত্র–ছাত্রীদের পাশের হার বিগত ৫ বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা ছিল খুবই সন্তোষজনক। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৩৮ সালের বি. এ. পরীক্ষার ফলাফলে পূর্ব বাংলার দশটি কলেজের মধ্যে আনন্দমোহন কলেজের স্থান ছিল দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে ছিল চট্টগ্রাম কলেজ যেখানে ঐ সময়ে বি. এ. পরীক্ষায় পাশের হার ৬৯.৫%।[৪৭] সুতরাং বলা যায় যে, দেশের আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আনন্দমোহন কলেজ স্বল্পকালীন সময়েই একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে তখনও পর্যন্ত আনন্দমোহনে বি. এস. সি. কোর্সের প্রবর্তন ছিল না। ১৯৩৯ সালে বি. এস. সি. ও ব্রিটিশ আমলের শেষ বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে কলেজের ইন্টারমিডিয়েট স্তরে কমার্স কোর্সের প্রচলন করা হয়।[৪৮] আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯৪৪ সালে বি. এস. সি. ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন প্রাক্তন ছাত্রের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, গ্রাজুয়েট কোর্সে বিজ্ঞান শাখা চালু হওয়ার পর প্রায় ৪৫ জন ছাত্র ভর্তি হয় এবং প্রথম ব্যাচের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অন্তত ৩৫ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। তিনি আরও বর্ণনা দেন যে, দ্বিতীয় ব্যাচের বি. এস. সি. কোর্সে ৪/৫ জন মুসলিম ছাত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে দু'জন কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এঁদের একজন করাচিতে একটি কলেজে রসায়ন বিদ্যার শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং অপর জন কাস্টমস অফিসার পদে নিয়োগ লাভ করেন। ঐ প্রাক্তন ছাত্র তাঁর স্মৃতিচারণে সমকালে আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনারত ৬ জন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে দুজন ছিলেন ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। উল্লেখিত ঐ শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন: ১. ড. হীরেন্দ্র পাল (পদার্থ বিদ্যা), ২. ড. ক্ষিতিশ ভট্টাচার্য্য (রসায়ন বিদ্যা), ৩. এস. রায় (বাংলা), ৪. মোক্ষদা চক্রবর্তী (বাংলা), ৫. পুলিন বিহারী (ইংরেজি), ৬. রবি গুহ (রসায়ন)। উপরোক্ত শিক্ষকদের মধ্যে রবি গুহ বিজ্ঞান গবেষণায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি খুব সস্তায় অক্সিজেন ও কসমেটিক্স দ্রব্য তৈরী করতে পারতেন এবং কুষ্ঠ রোগের ঔষধও আবিষ্কার করেছিলেন। তবে গবেষণা করতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় তাঁর শরীরের একাংশ ঝলসে গিয়েছিল। তাছাড়াও আনন্দমোহন কলেজে তৎকালীন সময়ে অধ্যয়নরত হান্নান (মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা) নামে জনৈক ছাত্র অগ্নি মিসাইল আবিষ্কার করে সুনাম অর্জন করেছিলেন।[৪৯] সুতরাং বলা যায়, আনন্দমোহন কলেজে ১৯০৮ সালে যে কেমিকেল ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছিল তারই ইতিবাচক ফলস্বরূপ ছাত্র শিক্ষকগণ বিজ্ঞান গবেষণায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। অন্যদিকে কলেজের শিক্ষা পাঠ্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পেলে ও সরকারি–বেসরকারি সহযোগিতার প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে:

সারণি ২

আনন্দমোহন কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান (১৯০৮-১৯৪২)

সাল	মোট ছাত্র-ছাত্রী
১৯০৮	১৭৬
১৯১২	২৪২
১৯১৫	৫৩৭

১৯৩৩	৮০৮
১৯৩৭	৯৭১
১৯৪২	১৩৬৪

সূত্রঃ *Report on Public Instruction in Bengal 1933-34,* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1935, p. 9. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to 1911-12,* Vol.I, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913, p.33. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917,* Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1918, p.41. *Ninth Quinqennial Review on the Progress of Education in Bengal 1932-33 to1936-37,* Calcutta: Bengal Government Press, 1939, p.63.*Tenth Quinqennial Review on the Progress of Education in Bengal 1937-38 to1941-42,* Calcutta: Bengal Government Press, 1944, p.53.

উপরোক্ত তথ্যে ঔপনিবেশিক আমল পর্যন্ত আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা একত্রে দেখানো হয়েছে। সরকারি বিবরণীগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর পরিসংখ্যান পৃথকভাবে জানা যায় না। তবে তৎকালীন একজন প্রাক্তন ছাত্রের দেয়া তথ্যানুযায়ী ঐ সময়ে কলেজে প্রায় ৫০ জন ছাত্রী অধ্যয়নরত ছিল।[৫০] তাছাড়াও উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে বাংলায় ১৯৪২ সালের পরে আর কোন সরকারি শিক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নি বিধায় পরবর্তী বছরগুলোতে কলেজের ছাত্র–ছাত্রীর তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সারণিতে লক্ষণীয়, কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বছরে প্রায় আটগুণ শিক্ষার্থী বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে সমগ্র বাংলা প্রদেশে সরকারি-বেসরকারি মোট ৬১ টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর দিক থেকে আনন্দমোহন কলেজ অষ্টম স্থানে অবস্থান করছিল। প্রথমে ছিল কলকাতার লর্ড রিপন কলেজ এবং এর মোট ছাত্র-ছাত্রী ছিল ৩২৭৫ জন। এটি ছিল একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ। তবে পূর্ববাংলায় কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া ও বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের পরেই ছিল ময়মনসিংহের আনন্দমোহনের স্থান। ঐ দু'টি কলেজের শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৭৩ ও ১৪০৮ জন।[৫১] উপরোক্ত সারণির পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য কোন সময়ে এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় নি। এর পেছনে প্রধানত তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকের অবদানকে উল্লেখ করা যায়। তাঁর সময়ের সরকারি শিক্ষা কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি ঐ সময়ে বাংলার শিক্ষা বিস্তারে প্রচুর অনুদান, বৃত্তি প্রদান, বিনা বেতন/ অর্ধ বেতনে পড়ার সুযোগ, ছাত্রাবাস নির্মাণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন সরকারি অনুদানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ১৯৩২-৩৩ সালে আনন্দমোহন কলেজে যেখানে অর্থ সাহায্য দেয়া হয় ৯১৮০ টাকা তা ১৯৩৭-৩৮ সালে ১২০৩০ টাকায় বৃদ্ধি পায়। এর পরবর্তী ৩/৪ বছরে এই অনুদানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে এ সময়ে আনন্দমোহন কলেজের পক্ষে সরকারি সাহায্য পৃথকভাবে জানা না গেলেও সমগ্র বাংলা প্রদেশের সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলোর জন্য অনুদানের পরিমাণ যে বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৬-৩৭ সালে বাংলার সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলোর জন্য ২,১৩,৮৪৯ টাকা অনুদান দেয়া হয়। ১৯৪১-৪২ সালে এই অনুদান বৃদ্ধি পেয়ে ৩,০৮,৪৩৪ টাকায় উন্নীত হয়। কিন্তু ১৯৩৬ সাল থেকে পূর্ববর্তী দশ বছরেও সরকারি অর্থ সাহায্য কোন প্রকার বৃদ্ধি পায়নি। শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯২৬ সালে বাংলা সরকার দেশের সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজগুলোর জন্য ২,৬২,৩৭৩ টাকা প্রদান করেছিলেন। অতএব লক্ষণীয়, বিগত এক দশকে সরকারি অনুদান স্থিতিশীলও ছিল না, বরং ৪৪,৫২৪ টাকা হ্রাস পেয়েছিল।[৫২]

আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণকে শিক্ষা ও গবেষণা চর্চার পাশাপাশি পাঠবর্হিভূত কার্যক্রম তথা খেলাক্ষুলা এবং বিভিন্ন সামাজিক–সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশ নিতে দেখা যায়। বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই অনুষ্ঠিত হত। খেলাধুলার ক্ষেত্রে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা ছিল ছাত্রদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে মতিউর

রহমান নামে জনৈক ছাত্র কলেজের ফুটবল দলের প্রধান ছিলেন। এ দল বিভিন্ন স্থানে প্রতিযোগিতায় অংশ নিত। অনেক প্রাক্তন ছাত্র কলকাতা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবেও যোগদান করেছিল। ময়মনসিংহ শহরে তখন ক্রিকেট লীগ ও নক আউট ট্রফি মহারাজা কাপ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। এসব প্রতিযোগিতায় স্থানীয় অন্যান্য ক্লাবগুলোর সাথে আনন্দমোহন কলেজ দলের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।[৫৩] তাছাড়াও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনেকেই কলেজ পরিদর্শন করতেন এবং কলেজের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সংবর্ধনা দেয়া হত। তেমনি ১৯২৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার আনন্দমোহন কলেজ পরিদর্শন করলে কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র প্রদান করা হয়।[৫৪] রবীন্দ্রনাথের আগমন ও তাঁর বক্তৃতা ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বেশ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। অন্যদিকে, সমসাময়িক রাজনৈতিক ও জাতীয় আন্দোলনগুলোতেও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল। বিভিন্ন হরতাল, ধর্মঘটের সময় কলেজ ফাঁকা থাকত। তবে কলেজের আন্দোলনে কোনরকম সহিংসতা পরিলক্ষিত হয় নি। যদিও ত্রিশের দশকে ব্রিটিশ বিরোধী আইন অমান্য আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ইত্যাদি ঘটনাগুলো দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু আনন্দমোহন কলেজের ক্ষেত্রে সেরূপ প্রভাব দেখা যায় নি। অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রদেরকে কোন প্রকার আন্দোলনে না জড়ানোর জন্য এক ধরনের চাপ অব্যাহত ছিল। সেজন্য বেসরকারি কলেজ হিসেবে সরকারি সাহায্য বন্ধ হওয়ার আশংকায় আনন্দমোহনে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তেমন জোরদার হয়নি যেমনটি ঐসব সরকারি কলেজগুলোতে হয়েছিল। তারপরেও কলেজ ছাত্রদের মাঝে জাতীয় কংগ্রেস সমর্থিত সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশন (AISF) এবং মুসলিম লীগ সমর্থিত সর্ববাংলা মুসলিম ছাত্র সমিতির (ABMSA) কিছুটা প্রভাব ছিল। কিন্তু আনন্দ মোহন কলেজের ছাত্রদেরকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সেরকম লেজুড়বৃত্তি করতে দেখা যায় নি।[৫৫] ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব বজায় ছিল এবং তারা একে অপরের সভা-সমাবেশে যোগদান করত। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে সর্ববাংলা মুসলিম ছাত্র সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সম্মেলনে আনন্দমোহন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কুমুদবন্ধু চক্রবর্তীসহ হিন্দু ছাত্রগণও যোগদান করেছিল।[৫৬] এ ধরনের হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ব্রিটিশ শাসনের পরও অব্যাহত ছিল। ঔপনিবেশিক উত্তর যুগে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালিদের সংস্কৃতি ও ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র এবং এতদঞ্চলের প্রতি প্রদর্শিত অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাতে আনন্দমোহন কলেজের ছাত্ররাও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অংশ নিয়েছিল। সর্বোপরি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ঐ কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। আনন্দমোহনের যেসব ছাত্র ঐসব আন্দোলনে যোগ দেন তাদের মধ্যে রফিকউদ্দীন ভূইয়া (পরবর্তীকালে কিশোরগঞ্জ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য) শামছুল হক (পরবর্তীকালে ময়মনসিংহের ফুলপুর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য) প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক কফিল উদ্দীন আতহারের তত্ত্বাবধানে শহরের ছাত্ররা হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[৫৭]

অন্যদিকে ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের পর বাংলা বিভক্তির প্রেক্ষিতে আনন্দমোহন কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সংযুক্ত হয় এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রযাত্রা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে।[৫৮] আনন্দমোহন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমানের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক যতীন সরকারের (জন্ম ১৯৩৬) প্রদানকৃত তথ্যানুযায়ী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক যুগ পর তথা ১৯৫৯ সালে ঐ কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৫০০। তার মধ্যে ছাত্রী ছিল আনুমানিক ৭০/৮০ জন।[৫৯] এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে কলেজে বি. কম. কোর্স এবং ১৯৬৩ সালে বাংলা ও ইতিহাসে বি.এ. সম্মান কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬৪ সালে আনন্দমোহন কলেজকে সম্পূর্ণ সরকারিকরণ করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার (১৯৭১) পর সরকার এ কলেজে বি. এ. সম্মান কোর্সের পরিধি বৃদ্ধিসহ পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স প্রচলন করার সিদ্ধান্ত নেন। সে প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এই কলেজের অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে

অনার্স কোর্স এবং প্রথমবারের মত বাংলা ও ইতিহাস বিভাগে এম. এ. পাঠ্যক্রম প্রচলন করেন। পাশাপাশি ১৯৭২–৭৩ সালে সরকার কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৭,০৮,৯১.৩৯ টাকা অনুদান প্রদান করেন। জেলা গেজেটিয়ার্স (১৯৭৮) থেকে জানা যায় ১৯৭৩ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত কলেজের মোট শিক্ষার্থী ছিল ১১২৯ জন। তার মধ্যে ১৪৪ জন ছিল ছাত্রী। বি. এ. সম্মান কোর্সে ৬৫ জন ছাত্রীসহ মোট ৩৩০ জন শিক্ষার্থী ছিল এবং এম. এ. ক্লাসে ৫৭ জন ছাত্রীসহ ১৩৫ জন শিক্ষার্থী ছিল। ছাত্র–ছাত্রীদের আবাসিক সুবিধার জন্য তিনটি হোস্টেল বিদ্যমান ছিল যেখানে ২৬১ জন শিক্ষার্থী থাকার ব্যবস্থা ছিল। কলেজ গ্রন্থাগারে ২১ হাজার ২৮৬টি গ্রন্থ সংরক্ষিত ছিল।[৬০]

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনায় আনন্দমোহন কলেজের সার্বিক তথ্য জানা যায়। এখানে আমরা ছাত্রীদের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করছি। তবে একটি বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে যে, আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম অন্যান্য দিক থেকে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা তেমন বৃদ্ধি পায় নি। বরং এর ৩০ বছর পূর্বে ১৯৪২ সালে যেখানে ১৩৬৪ জন ছাত্র–ছাত্রী ছিল এবং ১৯৫৯ সালে প্রায় ১৫০০, কিন্তু ১৯৭৩ সালে তা ১১২৯ জনে হ্রাস পেয়েছে। এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে শুধু আনন্দমোহন কলেজের ক্ষেত্রে নয়, বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার জন্যও হতাশাজনক ছিল। কিন্তু কেন ছাত্র–ছাত্রীদের সংখ্যা এত নিম্নে চলে এসেছিল তার কোন কারণ জেলা গেজেটিয়ার্স বা অন্য কোন সরকারি বিবরণীতে জানা যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, জেলা গেজেটিয়ার্স আনন্দমোহন কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপালের সূত্রের ভিত্তিতে ঐ পরিসংখ্যানের বিবরণ দিলেও শিক্ষার্থী হ্রাস পাওয়ার কোন ব্যাখ্যা তুলে ধরে নি। তবে আমাদের মনে হয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের পরিবর্তিত আর্থ–সামাজিক অবস্থার কারণে কলেজের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। অবশ্য কয়েক বছর পরেই কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। নীচের সারণিতে তা পরিলক্ষিত হয়:

সারণি ৩

আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা:১৯৭৭-৭৮ থেকে ১৯৮২-৮৩

সাল	ছাত্র	ছাত্রী	মোট শিক্ষার্থী
১৯৭৭-৭৮	১৯৫২	৩১৮	২২৭০
১৯৭৯-৮০	১৯৫৩	৩১৭	২২৭০
১৯৮২-৮৩	১৯৭৪	৪২৬	২৪০০

সূত্র : *Bangladesh Education in Statistics*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, 1985, p.58.

উক্ত সারণিতে দেখা যায়, দেশ স্বাধীনের পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যেই আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্য দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধোত্তরকালে দেশে উচ্চ শিক্ষার যে ক্ষতি হয়েছিল আনন্দমোহন কলেজ অতি অল্প সময়েই তা পূরণে সক্ষম হয়েছে। বিশেষত উপরোক্ত পরিসংখ্যানে ছাত্রী সংখ্যার উন্নতি ছিল খুবই সন্তোষজনক। এই সময়ে কলেজের বি. এ. পরীক্ষার ফলাফল ছিল চমৎকার। ১৯৮১-৮২ সালে বি. এ. (সম্মান ও পাস) কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষায় মোট ১৯৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬১ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। পাশাপাশি ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় এই সময়ে ২৫৮ জনের মধ্যে ১৩৯ জন ছাত্র পাশ করেছিল। বি. এ. ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার এই পাশের হার ছিল যথাক্রমে ৮৩.৪২% ও ৫৩.৮৮%।[৬১]

বর্তমানে আনন্দমোহন কলেজের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রমের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ১৯৯২ সালে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। কলেজটিতে এখন ১৮টি বিষয়ে বি. এ. সম্মান ও এম. এ. পাঠ্যক্রম চালু আছে। বিষয়গুলো হচ্ছে বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, সমাজবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূগোল, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা। আনন্দমোহন কলেজ ক্যাম্পাসের আয়তনও বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.২৮ একরে পরিণত হয়েছে।[৬২] উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পর্যায়ক্রমে কলেজটির জন্য নির্মিত হয়েছে কয়েকটি নতুন ভবন, অধ্যক্ষ ভবন, শিক্ষকদের আবাস ভবন, অতিথি

ভবন, শহীদ মিনার, ছাত্র-ছাত্রীর পৃথক মিলনায়তন, পোস্ট অফিস, একটি বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন, টেলিফোন বুথ, মসজিদ, খেলার মাঠ ও পুকুর। পাঁচটি ছাত্রাবাসের মধ্যে চারটি ছাত্রদের ও ছাত্রীদের জন্য রয়েছে একটি। শিক্ষার্থীদের জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেন ও বিভাগীয় গবেষণাগারও স্থাপন করা হয়েছে। পরিবহন সুবিধার ক্ষেত্রে ছাত্রদের একটি বাস ও শিক্ষকদের যাতায়াতের জন্য একটি মাইক্রোবাস রয়েছে। দারিদ্র্য ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আছে একটি কল্যাণ তহবিল। কমিশনপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পরিচালনায় বি.এন.সি.সি. ইউনিট, রোভার স্কাউট এবং সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার শেখার সুযোগ রয়েছে। কলেজে অনুমোদিত শিক্ষক পদের সংখ্যা ২০১ এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২২০০০।[৬৩]

পরিশেষে বলা যায়, বিশ শতকের সূচনায় পূর্ববাংলার জনমানসে আধুনিক শিক্ষার প্রতি যে সচেতনতা ও জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল তারই অনিবার্য ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ। সাধারণভাবে কলেজটির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯০৮ সালে বিবেচনা করা হলেও আমরা লক্ষ্য করেছি, এর মূল উদ্ভব হয়েছিল ১৯০১ সালে 'ময়মনসিংহ সিটি কলেজ' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। আর এক্ষেত্রে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন উপমহাদেশের প্রথম র‍্যাংলার, শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক আনন্দমোহন বসু। যদিও ১৯০৮ সালে সিটি কলেজের বিলুপ্তি ঘটে, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির পুনর্গঠনের ফলেই প্রথমে 'ময়মনসিংহ কলেজ' ও পরে 'আনন্দ মোহন কলেজ' এর উৎপত্তি ঘটে এবং ময়মনসিংহ কলেজের কার্যক্রম প্রথমে সিটি কলেজের প্রাক্তন ভবনটিতেই শুরু হয়েছিল। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে আনন্দমোহন বসুকেই 'আনন্দমোহন কলেজ' এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তবে কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে অন্যান্য হিন্দু জমিদারদের অবদানের পাশাপশি মৌলবি হামিদ উদ্দীনের অবদানকেও অস্বীকার করা যায় না। তিনি কলেজ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে মোট ২৬ বিঘা জমির মধ্যে কতটুকু জায়গা দান করেছিলেন তা তথ্য-সূত্রের অভাবে বিস্তারিত জানা যায় না। কিন্তু সমকালীন সি. এস. রেকর্ড ও অন্যান্য তথ্য এবং জনশ্রুতি অনুসারে তাঁরই দেয়া বৃহৎ অংশ জমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় এটা মোটামুটি নিশ্চিত। আনন্দমোহন কলেজের পাশে অবস্থিত 'হামিদ উদ্দিন রোড' আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। অন্যদিকে হামিদ উদ্দীনের সাথে কলেজের জন্য জমি প্রদানের ক্ষেত্রে ময়মনসিংহের মুসলিম মহিলা জোতদার রমজানী বেওয়ার নামও স্মরণীয়। রমজানী বেওয়ার জমিদানের ফলে বলা যায় যে, ১৯০৮ সালে আনন্দমোহন কলেজটি প্রতিষ্ঠার জন্য ধনাঢ্য মুসলিম নারীগণও উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়াও অন্যদিকে আমরা আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে, ১৯০৮ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সাফল্যে হিন্দু জমিদারগণও সহযোগিতা করেছেন। সুতরাং এটি প্রতীয়মান হয় যে, সমাজে শিক্ষার বিকাশে ময়মনসিংহের শিক্ষিত ও বিত্তশালী হিন্দু-মুসলিমদের একটি অংশ খুবই সচেতন ও উদার ছিলেন। এক্ষেত্রে ১৯০৮ সালটি ছিল ময়মনসিংহবাসীর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত আনন্দমোহন কলেজ বাংলার সর্ববৃহৎ জেলা ময়মনসিংহবাসীদের উচ্চ শিক্ষার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যদিও ১৯০০ সালে টাঙ্গাইলে প্রমথ মন্মথ কলেজ স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু ১৯১০ সালে সরকার এটিকে বিলুপ্ত করে ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সাথে একত্রিত করেন।[৬৪] ফলে ঔপনিবেশিক যুগে আনন্দমোহন কলেজই বৃহত্তর ময়মনসিংহ অধিবাসীদের জন্য একমাত্র উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার আনন্দমোহন কলেজের অগ্রযাত্রায় বেসরকারি উদ্যোগকে নানাভাবে সহযোগিতা দিলেও প্রতিষ্ঠানটিকে সম্পূর্ণ সরকারিকরণ করেন নি। ফলে ইংরেজ আমলে কলেজটি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের কাজ অব্যাহত রেখেছিল। যদিও সরকার এদেশের আধুনিক শিক্ষার বিকাশে উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রথমে নজর দিয়ে ছিলেন তবুও আনন্দমোহন কলেজের ন্যায় একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সে অনুযায়ী অর্থ অনুদান পায় নি। শুধু ১৯৩৭-১৯৪২ সাল পর্যন্ত এ.কে. ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থ অনুদান তুলনামূলকভাবে বর্ধিত করা হয়েছিল যা আলোচনায় লক্ষ্য করা গিয়েছে। পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য পেলে আনন্দমোহন কলেজ হয়ত দেশের উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতিতে আরও যথার্থ অবদান রাখতে সক্ষম হত।

নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ আজ বাংলাদেশের শিক্ষা

আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতীক। যে লক্ষ্য নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল কলেজ প্রতিষ্ঠানটি তা পূরণে সক্ষম হয়েছে বলা যায়। বর্তমান পর্যন্ত বহুকৃতি অধ্যাপক ও পণ্ডিতের অবদানের ফলে কলেজটি সমৃদ্ধি পেয়েছে।[৬৫] কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ৩৫ জন অধ্যক্ষ ও ১১ জন উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন যাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে নানা ভূমিকা পালন করছেন।[৬৬] অন্যদিকে, কলেজের অনেক ছাত্র–ছাত্রী দেশ–বিদেশের নানক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ প্রতিভা ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। [৬৭] সাম্প্রতিক সময়ে আনন্দমোহন কলেজেকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়করণের দাবি উত্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে এর একশত বছর পূর্তি উপলক্ষে ঐ আবেদন আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহবাসী আশা করছে, সরকার বাংলাদেশের আধুনিক উচ্চ শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তাঁদের দাবি পূরণে সচেষ্ট হবেন।

তথ্য নির্দেশিকা ও টীকা

১. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1978, p.34.

২. *Census of India 1901, Vol. VIA, The Lower Provinces of Bengal and their feudatories*, Part-II, The Imperial Tables, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902, p. 41.

৩. সজল কান্তি দত্ত রায় (সম্পাদক), *ময়মনসিংহের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: ময়মনসিংহ সম্মিলনী, ২০০১, পৃ.১২১।

৪. উদ্ধৃত, মোঃ আব্দুল করিম, *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ১৬৪। আরও দ্রষ্টব্য, মেহাম্মদ আব্দুশ শাকুর, 'ময়মনসিংহের শিক্ষা ব্যবস্থা', *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা*, ময়মনসিংহ: জেলা প্রশাসন, ১৯৮৭, পৃ. ১-১৩। Sontosh Kumar Das, *The Educational System of the Ancient Hindus*, Calcutta: Mitra Press, 1930, p.1.

৫. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917*, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, p. 137. কেদারনাথ মজুমদার, *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, ময়মনসিংহ প্রেস, ১৯১৭, পৃ. ৮৮-৮৯।*Report on the Toles of Bengal, Bihar and Orissa*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1892, p. 11ff.

৬. Rev. J. Long (ed.), *Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar, Submitted to Government in 1835, 1836 and 1838 with a brief view of its present Condition* , Calcutta: Home Secretariat Press,1868, p.60.

৭. *Adam's Reports*, p. 60. ময়মনসিংহের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আরও জানা যায়, *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1978*, p. 18-20. আহমদ সাইফ, 'ময়মনসিংহের পানি সম্পদ', *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা*, পৃ. ২৮-১১। কেদারনাথ মজুমদার, *ময়মনসিংহের বিবরণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৭, পৃ. ৬০।

৮. যেমন ১৯০১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সমগ্র জেলায় সরকার স্বীকৃত ২১২৯ টি স্কুলের ৫৯৬২৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। তার মধ্যে ১৬টি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৭৯৭ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1978*, p. 139.

৯. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1901-02-1906-07*, Vol. I, Shillong: Eastern Bengal and Assam Secretariat Printing Office, 1907, p. 35. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917*, p.140.

১০. ১৮৪৭ সালে তিনি তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমার জয়সিদ্ধি গ্রামের এক ভূস্বামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা, সমাজ সংস্কারক ও রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের (১৮২৮) পথ প্রদর্শক। ১৮৬২ সালে আনন্দমোহন ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এফ. এ., বি. এ. ও গণিতশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রি (১৮৬৮) লাভ করেন এবং প্রথম ভারতীয় র‍্যাঙলার হন। ১৮৭০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি' লাভ করে ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে উচ্চতর গণিত বিষয়ে পড়াশুনা করেন। তাছাড়াও বার. এট. ল. ডিগ্রিও সম্পন্ন করেন। ইংল্যান্ড যাওয়ার পূর্বেই তিনি সস্ত্রীক ব্রাহ্ম ধর্মমত গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি 'ক্যালকাটা স্টুডেন্টস' এসোসিয়েশন এর সভাপতি হন। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং ১৮৯৮ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সমাজের শিক্ষা বিস্তারে বসু কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৮৭৬ সালে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়', ১৮৭৯ সালে 'সিটি স্কুল', কলকাতা (পরে ১৮৮১ সালে সিটি কলেজ) ও ১৮৮৩ সালে 'সিটি স্কুল' (ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আনন্দমোহন এদেশের শিক্ষা বিস্তারে নানা অবদান রাখতে সক্ষম হন। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সরকারের গঠিত প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক উৎসাহী এই মনীষী ১৯০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক) *বাংলাপিডিয়া :*

বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, খণ্ড ১, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ.১৭০।

১১. 'আনন্দমোহন কলেজ', *সৌরভ*, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২০, পৃ.৩৯৭।

১২. Hossainur Rahman, *Hindu-Muslim Relation in Bengal (1905-1947)*, Bombay: Nachiketa Publications Limited, 1974, p.117-18. আরও দ্রষ্টব্য, *Revision of the List of Associations recognized by Government (Corrected up to 1st April 1923)*Government of Bengal, Political Department,1923. তাছাড়াও হামিদ উদ্দীন ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট ও প্রথম মুসলিম উকিল। প্রথম জীবনে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের পর ১৮৬৪ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রি ও পরে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। হামিদ উদ্দীন আঞ্জুমানে ইসলামিয়া ব্যতীত ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ময়মনসিংহ সভা' স্থাপনেও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সামাজিক সংস্থাটিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জড়িত ছিল। আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও এর নামকরণের ক্ষেত্রে হামিদ উদ্দীনের উলেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তা আমরা প্রবন্ধের সংশিষ্ট অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করব। *ময়মনসিংহের চরিতাবিধান*, ময়ময়নসিংহ: দরজি আব্দুল ওয়াহাব, ১৯৮৯, পৃ. ৫৪১-৫৪৩। *বাংলা একাডেমী চরিতবিধান*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ.৪৩৪।

১৩. *ময়মনসিংহের চরিতাবিধান*, পৃ. ৫৪১-৫৪৩। *বাংলা একাডেমী চরিতবিধান*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ.৪৩৪।

১৪. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh*, Dacca: Bangladesh Government Press, 1978, p.34.

১৫. *Census of India 1901, Vol. VIA, The Lower Provinces of Bengal and their feudatories*, Part-II, The Imperial Tables, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1902, p. 41.

১৬. সজল কান্তি দত্ত রায় (সম্পাদক), *ময়মনসিংহের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা: ময়মনসিংহ সম্মিলনী, ২০০১, পৃ.১২১।

১৭. উদ্ধৃত, মোঃ আব্দুল করিম, *ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২, পৃ. ১৬৪। আরও দ্রষ্টব্য, মেহাম্মদ আব্দুশ শাকুর, 'ময়মনসিংহের শিক্ষা ব্যবস্থা', *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা*, ময়মনসিংহ: জেলা প্রশাসন, ১৯৮৭, পৃ. ১-১৩। Sontosh Kumar Das, *The Educational System of the Ancient Hindus*, Calcutta: Mitra Press, 1930, p.1.

১৮. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917*, Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, p. 137. কেদারনাথ মজুমদার, *ময়মনসিংহের ইতিহাস*, ময়মনসিংহ প্রেস, ১৯১৭, পৃ. ৮৮-৮৯।*Report on the Toles of Bengal, Bihar and Orissa*, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1892, p. 11ff.

১৯. Rev. J. Long (ed.), *Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Behar, Submitted to Government in 1835, 1836 and 1838 with a brief view of its present Condition* , Calcutta: Home Secretariat Press,1868, p.60.

২০. *Adam's Reports*, p. 60. ময়মনসিংহের নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে আরও জানা যায়, *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1978*, p. 18-20. আহমদ সাইফ, 'ময়মনসিংহের পানি সম্পদ', *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা*, পৃ. ২৮-১১। কেদারনাথ মজুমদার, *ময়মনসিংহের বিবরণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: কুন্তলীন প্রেস, ১৯০৭, পৃ. ৬০।

২১. যেমন ১৯০১ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সমগ্র জেলায় সরকার স্বীকৃত ২১২৯ টি স্কুলের ৫৯৬২৮ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। তার মধ্যে ১৬টি ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪৭৯৭ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত ছিল। *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1978*, p. 139.

২২. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1901-02-1906-07*, Vol. I, Shillong: Eastern Bengal and Assam Secretariat Printing Office, 1907, p. 35. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917*, p.140.

২৩. ১৮৪৭ সালে তিনি তৎকালীন কিশোরগঞ্জ মহকুমার জয়সিদ্ধি গ্রামের এক ভূস্বামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা, সমাজ সংস্কারক ও রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের (১৮২৮) পথ প্রদর্শক। ১৮৬২ সালে আনন্দমোহন ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে মেধা তালিকায় নবম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এফ. এ., বি. এ. ও গণিতশাস্ত্রে এম. এ. ডিগ্রি (১৮৬৮) লাভ করেন এবং প্রথম ভারতীয় র‍্যাঙলার হন। ১৮৭০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি' লাভ করে ক্যামব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে উচ্চতর গণিত বিষয়ে পড়াশুনা করেন। তাছাড়াও বার. এট. ল. ডিগ্রিও সম্পন্ন করেন। ইংল্যান্ড যাওয়ার পূর্বেই তিনি সস্ত্রীক ব্রাহ্ম ধর্মমত গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে তিনি 'ক্যালকাটা স্টুডেন্টস' এসোসিয়েশন এর সভাপতি হন। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি এবং ১৮৯৮ সালের মাদ্রাজ অধিবেশনে বসু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সমাজের শিক্ষা বিস্তারে বসু কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। ১৮৭৬ সালে 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়', ১৮৭৯ সালে 'সিটি স্কুল', কলকাতা (পরে ১৮৮১ সালে সিটি কলেজ) ও ১৮৮৩ সালে 'সিটি স্কুল' (ময়মনসিংহ ব্রাঞ্চ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আনন্দমোহন এদেশের শিক্ষা বিস্তারে নানা অবদান রাখতে সক্ষম হন। ১৮৮২ সালে ব্রিটিশ সরকারের গঠিত প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যাপক উৎসাহী এই মনীষী ১৯০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক) *বাংলাপিডিয়া : বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ*, খণ্ড ১, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪, পৃ.১৭০।

২৪. 'আনন্দমোহন কলেজ', *সৌরভ*, ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩২০, পৃ.৩৯৭।

২৫. Hossainur Rahman, *Hindu-Muslim Relation in Bengal (1905-1947)*,Bombay: Nachiketa Publications Limited,1974,p.117-18. আরও দ্রষ্টব্য, *Revision of the List of Associations recognized by Government (Corrected up to 1st April 1923)*Government of Bengal, Political Department,1923. তাছাড়াও হামিদ উদ্দীন ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট ও প্রথম মুসলিম উকিল। প্রথম জীবনে ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের পর ১৮৬৪ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রি ও পরে বি.এল. ডিগ্রি লাভ করেন। হামিদ উদ্দীন আঞ্জুমানে ইসলামিয়া ব্যতীত ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ময়মনসিংহ সভা' স্থাপনেও অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সামাজিক সংস্থাটিতে হিন্দু–মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা জড়িত ছিল। আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও এর নামকরণের ক্ষেত্রে হামিদ উদ্দীনের উলেখযোগ্য ভূমিকা ছিল তা আমরা প্রবন্ধের সংশিষ্ট অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করব। *ময়মনসিংহের চরিতাবিধান*, ময়ময়নসিংহ: দরজি আব্দুল ওয়াহাব, ১৯৮৯, পৃ. ৫৪১-৫৪৩। *বাংলা একাডেমী চরিতবিধান*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ.৪৩৪।

২৬. *ময়মনসিংহের চরিতাবিধান*, পৃ. ৫৪১-৫৪৩। *বাংলা একাডেমী চরিতবিধান*, পরিবর্ধিত সংস্করণ, পৃ.৪৩৪।

২৭. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to 1911-12,* Vol. I, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1913, p.32.

১৫. *University of Calcutta: The Calendar, 1918& 1919,* Part I, The University of Calcutta, 1919, p.375, 377, 411.

১৬. *Ibid. Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917*, p.140.

১৭. অন্যান্য সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন:

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস -	উকিল জজকোর্ট
২. অক্ষয় কুমার মজুমদার এম.এ.বি.এল.	ঐ
৩. শ্রীনাথ রায় বি.এল.	ম্যানেজার, এস.কে.আচার্য্য এষ্টেট
৪. কৈলাসচন্দ্র নিয়োগী	চিফ অফিসার, ঐ
৫.অমর চন্দ্র দত্ত	শিক্ষক, কলেজিয়েট স্কুল
৬. বৈকুণ্ঠকিশোর চক্রবর্ত্তী	অধ্যক্ষ, সিটি কলেজ, ময়মনসিংহ
৭. শ্রীনাথ চন্দ	প্রাক্তন হেড পণ্ডিত, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল
৮. শ্যামাচরণ রায়	উকিল. জজকোর্ট ও চেয়ারম্যান,ময়মনসিংহ পৌরসভা

৯. গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি.এ. প্রধান শিক্ষক, কলেজিয়েট স্কুল
১০. সজল কান্তি দত্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.১২১।

১৮. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1901-02--1906-07,* Vol. I, p. 35.

১৯. 'আনন্দমোহন কলেজ', *সৌরভ*, ১৩২০, পৃ.৩৯৭।

২০. ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, 'Indian Universities Act, 1904,' *A Collection of the Acts Passed by Governor General of Indian in Council,* Calcutta, 1904. *Rules and Orders of the Education Department,* Fourth Edition, Calcutta, 1908, p.60-70.

২১. *Report on Public Instruction in Bengal,1903-04*, Calcutta: Bengal Secretariat Press,1904,p.11-12. *Progress of Education in Bengal ,1902-03Í1906-07,Third Quinquennial Review*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot,1908, p.13-18.

২২. 'আনন্দমোহন কলেজ', *সৌরভ*, ১৩২০, পৃ.৩৯৭।

২৩. *ঐ*, পৃ. ৩৯৮। *University of Calcutta: The Calendar, 1918& 1919,* Part I, p.377, 411. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to1911-12,* Vol. I, p.32. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917*, p.140.

২৪. *University of Calcutta: The Calendar, 1918& 1919,* Part I, p.411.

২৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, M.K.U. Molla, *The New Province of Eastern Bengal and Assam*, University of Rajshahi: IBS, 1981.

২৬. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917*, p.140-141. আরও দ্রষ্টব্য, *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to1911-12,* Vol. I, p. 32-33. 'আনন্দমোহন কলেজ', *সৌরভ*, ১৩২০, পৃ.৩৯৭।

২৭. দরজি আব্দুল ওয়াহাব, *ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহাসিক নিদর্শন*, ময়মনসিংহ: লেখক, ২০০৩, পৃ. ৩৮। দরজি আব্দুল ওয়াহাবের জন্ম ১৯২৯ সালে ময়মনসিংহের ফুলপুরে। ১৯৪৫ সালে পূর্বধলা হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন এবং ১৯৪৯ সালে তিনি আনন্দমোহন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। পরে তিনি নাসিরাবাদ কলেজ (ময়মনসিংহ) থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। আব্দুল ওয়াহাব পেশায় সরকারের কালেক্টর বিভাগের কর্মকর্তা হলেও লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপর বেশ ক'টি গ্রন্থের প্রণেতা তিনি। তিনি হামিদ উদ্দীনের কয়েকজন গ্রাজুয়েট সহযোগীর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য সূত্রের ভিত্তিতে তাঁর গ্রন্থে ঐ বিবরণ তুলে ধরেন। তাছাড়াও বর্তমান প্রবন্ধকারের সাথে সাক্ষাৎকারে আব্দুল ওয়াহাব একই বিষয়ের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করেন। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ০৬-১০-২০০৮।

২৮. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to 1911-12,* Vol. I, p. 32-33.

২৯. ১৯১৭ সালের ভূমি সংক্রান্ত সি. এস. খতিয়ান থেকে আনন্দমোহন কলেজের ১৩.৯০ বিঘা জমির মূল মালিকানা স্বত্ত্বের নাম জানা যায়। এতে দেখা যায় যে, ৪.৭৯ বিঘা জমি মৌলবি হামিদ উদ্দীন আহমদের নামে, ৫.৪৩ বিঘা রমজানী বেওয়ার নামে, ১.৭৮ বিঘা আনন্দময়ী দেব্যার নামে ও ১.৯ বিঘা জমি রাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের নামে স্বত্ত্ব ছিল। এই তথ্যটি সেটেল্টমেন্ট রেকর্ড রুমে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ময়মনসিংহ সংরক্ষিত আছে। এ তথ্য উদঘাটনে সহযোগিতার জন্য প্রবন্ধকার ২০০৮ সালে দায়িত্বপ্রাপ্ত ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক জনাব [illegible]য়াউর রহমান খান ও রেকর্ড কিপার জয়নাল আবেদীনের নিকট কৃতজ্ঞ।

৩০. *University of Calcutta: The Calendar, 1918 & 1919,* Part I, p.411.

৩১. 'আনন্দমোহন কলেজ', *সৌরভ*, ১৩২০, পৃ.৩৯৯।

৩২. দরজি আব্দুল ওয়াহাব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯। আরও দেখুন, *ময়মনসিংহের চরিতাবিধান*, পৃ. ৫৪২-৫৪৩।

৩৩. ময়মনসিংহে জন্ম গ্রহণকারী বাংলার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও লেখক আবুল মনসুর আহমদ(১৮৯৭-১৯৭৯) তাঁর আত্মজীবনীতে উলেখ করেন যে, ১৯১৩ সালে তিনি শহরের মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে পড়ার সময়ে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের মাঝে পারস্পরিক ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব লক্ষ্য করেন। এজন্য তারা স্কুলে পৃথক বেঞ্চ ব্যবহার করত। আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৮, পৃ. ১০৮-১১০। ময়মনসিংহ শহরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব খুবই তীব্র ছিল। যার ফলে প্রতিষ্ঠিত স্বদেশী বাজার এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এ আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিলনা বললেই চলে। বরং এ সময়ে টাঙ্গাইল মহকুমার মুসলিম নেতা ইব্রাহিম খান(১৮৯৪-১৯৮৭) স্বদেশী আন্দোলনের বিপরীতে স্বজাতি আন্দোলনের ডাক দেন। নজরুল ইসলাম, *বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, কলিকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৪০১ বাং, পৃ. ২১৩। সমকালে ময়মনসিংহের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য, আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৪, পৃ. ২৬। আহমদ তৌফিক চৌধুরী, *শহর ময়মনসিংহ*, ময়মনসিংহ: কাসরেসলীব পাবলিকেশন, ১৯৮৭ পৃ.২১-২২।

৩৪. *Report of the Second Session of the Provincial Muhammadan Educational Conference,* Held at Mymensingh on the 18th and 19th April, 1908, Calcutta, p.47.

৩৫. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to 1911-12,* Vol. I, p. 32-33.

৩৬. *Ibid.* M.K.U. Molla, *op.cit.*,p.176.

৩৭. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to1911-12,* Vol. I, p. 33. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917,* p.141. 'আনন্দমোহন কলেজ', *সৌরভ*, ১৩২০, পৃ.৩৯৯।

৩৮. *University of Calcutta: The Calendar, 1918 & 1919,* Part I, p.411-412. আরও দেখুন,পরিশিষ্ট -ক ।

৩৯. *Ibid.* দেখুন , পরিশিষ্ট -ঘ।

৪০. *Report on the Progress of Education in Eastern Bengal and Assam 1907-08 to1911-12,* Vol. I, p. 92,95.

৪১. *Report on Public Instruction in Bengal,1932-33*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1934, p.12.

৪২. *Report on Public Instruction in Bengal,1934-35*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1936, p.14.

৪৩. *Ibid.*

৪৪. *Ibid.*, p.14. *Report on Public Instruction in Bengal,1927-28*, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1929, p.14.

৪৫. *Report on Public Instruction in Bengal,1932-33*, p.14.

৪৬. মুসলমান গ্রাজুয়েটদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন :

১. মুজিবুর রহমান খান,
২. মো: আব্দুল ওয়াহেদ,
৩. সৈয়দ মাহবুবল হোসাইন,
৪. মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ,
৫. মোহাম্মদ আব্দুল বারী,
৬. মো. আব্দুল জলিল,
৭. মোহাম্মদ জাবেদ আলী,
৮. মোবারক হোসাইন,
৯. মোহাম্মদ রুস্তম আলী,
১০. মোহাম্মদ করিম উদ্দীন,
১১. মুনিরউদ্দীন আহমদ,
১২. আব্দুল হাশেম খান,
১৩. মো. ফয়েজুর রহমান।

University of Calcutta: List of Graduates, 1931, The University of Calcutta, p.19.

৪৭. *Supplement to the Repor on Public Instruction in Bengal, 1937-38*,Alipore: Bengal Government Pres , 1940, p.8.

৪৮. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1978,* p. 238.

৪৯. প্রবন্ধকারের নিকট সাক্ষাৎকার প্রদানকারী প্রাক্তন ছাত্রের নাম রামশংকর সরকার। তিনি ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে বর্তমান নেত্রকোনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি আনন্দমোহন কলেজ থেকে বি. এস. সি. ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় রামশংকর একজন এডভোকেট। তাছাড়াও তিনি ১৯৬২-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত নেত্রকোনা কলেজে অধ্যাপনা করেন। উলেখিত সকল তথ্য তাঁর নিকট থেকে সংগৃহীত। সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৩-১০-২০০৮।

৫০. ঐ সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত।

৫১. *Tenth Quinquennial Review on the Progress of Education in Bengal 1937-38 to 1941-42*, Alipore: Bengal Government Press, 1944, p.52-53.

৫২. *Ibid.*, p.62.

৫৩. সূত্র : রামশংকর সরকারের সাক্ষাৎকার, ১৩-১০-২০০৮। আরও জানা যায়, সজল কান্তি দত্ত রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ.২২৩-২২৫।

৫৪. আনন্দমোহন কলেজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ফলক থেকে সংগৃহীত। আরও দেখুন, গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ: পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র চর্চা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ৩০৯।

৫৫. সূত্র : রামশংকর সরকারের সাক্ষাৎকার, ১৩-১০-২০০৮।

৫৬. *Report on Public Instruction in Bengal,1940-41*, Alipore: Bengal Government Press,1943, p.8. *Report on Public Instruction in Bengal,1937-38*, Alipore: Bengal Government Press,1939, p.8.Bazlur Rahman Khan, *Politics in Bengal 1927-1936*, Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh,1987,p.117-119.

৫৭. বিমলকান্তি দে, 'ময়মনসিংহে মুক্তিযুদ্ধ –৭১', *ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা* (জেলা দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় কমিটি সম্পাদিত), ময়মনসিংহ: জেলা প্রশাসন, ১৯৮৭, পৃ. ৬-৭। আরও জানা যায়, দরজি আবদুল ওয়াহাবের প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, ৬-১০-২০০৮।

৫৮. *Report on Public Instruction in East Bengal, August 15,1947 to March31, 1948,*Dacca: East Bengal Government Press,1951,p.2.

৫৯. প্রবন্ধকারের নিকট সাক্ষাৎকার: ১২-০২-২০০৯। যতীন সরকারের জন্ম ১৯৩৬ সালে বর্তমান নেত্রকোনা জেলায়। ১৯৫৬ সালে তিনি বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৬৪-২০০২ সাল পযর্ন্ত যতীন সরকার নাসিরাবাদ কলেজে (ময়মনসিংহ) বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। বাংলাদেশের উদীচী শিল্পিগোষ্ঠীরও প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ২০০৮ সালে বাংলা একাডেমী কতৃক 'সাহিত্য পুরস্কার' লাভ করেন।

৬০. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1978,* p. 238-239.

৬১. *Bangladesh Education in Statistics,1985*, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, p.58.

৬২. কলেজের বর্তমান আয়তনের তথ্য প্রবন্ধকার কর্তৃক সদর ভূমি অফিসের (বাসাবাড়ি, ময়মনসিংহ) রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত।

৬৩. সকল তথ্য কলেজের রেকর্ড থেকে এবং প্রবন্ধকার কর্তৃক সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত।

৬৪. *Bengal District Gazetteers: Mymensingh, 1917,* p.41.

৬৫. এখানে উলেখ করা যেতে পারে যে, ১৯১১-১৯২০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালনকৃত কলেজের গণিত বিভাগের অধ্যপক রাধাবিনোদ পাল(১৮৯৬-১৯৬৭) পরবর্তীকালে একাধারে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক (১৯৪১-১৯৪৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪৩-৪৪) ও আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের অন্যতম বিচারক (টোকিও ১৯৪৬-১৯৪৮) নিযুক্ত হয়েছিলেন।সুবোদচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক),*সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, কলিকাতা :সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬,পৃ.৪৬৫। তাছাড়াও স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫) , আধুনিক ইতিহাসবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম (প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) ও প্রখ্যাত লেখক এবং সাহিত্যিক ড. সফিউদ্দীনের (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা

বিভাগ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়) মত বরেণ্য ব্যক্তিত্বও একদা আনন্দমোহন কলেজে শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।

৬৬. তাঁদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর নাম সবিশেষ স্মরণীয় যিনি ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাছাড়াও আনন্দমোহন কলেজের কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রফেসর এ.কে.এম.শামসুল ইসলাম (বাংলা বিভাগ), প্রফেসর মোঃ মজিবুর রহমান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ) প্রফেসর ড. মোঃ মজিবুর রহমান (পদার্থবিদ্যা বিভাগ) প্রফেসর এইচ. এম. মনিরুজ্জামান (ইতিহাস বিভাগ) ও প্রফেসর এ.এম.এম. শামসুর রহমানের (অর্থনীতি বিভাগ) নাম উলেখ্য। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' –এ দ্রষ্টব্য।

৬৭. এসব প্রতিভাবান প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে ইতিহাসবিদ ড. নীহার রঞ্জন রায়(১৯০৩-১৯৮১), প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খান(১৮৯৪-১৯৭৮), সৈয়দ ওয়ালীউলাহ (১৯২২-১৯৭১), যাদুকর পি. সি. সরকার (১৯১৩-১৯৭১), কবি নির্মলেন্দু গুণ, প্রফেসর ড. মোফাখ্খারুল ইসলাম(সাবেক উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), প্রফেসর ড. মোঃ আলাউদ্দিন (উপ-উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), রাহাত খান (সম্পাদক, *দৈনিক ইত্তেফাক*), হাসিনুর রহমান(অবসরপ্রাপ্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার), যতীন সরকার(বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ),কথাশিল্পী আতা সরকার, সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী(মুক্তিযুদ্ধের, ১৯৭১ সাব সেক্টর কমান্ডার, জেড ফোর্স) , চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব মাসুদ পারভেজ সোহেল রানা ও মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ ওয়াসিম (সাবেক মি. ইস্ট পাকিস্তান) প্রমুখের নাম উলেখযোগ্য। সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলা পিডিয়া*, পৃ. ১৬৯-১৭০ এবং প্রবন্ধকার কর্তৃক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত ।

পরিশিষ্ট –ক

আনন্দমোহন কলেজ : যাঁরা অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯০৮-২০০৮)

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১.	শ্রী বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্তী	১৯০৮	১৯১২
২.	শ্রী পি. কে. চ্যাটার্জী	১৯১৩	১৯১৪
৩.	রায় বাহাদুর যজ্ঞেশ্বর ঘোষ	১৯১৫	১৯২৮
৪.	শ্রী কুমুদ বন্ধু চক্রবর্তী	১৯২৯	১৯৫০
৫.	শ্রী আশ্বিনী কুমার লাহিড়ী	১৯৫১	১৯৫৫
৬.	জনাব আবদুল মুনিম চৌধুরী	১৯৫৫	১৯৫৮
৭.	শ্রী বিনয় চরণ রায়	১৯৫৯	
৮.	জনাব সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন	১৯৬০	১৯৬৩
৯.	জনাব আবদুল গণি খান (ভারপ্রাপ্ত)	১৯৬৪ (প্রথমার্ধ)	
১০.	জনাব আবদুল জলিল চৌধুরী	০১.০৬.৬৪	০২.১১.৬৫
১১.	জনাব এ. কে. এম. কবীর চৌধুরী	০৪.১১.৬৫	২২.০৩.৬৯
১২.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল উদ্দীন	০২.০২.৭০	১৬.০২.৭৫
১৩.	জনাব মোঃ আমিনুল হক	১৫.০৫.৭৬	১৯.০৮.৭৬
১৪.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	২০.০৯.৭৬	২০.০৭.৭৭
১৫.	ড. মোঃ মোবারক আলী আকন্দ	১২.০৮.৭৭	১৯.০৬.৮০
১৬.	জনাব মুহাম্মদ আবদুল আজিজ	২০.০৬.৮০	২৭.০২.৮৫
১৭.	জনাব আবদুল মোমেন	২৮.০২.৮৫	২৭.০২.৮৭
১৮.	জনাব হাসান ওয়ায়েজ	২৮.০৭.৮৭	০৯.০১.৮৯
১৯.	জনাব নাজির উদ্দীন আহমেদ	১০.০৯.৮৯	২০.০৬.৯০
২০.	প্রফেসর এম রেজা-উল করিম	০১.০৭.৯০	৩০.১০.৯৩
২১.	প্রফেসর মাহমুদ জাহাঙ্গীর হাসান (ভারপ্রাপ্ত)	৩১.১০.৯৩	০১.১২.৯৩
২২.	প্রফেসর এ.কে.এম.শামসুল ইসলাম	০২.১২.৯৩	০৯.১০.৯৬

২৩.	প্রফেসর মু. রিয়াজুল ইসলাম (চলতি দায়িত্ব)	০৮.১০.৯৬	২৬.১১.৯৬
২৪.	প্রফেসর মোঃ মজিবর রহমান	০১.১২.৯৬	১৫.০২.৯৯
২৫.	প্রফেসর এইচ. এম. মনিরুজ্জামান (ভারপ্রাপ্ত)	১৬.০২.৯৯	২৪.০৫.৯৯
২৬.	প্রফেসর ড. মোঃ মজিবুর রহমান	২৫.০৫.৯৯	১৪.০৬.২০০০
২৭.	প্রফেসর সুশীল কুমার গাঙ্গুলী	১৪.০৬.২০০০	২৮.০৬.২০০১
২৮.	প্রফেসর এস. এম. হায়দার	১০.০৭.২০০১	০৯.১০.২০০১
২৯.	প্রফেসর এ. বি. এম. জনাব আলী	১৩.১০.২০০১	৩০.০১.২০০২
৩০.	প্রফেসর এ. এম. মোঃ শহীদুলাহ	৩০.০১.২০০২	১০.০২.২০০২
৩১.	প্রফেসর এ. এফ. এম. শামসুজ্জোহা (দায়িত্বপ্রাপ্ত)	১০.০২.২০০২	১০.০৪.২০০২
৩২.	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আজিজুর রহমান	১১.০৪.২০০২	১১.০৫.২০০৪
৩৩.	প্রফেসর মুনিবুর রহমান	১২.০৫.২০০৪	১৯.০২.২০০৫
৩৪.	প্রফেসর আনিসুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২০.০২.২০০৫	২০.০৪.২০০৫
৩৫	প্রফেসর মোহাম্মদ তসলিম উদ্দীন	২১.০৪.২০০৫	২০.১২.২০০৫
৩৬.	প্রফেসর আনিসুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)	২০.১২.২০০৫	২৭.১২.২০০৬
৩৭.	প্রফেসর এ.এম.এম. শামসুর রহমান	২৭.১২.২০০৬	২৭.১২.২০০৭
৩৮.	প্রফেসর সফিউদ্দীন	২৭.১২.২০০৭	–

সূত্রঃ *আনন্দ মোহন কলেজের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত।*

পরিশিষ্ট-খ
উপাধ্যক্ষের তালিকা
(২৬.০৪. ১৯৮৯ সাল থেকে ২০০৮সাল পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১.	প্রফেসর মাহমুদ জাহাঙ্গীর হাসান	২৬.০৪.১৯৮৯	১৪.০৮.১৯৯৬
২.	প্রফেসর মুঃ রিয়াজুল ইসলাম	০৮.১০.১৯৯৬	২৬.১১.১৯৯৬
৩.	প্রফেসর কাজী আমীন আহ্‌মদ	১৪.১২.১৯৯৬	৩০.১১.১৯৯৭
৪.	প্রফেসর এইচ. এম. মনিরুজ্জামান	২২.১২.১৯৯৭	২৯.০৪.২০০০
৫.	প্রফেসর সৈয়দ আবুছালাম মোঃ আলম	২৯.০৪.২০০০	১৪.০২.২০০১
৬.	খন্দকার আব্দুল হান্নান	১৪.০২.২০০১	১৮.০৪.২০০১
৭.	প্রফেসর এ. এফ. এম. শামসুদ্দোহা	২১.০৫.২০০১	১০.০৮.২০০২
৮.	প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল মান্নান	২৫.০৮.২০০২	২৬.০১.২০০৫
৯.	প্রফেসর আনিসুর রহমান	২৭.০১.২০০৫	২১.০৩.২০০৬
১০.	প্রফেসর এ.এম.এম. শামসুর রহমান	৩০.০৩.২০০৬	০৪.০২.২০০৭
১১.	প্রফেসর এ.আর. এম. মনিরুজ্জামান মিঞা	২৩.০৪.২০০৭	৩০.১২.২০০৭
১০.	প্রফেসর রোকেয়া বেগম	৩০.১২.২০০৭	৩০.১২.২০০৮

সূত্রঃ *আনন্দ মোহন কলেজের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত।*

পরিশিষ্ট-গ

আনন্দমোহন কলেজের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের তালিকা (১৯১৮-১৯)

	নাম	পদবী
১.	রায় বাহাদুর যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, এম. এ., পিএইচ.ডি.–	অধ্যক্ষ
২.	তারাপদ মুখার্জী, এম. এ.–	অধ্যাপক, রসায়ন
৩.	রবীন্দ্রনাথ গুহ, এম. এ.–	ঐ
৪.	প্রফুলকুমার গুহ, এম. এ.–	অধ্যাপক, ইংরেজি সাহিত্য
৫.	বিমলামোহন গাঙ্গুলী, এম. এ.–	ঐ
৬.	অজিৎ নাথ নন্দী, এম. এ.–	ঐ
৭.	সঞ্জীব কুমার চৌধুরী, এম. এ.–	ঐ
৮.	রাধা বিনোদ পাল, এম. এ.–	অধ্যাপক, গণিত
৯.	বিধুভূষণ দত্ত, এম. এ.–	অধ্যাপক, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন
১০.	অক্ষয় কুমার ব্যানার্জী, এম. এ.–	ঐ
১১.	কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী, এম. এ.–	ঐ
১২.	নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ.–	অধ্যাপক, র্থনীতি
১৩.	সুরেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, এম. এ.–	অধ্যাপক,ইতিহাস
১৪.	পূর্ণেন্দু কিশোর চক্রবর্তী, এম. এ.–	ঐ
১৫.	শরৎচন্দ্র পাল, বি. এ.–	অধ্যাপক, সংস্কৃত
১৬.	যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, এম. এ.–	ঐ
১৭.	মৌলবি ফজলুর রহমান–	অধ্যাপক, ফারসি
১৮.	মৌলবি আব্দুল হাকিম–	ঐ
১৯.	পণ্ডিত নবকান্ত গুহ, কবিভূষণ–	অধ্যাপক, বাংলা
২০.	মুকুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বি.এস.সি.,–	প্রতিপাদক (Demonstrator)
২১.	সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি.এস.সি.–	ঐ
২২.	হরিপদ মণ্ডল, বি.এস.সি.–	গ্রন্থাগার সহকারী

সূত্রঃ *University of Calcutta: The Calendar, 1918 & 1919,* Part I, p.411-412

.পরিশিষ্ট-ঘ

কলেজ পরিচালনা কমিটি (১৯১৮-১৯)

সভাপতি – জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (পদাধিকার বলে),

সেক্রেটারি – রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়, উকিল এবং সভাপতি, ময়মনসিংহ পৌরসভা,

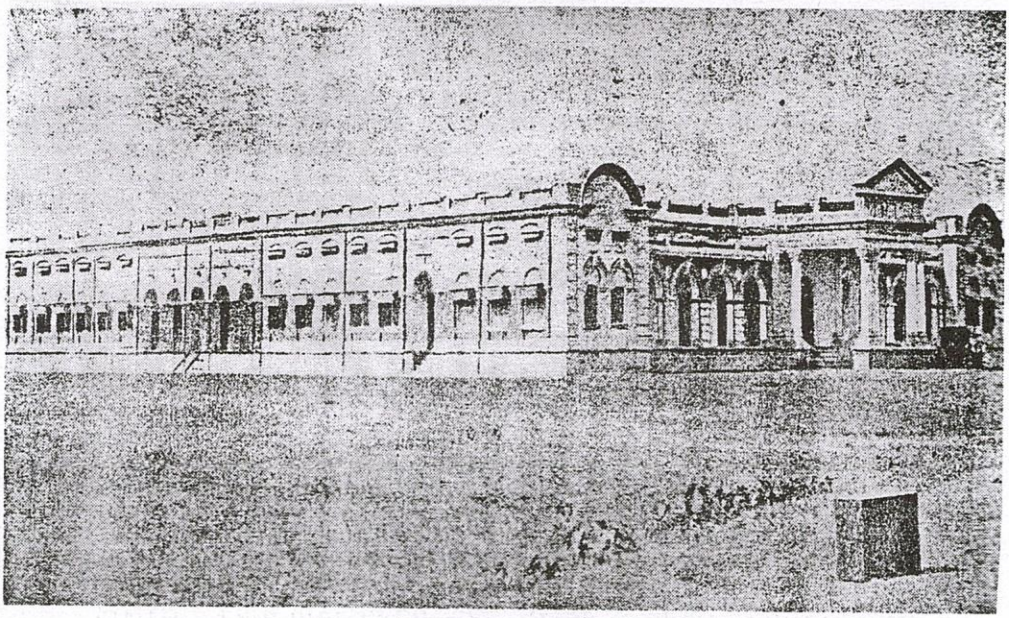
সদস্যবৃন্দঃ

১. রাজা শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, বাহাদুর,
২. কুমার নগেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী,
৩. বাবু মনমোহন নিয়োগী, বি. এল.,
৪. মৌলবি মোহাম্মদ ইসমাইল, বি. এল.,
৫. মৌলবি শাহাবুদ্দীন আহমদ, বি.এল., সরকারি আইনজীবী এবং সহ–সভাপতি, জেলা বোর্ড, ময়মনসিংহ,
৬. রায় বাহাদুর নিশীকান্ত ঘোষ, বি.এল.,
৭. অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম.এ.,
৮. অধ্যাপক শরৎচন্দ্র পাল, এম. এ.,
৯. রায় বাহাদুর যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, এম. এ., পিএইচ.ডি., অধ্যক্ষ, আনন্দমোহন কলেজ (পদাধিকার বলে)।

সূত্রঃ *University of Calcutta: The Calendar, 1918 & 1919,* Part I, p.411-

পরিশিষ্ট-ঙ

১৯১২ সালে নির্মিত আনন্দমোহন কলেজের প্রথম ভবন



আনন্দ মোহন কলেজ

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ: সমসাময়িক স্থানীয় নাটকে রংপুরের চিত্র

আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ্*

Abstract: Almost three lakh people of Bengal died due to the famine of 1943. Northern part of Bengal was the most affected area at that time. Many dramas were written on the issue by many playwrights after the famine. This article aims to explore the reflection of famine in the dramas.

বৃটিশ বাংলায় মহাদুর্ভিক্ষগুলোর অন্যতম ছিল ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। ভারতবর্ষও স্মরণাতীত কাল থেকে দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল।[১] তবে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, শিল্প বিপ্লব, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুশাসন ইত্যাদির ফলে যখন ইউরোপের দেশগুলো থেকে দুর্ভিক্ষ বিদায় নেয় বৃটিশ আমলে বাংলায় তখন দুর্ভিক্ষ একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়। ফলে পূর্বের তুলনায় বৃটিশ আমলে বাংলা সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।[২] এর জন্য মূলত বৃটিশ ভূমিরাজস্বনীতি ও শিল্পনীতিকে দায়ী করা হয়।[৩] রংপুর জেলা তৎকালে বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় রংপুরও একটি দুর্ভিক্ষ অঞ্চলে পরিণত হয় এবং বাংলায় সংঘটিত প্রায় সবগুলো দুর্ভিক্ষই রংপুরে কমবেশী আঘাত হানে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৩ সালেও বাংলায় আর একটি মহাদুর্ভিক্ষ (Great Famine) সংগঠিত হয়। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।[৪] বাংলার অন্যান্য জেলার মত রংপুরেও এই দুর্ভিক্ষ আঘাত হানে এবং পাশের জেলাগুলোর তুলনায় এখানে এর তীব্রতা ছিল অনেক বেশী।[৫] দুর্ভিক্ষের উপর প্রকাশিত বিভিন্ন সরকারী,[৬] বেসরকারী[৭] রিপোর্ট, বই-পু স্তক[৮] ও গবেষণা কর্ম[৯] থেকে এই দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে বি স্তারিত জানা যায়। তবে এ সম স্ত সরকারী ও বেসরকারী নথিপত্রের পাশাপাশি দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুরের স্থানীয় নাটকেও রংপুরের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

নাটক চলমান সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত হয় অন্যান্য বিষয়ের মত সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার প্রকৃত চিত্র। আবার কোন একটি নির্দিষ্ট ঘটনা বা দুর্যোগের উপর রচিত নাটক থেকে ঐ ঘটনা বা দুর্যোগ সম্বন্ধে প্রচুর উপাত্ত পাওয়া যায়। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের গবেষণায় দেখা যায় যে, একে কেন্দ্র করে রংপুরে স্থানীয় পর্যায়ে এক নতুন লোকজ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠে।[১০] দুর্ভিক্ষের বিষয়ে নাটক রচনা ছিল এর একটি অংশ। ফলে এ সময় স্থানীয়ভাবে এবং গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে দুর্ভিক্ষের বিষয়ে অনেক নাটক রচিত হয়। বস্তুতঃ রংপুর জেলার নাট্যচর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের।[১১] তবে দীর্ঘকাল ধরে রংপুরে নাট্যচর্চা অব্যাহত থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে জেলার নাট্যচর্চা কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের রিলিফের অর্থ সংগ্রহ, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে জনমত সংগঠন প্রভৃতি কারণে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে গণনাট্য সংঘ।[১২] মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের ফলে আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিপর্যয় নাটক রচনার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়।[১৩] ফলে এ সময় থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নির্যাতনের বিভৎসতা, দুর্ভিক্ষ

---

* ড. আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ, সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

এবং যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এ ধরনের বিষয়ের উপর ভিত্তিকরে নতুন নতুন নাটক রচিত হতে থাকে। এই নতুন নাট্য সাংস্কৃতির অগ্রদূত ছিল বাংলার গণনাট্য সংঘ। এরই অংশ হিসাবে দুর্ভিক্ষ ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধের জন্য জেলার কমিউনিষ্টপার্টির পরিচিত অপরিচিত সাংস্কৃতিক কর্মীরা রচনা করেন বিভিন্ন নাটক। কুড়িগ্রাম অঞ্চলের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বসন্তবাবু, জীবন দে প্রমুখ কর্তৃক গ্রাম্য শিল্পীদের নিয়ে গঠিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কর্মীরা নিজেরাই দুর্ভিক্ষ বিষয়ে নাটক রচনা করেন।[১৪] এ সব নাটকের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ ও মজুতদার বিরোধী অভিযান এবং দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সাহায্য সংগ্রহ অভিযান এক সাথে পরিচালিত হয়। কমরেড গোপেন রায় জেলার দুর্ভিক্ষবস্থার বা স্তব চিত্র নিয়ে মজুতদার ও মহাজন বিরোধী, দুর্ভিক্ষ এবং শ্রেণী সংগ্রাম বিষয়ে নাটক রচনা করেন।[১৫] এ নাটক সমগ্র জেলায় এমনকি বগুড়াতেও ব্যাপক জনপ্রিয় হয়েছিল।[১৬] কেন্দ্রীয় গণনাট্য সংঘের কর্মী গাইবান্ধার পানুপাল মজুতদার, চোরাবাজারী বিরোধী নৃত্যনাট্য রচনা করে সে সময় আলোড়ন তুলেছিলেন।[১৭] কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে (১৯৪৪) সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল রংপুর দলের মহা-বুভুক্ষানৃত্য।[১৮] এভাবে গণনাট্য সংঘ দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে নাটকে দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং তা প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

একই সাথে রংপুরের জমিদার শ্রেণীও এ সময় রংপুরের সাংস্কৃতির বিকাশে এগিয়ে এসেছিলেন। রংপুরের জমিদারগণ জেলার দুর্ভিক্ষপীড়ীত মানুষের কথা নাটকের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ কাজে সর্বাগ্রে ছিলেন বামনডাঙ্গার জমিদার তুলশীদাস লাহিড়ী (১৮৯৬-১৯৫৭ খ্রীঃ)। তিঁনি ১৮৯৬ সালের ৫ই এপ্রিল রংপুরের নলডাঙ্গা গ্রামের এক সভ্রান্ত জমিদার বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রংপুরের সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে লাহিড়ী পরিবারের অবদান অন্যতম। তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ছিলেন একজন সঙ্গীত-ও স্তাদ। আর তুলশী দাস লাহিড়ী ছিলেন একজন সফল নাট্যকার। তাঁর লেখা দুঃখীর ইমান[১৯] ও ছেঁড়াতার[২০] নাটক দুটো ছিল জেলার দুর্ভিক্ষের উপর রচিত নাটক। তন্মধ্যে ছেঁড়াতার নাটকের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে নাটকটি চীনদেশেও মঞ্চস্থ হয় এবং এই নাটক উর্দু, পাঞ্জাবী ভাষাতেও অনুদিত হয়।[২১] মূলতঃ তুলশী দাস লাহিড়ী রচিত উক্ত নাটক দুটোতে ১৯৪৩ সালের রংপুরের দুর্ভিক্ষ সময়ের সমাজের উপেক্ষিত ও উপদ্রুত মানুষের বঞ্চনা ও বেদনা বা স্তব সত্যের স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এভাবে দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে রংপুরে যে লোকজ নাটক সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রসার ঘটেছিল তা যেমন সাহিত্যের উপাদান তেমনি এগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। বিশেষ করে জানা অজানা এ সম স্ত নাটক আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হওয়ায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে দুর্ভিক্ষের বিষয় জানার ক্ষেত্রে এগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও এ সম স্ত নাটককে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধীয় কোন গবেষণা কর্মের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়নি। দুর্ভিক্ষের তথ্য সম্বলিত এ সম স্ত নাটক দিন দিন লুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং অনতিবিলম্বে এ সব নাটক সংগ্রহ করা এবং তার গুরুত্ব নিরূপন করা অত্যন্ত জরুরী। ১৯৪৩ সালের রংপুরের দুর্ভিক্ষের উপর তুলশীদাস লাহিড়ী রচিত 'দুঃখীর ইমাম' ও 'ছেঁড়াতার' নাটক দুটো অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় নাটক দুটো রচিত হওয়ায় এগুলো থেকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে রংপুরের দুর্ভিক্ষের কারণ, ব্যাপকতা, ফলাফল ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা যায়। যা রংপুরের দুর্ভিক্ষের সামগ্রিক বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদান। বর্তমান প্রবন্ধে 'দুঃখীর ইমাম' ও 'ছেঁড়াতার' নাটকে ১৯৪৩ সালের রংপুরের দুর্ভিক্ষের যে চিত্র বর্ণিত আছে তা আলোচনা করা হবে।

দুর্ভিক্ষের কারণ সংক্রান্ত চিত্র :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের একটি অন্যতম কারণ। যুদ্ধে বার্মার পতনের ফলে সেখান থেকে চাল আমদানী বন্ধ হওয়ায়[২২] এবং বাংলায় অবস্থানরত সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যশস্য মজুত[২৩] করায় চালের মূল্য চরমভাবে বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া জাপানী আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতে *পোড়ামাটি* নীতি গ্রহণ করে বাংলায় শত্রু সেনাকে সাহায্যহীন করার অভিপ্রায়ে যাতায়াত, খাদ্য সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু ধ্বংস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।[২৪] উপরন্ত সরকার খাদ্য হুকুম দখলের খবরে দেশের সর্বত্র আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং বাজার থেকে ধান চাল উধাও হয়ে যায়। কারণ সরকার

দখল করা খাদ্য শস্যের মূল্য পরিশোধের কথা বললেও তা ছিল বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক কম এবং মূল্য আদায়ের ছিল নানান জটিলতা। চরম খাদ্য সংকটের মুখে ব্রিটিশ সরকারের এই নীতি জেলায় খাদ্য সংকটকে ভয়াবহ করে তোলে। সরকারের এ যুদ্ধ নীতি রংপুরেও গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের জন্য মোতায়েনকৃত লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে খাওয়ানোর জন্য সরকার এ সময় জেলায় বিভিন্ন বাড়ী বাড়ী গিয়ে জোর জুলুম করে মানুষের ধান চাল হুকুম দখল করে।[২৫] তদুপুরী জাপানী সৈন্যের অগ্রাভিযানে ভীত হয়ে সরকার এখানে মাহিগঞ্জের তাজহাট ব্রিজের কাছে নষ্টের অজুহাতে ট্রাকে ট্রাকে চাল নদীতে ফেলে দেয়।[২৬] পরে সে চাল অভাবী মানুষ কাদামাটি পানি সহ তোলার জন্য কাড়াকাড়ি শুরু করেছিল। তাছাড়া তি স্তা নদীতেও চাল ফেলে দেওয়া হয়েছিল।[২৭] 'দুঃখীর ইমান' এবং 'ছেঁড়াতার' নাটকে এ সমস্ত বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে –

দুঃখীর ইমান

.....

ধর্ম্মদাস - এই যুদ্ধে হামাক[২৮] খাইবে।

বুদ্ধিমান - খাইবেত। যারা বড় তারা খালি যুদ্ধের কথায় কয়, হামার কথা কবাওে মোনায়[২৯] না। (পৃ. ২৬)

.....

ধর্ম্মদাস - টাকার লোভ দ্যাখেয়া হামার সব ধান কিনি নিয়া আইজ হামার কাছে দুনা দামে[৩০] ব্যবচার ধইচ্ছেন।

ছেঁড়াতার

.....

প্রেসিডেন্ট - চাইরোপাকে হাহাকার। এই যুদ্ধে দ্যাশটাক খাইবে। কোঠে লড়াই কোঠে কি ধামধূমিৎ[৩১] হামারা মাইনো। এতেত[৩২] আকালের শোরগোল ওত্তিফির[৩৩] শহরে ফিসফিস্ শুনি আইনো জাপান যুদ্ধে নামলে তাত্ সরকার পোড়ামাটি কইরবার চায়।

হাকিম - কনকি সর্বনাশের কথা। হাওয়া জাহাজ[৩৪] থাকি চতুর পাকেজ আগুন দিবে নাকি ?

প্রেসিডেন্ট - কি বা করবে তা উয়ারায়[৩৫] কবার পারে। (পৃ. ৫৪)।

হাকিম - ধান আটকের কথা কিছু শুনি আইলেন ?

প্রেসিডেন্ট - সরকার থাকি মুল্লুকের ধান তামাম আটক হইবে। তবে দাম দ্যাওয়া হইবে কইল।

হাকিম - ঘন্টা দিবে। বাজারে ৭০/৮০ টাকা হইছে। সরকার থাকি খুব যদি দ্যায়ত ৩০ দিবে। তাও আদায় কইত্তে ছয়মাস দৌড়াদৌড়ি, তাগিদ, তদ্বির, ঘুষ, পান-খাই খরচা কত কি?

প্রেসিডেন্ট - ব্যাচাবার পাইল্যে ভাল হয়। চড়া দাম আছে। কিন্তুক ধান সরকার থাকি ধইরবে বলিয়া কেউ ধান বাঁধেনা। বেচাইবেন কার কাছে। যে রকম শুনি আইনো ২/৪ দিনেই সরকার থাকিয়া ধান ধরা শুরু হইবে।

ওহিম - সারা মুল্লুকে কারও ঠিকমত খোরাকি নাই। ধনীর কাছে নাই। গোলাদারের কাছে নাই। চাউল সব সরকারী ধরি রাইখছে, সরকারের কাছে ধান। ....।

গোবিন্দ - সরকার তামাম ধান আটকি[৩৬] রাখি মানুষগুলোকে উপাস করিয়া মাইরবে। মাইনষের কি বাঁচার কোন দাবী নাই। (পৃ. ৭৩)

মহাজন, সুদখোর, মুনাফাখোর, মজুতদাররা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাধারণের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে। দুর্ভিক্ষের মত দেশের কোন গুরুতর দুর্যোগে এ সম স্ত ব্যক্তি নিজ নিজ পেশায় অধিক মনোযোগী হয়ে অভাবী মানুষের দুর্ভোগকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।[৩৭] ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষেও মজুতদারী, কালোবাজারী, সুদ ব্যবসা মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পায়।[৩৮] এমনকি ইতিপূর্বে যারা তাদের অধীনস্থ কৃষকদের ধান ধার দিত অতিরিক্ত লোভে এবার তারা তা দেয়নি। ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে দুর্ভিক্ষ মারাত্মকরূপে

দেখা দেয়। সে সময় রংপুরেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। রংপুরেও সিমাহীন দূর্নীতি চোরাবাজারী ব্যবসা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৩৯] এসময় খাদ্যশস্য মজুত হয়েছিল সরকার, চোরাকারবারী আর মজুতদারের গুদামে।[৪০] এ বিষয়ে একটি সরকারি রিপোর্টে দেখা যায় যে, "মহাকুমার একটি ইউনিয়নে প্রতিটি বাড়ী অনুসন্ধানের পর যে ৩৬ হাজার মণ চাল এবং ২৫ হাজার মণ ধানের মজুত পাওয়া গেছে তার সম স্তটাই ছিল মজুতদার ও জোতদারের ঘরে"।[৪১]

দুঃখীর ইমান ও ছেঁড়াতার নাটকে এ ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়।

দুঃখীর ইমান

..... - রঘুনাথ হামার ধান করজ[৪৩] দিয়া তোকে বাঁচেয়া রাখি আর তুই কলু[৪৪] হামি[৪৫] চুষি খাই।

টেপারু - খাইসে-ত'। আর সাল দুই মণ ধান করজ নিছিনো।[৪৬] আড়াই টাকা করি বাজারত তখন, আরও বাড়িবে বলি তিন টাকা করি দাম ধরি ছয় টাকা আর সুদ তিন টাকা, নয় টাকা দিবার কথা আছিল।[৪৭] এ সাল ৪।।০ নীচে দাম নামিল না দেখিয়া টাকা না নিয়া অমনি ধান তিন মণ আদায় করি নিলেন। সেই তিন মণে তিরিশ টাকা পাইছেন নাঃ (পৃ.২৯-৩০)।

.....

ধর্ম্মদাস - সেই বিশ মণ ধানের অন্তে হামি আইজতক[৪৮] দুই কুড়ি মণ ধানের থাকি বেশী ধান দিছি। তবু নাকি শোধ হয় না।

.....

রঘুনাথ - তুই হিসেবটা শুনি রাখ। পয়লা সাল দশ মণের সুদ পাঁচ মণ। (পৃ. ৩২)।

হারেরাম - চাষার হাতে ধান থাকেনা।

বংশী - দেখ যারা ধনীর বাড়ী গোলৎ[৪৯] বাঁধি রাইখছে।[৫০] (পৃ. ২৫)।

.....

টেপারু - ... যখন ধান করজ নিছি - সুদ দিয়া ফিরিয়া দিছি। তবু ক্যানে[৫১] ধনীর ঘর ধান করজ দিবার চায়না এ সাল।

উংশী - ... ধনীর 'ত কইছে ধান করজ দিবারনয়। (পৃ. ২৬)

ছেঁড়াতার

.....

হাকিম - ... ধান করজ ত' চাইবে। ...গোলায় ধান থাকিতে ত' কওয়া[৫২] যাবার নয় ধানদিবার নই, তা তে তোমারা মর আর বাঁচ।

কুদরৎ - কিছু ধান আলগা[৫৩] করি রাখিলে হয়। ...

হাকিম - ক্যামন করি সরাই? কোঠে সরাই? কাঁয়[৫৪] সরায়?

সহরুল্ল্যা - দোতলার বাঁশের ছাদে খানিক তুলি থুইলে[৫৫] হয়।

কুদরৎ - মুই কই অন্দরের দুই তলায় ছাদ ম্যারামত হইছেনা? ওঠে ৬০/৭০ মণ রাখা যায়। কনত[৫৬] রাইতে গোলা থাকি সরাই। (পৃ. ৫২-৫৩)।

.....

হাকিম - কি কলু? মুই ঠক? মানুষ ঠকাই?

রহিম - ভুঁইগুলা মোর তোমার প্যাটে গেল ক্যামন করি ?

হাকিম - ভুঁই এমনি নিছি নাকি? করজ নিছিল[৫৭] তোর বাপ। শোধ কইরবার পারে নাই। হক পাওনা আদায় কচ্ছি। (পৃ. ২৩)

..... - করজ দ্যাওয়াটায় ভালো। খাতকগুলাক কমো[৫৮] এ সালের বাজার দামের মত টাকার ধান হামি আর সাল চাই।

প্রেসিডেন্ট - সুদ?

হাকিম - আচ্ছা আকাল বলি সুদ মাপ দিয়া দেমো।[৫৯] বুঝেন নাই। সরকার থাকি নিলে নিবে ৩০ মণ, খাতকওয়ালার কাছে ফেরৎ পামো[৬০] ৭০ মণ করা। নিজের লোকের হাতে ওজনের পাল্লা। তাতেও কিছু লাভ থাকিবে। (পৃ. ৫৬)।

.....

গোবিন্দ - ধানের যে দাম হইছে গরীবগুলো অত টাকা কোঠে পাইবে? ধান করজ দ্যাও সুদ দিবে।

হাকিম - হয়রে গোবিন্দ। ... একমণ ধান নিয়া সুদ দিবু আধমণ কি কইস?

গোবিন্দ - সেইমত বরাবর দিচ্ছি।

হাকিম - বরাবরের কথা ছাড়। ... ৭০ টাকা দরের ধান নিয়া আর সাল ২০ টাকা দরের মণ তোরা ফিরি দিবার চাইসরে? ৭০ টাকা নিয়া ফিরি দিবু ২৫ টাকা। দ্যাখেন প্রেসিডেন্ট সাহেব চ্যাংড়াগুলো মোক ঠকাবার চায়। (পৃ. ৫৯)

খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি ছিল দুর্ভিক্ষের একটি অন্যতম কারণ।[৬১] জেলার প্রধান ফসল হলো ধান। স্বাভাবিকভাবেই চাল হচ্ছে প্রধান খাদ্যদ্রব্য। কোন কারণে কখনও ধান উৎপাদন ব্যাহত হলে ধান এবং চালের মূল্যবৃদ্ধি পায়। আর এই মূল্যবৃদ্ধি মানুষের দুর্ভোগের জন্য দায়ী। ১৯৪৩ সালে রংপুরে এ ধরনের একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৮৮০ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সময়ে জেলার প্রধান খাদ্য চালের মূল্য ১৭৫% বৃদ্ধি পেলেও ১৯৪০ সাল পর্যন্ত চালের মূল্য স্থিতিশীল ছিল।[৬২] কিন্তু ১৯৪৩ সালে পুনরায় চালের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। এসময় চালের দাম মণ প্রতি তিন থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পায়। অথচ দুর্ভিক্ষের পূর্বে এ মূল্য ছিল যথাক্রমে মণ প্রতি ১৫ থেকে ২০ টাকা।[৬৩] 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়াতার' নাটকের কয়েকটি সংলাপে জেলায় খাদ্য মূল্যবৃদ্ধির একটি চিত্র পাওয়া যায়–

দুঃখীর ইমান

.....

বুদ্ধিমান - ধানের দামে দেখছিস। সব বসি আছে আরও বাড়িবে বলিয়া।

বংশী - হাটেত ১৫ দাম গেইছে। ...(পৃ. ২৬)

.....

ছোট - মরবে ব্যাটারা এবার। বার তের টাকা মণ হতেই লোভে পড়ে যে যার মত সব ধান চাল বেচে দিলে। আর এখন ২৫-৩০ টাকা দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে তাও পাচ্ছে না। (পৃ. ৭৮)।

ছেঁড়াতার

.....

সহরুল্লা - চাইরোপাকে[৬৪] খালি এক দরবার। ধানের দামে আগুন লাগি গেইছে ...। (পৃ. ৫৩)।

.....

কুদরৎ - এক স্যার[৬৫] চাউল হয় না দুই টাকায়। (পৃ. ৫১)।

.....

হাকিম - .....। কোনও দিন ২০ টাকায় বেশী ধানের মণ দেখছিস? এ সাল ৭০ টাকা। (পৃ. ৫৯)।

অনাহার বা চরম খাদ্যভাব হলো দুর্ভিক্ষের পূর্বশর্ত।[৬৬] কোন একটি এলাকায় এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে বুঝতে হবে সেই এলাকায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে। জেলায় ১৯৪৩ সালে এ রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন বিভিন্ন সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, সে সময় জেলায় ধান উৎপন্ন হয়েছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় অর্ধেক।[৬৭] ঘাটতি খাদ্য উৎপাদনের সাথে যোগ হয়েছিল মজুতদারী ও কালোবাজারী।[৬৮] এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হাতে বার্মার পতনের ফলে লক্ষাধিক বর্মি শরণার্থীকে রংপুরে আশ্রয় দেয়ায় খাদ্য সমস্যা মারাত্মক রূপ নেয়।[৬৯] যা জেলায় তীব্র অনাহার এবং একই সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল। আলোচ্য নাটক দু'টোতেও দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুরে ব্যাপক অনাহারের প্রমাণ পাওয়া যায়–

দুঃখীর ইমান

.....

বুদ্ধিমান - হামরা যে ছাওয়া-ছোট[৭০] নিয়া না খায়া মইনো।[৭১] ধর্ম্মদাস। (পৃ. ২৫)।

.....

হরেরাম - খালি তুই খাইলে হইল নাকি? তোর বৌ বেটি ছাওয়া ছোট তাক্ কাঁয় খোয়াইবে?

.....

টেপারু - (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল) থাকিয়া খোয়াবার পারিনা। ঘরে যাইতে ছাওয়াগুলা চাইরে পাকে আসি খাঁড়া হয়। ছোটগুলা পুছে[৭২] কি আইনছেন, আর বড়গুলা খালি মুখের ভিতে[৭৩] চায়া থাকে বুক ফাটি যায় বংশী বুক ফাটি যায়। (পৃ. ২৭)।

.....

ধর্ম্মদাস - ছাওয়া ছোটগুলাক খাওয়াবার পারিনা। ছোখের উপর তারা শুকিয়া কোঁকড়া লাগি গ্যাল। হামরা যদি উয়ার[৭৪] মত হইলে ত হামি পাগল হয়া গেনু হয়। (পৃ. ৯৪)।

ছেঁড়াতার

.....

ফুলজান - .....। কি দিন হইল। যে ফুফা মোক বাচ্চা থাকি পাইলছে[৭৫], কত সোহাগ কইছে, বাড়ী যায়া খাড়া হইতে, মোক দেকি ঝাঁকি[৭৬] উঠিল। কয় প্যাট চালবার আসছিস? নিজের খোরাক নাই, দুইখান প্যাট কি চালাইলে হইল। (পৃ. ৮৩)।

রহিম - শ্রীমন্তরে আইজ মোর দরিয়ায় ডুবায় লাগিবে। হায়রে হায়। মানুষ হয় বৌ ব্যাটাকে খাওয়াবার পাইন্যেনা।[৭৭] (পৃ. ৮১)। ...। মাও মোর উপাস করি মরি গেল ... মাও চলি গেইছে কোন দিন বা হামরাও চলি যাই। (পৃ. ৭০-৭৩)।

.....

সরেমামুদ - হামরা সব না খায়া মইনো।

হাকিম - ....। শ্রীমন্ত তুইও না খাওয়া?

শ্রীমন্ত - মেরও ঐ কথা। (পৃ. ৫৭-৫৮)।

.....

শিয়ালু - মোক বাঁচান। ছাওয়া-ছোট নিয়া তিন দিন না খাওয়া। (পৃ. ৭১)। দুর্ভিক্ষের বিবরণ, প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সংক্রান্ত চিত্র:

খাদ্য সংকটের পাশাপাশি অন্য যে সংকটটি দুর্ভিক্ষকে ভয়াবহ করে তুলেছিল তা হলো বস্ত্র সংকট। ব্যবসায়ী ও সরকারী প্রশাসনের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে কাপড়ের মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৭৮] ফলে নিরন্ন কৃষকের পক্ষে এই দুর্মূল্যের বাজারে খাদ্য ও বস্ত্র একই সংগে যোগাড় করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। এতে সাধারণ কৃষক পরিবারগুলোর মান মর্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। জেলার এই অবস্থার চিত্র আলোচ্য নাটক দু'টোতে পাওয়া যায় -

জামাল - কাক খবর দিবেন? আমার কি কেউ আছে। বেটি ছাওয়া কোনার কাপড়ায় নাই। তায় বাড়ী থাকিয়া বাইরে হবার পাইরবার নয়। তাওে ছ্যাওঠা[৭৯] আমি পরি আছি। (পৃ. ৯১)

ধর্ম্মদাস - ... চতুরপাকে খালি হাহাকার লাগি গেইছে। ... বৌ বেটির ইজ্জৎ থাকেনা, তারা ন্যাংটা হয়া গেইছে। (পৃ. ৯৪)।

২য় - মিঞা ! ব্যামারে ভুগিয়া- না খায়া- আর ফাটা কাপড় পিঁধিয়া বেটি ছাওয়াগুলার যে ছুরৎ হইছে না- হামারে দেইখব্যার ইচ্ছা করেনা। পল্টন[৮০] এগুলোক দেখিয়া প্যাত্তানী[৮১] ভাবিয়া পালাইবে। (পৃ. ২০)।

ওহিম - ছাড়ি দ্যাও অন্দরের কথা। ভাঙ্গা বেড়া, ভাঙ্গা ঘর। বৌ বেটির পরণে ছিড়া ফাটা ছ্যাওটা। তার ফির অন্দর আর পরদা। (পৃ. ৩৭)।

দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সংকট থেকে বাঁচার জন্য অভাবী মানুষ তখন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রি করেছিল।[৮২] প্রকৃত পক্ষে কৃষক অভাবের তাড়নায় নাম মাত্র মূল্যে দুর্ভিক্ষের সময় জমি, গরু, বাছুর, হাঁস, মুরগী থালা-বাসন সহ যাবতীয় গৃহস্থালী সামগ্রী অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তির নিকট বিক্রি করবে এটাই স্বাভাবিক। রংপুরেও তখন এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। জেলার সচ্ছল অসচ্ছল সকল পরিবারের মানুষ খাদ্য কেনার জন্য প্রথমে কাঁসার জিনিস পত্র বিক্রি করে।[৮৩] এবিষয়ে এক রিপোর্টে দেখা যায় যে, জেলার ডোমার বাজারে প্রতিদিন প্রায় একশত মণ কাঁসার বাসন পত্র বিক্রি হত।[৮৪] জেলার কৃষক সম্প্রদায় সেসময় বেঁচে থাকার জন্য হালের গরু বিক্রি করেছিল। এক সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, কুড়িগ্রাম অঞ্চলে প্রায় তিন ভাগের এক চাষী অভাবের তাড়নায় হালের বলদ বেঁচে দিয়েছিল।[৮৫] এছাড়া জেলায় জমি বিক্রির ঘটনাও ঘটেছিল অস্বাভাবিক।[৮৬] এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সালের প্রথম নয় মাসে কেবল নীলফামারী সাব রেজিস্ট্রারী অফিসেই গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী জমি রেজিস্ট্রি হয়েছিল।[৮৭] আলোচ্য নাটক দু'টোতেও এ চিত্র পাওয়া যায়।

দুঃখীর ইমান

.....

ধর্ম্মদাস - ... তোমার ত হাল গরু আছে। ... হামার'ত তাও নাই।

বুদ্ধিমান - গরু ব্যাচেয়া না খাইছি। .... করজ শোধ দিতে সোদর হাউলিয়া[৮৮] খাওয়াইতে ফুরাইছে। (পৃ. ২৫)

.....

জামাল -.... একটা খাসী আমার ছাওয়ালটা নিয়া বেড়াছিল আইছ সেটা বেচাছি হামার গাঁয়ের প্রধানের কাছে। ৪ টাকা দাম হইল। দুই ধারা ধান করচ নিছিনু[৮৯] তারে দাম ৩/০ আনা কাটি নিয়া-৪ পাইসা দিলে। .... জমি নাই, জিরাত নাই, কোনয় আশা নাই হামার, কোনই আশা নাই খালি হতাশ, মরি গেইলত হইলে হয়। (পৃ. ৭২)

ছেঁড়াতার

.....

গোবিন্দ - ঘরের ধান বেচাইলে, বলদ জোড়া গেল। উয়ার মায়ের নামে যে কয়দাগ জমীন আছিল তাও গেল ঐ হাকিমুদ্দীর প্যাটে। ... (পৃ. ৬৫)

.....

মামুদ - আকালে কাম দিলে শোলগাড়ীর শানুল্যা পাইকার। মুল্লুকটার গরু, বলদ কিছুই রাইখলেনা। যত আড়িয়া বকনা বলদ, গাই স স্তায় কিনিয়াদিলে লালমনিরহাটে চালান করিয়া। শুনি সেইটে নাকি ওজন করিয়া গরু কিনে। সেরকে তিন টাকা। (পৃ. ৬৭)।

.....

তমিজ - মানুষ কোনটা কইরলে? ভোখের জ্বালায় জমীন বাচাবার গেইনো।[৯০] আবাদ শুদ্ধ শও টাকার বেশী কয়না। শও টাকায় ৪ মণ ধানের থাকি কি দ্যাওয়া যায়?

শ্রীমন্ত - দ্যাখো যায়া রেজেস্টারীতে[৯১]। দিন রাইতে কাম হইতেছে। সব জমীন ধনীর প্যাটে গেল। (পৃ. ৭০-৭১)

খাদ্য সংকট তীব্র হলে মানুষ বাঁচার তাগিদে স্বাভাবিক খাদ্য নয় এমন অনেক কিছুই খেতে বাধ্য হয়।[৯২] চাল, ডাল, মাছ, মাংশের পরিবর্তে রাঙা আলু, কাঠ আলু সহ বিভিন্ন শাকপাতা অন্তর্ভুক্ত হয় খাদ্য তালিকায়। তাও আবার সামান্য সময়ের জন্য। কারণ এগুলোর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। তাছাড়া এ সম স্ত অখ্যাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বিভিন্ন মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ১৯৪৩ সালে রংপুরেও এই অবস্থা হয়েছিল। জেলায় মারাত্মক খাদ্যাভাবের কারণে গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ধরণের ফলমূল গাছের লতা পাতা খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলেছিল।[৯৩]

সজিনার পাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছিল।[৯৪] এসব অখাদ্য কুখাদ্য খাবার ফলে শুরু হয় মহামারী।[৯৫] যা জেলার দুর্ভিক্ষকে দীর্ঘ করেছিল। উক্ত অবস্থার বিবরণও এই নাটক দু'টোতে পাওয়া যায়।

দুঃখীর ইমান

.....

টেপারু - (উত্তেজিতভাবে) মইনো তো। শাক আলু আর শাক পাতা খায়া আছি। ৪/৫ দিন একবেলা ভাত খাওয়া জোটাবার পারিনা।

উংশী - একটা বুড়া লাউ বিজ কইরমো আর বশ[৯৬] বানামো বলিয়া রাখছিলো। প্যাটের ভুখে তাও খায়া ফেলাইছেনা। (পৃ. ২৫)

.....

বুদ্ধিমান - কৃষাণগুলার বাড়ীতে বৌ-বেটি ছাওয়া ছোট কচু ও শাক সিদ্ধ করি খাইতেছে। (পৃ. ২৭)

.....

জামাল - ... আইজ একমাসে পাঁচদিন ভাই খাইছি। শাকপাতা, কচু এই সব ভর্ত্তা করি খায়া হামার[৯৭] ছোট ছাওয়ালটার রক্ত আমাশার ব্যারাম হইছে, তাজা ছাওয়ালটা কাঠির মত হয়া গেইছে। বাঁচে কি মরে। (পৃ.৯২)

ছেঁড়াতার

.....

কুদরৎ - চাইরোপাকে হাহাক্কায়[৯৮] পড়ি গেইছে। আউষের ভরসা কচ্ছিল মানুষ তাওনা গেইছে। শাক আলুতে চৈত মাস গেইছে। আম কাঁঠাল আষাঢ় শাওন। এলায় কচু ঘেচু ছাড়া মানুষ আর কিসে বাঁইচবে।...(পৃ. ৫১)

.....

শ্রীমন্ত - বিপদের উপর বিপদ আইসে ভাই। তার উপর লাগি গেল কলেরা। ... (পৃ. ৮০)
.... কলেরা নাগিয়া বাড়ীর চাইর চারটা মানুষ মইলো। .... (পৃ. ৫৮)

পঞ্চাশের মনন্তর এতই বীভৎস ছিল যে, সে সময় মানুষ ভাতের পরিবর্তে ফ্যান ভিক্ষা করতো।[৯৯] ধান, চালের দুর্মূল্যের বাজারে ভাত ছিল অকল্পনীয় খাদ্য। ফলে অনাহারী মানুষ খাদ্যের সন্ধান করতে না পেরে বেঁচে থাকার জন্য এক পর্যায়ে ভাতের পরিবর্তে ভাতের ফ্যান ভিক্ষা শুরু করেছিল। এক সময় এই উচ্ছিষ্ট ফ্যানও দুষ্পাপ্য হয়ে যায়। '৪৩ সালের রংপুর জেলার এ জাতীয় একটি পরিবেশ পরিস্থিতির কথাও নাট্যকার তার নাটক দু'টোতে তুলে ধরেছেন –

দুঃখীর ইমান

.....

রঘুনাথ - ... এ সাল না খায়া মরা লাগিবে। হিংসা করি বিয়ান[১০০] হইতে ছওয়াগুলাক কচুর পাতা হাতে নিয়া হামার বাড়ীতে পাটেয়া দ্যায়।

ধর্ম্মদাস - ক্যানে।

রঘুনাথ - কৃষাণ মজুরগুলার বিয়ানের ভাত হইলে কয় ভাতের ফ্যানগুলা হামাক[১০১] দাও। এমন শিক্ষা দিছে যে ফ্যান চায় আর কাঁদন নাগে ন্যায়। আরে হামি যে শও টাকা দিয়া পশ্চিমা গাই কিনছি তাক ফ্যান, খোয়াবার নাই। কিছুয় বোঝে না, খালি হিংসা। (পৃ. ৩১)

ছেঁড়াতার

.....

রহিম - ... যত তোমার মত না খাওয়া মানুষ গুলা খালি ফ্যান দাও ফ্যান দাও করি কাইন্দাতেছে আর রাস্তায় ইতি উতি[১০২] পড়ি দম ফুরাইতে মইত্তেছে। (পৃ. ৭১)

অভাবী ও অনাহারী মানুষকে রান্না করা খাবার সরবরাহের জন্য সে সময় সরকার লঙ্গরখানা খুলেছিল।[১০৩] একবেলা খাবারের আশায় প্রত্যেকদিন দূরদূরান্ত থেকে অগণিত মানুষ এখানে এসে ভীড় করে। লঙ্গরখানার মানুষ ভুলে গিয়েছিল জাত-পাত আর মান সম্মান। তবে এখান থেকে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করা হতো না। সে সময়ে রংপুর জেলার লঙ্গরখানা বিষয়ে বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, অনাহারী মানুষকে সাহায্যের জন্য রংপুরে স্থাপিত লঙ্গরখানার সংখ্যা ছিল খুবই কম এবং এগুলো চালু করা হয়েছিল বিলম্বে।[১০৪] লঙ্গরখানা গুলোতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের প্রচণ্ড ভিড় থাকলেও [১০৫] এখানে সাহায্যের পরিমাণ ছিল অপ্রতুল এবং খাবার ছিল অপুষ্টিকর।[১০৬] তাছাড়া বেশির ভাগ সাহায্য লঙ্গরখানা তদারকি কাজে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ নিজেরাই আত্মসাৎ করত।[১০৭] ছেঁড়াতার নাটকেও লঙ্গরখানার এরূপ কাহিনী সমর্থিত হয়েছে–

.....

ওহিম - ... কাগজে পড়ছি কত কত গেরামে লঙ্গরখানা হইছে। (পৃ. ৭৪)

.....

হাকিম - হামরাও হাকিমকে লঙ্গরখানার কথা কমো। যদি বুঝি যে হাকিমের মত আছে, ত' হামরায় ভার নিয়া কাজ কাম শুরু করি দেমো।(পৃ.৭৬)

.....

ওহিম - যাও যাও ফুলজান উয়াক[১০৮] নিয়া লঙ্গরখানায় যাও। উয়াক খোয়াও। উয়াক বাঁচাও। ... ক্যানে দেরী করিস? মানুষ বেশী হইলে খাওয়া পাওয়া যায় কি না যায়- যাও যাও ছাওয়াক খোওয়াও। (পৃ. ৮৪)

.....

মামুদ - ওঠে ভিক্ষুক হয়া গেইলে মান যাবার নয়।

গোবিন্দ - মান ক্যানে যাইবে ...। (পৃ. ৭৪)

.....

শ্রীমন্ত - কাইল[১০৯] মুইও খাইছোঁ না। দ্যাখ যায়া কত হিন্দু মুসলমান, বাবাজি- ফাবাজি [১১০] সব আসি জড়ো হইছে। আকালে সব এক হয়া গেল। (পৃ. ৮৫) ... তুইনা কছিলুরে যে লঙ্গরখানায় ৪/৫ শওয়ের বেশী মানুষ হবার নয়। দ্যাখ যায়া মাইনষের গুমগুমী আর ধুমধুমী।[১১১] (পৃ. ৭৭)

.....

ওহিম - মুই ফুলজান আর বছিরোক হাকিমুদ্দীর বাড়ীর লঙ্গরখানাতে পাঠাইছোঁ। উঃ মোক হাইর মানাইলেরে? (পৃঃ ৮৫)

হাকিম - ... লঙ্গরখানা হইলে তোমার হাতে চাউল-ডাউল থাকিবে সঙ্গে মুইও আছোট। সবারে কিছু কিছু হইবে। (পৃঃ ৭৬)

শ্রীমন্ত - ... উয়ারে বাড়ীতে লঙ্গরখানা চাউল-ডাউল আমদানী হয় ফির উয়ারে হাতে হিসাব।

রহিম - শ্রীমন্ত। এই রকম মানুষগুলার মান নাই। কিন্তুক লাভের হুশ আছে পুরো। লাভের গন্ধ পাইলে ঘুসটি ঘুসটি[১১২] সব কামে যায়া ইয়ারা জুটে। (পৃঃ ৭৮)।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ অসহায়, অভাবগ্র স্ত মানুষকে সাহায্যের জন্য সরকার সারাদেশে কন্ট্রোল (রেশনিং) ব্যবস্থা চালু করেছিল।[১১৩] উদ্দেশ্য ছিল কন্ট্রোলের দোকান থেকে চাল, ডাল, লবণ, কেরাসিন ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যে দুর্দশাগ্র স্তদের সাহায্য করা। রংপুরেও এসময় রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।[১১৪] কন্ট্রোল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল মানুষের তুলনায় কন্ট্রোল দোকানের সংখ্যা অনেক কম ছিল।[১১৫] আর

এই ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন দূনীতি পরায়ণ।[১১৬] দুঃখীর ইমান নাটকে দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুরে কন্ট্রোল ব্যবস্থার প্রমাণ মেলে –

ওাম - আর বাপরে কউন কউন, গ্রাম যে হাজারো আদমী আসিয়ে গিয়েছে, আউর কন্ট্রোলকে এক দোকান।

ছোট - কেন চাল পেলে না? (পৃ.৭৩)

ধর্ম্ম - রাইত থাকিয়া কত হাজার লোক আসিয়া রাস্তায় বসিয়া আছে। তা ফির শোনা গেল চাউল সবাকে দিবার পাইরবার নয় ... (পৃ. ৭৯)।

... এই যে হাজার হাজার লোক না খায়া, না দায়া তোমার সরকারী চাইলের দোকানের সামনে রাইত থাকিয়া খাঁড়াইয়া আছে, কোন মানুষটা জীব বলি তারা দয়াা কইরতেছে? .. (পৃ. ৮১)

.....

ভদ্র - ছোট বাবু, দয়া করে আমাদের দোকানে শীগগীর চলুন। ... চাল নেবার জন্য সব লাইন বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। এখন লাইন ভেঙ্গে সব মারামারি আরম্ভ করেছে। ... ভয়ানক ভীড়, অনেক লোক, কি জানি যদি গোলমালের ছুতো করে লুটপাট আরম্ভ করে...

ছোট - মারামারি করেছে ?

১ম লোক - না হুজুর। সকাল থাকি লাইনে খাঁড়া আছি। আর এই লোকটা দৌড়িয়া আসিয়া ঠেলাঠেলি করিয়া হামার আগে খাঁড়া হইল। মানা করিনো অমনি হামাক মারিল।

দুর্ভিক্ষের বছরে মাঝে মধ্যেই খাদ্য শস্য চুরি ডাকাতি সংঘটিত হতো। অবস্থাপন্ন কৃষক বা যাদের বাড়ীতে ধান-চাল মজুত ছিল তারাই এ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে রা স্তা-ঘাট বা বাজার থেকেও খাদ্যশস্য লুটের ঘটনা ঘটতো।[১১৭] মূলত অনেকেই এমন দুর্দিনে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন হিসাবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কাজে লিপ্ত হয়েছিল। জেল-পুলিশের ভয় তারা করতো না। তারা মনে করতো জেলে গেলে অন্তত একবেলা খাবার পাওয়া যাবে। ১৯৪৩ সালে রংপুরের দুর্ভিক্ষের সময়ে এখানেও এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়ে বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, এখানকার শস্য ডাকাতরা অতর্কিতে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ির দোকান, খাদ্যশস্যবাহী গাড়ি, কৃষকের শস্যগোলা আক্রমণ করে তা লুট করত।[১১৮] পঞ্চাশের মনন্তরের এরকম একটি সামাজিক প্রতিচ্ছবি নাট্যকার তার এ দু'টো নাটকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন –

দুখীর ইমান

ধর্ম্মদাস - ক্যানে? [১১৯] চুরি করবু।

বংশী - কইরময় ত না খায়া থাকিমো না কি?

ধর্ম্মদাস - তারপর যখন পুলিশ আসিবে, ধরি নিয়া জ্যালে[১২০] রাখি দিবে তখন?

সকলে - ধরে ধইরবে। আইজত খায়া বাঁচি? (পৃ. ২৭-২৮)

... শালা ধনীর ঘর। শ্যালারা হামাক দ্যাখে খায় আর হামরা।

লোক - জেলে ভয় কিরে। সেখানে সব এক সাজ পোষাক এক খাওয়া। যত জ্বালা ত বাইরে। আর দশজন ভাল খাবে, আর আমি পারব না-এতেই গায়ের জ্বালা হয়।

... ...

ওাম - ... ওদিন দফাদার বলিতেছিল কিযে, এই মুল্লুক কে সব আদমী চোর হইয়ে গিয়েছে। এওকর[১২১] বাড়ী চুরি করতেসে।

... ও সব আদমী ভুখকে মারে চোর হইয়ে গিয়েছে কি না?

ছোট - হোক হোক। লুটতরাজ হওয়া দরকার। খালি ধান চুরির এজাহার লিখে লিখে বিরক্ত ধরে গেল।

ওাম - হপ্তামে চার রোজ তো থানাযে ডিউটি আওর তিন রোজ মফস্বল। আউর সেখানে ভি কোই ডরতেছেনা। বলে কি পুলিশে ধরিয়ে লিবে তো কি হোবে? খানাতো মিলবে। ... (পৃ. ৭৪-৭৫)

ছেঁড়াতার

গহরুল্লা - ...দ্যাওয়ানীর বড়য় ভয় হইছে। কয় নৌতুন নৌতুন মানুষজন নাকি গেরামে দেখা যাইতেছে। যায়া তুই প্রেসিডেন্টক কয়া আয়-গ্রামরক্ষীগুলাক একটু চ্যাতন [১২২] করি নেয়।

কুদরৎ - হয় হয় দ্যাখো যায়া সরোমামুদের আঙ্গিনায় চতুরপাশের মানুষগুলা জড়ো হইছে।

গহরুল্লা - ... কেনেরে। লুটতরাজ হইবে নাকি? (পৃ. ৬৪-৬৫)

... ...

হাকিম - ... চতুরপাকে হাহাকার। একদিন ফটকরি[১২৩] লুট হয়া যাইবে। লুটের চাকর বাকর সব সেই দলে হয়া যাইবে। (পৃ. ৫৫-৫৬)

... ...

মামুদ - দ্যাওয়ানী অনেক মানুষ। সব গোটো[১২৪] হইছে সরেমামুদেও আঙ্গিনায়।

হাকিম - লুটের বুদ্ধি কইরবার আইসছে বুঝি রহিম্‌দ্দীর কাছে। (পৃ. ৭৫)

... ...

প্রেসিডেন্ট - লুটের যুক্তির খবরত আমি পাচ্ছি। থানায় একটা খবর পাঠেয়া দিছি। (পৃ. ৭৬)

সাধারণ কৃষক ও দরিদ্র দিনমজুর ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে বেশী ক্ষতিগ্র স্ত হয়েছিল।[১২৫] জীবীকা নির্বাহের জন্য এদের পর্যাপ্ত জমি না থাকা এবং অনেকের একেবারেই না থাকার কারণে এরা ছিল দিনমজুরীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাব এতটাই তীব্র হয় যে, এই শ্রেণীটির পক্ষে অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুরেও এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দুর্ভিক্ষ বিষয়ক বিভিন্ন রিপোর্টে দেখা যায় যে, ১৯৪৩ সালে জেলার প্রায় সকল দ্রব্যাদির দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদার, জোতদার, রায়ত বা অবস্থাপন্ন কৃষক খুব প্রয়োজন না হলে কোন মজুরকে কৃষি বা অন্যকোন কাজে নিয়োগ করেনি।[১২৬] তাছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় মজুরিও ছিল কম। ফলে ভূমিহীন ক্ষেতমজুররা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে এবং ত্রাণ কেন্দ্র গুলোতে ভিড় করে অথবা খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করে।[১২৭] দুর্ভিক্ষের এরূপ বা স্তবতার চিত্র নাটক দু'টোতে দেখা যায় –

দুখীর ইমান

... ...

ধর্ম্মদাস - চাউলের দাম বাড়িয়া খোরাকি[১২৮] দেওয়া লাগে বলিয়া হাউলি কৃষাণ[১২৯] কায়ো ডাকাবারে চায়না। আর চাইলেকি দিবেতো ৯ পাইসা আর এক বেলার খোরাক। সারাদিন খাটিয়া দুইবেলা প্যাটের ভাতে জোটবার পারিনা তোকে খাওয়াম কি? ...

... ...

বংশী - পইসা[১৩০] কোটে পাই। খোরাকী দেওয়া নাগে[১৩১] বলিয়া কায়ো কৃষাণ ডাকাবার চায়না। ... (পৃ. ২৬)

ছেঁড়াতার

... ...

সামাদ - আচ্ছারে গোবিন্দ ভাই। হামারা এই চাষীগুলা ধান, চাউল, আনাজপাতি[১৩২] সব পয়দা করি ফির হামরায় না খায়া মরি। বন্দরিয়া[১৩৩] মানুষগুলা কিছুই পায়দা করেনা তার ক্যানে আকাল নাইরে।(পৃ. ৬৯)

.. .. । আইজো কোনও কাম পালুনা।

রহিম - কে কাম দিবে? খোরাকী দ্যাওয়া নাগে যে। রোয়াগাড়া [১৩৪] সাড়া পইড়ছে। চাষের বা কাজ কই? আর থাকিলেও ডাকে না (পৃ. ৭৭)

... কাইল সারাদিন বাড়ী আসি নাই। এটেওটে [১৩৫] কাজের খোঁজে বেড়াচ্ছি। কোনঠে কাম পাইনো না। ... । (পৃ. ৭৯)

দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ বাঁচার জন্য মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছিল। এ সময় মানুষ বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন হিসাবে নিজের ছেলে-মেয়েকে অনেকটা বাধ্য হয়ে বিক্রি করে দিত।[১৩৬] স্নেহ বা ভালবাসার বন্ধন এখানে হয়ে যায় গৌণ। দুর্ভিক্ষের সময় রংপুরে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। অনাহারী অভাবি কৃষক এ সময় তার স্ত্রী কন্যাদের বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। এ সুযোগে যুবতী মেয়েদের কেনার জন্য গোপনে মেয়ে ব্যবসায়ী ও দালাল তৈরি হয়েছিল।[১৩৭] জেলার এ রকম পরিস্থিতির বিবরণ ছেঁড়াতার নাটকে পাওয়া যায়।

... ...

শ্রীমন্ত - ...। যদি বাঁচি থাকিরে ভাইত কবার[১৩৮] পাইরমো[১৩৯] আকাল কাক কয়। গাই বদলের চায়াও মাইনসের দাম কম হইল হে। দুলুটা উদিনকা[১৪০] পাঁচ টাকাতে ব্যাছে দিছে যুয়ান বৌটাক।

মামুদ - হয় নাকিন। কায় কিনলেরে।

গোবিন্দ - শীতু পাইকার।

তমিজ - দুলুর বউটাও ত আচছা বেটি ছাওয়া। উয়াক[১৪১] বেচাইলে তবু অয় কিছু কইলোনা।

গোবিন্দ - আরেভাই যে মানুষটা টাকা দিয়া কিনলে তায়ত[১৪২] খাবার দিবে? দুলুর ঘরে ধরম ধরি থাকলে নগদ যে শুটকী হয়া মরা।

... ...

ওহিম - ... ... যে ঝড় দেশের উপর দিয়া বয়ে গেল .. তাতে কতজনেরই ত ঘর ভেঙ্গেছে মা-বাপ সন্তানকে বেচেছে, স্বামী স্ত্রীকে বেচেছে। (পৃ.৯৬)।

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের কারণে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যার একটি ছিল পতিতা বৃত্তি[১৪৩]। দুর্যোগের সময় অভাবে পড়ে অনেক পুরুষই স্ত্রী কন্যাকে ত্যাগ করেছিল। সহায় সম্বলহীন এ সম স্ত ছিন্নমূল মানুষ সহজেই দালালদের খপ্পরে পড়ে ইংরেজ সৈনিকদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে রংপুরে স্থাপিত সেনাক্যাম্প গুলোতে অভাবের তাড়নায় বিক্রিত মেয়েদের দিয়ে দেহ বিক্রির ব্যবসা চলেছিল।[১৪৪] এ রকম একটি সামাজিক সমস্যাও ছেড়াতার নাটকে চিত্রিত হয়েছে-

... ...

তমিজ - শীতু পাইকারকে দ্যাখে দিস ভাই। সব ব্যাচেয়া দেমো।

গোবিন্দ - তাঁয়[১৪৫] আবার ছোটগুলাক[১৪৬] নেয় না। খালি যুয়ান গাবুর[১৪৭] গুলাক কেনে। যুয়ান বেটি ছাওয়া দিয়াও নাকি মিলিটারীর কাম হয়। ... (পৃ. ৬৭)

পঞ্চাশের মনন্তর ছিল ভয়াবহ। এ দুর্যোগে পড়ে মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে অকাতরে রা স্তাঘাটে পড়ে মারা গিয়েছিল।[১৪৮] প্রয়োজনীয় সৎকারের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে এ সম স্ত মরদেহ শিয়াল কুকুরের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল।[১৪৯] ব্যাপক অনাহার ও মহামারিতে জেলার বিভিন্ন এলাকাতেও প্রতিদিন মানুষ মারা যেত। এ সম স্ত মৃত মানুষদের অধিকাংশ বিভিন্ন রা স্তাঘাট, স্টেশনের প্লাট ফর্মে পড়ে থাকত।[১৫০] দুর্ভিক্ষের সময়ে জেলার এ রকম একটি ভয়াবহ চিত্র ছেঁড়াতার নাটকেও দেখা যায়-

... ...

গোবিন্দ - শিয়ালে তাড়া কচ্ছিলরে? পার হইছে কোনও মতে ও! হো! কি আন্দাজ আকাল হইলরে। মরা মানুষ খায়া শিয়াল কুত্তার এমন ত্যাজ হইছে যে মানুষ দেখি আর ডরায় না।

মামুধ - কি? বাঁচি থাকিতে শিয়ালে খাইল?[১৫১]

গোবিন্দ - খাইলত। উপাসে মধূ মরিয়ায় আছিল। ঘরের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়া শিয়ালগুলা ঢুকিয়া ধইচ্চে টুটি কামড়েয়া। আর কাবড়াবারও[১৫২] পাওে নাই। (পৃ. ৬৬)।

দুর্ভিক্ষের সময়ে দেশত্যাগের ঘটনাও ঘটে থাকে। অভাবে পড়ে সবকিছু হারিয়ে মানুষ যখন নিঃস্ব হয়ে যায় তখন সে খাদ্যের সন্ধানে অন্যত্র চলে যায়।[১৫৩] রংপুরে এই চলে যাওয়াকে স্থানীয়ভাবে বলা

হতো 'ভোটান-যাওয়া'।[১৫৪] খাদ্যের সন্ধানে যে সম স্ত অভাবী মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যেতো লোকে মনে করতো তারা ভুটানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তবে ভুটান কোথায়া তা তারা জানতো না। আলোচ্য নাটক দু'টোতে দুর্ভিক্ষের সময়ে দেশত্যাগের ঘটনা উল্লেখ আছে -

দুঃখীর ইমান

... ...

ভুঁই - এ ব্যাটা যে দক্ষিণ দেশী কথা কয়। বাড়ী কোথায় তোর ?

লোক - অনেক দুর-নদে[১৫৫] জেলা।

ভূঁই - এখানে এলি কি করে?

লোক - আকাল-সারা বাঙলায় আকালের বান ডেকেছে। কে কোথায় বান- ভাসা হয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে। সব দক্ষিণে কলকাতার দিকে গেল, আমি এলাম উত্তরে। (পৃ. ৫২)।
... শহরের খবর রাখিসনা, সেখানে দলে দলে কাঙ্গাল গিয়ে জুটেছে। ভাবছে ভিক্ষা করে খাবে। ... (পৃ. ৫২)

ছেঁড়াতার

... ...

গোবিন্দ - মুইত, দ্যাশান্তরী হয়া শহরে চলি যাবার মন কচ্ছি। (পৃ. ৭১)।

... ...

রহিম - কাইল বিহানে মুই যে ফুলজান আর বছিরকে পাঠেয়া দিবার চাই ফুলজানের ফুফার বাড়ী ... দেখি যদি দুঃখের দিনে উয়ারা কয়দিন প্যাট দুটা চালে দিবার পারে।

শ্রীমন্ত - হইবেরে একদিনের খোরাকির বুদ্ধি হইবে। তুই চলেত ত'কাইল শহরে .... (পৃ. ৭৪-৭৫)

চাষী, মজুর, সাধারণ কৃষকদের সাথে সে সময় দেশের শিক্ষিত সমাজও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে বিশেষ করে শিক্ষক সম্প্রদায় চরম দূরাবস্থায় পতিত হয়েছিল।[১৫৬] বাজার মূল্যের সাথে তাদের আয় সামঞ্জস্য পূর্ণ না হওয়ায় তারা প্রায় অর্ধাহারে অনাহারে জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। 'দুঃখীর ইমান' নাটকে এ বিষয়েও বক্তব্য পাওয়া যায় -

ধর্ম্মদাস - ... প্যাটের ভুখের[১৫৭] দুঃখের কাছে কি আর কিছু আছে মাস্টার বাবু. সে দুখ তোমরা বুঝাবারে পারবার নন।

মাস্টার মহাসয় - ... আমাদের বুঝি উপবাস কর্ত্তে হয় না- এই তোর ধারণা। ... আমার মত খেটে খাওয়া অনেক ভদ্রলোক আজ তোদের মত উপবাস কচ্ছে। সারা দেশের খেটে খাওয়া লোক খিদেয় কষ্ট পাচ্ছে। (পৃ. ৮-৯)

দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশার সম্মুখীন হলেও একটি বিশেষ শ্রেণী ছিল দুর্ভিক্ষমুক্ত [১৫৮]। বিশেষ করে গ্রামের সুদখোর মহাজন, উচ্চবিত্ত পরিবার, বড় ব্যবসায়ী প্রমুখ ছিল দুর্ভিক্ষের বাইরে। কারণ এদের অধিকারে ছিল জমির মালিকানা ও ধান, চালের মজুত, জমি বিক্রি ও বন্ধক রেখে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা। এ বিষয়গুলো দুঃখীর ইমান নাটকে পাওয়া যায় -

... ...

ধর্ম্মদাস - তাঁয় কয়া[১৫৯] গেল সারা দুনিয়ায় নাকি এই দ্যান আকাল।

টেপারু - হেই। ধনীর ঘরে আকাল কোটে।[১৬০] রঘুনাথ প্রধান কাইল হাটে ৫ আনা দিয়া বড় বড় পানি মাছ কিনি নিয়া গেল। (পৃ. ২০)

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এটা বলা যায় যে, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের প্রভাব বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত রংপুর জেলাতেও অনুভূত হয়েছিল। প্রাণহানিসহ নানা ধরনের সামাজিক বিপর্যয় এ সময়ে লক্ষ্য করা

গেছে। একদিকে স্থানীয় সুদখোর, মজুতদারের অপকর্ম, অন্যদিকে সরকারী অবহেলা রংপুরের জনগণের দুর্বিসহ যন্ত্রণা আরও বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছিল। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় রংপুরে স্থানীয়ভাবে রচিত নাটক থেকেও এর প্রমাণ মেলে। মূলতঃ মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে রংপুরে যে নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা নির্দিষ্ট কোন স্তরে থেমে থাকেনি। আর এই মন্বন্তর লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল দুর্ভিক্ষের বিষয়ে নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে। তৎকালীন এক তীব্র আর্থ-সামাজিক সংকটের প্রেক্ষাপটে এবং সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে এ সম স্ত নাটক রচিত হওয়ায় এ সকল স্থানীয় নাটকের মধ্য দিয়ে রংপুরের দুর্ভিক্ষের প্রকৃত একটি স্বরূপ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বিশেষ করে 'দুঃখীর ইমান' ও 'ছেঁড়াতার' নাটকে দুর্ভিক্ষের যে প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মজুতদারী ব্যবস্থা, খরা, তীব্র খাদ্যভাব প্রভৃতি কারণে যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি তার ফলে অনাহার, মহামারী, মৃত্যু, লঙ্গরখানা, পশু-পাখির বেওয়ারিশ লাশ ভক্ষণ বসত ভিটা ত্যাগ গৃহস্থলী সামগ্রী বিক্রি, স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি দুর্ভিক্ষের সময়ে রংপুরের একটি মর্মান্তিক অথচ প্রত্যাহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। মন্বন্তর সাধারণ মানুষের জীবনে প্রচণ্ড দুর্ভোগ ও দুর্দশা সৃষ্টির পাশাপাশি তীব্র অর্থনৈতিক ও নৈতিক সংকট সে সময় কালোবাজারী, মুনাফাখোর, নারী ব্যবসায়ী তথা অর্থ লোভীর মত একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায় যা দুর্ভিক্ষকে দীর্ঘ করেছিল। এমনিভাবে ১৯৪৩ সালে রংপুরের দুর্ভিক্ষের সামগ্রিক বিষয়ের একটি চিত্র এ সম স্ত নাটকে পাওয়া যায়।

তথ্যপঞ্জি

1. B. M. Bhatia, *Famines in India: A study in some Aspects of the Economic History of India, (1860-1945)*, New York: Asia Publishing House, 1963), P. 7. f. n. 15.
2. ২৯৮ খৃ. পূর্বাব্দ থেকে ১৯৪৪ খৃ. পর্যন্ত ভারতে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের তালিকায় দেখা যায় যে, বৃটিশরা বাংলায় ক্ষমতা গ্রহণের (১৭৬৫ খৃঃ) পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় মাত্র ৩টি দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে বৃটিশদের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত মাত্র পৌণে দু'শো বছরে বাংলায় ৯টি বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। এ সম্পর্কে দেখুন- Paul R. Greenough, *Prosperity and Misery in Modern Bengal: The Famine of 1943-44*, (New York: Oxford Univeristy Press, 1982) Appendix A. Check List of Indian Famines From 298 B. C. To A. D. 1944, pp. 276-284.
3. বিস্তারিত দেখুন- Romesh Dutt, *Economic History of India: Vol. I & II*, (London: Routledge, 1950).
4. Paul R. Greenough, *op. cit.*, p. 237.
5. রংপুরে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বিষয়ে বি স্তারিত দেখুন- আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ্, *১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষঃ রংপুর জেলার একটি সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস, (ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮)
6. Sir John Woodhead (ed.), *The Famine Inquiry Commission Report*, (Delhi: Manager of Publications, 1945); Government of Bengal, Bengal Revenue Department. *A Scheme for Relief and Rehabilitation in Bengal*, (Calcutta: Bengal Government Press, 1944); Sir Theodore Gregory (ed). *Report of the Foodgrain Policy Committee*, (Delhi: Manager of Publications, 1944).
7. P. C Mahalanobis, æThe Bengal Famine: The Back-ground and Basic Facts", *Asiatic Review, vol.* 42 (January 1946), pp. 310-18; K. P. Chattapadhyay: Famine and Destitution in Rural Bengal", *Science and Culture*, Vol. II (November, 1945), pp. 228-39; Bimal Chandra Bhattacharaya, Extent of Starvation Among the Landless Workers of Bengal", *Science and Culture*, Vol. II, (May, 1946), pp. 4041-51.
8. Kalicharan Ghosh, *Famines in Bengal, 1771-1943*, (Calcutta: India Associated Publishing Company, 1944); B.M. Bhatia, *Op.cit.*; T.K. Dutt, *Hungry Bengal*,

(Lahore: Indian Printing works, 1944); T.G. Narayan, *Famine Over Bengal* (Calcutta: The Book Company Limited, 1944).

9. Paul R. Greenough, *op. cit.*

১০. বিস্তারিত দেখুন, সুধীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ, *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলন ও পার্টি*, (কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৮০), পৃ: ৭৫-৭৬; সুস্নাত দাশ, *ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা*, (কলিকাতা: প্রাইমা পাবলিকেশন, ১৯৮৯), পৃ: ১৯৪-২০১।

১১. সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ: ৪২-৪৩।

১২. গঙ্গাপদ বসু, *নাটক ও নাট্য আন্দোলন*, (কলকাতা: আনন্দ ধারা প্রকাশন, ১৯৭২), পৃ: ১১-১২।

১৩. ড. দীপক চন্দ্র, *বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা*, (কলকাতা: সাহিত্য সংস্থা, ১৯৮২), পৃ: ১৯০।

১৪. এ সম স্ত নাটকের নাম পাওয়া যায়নি, দেখুন, সুধীর মুখোপাধ্যায় ও নৃপেন ঘোষ, *প্রাগুক্ত*।

১৫। নাটকটির নাম পাওয়া যায়নি। দেখুন, ঐ পৃ. ৭৬-১২৫

১৬। ঐ পৃ. ৭৬

১৭। ঐ

১৮। সুস্নাত দাশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

১৯। তুলশী দাস লাহিড়ী, *দুঃখীর ইমান*, (কলিকাতা: ভি.এম.লাইব্রেরী, ১৩৬০ বাং)

২০। তুলশী দাস লাহিড়ী, *ছেঁড়াতার*, (প্রকাশস্থান, প্রকাশক ও সাল নেই)

২১। সুনীল দত্ত, *নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর*, (কলকাতা: জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭২), পৃ: ৪৯

২২। Paul R. Greenough, *op.cit.*, p. 86-98

২৩। বদরুদ্দীন উমর, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার কৃষক*, (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৩৮১ বাং), পৃ: ৬৪

২৪। Paul R. Greenough, *op.cit.*, p. 89

২৫। *জনযুদ্ধ*, ২১ মার্চ, ১৯৪৩

২৬। সাক্ষাৎকার: নাম: শ্রী যিতেন্দ্রনাথ মুখার্জী, বয়স-৭৬, পেশা-ব্যবসা, গ্রাম-মাহীগঞ্জ, ওয়ার্ড নং-৫, থানা ও জেলা- রংপুর, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান-মাহীগঞ্জ নিজ ব্যবসা কেন্দ্র। তারিখ-০৬/০৭/১৯৯৫ খৃ:

২৭। ঐ

২৮। 'হামাক' অর্থ আমাদেরকে।

২৯। 'মোনায়' অর্থ ইচ্ছা।

৩০। 'দুনা দামে' অর্থ দুইগুণ।

৩১। 'ধামধুমিৎ' অর্থ শোরগোল।

৩২। 'এতেত' অর্থ এখানে।

৩৩। 'ওত্তিফির' অর্থ ওদিকে।

৩৪। 'হাওয়া জাহাজ' অর্থ যুদ্ধ বিমান।

৩৫। 'উয়ারায়' অর্থ তাহারা (এখানে সরকারকে বুঝানো হয়েছে)।

৩৬। 'আটকি' অর্থ আটক।

৩৭। বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*।

৩৮। বি স্তারিত দ্রষ্টব্য: *Famine Inquiry Commission Report, (1945),* pp.55-56

৩৯। *জনযুদ্ধ*, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪২

৪০। ঐ, ৬ জানুয়ারী, ১৯৪৩

৪১। Report from the sub-divisional officer. Nilphamari, To the District Magistrate and Collector, Rangpur, Copy to D.O. 3665. dated: The 28th October, 1942 (Rangpur Muhafezkhana Record) Gici RMR লেখা হবে।

৪২। 'হামার' অর্থ আমার।

৪৩। 'করজ' অর্থ ধার।

৪৪। 'কলু' অর্থ বললি।

৪৫। 'হামি' অর্থ আমি।

৪৬। 'নিছিনো' অর্থ নিয়েছিলাম।

৪৭। "আছিল" অর্থ 'ছিল'।
৪৮। 'আইজতক' অর্থ এ পর্যন্ত।
৪৯। 'গোলাৎ' অর্থ ধানের গোলা।
৫০। 'বাঁধি রাইখছে' অর্থ মজুত রাখা।
৫১। 'ক্যানে' অর্থ কেন
৫২। 'কওয়া' অর্থ বলা।
৫৩। 'আলগা' অর্থ আলাদা।
৫৪। 'কাঁয়' অর্থ কে।
৫৫। 'তুলি থুইলে' অর্থ উঠিয়ে রাখলে।
৫৬। 'কনত' অর্থ বলেনতো।
৫৭। 'নিছিল' অর্থ নিয়েছিলেন।
৫৮। 'কমো' অর্থ বলবো।
৫৯। 'দেমো' অর্থ দেবো।
৬০। 'পামো' অর্থ পাবো।
৬১। *Famine Inquiry Commission Report (1945)*, p.10
৬২। নূরুল ইসলাম (সম্পা:), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার রংপুর*, (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মন্ত্রণালয়, ১৯৯০), পৃ: ১৪৪-১৪৫
৬৩। ঐ
৬৪। 'চাইরোপাকে' অর্থ চারিদিকে।
৬৫। 'একস্যার' অর্থ একসের।
৬৬। এ বিষয়ে বি স্তারিত দেখুন, *Encyclopaedia Britannica*, Vol-9, (Chicago: William Benton, 1973), P. 58; *Chambers Encyclopaedia*, Vol-5, (Oxford pergamon Press, 1967), P. 560. Edwin R.A. Sligman (ed.), *Encyclopedia of Social Sciences*, Vol-5-6, (Newyork: The Macmillan Company, 1959), P. 85.
৬৭। Report from Kurigram Sub-divisional Officer to the Collector of Rangpur, Land Revenue Administrationn Report of the Kurigram Sub-division. No. 1080. Date 15th april, 1942 (RMR); *জনযুদ্ধ*, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩
৬৮। *জনযুদ্ধ*, ৫ এপ্রিল ১৯৪৩, ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩
৬৯। Inspection Report of the Chairman Rangpur Disrict Board, File on 10th May 1942 to 28th December 1942. (Rangpur Zilla parisad Records) এরপর RZPR লেখা হবে।
৭০। 'ছাওয়াছোট' অর্থ সন্তান সন্ততি।
৭১। 'মইনো' অর্থ মরে গেলাম।
৭২। 'পুছে' অর্থ প্রশ্ন করে।
৭৩। 'ভিতে' অর্থ দিকে।
৭৪। 'উয়ার' অর্থ তার।
৭৫। 'পাইলছে' অর্থ লালন-পালন করা।
৭৬। 'ঝাঁকি' অর্থ রেগে।
৭৭। 'পাইন্যেনা' অর্থ পারলাম না।
৭৮। এ বিষয়ে বি স্তারিত দ্রস্টব্য: পিটার কাস্টার্স (কৃষ্ণা নিয়োগী অনুদিত), *তেভাগা অভ্যুত্থানে নারী: গ্রামীণ গরীব নারী ও বিপ্লবী নেতৃত্ব, ১৯৪৬-৪৭* (ঢাকা: গণসাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৫২-৫৩
৭৯। 'ছ্যাওঠা' অর্থ মেয়েদের ছায়া।
৮০। 'পল্টন' অর্থ সেনা বাহিনী।
৮১। 'প্যাত্তানী' অর্থ প্রেত শব্দের আঞ্চলিক রূপ।
৮২। এ বিষয়ে বি স্তারিত দেখুন: J.K. Bose, 'A Survey of Callcultta Destitute', *Modern Review. 75*, (June, 1944), pp. 428-29; Paul R. Greenough, *op. cit.*, p. 219
৮৩। *জনযুদ্ধ*, ২৮ অক্টোবর, ১৯৪২

৮৪। ঐ
৮৫। ঐ
৮৬। অমলেন্দু দে, *বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পু স্তক পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ: ২৪৮
৮৭। *দৈনিক আজাদ*, ৩০ অক্টোবর, ১৯৪৩
৮৮। 'সোদর হাউলিয়া' অর্থ যারা কেবলমাত্র আত্মীয় স্বজনের মধ্যে খাবার বিনিময়ে চাষের কাজ করে।
৮৯। 'নিছিনু' অর্থ নিয়েছিলাম।
৯০। 'গেইনো' অর্থ গেলাম।
৯১। 'রেজিস্টারীতে' অর্থ রেজিস্ট্রী অফিস।
৯২। Paul R. Greenaough, *op. cit.*, p. 23
৯৩। *জনযুদ্ধ*, ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩
৯৪। ঐ
৯৫। Inspection Report to the Chairman of Rangpur District Board, File on 3.7.1943 to 30.6.1944 (RZPR);
৯৬। 'বশ' অর্থ লাউ গাছে লাউ বড় হয়ে শুকিয়ে গেলে এর (লাউয়ের) ভিতরের অংশটুকু বের করার পর শুকনা লাউ।
৯৭। 'হামার' অর্থ আমার।
৯৮। 'হাহাক্কায়' অর্থ হাহাকার।
৯৯। Bhabani Bhattacharya, *So Many Hungers*, (Bombay: Jaico, 1964), p. 173.
১০০। 'বিয়ান' অর্থ সকাল।
১০১। 'হামাক' অর্থ আমাদের।
১০২। 'ইতি-উতি' অর্থ এখানে ওখানে।
১০৩। *Famine Inquiry Commission Report (1945)*, p. 70
১০৪। *দৈনিক আজাদ*, ৫ আগস্ট, ১৯৪৩
১০৫। Rangpur District Board Meeting. Special Resolution No. 1. Dated 14th July 1943. (RZPR)
১০৬। *Famine Inbquiry Commission Report (1945)*, p. 128
১০৭। *দৈনিক আজাদ*, ঐ
১০৮। 'উয়াক' অর্থ তাকে।
১০৯। 'কাইল' অর্থ এখানে গতকাল বুঝানো হয়েছে।
১১০। 'বাবাজি-ফাবাজি' অর্থ দরবেশ সন্ন্যাসী।
১১১। 'গুমগুমী আর ধুমধুমী' অর্থ প্রচন্ড ভীড়।
১১২। 'ঘুমটি ঘুমটি' অর্থ অযাচিতভাবে।
১১৩। বিব স্তারিত দ্রষ্টব্য: *Famine Inquiry Commission Report (1945)*, pp. 63-65, 69.
১১৪। Proceedings of the special meeting of The Commissioners of The Rangpur Municipality of the 9th September, 1943. Rangpur Municipality Minite Record Report. File No. 6.4, 1943 to 6.4. 1944. (Rangpur Pourashava Records).
১১৫। *জনযুদ্ধ*, ২০ অক্টোবর, ১৯৪৩
১১৬। *'দৈনিক আজাদ'* ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩
১১৭। আরও দেখুন-*Famine Inquiry Commission Report (1945)*, p. 68
১১৮। Letter from O/C Kishoreganj P.s. to the Sub-divisional Officer Nilphamari. No. 8972. Dated 14th March, 1943. (RMR).
১১৯। 'ক্যানে' অর্থ কেন।
১২০। 'জ্যালে' অর্থ জেলে/হাজতে।
১২১। 'এওকর' অর্থ একে অন্যের।
১২২। 'চ্যাতন' অর্থ সজাগ।

১২৩। 'ফটকরি' অর্থ হঠাৎ।
১২৪। 'গোটো' অর্থ একত্রিত হওয়া।
১২৫। *Famine Inquiry Commission Report (1945)*, p.68
১২৬। Letter from The Chairman Rangpur District Board, to The collector of Rangpur, No. 135G. Dated 19-10-1943 (RZPR)
১২৭। *Ibid.*
১২৮। 'খোরাকি' অর্থ কাজের বিনিময়ে প্রদত্ত খাবার।
১২৯। 'হাউলি কৃষাণ' অর্থ খাবার বিনিময়ে কাজ করা।
১৩০। 'পইসা' অর্থ পয়সা।
১৩১। 'নাগে' অর্থ লাগে।
১৩২। 'আনাজপাতি' অর্থ শাকসবজি।
১৩৩। 'বন্দরিয়া' অর্থ শহরবাসী।
১৩৪। 'রোয়াগাড়া' অর্থ চারা রোপন করা।
১৩৫। 'এটেওটে' অর্থ এখানে ওখানে।
১৩৬। 'বি স্তারিত দেখুন- Paul R Greenough, *op.cit.*, pp. 220-250
১৩৭। অদিতি ফাগুনী (শাহীন রহমান সম্পা:), *বাংলার নারী সংগ্রামী: ঐতিহ্যের সন্ধানে*, (ঢাকা: স্টেপসটুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৭), পৃ. ১১৪
১৩৮। 'কবার' অর্থ বলতে।
১৩৯। 'পাইরমো' অর্থ পারবো।
১৪০। 'উদিনকা' অর্থ গত পরশু।
১৪১। 'উয়াক' অর্থ তাকে।
১৪২। 'তায়ত' অর্থ তিনি/সে।
১৪৩। বি স্তারিত দ্রষ্টব্য: পিটার কাষ্টাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ৫০-৫২
১৪৪। ঐ, পৃ. ৫১
১৪৫। 'তাঁর' অর্থ তিনি।
১৪৬। 'ছোট গুলাক' অর্থ অল্প বয়সী মেয়ে।
১৪৭। 'যুয়ান গাবুর' অর্থ যুবতি মহিলা।
১৪৮। *Famine Inquiry Commission Report (1945)*, p. 109
১৪৯। ধনঞ্জয় রায় (সম্পা:), *রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা সংগ্রাম*, (কলিকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৮৬), পৃ: ১০১
১৫০। *দৈনিক আজাদ*, ১২ অক্টোবর, ১৯৪৩
১৫১। 'খাইল' অর্থ খেয়ে ফেললো
১৫২। 'কাবড়াবার' অর্থ চিৎকার করতে
১৫৩। Paul R. Greenough, *op.cit.* p-218
১৫৪। এ বিষয়ে বি স্তারিত দেখুন, সত্যেনসেন, *গ্রামবাংলার পথে পথে*, (ঢাকা: কালিকলম প্রকাশনী, ১৩৮১বাং), পৃ.৭-৮
১৫৫। 'নদে' অর্থ নদীয়া জেলা
১৫৬। *দৈনিক আজাদ*, ৮ আগষ্ট, ১৯৪৩
১৫৭। 'প্যাটেরভুখের' অর্থ ক্ষিদে
১৫৮। *দৈনিক আজাদ*, ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৩
১৫৯। 'তাঁয় কয়া' অর্থ তিনি বলেন।
১৬০। 'আকাল কোটে' অর্থ দুর্ভিক্ষ কোথায়।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

বগুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারে সুফি সাধকগণের অবদান

মো. আখতার হোসেন*
মো. আব্দুল খালেক♣

Abstract: Sufis message to the individual is, 'Love all and forget your own individuality in doing well to others.' To win the peoples' heart is the greatest pilgrimage, and one heart is worth more than a thousand Kaba which is a mere cottage built by Abraham but the heart is the very home of God. Sufism is a way and a means of striking a root though the harrow gate in the depth of the soul. These views are found among the sufis of Bogra district.

ভূমিকা:

মানুষের মরমি প্রবণতা বিশ্বজনীন। পৃথিবীর সবজাতি ও ধর্মের মধ্যেই এই মরমি প্রবণতা লক্ষ করা যায়। পরম সত্তার সাথে একাত্মবোধের বাসনা মানুষের প্রবৃত্তিজাত। ইসলামে এই মরমিবাদ তাসাউফ বা সুফিবাদ নামে পরিচিত। এই দর্শনকে আত্মোপলব্ধির দর্শনও বলা হয়। নিজেকে জানার এবং নিজের ভিতর দিয়ে আল্লাহকে চেনার উপাই সুফিমতবাদ। হযরত মুহম্মদ (স:) এর হেরা পর্বতের নির্জন আরাধনা, ভোগ-বিলাসহীন সরল জীবন-যাপন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সুফিবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সুফিগণ মনে করেন, কুরআনের অনেক উক্তির দুই অর্থ আছে। একটি ব্যক্ত অর্থ, অপরটি গুপ্ত অর্থ যা প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞানময়, সর্বশক্তিমান। এই গুণগুলোই তাঁর স্বরূপ। এছাড়া তাঁর অন্যরূপের মধ্যে আছে বিশ্বরূপ ও প্রেমময়রূপ। সমগ্র বিশ্বই তাঁর শক্তির প্রকাশ। তাই পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন, 'যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেই দিকই আল্লাহ মুখ।' আবার বলেছেন, 'আমি মানুষের কণ্ঠ-শিরা হতেও নিকটবর্তী।' এইসব বাণী থেকেই মূলত মরমি ভাববাদের আবির্ভাব ঘটেছে। সুফিগণ মহান আল্লাহর জ্ঞানের আরাধনা ও রাসূল (স:) এর জীবন আদর্শকে আপন জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে বরণ করে নিয়েছেন। রাসূল (স:) জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে অনুসরণ করে বেশ কিছু সাহাবা সর্বদা জাগতিক কাজ-কর্ম ফেলে মসজিদের এক পাশে জিকির ও ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তাঁদের বলা হতো আসহাবে সুফ্ফা। রাসূল (স:) এবং এই সাহাবীদের পথ অনুসরণে পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সুফিবাদের চর্চা শুরু হয়। রাসূল (স:) এর পর

---

* ড. মো. আখতার হোসেন সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রা. বি.
♣ প্রফেসর ড. মো. আব্দুল খালেক সভাপতি, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, রা. বি.

আহলে বয়াতের দায়িত্বপান হযরত আলী (রা:)। এরপর যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (রহ:), আবুল হাসেম (রহ:), জালাল উদ্দীন রূমী (রহ:), ইবনুল আরাবী (রহ:), ইমাম গায্যালী (রহ:), খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ:) প্রমুখ। বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ সুফি-সাধকদের মধ্যে আছেন হযরত শাহ্ জালাল (রহ:), হযরত শাহ্ মখদুম (রহ:), হযরত শাহ্ সুলতান মাহমুদ আল্ বলখী (রহ:) প্রমুখ। এঁদের মাধ্যমে ইসলামের মরমিবাদ সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর এই মহান ওলীগণের আধ্যাত্মিক সাধনা ও জীবনবোধ সাধারণ মানুষের হৃদয়কে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে। পার্থিব সর্বপ্রকার মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে অনন্ত অসীমের সাথে মানবত্মার মিলনের যে গোপন অভিসার, সেই সাধনার পথ ধরে এদেশে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে। বগুড়া জেলাতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধে সুফি-সাধকগণ কর্তৃক ইসলাম প্রচারের এই মহান প্রচেষ্টাই তুলে ধরা হয়েছে।

ইতিহাসের উষাকালে প্রাচ্যভারতে বাঙালি জাতি শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্কের অভ্যুদয়, অষ্টম শতকে পালরাজ শক্তির উত্থান ও বহির্বঙ্গে রাজ্য বিস্তার - এসব বাঙালির বীর্যবান সত্তার বহিঃপ্রকাশ। তুর্কী জাতি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের সময় সমগ্র বঙ্গদেশ ছিল একচ্ছত্রভাবে সেন রাজাদের অধীনে।[১] সমগ্র অঞ্চল কয়েকটি প্রশাসনিক এককে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে তিনটি প্রধান ভুক্তির পরিচয় বিভিন্ন উৎকীর্ণ থেকে পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, বর্ধমান ভুক্তি এবং কঙ্কগ্রাম ভুক্তি। তবে পুণ্ড্রবর্ধন ভক্তিই ছিল সর্ববৃহৎ যা সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গের একটি অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল।[২] পাল শাসনামলের (৮ম-১২শতক) ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রলেখা থেকে বঙ্গদেশের তিনটি প্রধান প্রশাসনিক এককের প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি এবং দণ্ডভুক্তির নাম। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ ছিল পুণ্ড্রবর্ধন।[৩] সমগ্র উত্তর বঙ্গ 'বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী' নামে খ্যাত ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এবং বৈদ্যদেবের কমৌলতাম্র শাসনে বরেন্দ্রীকে পালদের জনকভূ বা পিতৃভূমি বলা হয়েছে। পাল ও সেনদের বিভিন্ন তাম্রলেখে স্পষ্ট বলা হয়েছে বরেন্দ্রী প্রশাসনিক দিক থেকে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত ছিল। এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় বর্তমান বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী, দিনাজপুর ও পাবনার কিছু অংশ বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। পাল, সেন ও মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গ বিজয়কালে এবং তার পরবর্তী সময়ে এ সব অঞ্চলে সুফিদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সংস্টিষ্ট এলাকার সুফি-সাধকদের অনুসারীদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এখানে আমরা বগুড়া জেলার সুফি সাফিগণের জীবন ও কর্ম আলোচনার প্রয়াস পাবো।

শাহ সুলতান মাহমুদ বল্খী

যে সমস্ত আল্লাহর ওলী-আউলিয়াগণ এদেশে আগমন করেছিলেন, তাঁরা প্রথমে এসে কোনো এক স্থানে 'খানকা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে অবস্থানের ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের সততা ও নিষ্ঠায় অভিভূত হয়েছিল। এসব খানকায় অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করা হতো। এভাবে তাঁরা অসংখ্য মানুষের হৃদয় জয় করেছিলেন। সুফি-সাধকগণ জনসাধারণের সম্মুখে ইসলামের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনার্শন তুলে ধরেছিলেন। এমনি একজন ওলী ছিলেন হযরত শাহ্ সুলতান বল্খী। তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বগুড়া জেলার মহাস্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন। বাগদাদ, ইয়েমেন বা অন্যান্য আরবদেশ থেকে যে সমস্ত মহান সাধক এদেশে এসেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের সমসাময়িক। সুলতান বল্খী প্রথমে ঢাকার

হরিরামপুরে বলরাম নামক এক হিন্দু রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কতিথ আছে, বলরাম রাজা ছিলেন কালীদেবীর গোঁড়া উপাসক। তার প্রাসাদের মধ্যে ছিল বিশাল কালীমূর্তি ও ছোটো ছোটো অনেক মূর্তি। সুলতান বল্‌খী এই মন্দিরের পাশে অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক আদর্শের জন্য অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মানুষকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর নিকট মাথা নত করার উপদেশ দিতে শুরু করেন। সুলতান বল্‌খীর মানবতার মহান আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক সময় দলে-দলে মানুষ ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নিতে শুরু করে। এতে রাজা বলরাম অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং সুলতানকে দমন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। সুলতান বল্‌খীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রাজা বলরাম নিহত হন। এভাবে হরিরাম নগরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর তিনি বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করতে মনস্থির করেন। তখন এ অঞ্চলের মানুষ পরশুরাম নামে এক হিন্দু রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। সুলতান বল্‌খী বগুড়া জেলার মহাস্থানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাজার নিকট সামান্য ভূমি চান। রাজা এই মহান ওলীর বীরত্বের কথা পূর্ব থেকেই জানতেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। সুলতান বল্‌খী যখন তাঁর জন্য বরাদ্দকৃত যায়গায় নিজের দস্তানা বিছিয়ে দেন, তখন দেখা গেল অলৌকিক ভাবে সেটি বড় হয়ে সমস্ত রাজ প্রাসাদকে বেষ্টন করে ফেলেছে। রাজার ছিল এক কন্যা রত্না ও ভগ্নী শীলাদেবী। এরা ছিলেন কালীর সেবক। শীলাদেবী ছিলেন যাদুবিদ্যা ও তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী। সুলতান বল্‌খী, দেখলেন রাজা প্রতি বৎসর বিশেষ এক দিনে রাজ প্রাসাদে অবস্থিত কালী মূর্তির সম্মানে মানুষ বলি দিতেন। শীলাদেবীও এই কালীমূর্তির সম্মুখে তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য ধ্যানসাধনা করতেন। সুলতান রাজাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে এসব মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। রাজা এতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সুলতানকে দমন করতে উদ্যত হন। রাজা পরশুরাম সুলতানের বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান জয়ী হন এবং রাজা আত্মহত্যা করেন। এরপর সুলতান যাদুবিদ্যা বিশারদ শীলাদেবীকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু শীলাদেবী সুলতানকে ভুল বুঝে প্রথমে রাজ প্রাসাদে অবস্থিত কালীমন্দিরে আশ্রয় নেন; পরে নিকটস্থ করতোয়া নদীতে ঝাঁপদিয়ে আত্মহত্যা করেন। তবে রাজার কন্যা রত্নামনি আল্লাহর ওলীকে ঠিকই চিনতে পারেন। তিনি সুলতানের মানবতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সুলতান পরে সুহরাব নামে এক যুবকের সাথে তার বিবাহ দেন। মুহম্মদ এনামূল হক মনে করেন, সুহরাব প্রথমে পরশুরামের সেনাপতি ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[৪] এভাবে আল্লাহর মহান সাধক সুলতান বল্‌খী কর্তৃক সমাজে মানুষের ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচার লাভ করে এবং শান্তি ফিরে আসে। মহাস্থানগড়ে বিজয় লাভ করার পর সুলতান এখানে একটি মসজিদ ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বসেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুলতান বল্‌খী মানুষকে মারেফতের দীক্ষা দিয়ে গেছেন। সেই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং এখনও করছেন। প্রতি বৎসর তাঁর ওফাত দিবসে ওরস উৎযাপিত হয়। এ উপলক্ষে দেশ ও বিদেশ থেকে হাজার হাজার আল্লাহ পাগল মানুষ ওরসে অংশ গ্রহণ করেন। ওরসের পর মাসব্যাপী 'সুলতান মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রতিদিন শতশত মানুষ আসেন তাঁর মাজার জিয়ারত করতে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবশ্রেণীর মানুষ তাদের মনের আশা পূরণ করতে প্রতিনিয়ত ছুটে আসে আল্লাহর এই মহান ওলীর কাছে।

হযরত ফতেহ আলী (রহ:)

তুর্কী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর ইসলাম প্রচারে যে সব সুফিসাধক বগুড়ায় আগমন করেন তাদের মধ্যে হযরত ফতেহ আলী আস্কালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারতের পাঞ্জাব

প্রদেশের অন্তর্গত 'আস্কালা' নামক স্থানে আনুমানিক ১৬৮১ খ্রিঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুহম্মদ হুসাইন একজন কামিল দরবেশ ছিলেন। তিনি পুত্র ফতেহ আলীকে মারেফতের উপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্য প্রথমে 'সামন্দ' নামক স্থানে, পরে শাহবাল নামকস্থানে নিয়ে যান। এখানে মজনু শাহ্ নামক এক সাধকের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁরই নিকট বয়াত গ্রহণ করেন। এই পীরের সৎসর্গে টানা নয় বৎসর আধ্যাত্মিক সাধনার শিক্ষা লাভ করেন। মজনুশাহ্র ওফাতের পর তিনি শাহ্ মঈনুদ্দীন ও শাহ্ সিকিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এভাবে দীর্ঘকাল এঁদের মাধ্যমে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেন। এরপর ফতেহ আলী মাতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর মনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সংসারের প্রতি তাঁর বৈরাগ্যভাব লক্ষ করা যায়। পিতা-মাতা বিয়ের জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি একদিন সবার অজান্তে গৃহত্যাগ করেন। এরপর ফতেহ আলী ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে চীনে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি আঠারো বৎসর অতিবাহিত করেন। এরপর পুনরায় ভারতবর্ষে ফিরে আসেন এবং আজমীর শরীফে কিছুদিন অবস্থান করেন। আজমীর থেকে তিনি 'বগজ' ও সিবিস্তান গমন করেন। সেখানে বেশকিছু দিন অবস্থানের পর বাংলাদেশে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি পূর্বেই বগুড়া জেলার প্রখ্যাত সুফিসাধক সুলতান মাহমুদ বল্খীর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাই এই মহান সাধকের রূহানী ফয়েজ লাভের উদ্দেশ্যে মহাস্থানগড়ে অবস্থিত বল্খীর মাজারের নিকটবর্তী স্থানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি বগুড়া শহরে প্রবেশ করেন এবং বর্তমানে যেখানে তাঁর মাজার শরীফ অবস্থিত সেখানে খানকা গড়ে তোলেন। তাঁর বগুড়া শহরে আগমনকাল সম্ভবত ১৭৫৬ খ্রিঃ। তিনি সেখানে আঠারো বৎসর অবস্থান করে এই অঞ্চলের মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে দীক্ষিত করে তোলেন। ক্রমে তাঁর ভক্ত মুরিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। দেশের দূর-দূরান্ত থেকে বহু লোকের আগমন ঘটতে থাকে। মানবতার মহান পুরুষ আধ্যাত্মিক সাধক হযরত ফতেহ আলী অসংখ্য ভক্তকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ১৭৭৪ খ্রিঃ ৯৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৫] এরপর থেকে প্রতি বৎসর ২২ বৈশাখ তাঁর মাজারে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে অগণিত লোকের সমাগম হয়। ওরস উপলক্ষে ধর্মালোচনা, জিকির আজকার, ও ফাতেহাখানী অনুষ্ঠিত হয়। ফতেহ আলী আঠারো শতাব্দীর বগুড়া অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফিসাধক ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক দর্শন ও উচ্চ মানবিক আদর্শের কারণে এখন পর্যন্ত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে আসছে। ধর্মের গোড়ামির উর্ধ্বে উঠে তিনি প্রকৃত আল্লাহ প্রেমিক হতে পেরেছিলেন। আল্লাহর এইসব মহান ওলীদের জীবন ও ধর্মীয় আদর্শকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে বগুড়া জেলায় সুফিসম্প্রদায়ের যে বিকাশ লাভ করেছিল তা এখনও অব্যাহত আছে।

ভাইপাগলা

বগুড়া শহরের গোরস্তানে একজন কামেল ব্যক্তি শুয়ে আছেন। তাঁর প্রকৃত নাম জানা না গেলেও তিনি বগুড়াবাসীর নিকট 'ভাই পাগলা' নামে সুপরিচিত। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে জানা না গেলেও অনুমান করা হয় পাবনা বা সিরাজগঞ্জ জেলায় তাঁর জন্ম হয়ে থাকতে পারে। বাবা 'ভাই পাগলা' অল্প বয়সেই মারেফতের জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাই স্বাভাবিক জীবন চর্চা তার ভালো লাগে নি। ছোটবেলা থেকেই তিনি বগুড়া এবং তার পার্শ্ববর্তী থানাসমূহে পাগল বেশে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর অস্বাভাবিক আচরণ ও বেশভূষা দেখে ছোট-ছোট ছেলেরা ঢিল-পাটকেল

ছুড়লে তিনি আত্মরক্ষার জন্য অন্যের দোকানে বা বাড়িতে জোর করে ঢুকে যেতেন। অনেক সময় তিনি উলঙ্গ বা খুবই সংক্ষিপ্ত বস্ত্র পরিধান করতেন। অনেকে তাঁকে ছালা বা বস্তা পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী। শহরের সবশ্রেণীর মানুষের সাথে তিনি উপযাচকের মত মিশতেন। দোকানে-দোকানে গিয়ে বলতেন, 'ভাই ভালো, ভাই ভালো।' সবার আগে তিনি সালাম দিতেন 'সালাম ভাই' বলে। সবাইকে ভাই ভাই বলতেন বলেই তাঁকে 'ভাই পাগলা' নামে ডাকা হতো। তাঁর সংস্পর্শে যারাই এসেছে তাদের কোনো না কোনো উপকার হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী বগুড়া শহরের মির্জাপুর এলাকার বেলায়েত হোসেন জানান, তিনি ভাই পাগলাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে রাতে থাকতেন। রাত্রেবেলা ঘুমিয়ে পড়লে 'ভাই পাগলা'র দেহের ভিতর থেকে রাব্বুল আল্ আমিনের নামের জিকির শোনা যেত। চৌকির উপর ভাই পাগলা শুয়ে থাকলে দেখা যেত চৌকিটি কাঁপছে এবং 'রাব্বি' নামের জিকির ধ্বনিত হচ্ছে। তিনি কোনো দোকানে গিয়ে সাময়িক আশ্রয় নিলে দোকানদার অত্যন্ত খুশি হতো। কারণ, এতে অলৌকিক ভাবে দোকানের কেনা-বেচা বেড়ে যেত। তিনি আল্লাহর এলেম দিয়ে মানুষের চিকিৎসা করতেন। কিন্তু তার বিনিময়ে কোনো সুবিধা গ্রহণ করতেন না। এলাকাবাসীর অভিমত, অনেক দুরারোগ্য ব্যাধিও তাঁর হাতের স্পর্শে ভালো হয়ে গেছে। তাঁকে কেউ কখনো গোসল, পায়খানা-প্রস্রাব করতে দেখেনি, কিন্তু তাঁর গায়ে কোনো দুর্গন্ধ ছিল না। কথিত আছে, যুদ্ধের সময় পাক সেনারা তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করলেও গুলি তাঁর গা স্পর্শ করতে পারেনি। মাঝিড়া গ্রামের রিক্সা চালক মকলেছ আলী বলেন, যুদ্ধের সময় তিনি সাতমাথা এলাকা থেকে 'ভাই পাগলা' কে নিজের রিক্সায় করে প্রথমে নিজ গ্রাম মাঝিড়া পরে সেখান থেকে শেরপুর নিয়ে যান। শেরপুর পৌছাবার পূর্বে পাক সেনারা তাদের রিক্সা থামিয়ে দেয়। রিক্সাচালক আল্লাহর এই কামেল পীরের পরিচয় দিলে তারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। শুধু তাই নয় ভাই পাগলাকে অসম্মানজনক ভাবে টান দিয়ে রিক্সা থেকে ফেলে দেয়। ভাই পাগলা মাটিতে পড়ে গেলে মিলিটারীরা গুলি করার চেষ্টা করে কিন্তু গুলি বের হয়নি। ভাই পাগলা হাসতে হাসতে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মকলেছের হাত ধরে স্থান ত্যাগ করেন। এই সময় অনেক মিলিটারী একাধিকবার 'ভাই পাগলা' কে লক্ষ করে গুলি ছোড়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। রাগে-দুঃখে যখন বন্দুকের নল আকাশের দিকে তাক করে গুলি ছোড়ে তখন বিকট শব্দে নল থেকে গুলি বেরিয়ে যায়। রিক্সাচালকও ভাই পাগলার দোয়াতে বেঁচে যায়। 'হু, হা' ছিল ভাই পাগলার সর্বজনশ্রুত জিকির। মারেফাতের তত্ত্ব অনুযায়ী 'হু' জিকিরটি ফানাহ্ এবং 'হা, হি' জিকির আল্লাহর লীলা শ্রেণীভুক্ত। তিনি প্রকাশ্য রাজপথে উচ্চস্বরে এই জিকির করতেন। আল্লাহর এই মহান সাধক ১৯৭৪ খ্রিঃ ইহলোক ত্যাগ করেন। এরপর তাঁকে গোরস্তান সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বের ডোবার মধ্যে সমাহিত করা হয়। ভাই পাগলার মাজার সম্পর্কে দক্ষিণ বগুড়া গোরস্তান ও ভাই পাগলা মাজার প্রকল্প সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এ. বি. এস. জহুরুল হক বলেন,[৬] ভাই পাগলাকে ডোবার মধ্যে সমাহিত করা হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে মাটি কেটে ভরাট করে সুন্দর বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ডোবা ছিল ঢাকা-বগুড়া মহাসড়কের পাশে অবস্থিত একটি আস্তাকুড়ে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ভাই পাগলা মাজার প্রকল্প সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থার প্রচেষ্টার ফলে আজ ভাই পাগলার মাজারটি দৃষ্টিনন্দন শিল্প সৌন্দর্যরূপ লাভ করেছে। এখন প্রায় প্রতিদিন বগুড়া শহর ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে তাঁর মুরিদ বা ভক্তবৃন্দ আসছে মাজার জিয়ারত করতে। এছাড়া প্রতিবৎসর অত্যন্ত ভাব গাম্ভীর্যের মাধ্যমে ওরস

উৎযাপন করা হয়। এতে বহুলোকের সমাগম ঘটে। আল্লাহর এই মহান সাধক বগুড়াবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন।

হযরত আদম পীর

১২৫৮ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খান কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের পর থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিপ্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। যদিও খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক ভারতে সুফিপ্রভাবের যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু সে সময় খুব অল্প সংখ্যক সুফিসাধক এদেশে এসেছিলেন। 'আদম' পীর তাঁদের মধ্যে একজন। হযরত পীর আদমকে কেউ বলেন 'আদম পীর', আবার কেউবা বলেন 'বাবা আদম'। তাঁর জন্ম, ওফাত, পিতৃকুল বা মাতৃকুলের পরিচয় জানা না গেলেও ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে তিনি প্রথমে ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খ্রিঃ) পীর আদম শহীদ তাঁর ভক্ত অনুচরদের নিয়ে ঢাকা জেলার রামপাল নামক স্থানের নিকটবর্তী আবদুল্লাহপুর গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আগমন করেন।[৭] রাজা বল্লাল সেনের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং তিনি যুদ্ধে শহীদ হন। বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলাতেও এই নামে একজন ওলীর নাম পাওয়া যায়। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় তিনিও রাজা বল্লাল সেনের রাজত্বকালে বেশ কিছু শিষ্যসহ বর্তমান বগুড়া জেলার অদূরে একটি খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। সে সময় ঐ অঞ্চলে খাবার পানির তীব্র অভাব ছিল। এই অভাব দূর করতে তিনি বিশাল একটি পুকুর খননের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে পুকুরটির নামকরণ করা হয় 'আদমদীঘি'। বাবা আদমও রাজা বল্লাল সেন ও তার হিন্দু রাজকর্মচারীদের দ্বারা নির্যাতিত সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। পীর বাবা আদম শহীদ এবং আদমদীঘির বাবা আদম একই ব্যক্তি কিনা তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এ ব্যাপারে কোনো গবেষকই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারেন নি। তবে সবাই একমত যে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে একদল সুফিসাধক প্রথমে গৌড়, তারপর রাজশাহী, রাজশাহী হতে বগুড়ার মহাস্থানগড় ও আদমদীঘি, আদমদীঘি থেকে বগুড়ার শেরপুর, ঢাকার আবদুল্লাহপুর, চট্টগ্রাম, সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। রাজশাহীতে অবস্থান করেন শাহ্ মখদুম রূপস (রঃ)। আনন্দ ভট্টের 'বল্লাল চয়িত' থেকে জানা যায়, বাবা আদম এবং রাজা বল্লাল সেনের যুদ্ধ মুসলিম বিজয়ের আগেই সংঘটিত হয়েছিল। ডঃ ওয়াইজ ম্যান মনে করেন, বাবা আদম বল্লালের হাতে শহীদ হন।

হযরত শাহ্ তুরকাণ বাগদাদি

বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় আছেন কয়েকজন আল্লাহর ওলী। এদের মধ্যে হযরত শাহ্ তুরকাণ বাগদাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেরপুর শহরের প্রায় এক কিলোমিটারের মধ্যে 'সির মোকাম' ও 'ধর মোকাম' নামে তাঁর দু'টি মাজার অবস্থিত। হযরত তুরকাণ এর পবিত্র মস্তক যে মাজারে অবস্থিত তার নাম 'সির মোকাম' এবং তাঁর দেহ আছে যে মাজারে তার নাম 'ধর মোকাম'। এ প্রসঙ্গে W.W. Hunter বলেন, Turkan Shahid was a gazy, slain in battle by Hindu King Ballal sen. One shrine is called `Sir mokam' where the head fell, other `Dhar mokam' where the body fell.'.মাজার দু'টির

আকৃতি পর্যালোচনা করলে ঐতিহাসিক সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সির মোকামের মাজারটি সংক্ষিপ্ত পরিধির। সে তুলনায় ধড় মোকাম মাজারটি অনেক বড়। সির মোকামের দরগাহটি মজবুত, স্থূল গাঁথনি যুক্ত, তাই আজও অটুট ও অক্ষত। কিন্তু ধড়মোকামের দরগাহটি মজবুত ছিলনা বলে বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। W.W. Hunter ও অপরাপর প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে শাহ্ তুরকাণকে রাজা বল্লাল সেনের অন্যায়-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কথিত আছে যে, যুদ্ধ শেষে রণক্লান্ত শাহ্ তুরকাণ দলবল নিয়ে তাঁর আস্তানায় ফিরে যে মুহূর্তে নামাজে গভীরভাবে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় সেন বাহিনী কাপুরুষের মত অতর্কিতে আক্রমণ করে মহান ওলীর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রের এই সংবাদে রাজা বল্লাল সেন উল্লসিত হয়েছিলেন। উপহাস করার উদ্দেশ্যে তিনি ও তাঁর সৈন্য দল শহীদ তুরকাণের ছিন্ন মস্তক নিয়ে রাজ দরবারের দিকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে শাহ্ তুরকাণের সহযোদ্ধারা আক্রমণ করলে ছিন্ন মস্তক ফেলে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সবাই ছোটাছুটি করতে থাকে। এ সময় রাজার বহু সৈন্য নিহত হয়। রাজা কোনো রকম প্রাণে বেঁচে যান। তিনি নিজ প্রাসাদের দিকে ছুটতে থাকেন। কারণ, যুদ্ধের প্রাক্কালে পরিবারের সদস্যদের হুকুম দিয়েছিলেন, যদি মুসলমানদের কাছে পরাজয়ের সংবাদ তারা পায়, তবে যেন সবাই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেয়। কিন্তু অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে হযরত তুরকাণ এর নিহত হবার সংবাদটি পৌছানোর পূর্বে রাজার পরাজয়ের সংবাদটি রাজ প্রাসাদে পৌছিলে, রাজপরিবারের সবাই আত্মহত্যা করেন। সেন রাজা রাজপ্রাসাদে পৌছে দেখেন সবাই মারা গেছেন, তাই রাগে-দুঃখে তিনিও অগ্নি কুণ্ডে আত্মহত্যা করেন। হযরত শাহ্ তুরকাণের শাহাদাত বরণের মাধ্যমে শেরপুর অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শাহ্ সদরুদ্দীন বন্দেগী

শেরপুরের মাটি ধন্য করে এখানে আরো যে সব ওলী-আউলিয়াগণ অন্তিম শয্যা গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে শাহ্ সদরুদ্দীন বন্দেগীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তিনি হযরত শাহ্ তুরকাণের সমসাময়িক ছিলেন না। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় উপদেষ্টা হিসেবে তিনি এ অঞ্চলে আসেন। শাহ্ সদরুদ্দীন একজন সুফি সাধক ছিলেন, তিনি শেরপুর তথা সমগ্র বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শাহ্ বন্দেগী ও শাহ্ গাজী

শেরপুর পৌরসভার খন্দকার টোলায় দুইজন মহান ওলীর মাজার আছে। এই মাজারের পার্শ্বে চম্পাবতি নামে এক মহিলার মাজার আছে। এই মাজার সমূহ সম্পর্কে স্থানীয় সুফি সাধক পীর করিম পাগলা[৮] বলেন, হযরত শাহ বন্দেগী এবং হযরত শাহ গাজী আনুমানিক তিনশত বৎসর পূর্বে শেরপুর অঞ্চলে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। শাহ বন্দেগী এবং শাহ গাজী দুই ভাই ছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল বাগদাদে। তাঁরা বাদশার সন্তান ছিলেন। এঁরা দুজনই ছিলেন আল্লাহর ওলী, তবে শাহ বন্দেগী ছিলেন বীর যোদ্ধা এবং শাহ গাজী ছিলেন মানব দরদী। তাঁরা খন্দকার টোলার যেখানে মাজার আছে সেখানে খানকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরা একটি আসা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এখানে থাকতে থাকতেই আল্লাহ পাক তাঁদের তুলেনেন। এঁদের মৃত দেহ কেউ দেখে নি। শাহ বন্দেগী ও শাহ গাজীর অর্ন্তধানের পর এলাকাবাসী কল্পিত

মাজার গড়ে তোলে এবং শাহ বন্দেগীর মাজারের মাথার কাছে বিদ্যুতের খুঁটির মত পঞ্চাশ-ষাট ফুট লম্বা ওলীদের বাগদাদথেকে আনা সেই আসা পুঁতে রাখে। এখনও সেই আসাটি সেখানে আছে। আসাটি ছিল মৌর্যযুগের পাথর দ্বারা তৈরি। এই আসাকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী-কিংবদন্তী এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। আল্লাহর এই ওলীদ্বয়ের মাজারে যখন আসা রাখা হয়েছিল তখন ছিল হিন্দু যুগ। হিন্দু রাজাগণ ওলীদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার উদ্যোগ হিসেবে এই আসাকে উৎপাটিত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। আসাটির চারিদিকে গর্ত করে অনেক হাতি একসাথে আসার সাথে বেঁধে টেনে তোলার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল, শুধু একটু হেলাতে পেরেছিল মাত্র। বর্তমানে আসাটি একটু হেলানো অবস্থায় আছে যা এসব কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে। এই আসা সম্পর্কে পীর করিম পাগলা বলেন, এটি শুধু একটা পাথরের দণ্ড নয়, সৃষ্টিকর্তার গুণামাফের পাথর। অর্থাৎ এই পাথরে স্পর্শ করলে দিলে গুণা মাফ হয়ে যায়। এটি বাবা আদমের পাথরের মত যা আল্লাহ উপহার হিসেবে এই দুই ওলীকে দিয়েছিলেন। এটি মক্কায় অবস্থিত হাযরে আসওয়াদ এর মত। করিম পাগলা এই পাথরের নাম দিয়েছেন 'বিসমিল্লাহ আলিফ আসওসাত পাথর'। তিনি মনে করেন, বিগত প্রায় তিন শত বৎসরে এটি কেউ উৎপাটন করতে পারে নি, ভবিষ্যতেও পারবে না। এটি উপড়ে ফেলার দিন কিয়ামত হবে। তার এই অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে অবশ্য এলাকাবাসী একমত নয়। শাহ বন্দেগী ও শাহ গাজীর মাজার জিয়ারত করতে এখনও বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান-হিন্দু আসে। তারা পাথরের আসা স্পর্শ করে মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চায়, মানত করে। বহু বৎসর ধরে এই মাজারে ওরস উৎযাপন হয়ে আসছিল। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ ছিল, বর্তমানে আবার সরকার ওরস করার অনুমতি দিয়েছে। গত ২০০৯ সালের ৮ মে জাঁকজমকের সাথে নতুন ভাবে ওরস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে বহু লোক যোগদান করেছিল। মাজারটি মাটি থেকে প্রায় দুইহাত উঁচুতে। মাজার চত্তরের ঠিক পূর্ব পাশে বর্গাকার একটি পাথরের টুকরো আছে, যেটি সিঁড়ির কাজ করছে। কথিত আছে, এই পাথরের টুকরোর উপর বসে ওলীদ্বয় ওজু করতেন। এই পাথরকে ঘিরেও বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে এই পাথরটি কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পাওে না। যেমন আজ থেকে প্রায় দশ বৎসর পূর্বে পাথরটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার চুরি করার একদিন পর পাথরটিকে পূর্বের স্থানেদেখতে পাওয়া যায়। এ ঘটনা এলাকার সবাই জানে। পাথরটি বেশি বড় না হলেও এককভাবে কেউ তুলতে পারে না।

মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন, মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) ব্যক্তিগত জীবনে তাত্ত্বিক তথা মরমিয়াও ছিলেন এবং তাঁর প্রিয় সহচর হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবু বক্কর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওসমান (রাঃ) কে এই তত্ত্বের দীক্ষা দিয়েছেলেন। রাসূল (সঃ) জীবনের অনেকটা বছর হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় কাটিয়েছেন। আল্লাহ প্রেমের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। রাসূল (সঃ) এর হেরা পর্বতের এই নির্জন আরাধনা, ভোগ বিলাসহীন সহজ-সরল জীবনযাপন, আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁর নিকটথেকে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সুফিবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। মানবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ, বিশ্বজগৎ ও পরমসত্তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সঃ) এর উক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি সুফিবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ, রাসূল ও মানবত্মার যে প্রেমমিলন তাই সুফিদের মূল উদ্দেশ্য। সুফিদের মধ্যে প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। একটি সংসার ত্যাগ করা অপরটি আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

করা। তাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসার পাশাপাশি তাঁর নিকট নিজকৃত পাপের জন্য ভয়ে ভীত থাকেন। শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের আশায় পার্থিব সুখ ও ভোগ পরিত্যাগ করে সর্বত্যাগী জীবনযাপন করেন। সুফিগণ সংসার বিমুখতা ও দারিদ্র্যকে আল্লাহকে পাওয়ার উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রথমযুগের সুফিদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সুফি বাদ্য-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহ প্রেমে মসগুল থাকতেন। আবার একদল সুফি জিকির ও ভক্তিপূর্ণ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তবে উভয় দলের সুফিগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী অকাট্য বলে মনে করতেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত, আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত রূহানী জগৎকে আদমের (আ:) নিকট সেজদাবনত হবার ঘটনা সুফিগণের চিন্তার জগতে প্রচণ্ড আলোড়ণ সৃষ্টি করে। সুফিগণ বিশ্বাস করেন যে, আদমের আত্মা যদি পরমাত্মার অংশ না হতো তবে আল্লাহ কখনই এই সেজদার নির্দেশ দিতেন না। কারণ, আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে তাঁকে ছাড়া আর কারও কাছে অবনত হতে নিষেধ করেছেন। আবার এও বলেছেন, তাঁর বিধানের পরিবর্তন কোথাও কেউ দেখতে পাবে না। তাহলে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি বা প্রকাশই আদম। এই আদমের মধ্য দিয়ে এবং আদমের দ্বারাই আল্লাহ অভিব্যক্ত। আলিফ ও মীম, লামের মধ্যে প্রকাশিত। অর্থাৎ আল্লাহর জাতনূর ও সেফাতনূর এর যৌথ প্রকাশ হচ্ছে আদম। মারেফতে দীক্ষিত সমগ্র সুফি সমাজ এই তত্ত্ব বিশ্বাস করেন। মানবের জড় সত্তা বা নাসূত কেবল ঐশী সত্তা বা লাহুতে রূপান্তরিত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছেন। এই কারণে সুফিগণ মনে করেন, এই বিশ্বজগৎ আল্লাহর সত্তাময় প্রকাশ। আল্লাহ ও বিশ্ব কোনো ভেদ নেই। সমগ্র বিশ্বজগতই আল্লাহ এবং আল্লাহই সমগ্র বিশ্বজগৎ। দর্শনে এই মত সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। তবে সমস্ত বিশ্বজগৎ আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ এর বাইরের সত্তাও বটে। তাই সুফিগণ আল্লাহর অতিবর্তিতা ও অন্তর্ব্যাপিতা উভয়ই বিশ্বাস করেন। আল্লাহ এখনও বিশ্বজগতের নতুন নতুন বস্তু ও সত্তার মাঝে নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন এবং বিশ্বের সৃষ্টিপ্রবাহ এখনও চলছে, বিশ্বে স্রষ্টার ঐশী অস্তিত্ব প্রকাশিত হচ্ছে।[৯] কুরআনে বর্ণিত আল্লহর পরিচয় নিম্নরূপ: এক. শুদ্ধস্বরূপ বা অদৃশ্য আল্লাহ, দুই. আকার প্রাপ্ত বা নূরে মুহম্মদী, তিন. মূল আদর্শ আকার ও চার. ওয়াহদাতুল ওজুদ বা বিশ্বজগৎ রূপ। তাই সুফিগণ আল্লাহর অতিবর্তী ও অন্তর্ব্যাপিতা উভয়ই বিশ্বাস করেন। পবিত্র কুরআনের বেশির ভাগ আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা আছে। একটি প্রকাশ্য অপরটি গুপ্ত, সুফি-সাধকগণ বাতেন বা গুপ্ত নির্দেশ গ্রহণ করেন। আল্লাহর একত্ব ও সর্বময়ত্বের বাণীর মধ্যেই পাওয়া যায় সুফি আদর্শের সর্বেশ্বরবাদ। আবার আল্লাহ যেমন অনাদি, অনন্ত, তেমনি প্রেমময়, আনন্দময়। এই আনন্দ বা প্রেম স্বরূপতাই তাঁর মূল স্বরূপ। কারণ, এই প্রেম দ্বারাই সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, আবার প্রেমের সাধনার মাধ্যমে তাঁর সাথে সৃষ্টির মিলনের পথ উন্মুক্ত করে রেখেছেন। সুফিবাদ এই অভিনব ঐশীপ্রেমের দর্শন উপস্থাপিত করে। শাহ্ বন্দেগী ও শাহ গাজী সুফিবাদের এই দর্শন শেরপুর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে প্রচার করে ছিলেন।

পীর পাল দেওয়ান

বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার সারিয়াকান্দি ডিগ্রী কলেজের পশ্চিম পার্শ্বের মাঠ সংলগ্ন বালুয়াহাটা এলাকায় 'দরগাতলা মাজার' নামে একটি মাজার আছে। এই মাজার সম্পর্কে স্থানীয় হিন্দুকান্দি এলাকার অধিবাসী মো: দুলাল বলেন,[১০] বালুয়াহাটা মাজারে শুয়ে আছেন 'পীর পাল দেওয়ান'। লোকশ্রুতি থেকে জানা যায়, হযরত শাহ্ সুলতান বলখী (র:) জীবিত থাকাকালে

তিনটি স্থানে বেশির ভাগ সময় অবস্থান করতেন। ১. মহাস্থানগড় ২. বগুড়া ফতেহআলী বাজার এলাকায় এবং ৩. সারিয়াকান্দির বালুয়াহাটায়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গী হিসেবে থাকতেন অন্যান্য ওলীগণ; পীর পাল হচ্ছেন এঁদেরই অন্যতম। মাজারটি যে একজন প্রাচীন কামেল পীরের সে ব্যাপারে এলাকাবাসীর কোনো সন্দেহ নেই। কারণ মাজারটির গাথুনী ও এতে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী দেখলে সহজে বুঝা যায় এটি বহুপুরাতন মাজার। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক আসেন মাজার জিয়ারত করতে। ধর্মভীরু মানুষের বদ্ধমূল ধারণা এই মাজারে এসে মানত করলে মনের আশা পূরণ হয়। তাই প্রতি শুক্রবার ভক্তরা শিরনী বিতরণ করেন। এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, এই মাজার এলাকার ধূলো নিয়ে বিশ্বাস করে গায়ে মাখলে অসুখ ভালো হয়।

মজিবর দরবেশ

সারিয়াকান্দি থানার হিন্দুকান্দি গ্রামে আর একজন কামেল ব্যক্তির মাজার আছে। তাঁর নাম মজিবর দরবেশ। তাঁর জন্ম এই সারিয়াকান্দি থানায়। জন্ম তারিখ সঠিকভাবে না জানা গেলেও এলাকার সবাই তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে অবগত। তিনি ধনীঘরের সন্তান ছিলেন এবং প্রথম জীবনে বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করতেন। কিন্তু একসময় তাঁর মনে পরিবর্তন আসে। তিনি ভারতের জলেশ্বরপুরে গিয়ে সুফি নাসির উদ্দিনের হাতে হাত রেখে বয়াত গ্রহণ করেন। তারপর দেশে ফিরে এসে ধন-সম্পদ ত্যাগ করে, সেলাই বিহীন এক সাদা কাপড় পরে অতি সাধা-সিধা জীবন যাপন শুরু করেন। কথিত আছে, তিনি পিতার প্রায় আড়াইশত বিঘা জমি ত্যাগ করে দীনহীন বেশে আল্লাহর পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মজিবর দরবেশ দ্বার পরিগ্রহ করেন নি, সর্বদা আল্লাহ ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এ সব তথ্য পাওয়া যায় তাঁর প্রথম মুরিদ ও ভক্ত ছাবজল হোসন ফকিরের কাছ থেকে।[১১] তিনি বর্তমানে মজিবর দরবেশের দরবার শরীফের খাদেমের দায়িত্ব পালন করছেন। ছাবজল হোসেন তাঁর পীরের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা সম্পর্কে অল্প কথায় বলেন, অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে পারলেই নামাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয়। মিথ্যাকথা, জুয়াচুরি, জুলুম, ধোকাবাজি না ছাড়লে ইবাদত করে কোনো ফায়দা হবে না। তাই সর্বদা সত্যকথা বলতে হবে, সৎকাজ করতে হবে, জবানের বা মুখের কথার পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। আল্লাহকে ভালোবাসার বিনিময়ে জীবনের সব সুখ ত্যাগ করতে হবে। কাদরিয়া তরিকার এই কামেল পীর নিজের জীবনে এসবের বাস্তবায়ন করে এলাকাবাসীর কাছে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ দেখিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর এই মহান বন্ধু মজিবর দরবেশ ইংরেজি ২০০০ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন। এরপর থেকে প্রতি বৎসর শাওয়াল মাসের ২৯ তারিখে ওরস পালিত হয়। ওরস উপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়।

একদিল পীর

ধুনট থানার গোলাপ নগর ইউনিয়নের মহিশুরা গ্রামে বিখ্যাত একদিল পীরের মাজার অবস্থিত। এ এলাকার মানুষের বিশ্বাস তিনি প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে মিসর থেকে এ অঞ্চলে এসেছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। মাজারটি ছিল অত্যন্ত পুরোনো ও লোকালয় থেকে দূরে, বর্তমানে মাজারটির আশেপাশে অনেক বাড়ি-ঘর, মসজিদ, মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। মাজারটির চতুরদিকে দেয়াল ও উপরে টিনের চালা দেয়া আছে এবং লালশালু কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা

হয়েছে। মাজারটি কিভাবে আবিস্কৃত হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয় মহিশুরা গ্রামের জনৈক কামেল ব্যক্তি স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, এখানে একদিল পীর নামে একজন ওলী শুয়ে আছেন। তিনি এই তথ্য গ্রামের সবাইকে জানালে গ্রামবাসী তা বিশ্বাস করে এবং সম্মিলিত ভাবে মাজার প্রতিষ্ঠা করে। এটি প্রায় একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের ঘটনা বলে এলাকাবাসী জানান। তখন থেকে নিয়মিত মাজার জিয়ারত শুরু হয়। এই পীর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী লোক মুখে প্রচলিত। একদিল পীরের ভক্ত মহিশুরা গ্রামের মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন জানান,[১২] তিনি একদিন বিকেল চারটার দিকে একদিল পীরের মাজারের ভিতরে দান করতে গিয়ে দেখতে পান পীর সাহেব স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সাদা পোশাকে, সাদা পাগড়ি পরে হাতে তসবি নিয়ে আছেন। সুরাইয়া খাতুনের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই সুরাইয়া খাতুন অচেতন হয়ে পরেন। পরে জ্ঞান ফিরে আসলে ভয়ে-আনন্দে শিহরিত হন। এ সময় সেখানে আর কেউ ছিলো না। সুরাইয়া খাতুন সেই তসবির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তসবিটি ছিল অস্বাভাবিক লম্বা। এরছিল তিনটি দানা। একটি আগুনের মত উজ্জ্বল, একটি আকাশী বর্ণের এবং তৃতীয়টি হলুদ বর্ণের ছিল।

একদিল পীরের মাজারকে ঘিরে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। যেমন-এ অঞ্চলে এ পর্যন্ত অনেক ভয়াবহ বন্যা হয়েছে, মাজার এলাকার আশেপাশের অঞ্চল ডুবে গেলেও এ পর্যন্ত মাজারটি কোনোদিন ডুবে যায় নি। ব্যাপারটি ব্যাপক চাঞ্চল্যের জন্ম দিয়েছে। এছাড়া আজ থেকে বার/তের বৎসর পূর্বে আর একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। মাজারটির উপর ছিল প্রকাণ্ড একটি পাইকুড় গাছ। একদিন গাছটি বৈশাখী ঝড়ে সম্পূর্ণ উৎপাটিত হয়। মাজারের টিনের চালার উপর পড়ার কথা থাকলেও গাছটি ধনুকের মত বাঁকা হয়ে ঘরটিকে রক্ষা করে মাটিতে পতিত হয় যা এই এলাকায় মহাবিস্ময়ের জন্ম দিয়েছিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য দেশের দূর-দুরান্ত থেকে বহু লোক এসেছিল। এছাড়া প্রতিনিয়ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু লোক আসে মাজার জিয়ারত করতে ও মানত করতে। মানত পুরা হওয়ায় অনেকে টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে গরু-খাসি পর্যন্ত দান করে। এসব নিয়ে শিরনি-সালাতের আয়োজন করা হয়।

একদিল পীরকে ঘিরে এ অঞ্চলে অনেক পালাগান রচিত হয়েছে। পালাকারগণ বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে পীরের জীবন ও কর্মজীবন গানের মাধ্যমে বিধৃত করেন, মানুষ অত্যন্ত ভক্তি সহকারে এসব তা শ্রবণ করে। এ সব পালাকারদের মধ্যে বাদুলী, গফুর বয়াতী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গফুর বয়াতীর[১৩] সাথে সাক্ষাতে একদিল পীরের জন্মের প্রচলিত লোকবিশ্বাস জানা যায়। তিনি যেভাবে এ কাহিনী বর্ণনা করেন তা হলো: 'মিশর নগরীর এক সওদাগরের নাম সাইনাল, তাঁর স্ত্রীর নাম আশেক নূর। এই দম্পতির কোনো সন্তান ছিলো না। দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকার পর আশেক নূর মনের দুঃখে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। তিনি যখন বনে গিয়ে আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় অলৌকিকভাবে হযরত মুসা (আ:) এসে তার সামনে উপস্থিত হন এবং আত্মহত্যার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আশেক নূর প্রথমে বিস্মিত হলেও নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মনের কষ্টের কথা জানান। এরপর হযরত মুসা (আ:) আশেক নূরকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। প্রথমে আল্লাহ রাজি না হলেও বহুকষ্টে তাঁকে রাজি করানো হয়। ফলে আশেক নূর সন্তান প্রাপ্ত হন। কিন্তু একদিন পর আল্লাহ আবার সেই সন্তানকে ফিরিয়ে নেন। পরে বহুশর্তের বিনিময়ে আল্লাহ আশেক নূরকে সন্তান ফিরিয়ে দেন।

এই সন্তানই একদিল পীর। তিনি বড় হয়ে ধন-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে মিশর থেকে এদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন। বিভিন্ন পালায় প্রায় এ রকম কাহিনীর বর্ণনা থাকলেও এর প্রকৃত সত্যতা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না।

একদিল পীরের ওফাতকাল সঠিক ভাবে জানা নাগেলেও দীর্ঘদিন ধরে ওরস পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এই ওরস পালিত হয়। ওরস উপলক্ষে অসংখ্য লোকের ভিড় লক্ষ করা যায়। মহিশুরা গ্রামের উপর দিয়ে ইছামতি নদী প্রবাহিত। একুট লক্ষ করলে দেখা যাবে, নদীটিও মাজার এড়িয়ে গতিপথ পরিবর্তন করে অন্যদিক দিয়ে চলে গেছে।

বুড়াপীর

বগুড়া জেলার গাবতলী থানার দুর্গাহাটা ইউনিয়নের বাইগুণী গ্রামে বুড়াপীর বাবা নামে একজন কামেল ব্যক্তি শুয়ে আছেন। এই গ্রামের মোঃ এনামূল হক বেলালের সঙ্গে সাক্ষাতে জানা যায়,[১৪] প্রায় দুইশত বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। উক্ত গ্রামে তাঁর মাজার থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে মাজারটি পাকা করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয় নি। শুধু ইট দ্বারা এলাকাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। মাজারটি পাকা রাস্তার পাশে। এই পীরের অনেক অলৌকিক ঘটনা গাবতলী থানা এবং এর আশে পাশের এলাকার প্রায় সব লোক জানে। এখনও প্রতিদিন উক্ত মাজারের পাশ দিয়েযেসব গাড়ি যাতায়াত করে, সবগাড়ির ড্রাইভার (মুসলমান হোক বা হিন্দু হোক) গাড়ীর গতি কমিয়ে সালাম বা শ্রদ্ধা জানিয়ে যায়। কেউ যদি অশ্রদ্ধা করে তবে তাকে নিশ্চিত দুর্ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়। কেউ যদি নতুন ব্যবসা শুরু করে বা নতুন গাড়ি ক্রয় করে, তবে বুড়াপীর বাবার মাজারে মানত দিয়ে আসে। রাত্রে বেলায় কেউ যদি মাজার সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় পায়, তবে অলৌকিকভাবে অচেনা লোকজন এসে তাকে রাস্তা পার করতে সহায়তা করে। এসব লোকের সাথে কথা বলার কোনো সুযোগ থাকে না। এই মাজার সম্পর্কে কেউ কুটক্তি করলে বা বেয়াদবী করলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। প্রত্যক্ষদর্শী এলাকাবাসী জানান, দিনের বেলায় এমন হয়েছে অদৃশ্য হাত দিয়ে গাড়ী উল্টে ফেলে দেয়া হয়েছে। উক্ত গ্রামের কোনো কৃষক যদি জমিচাষ করার সময় তার হালের গরু দড়ি ছিড়ে ফেলে, এ সময় যদি সে বুড়া বাবার সাহায্য চায় তবে সাহায্য পায়। এরূপ আরো অনেক লোক বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

ঘোড়াপীর

বগুড়া জেলার সোনাতলা থানার সোনাতলা বন্দরে বিখ্যাত ঘোড়াপীরের মাজার অবস্থিত। তাঁর প্রকৃত নাম কি এবং কোন্ সময় এ অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা না গেলেও লোকশ্রুতি আছে যে, তিনি ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন এবং সবসময় ঘোড়ায় চড়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরেঘুরে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাঁকে কেন্দ্র করে আরো অনেক কিংবদন্তী এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তার স্মৃতি ধরে রাখতে প্রতি বৎসর একমাস ব্যাপী মেলা হয়, যা বগুড়া জেলার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ মেলা।

পাগলাপীর

সোনাতলা থানার দিগদাইড় ইউনিয়নের ফাজিলপুর গ্রামে 'পাগলা পীর' নামে একজন আল্লাহর ওলীর মাজার আছে। স্থানীয় তথ্যদাতা মাহবুবুর রহমান জানান,[১৫] তিনি এতদঅঞ্চলে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন। তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য জানা না থাকলেও

সবার ধারণা প্রায় একশত বৎসর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তিনি ফাজিলপুর গ্রামের সন্তান ছিলেন এবং অবিবাহিত ছিলেন। এখনো তাঁর অনেক ভক্ত-মুরিদ এই অঞ্চলে আছেন। তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর দোয়াতে সিদ্ধ করা ধান জমিতে বুনে দিলেও গাছ হতো। তাঁর মাজারে বহু লোকের সমাগম হয়। এলাকাবাসীর বিশ্বাস তাঁকে ভক্তি ভরে ডাকলে তিনি সাড়া দেন।

সুলতান পীর

বগুড়া জেলার ধূপচাচিয়া থানার ধাপসুলতানগঞ্জ গ্রামে 'সুলতান পীর' নামে একজন পীরের মাজার আছে। স্থানীয় তথ্যদাতা কে. এম. বেলাল বলেন,[১৬] আল্লাহর এই ওলী কখন এসেছিলেন তা কেউ বলতে না পারলেও এ অঞ্চলের জনগণের স্মৃতিতে এখনও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হয়ে আছেন। তাঁর নাম অনুযায়ী গ্রামের নামকরণ করা হয়েছে ধাপসুলতানগঞ্জ। সুলতান পীরের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এখানে কিছুদিন পূর্বেও পনেরদিনব্যাপী বিশালমেলা বসতো। এছাড়া একই থানার গয়াবান্ধা গ্রামের চৌধুরীপাড়াতেও প্রায় চারশো/পাঁচ শত বৎসরের পুরোন একটি মাজার আছে। মাজারে কে শুয়ে আছেন তা সঠিকভাবে কেউ বলতে না পারলেও এখনো প্রতি বৎসর নিয়মিত ওরস হয়, মানত করা হয়, খাসি, মুরগি ইত্যাদি ভক্তরা নিয়ে আসে।

শাহ সুলতান নাসির উদ্দিন

বগুড়া জেলার কাহালু থানার নারহট্ট ইউনিয়নের নারহট্ট গ্রামে দরগারহাট মাজার নামে একটি মাজার আছে। এই মাজারে আছেন শাহ সুলতান নাসির উদ্দীন। তিনি শাহ সুলতান বলখী (র:) এর ফুফাতো ভাই, তাঁরা উভয়ই বগুড়া অঞ্চলে একই সময় এসেছিলেন। দরগারহাট মাজার শরীফের মোতওয়াল্লী আবদুস সামাদ খন্দকারের সাথে সাক্ষাতকালে জানা যায়,[১৭] বহুপূর্বে এ অঞ্চলে হিন্দুদের বসবাস ছিল এবং এখানে মানুষ কেনা-বেচা হতো,সেই থেকে এ স্থানের নাম নরহাট বা নারহট্ট হয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর যখন চরম নির্যাতন চলতো সেই সময় শাহ সুলতান নাসির উদ্দীনের আগমন ঘটে। তিনি সুদূর বাগদাদের বলখী নগরী থেকে এখানে এসে খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এ অঞ্চলটি ছিল ময়মনসিংহের গৌরীপুর এলাকার হিন্দু জমিদার রত্নাদেবীর কাচারী এলাকা। বগুড়াজেলার শিবগঞ্জ থানার মহাস্থানগড় থেকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তিনি নারহট্ট গ্রাম থেকে সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি নিরীহ হিন্দুদের হত্যা করে ইসলাম প্রচার করেন নি। বর্তমানে তাঁর মাজারটি পাকা করা হয়েছে। আগে প্রতি বৎসর ওরস হতো কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপরেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক এসে মাজার জিয়ারত করে। মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য দোয়া চায়, মানত করে। তারা খাসি, মুরগি ইত্যাদি নিয়ে আসে। তাদের বিশ্বাস ওলীর দোয়াতে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এলাকাবাসীর অনেকে এখনো তাঁর অলৌকিক শক্তির আলামত পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। যেমন এখনও যে তাঁর মাজারকে অপমান বা মাজারের উপর দিয়ে জুতো, সেণ্ডেল পরে হেঁটে যাবে তার নিশ্চিত কোনো না কোনো বিপদ হবে। আগে মাজারের সামনে কেউ গরু-বাছুর বাঁধতে পারতো না। মাজারের পাশে প্রায় দু'শত বৎসরের পুরানো একটি

নিম গাছ আছে। এ গাছটি সে সময় থেকে ঠিক একই রকম হয়ে আছে, তার কোনো বৃদ্ধি নেই। গাছটিতে কোনো ফল হয় না, এবং এর ডালকাটার সাধ্য কারো নেই। নাসির উদ্দীন ওলী কে কেন্দ্র করে গ্রামের এক ব্যক্তি অলৌকিক ঘটনার সম্মুখীন হন। কাঙ্গালু নামের এই ব্যক্তি নিয়মিত একা মাজারের ভিতরে নামাজ পড়তেন, জিকির করতেন। এ অবস্থায় একদিন হঠাৎ দেখেন নাসির উদ্দীন হুজুর বলছেন মাজারের বাইরে নামাজের স্থানে নামাজ পড়তে। এছাড়া তিনি কাঙ্গালুর ভক্তি শ্রদ্ধায় খুশি হয়ে তাকে সোনার মোহর দিতে চাইলেন। কিন্তু কাঙ্গালু ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েন এবং বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন। ভয়ে ও বিস্ময়ের ভুলে মোহরটি না নিতে চাইলে হুজুর ক্রুদ্ধ হয়ে দু'হাত তুলে ভয় দেখান। এতে ভীষণ ভীত হয়ে কাঙ্গালু বাড়ি ফিরে যান। এরপর প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হন। এ ঘটনাটি এলাকায় ভীষণ চাঞ্চাল্যেও সৃষ্টি করে। আবদুস সামাদ খন্দকার আরো জানান, শবে কদরের এক রাত্রে তিনি মাজারের পার্শ্বে ইবাদত করছিলেন, রাত ২.৩০ মিনিটের দিকে দেখেন মাজারের উপর লাল, সবুজ, নীল, হলুদ এরকম আরো কয়েকটি আলো উঠা-নামা করছে, আর গায়েবী জিকিরের শব্দ ভেসে আসছে। এই সাথে চারিদিকে সুন্দর সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। এই ঘটনা তিনি ছাড়া আরো অনেকেই দেখেছিলেন। সাক্ষাৎকারের সময় উপস্থিত এলাকাবাসী জনৈক্য নজরুল ইসলামও এ ঘটনা দেখেছেন বলে দাবি করেন।

এই মাজারের পাশে একটি বিশাল দীঘি আছে। রাণী রত্নাদেবীর নির্দেশে এটি খনন করা হয়েছিল। খুব গভীরভাবে খনন করার পরও পানির দেখা পাওয়া যায় নি। প্রায় ষাট বিঘার এই পুকুরে ছিল ষোলটি কূপ। অনেক পূজা-অর্চনা করেও কোনো লাভ হয় নি। একদিন এক সওদাগর ঘটা করে তার ছেলেকে বিয়ে করিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাণীর আদেশে এলাকাবাসী বাধ্য করে বরযাত্রীদের শুকনো পুকুরের ভিতর দিয়ে যেতে। যখন সওদাগর অনেক লোকজন নিয়ে পুকুর অতিক্রম করছিলেন, এমন সময় হঠাৎ পানিতে সমস্ত পুকুর ভরে যায়; এতে সব লোক ডুবে মারা যায়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, কোনো লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই পুকুর নিয়ে আরো কল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে। পুকুরে পানি আসার পর এলাকাবাসী লক্ষ করেছিল একজন লোক পুকুর থেকে প্রতিহাট বারের দিন বের হতো এবং গোয়ালার কাছ থেকে দই কিনে আবার পুকুরের মধ্যে চলে যেত। এভাবে নিয়মিত দই নিতে থাকলে গোয়ালার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। একদিন সে লোকটির পরিচয় জানতে চায়। কিন্তু লোকটি কোনো কথা না বলাতে তার পিছু পিছু গোয়ালা পুকুর পাড় পর্যন্ত চলে আসে। তারপর ঘাটে এসে দেখে পুকুরের মধ্যে সুন্দর একটি রাস্তা, লোকটির সঙ্গে সেও সেই রাস্তা দিয়ে পুকুরের মধ্যে ঢুকে যায়। যেয়ে দেখে সুন্দর এক রাজবাড়ী। বাড়ীতে এক বুড়ো লোক বসে আছে। গোয়ালার সঙ্গে সবাই খুব ভাল ব্যবহার করে। কিছু অর্থ দিয়ে সেই লোকটি গোয়ালাকে আবার পুকুরের উপর রেখে আসে। এরপর থেকে আর কোনো দিন ঐ লোককে দেখা যায় নি। এটি ছিল সুলতান নাসির উদ্দীন এর আগমনের পূর্বের কাহিনী। এখনো এরূপ কল্প-কাহিনী এ অঞ্চলের মানুষ স্মৃতিতে লালন করে চলেছে।

শাহ্ জামাল পীর

নারহট্ট গ্রামের উত্তর পার্শ্বে পাইকড় গ্রাম অবস্থিত। এখানে শাহ্ জামাল নামে আর একজন কামেল পীরের মাজার আছে। এই মাজার সম্পর্কে স্থানীয় তথ্য দাতা মো: আছাদুল্লাহ বলেন,[১৮] পূর্বে এ অঞ্চলে নদী ছিল, নদী থেকে একটি দ্বীপের সৃষ্টি হয় এবং দ্বীপের মধ্যে মাজারের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়। বর্তমানে মাজারের পাশদিয়ে যাতায়াতের জন্য বড় রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসার সময় সব গাড়িরচালক গাড়ির বেগ কমিয়ে মাজার অতিক্রম করে। কিন্তু কিছুদিন আগে এর ব্যতয় ঘটেছিল। এক ট্রাক ড্রাইভার ওলীর মাজারকে অশ্রদ্ধা করে দ্রুত মাজার অতিক্রম করছিল এমন সময় ট্রাক সহ রাস্তা মাটির নিচেদেবে যায়। ট্রাকে ছিল ধান ভাঙ্গা মেশিন। পরে তওবা করে মাজারে মানত দিয়ে সে ট্রাক উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে মাজারকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সবের মধ্যে শাহ জামাল সিনিয়র আলেম মাদ্রাসা ও আলীয়া মাদ্রাসার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শাহ জামালের আগমন ও ওফাতের সঠিককাল জানা না গেলেও এখনো প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ওরস অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনেক ভক্ত অংশ গ্রহণ করে। ওলী-আউলিয়াদের মাজারকে কেন্দ্র করে প্রচলিত এইসব লোক-বিশ্বাস আমাদের বাঙ্গালি সংস্কৃতির অংশ।

সৈয়দ মোকাররম

কাহালু থানার কালাই ইউনিয়নের নলডুবি গ্রামে হযরত খাজা সৈয়দ মোকাররম কালিমী চিশতীর মাজার শরীফ আছে। তিনি সাম্প্রতিককালের একজন কামেল পীর ছিলেন। ২০০৫ খ্রি: তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি দিল্লী থেকে এসেছিলেন। তাঁর ওফাত উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাগুন মাসের এক তারিখে বিশাল ওরস উৎযাপিত হয়। দিল্লী থেকে তার সন্তান এসে ওরস পরিচালনা করেন। এই ওরসকে সমগ্র বগুড়া অঞ্চল তথা উত্তরাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ ওরস হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের সমাগম হয় এবং ওরস এলাকার আশেপাশে প্রায় পনের/ষোল মাইল পর্যন্ত গাড়ির বহর থাকে।

উপসংহার

সুফিগণ এই জগতকে আল্লাহর প্রতিবিম্ব স্বরূপ মনে করেন। কারণ, প্রতিবিম্ব যেমন তাব আমলের রূপচ্ছবি প্রকাশ করে, তেমনি এই জগৎ আল্লাহর কুদরত শক্তি প্রকাশ করে। সুফিগণ বিশ্বাস করেন, কামনাজনিত কর্মফল দ্বারাই নির্ধারিত হয় মানুষ নীচ আত্মাধারী পশু কি-না। এই পৃথিবীতে সাধকেরা আল্লাহর প্রেমানলে দগ্ধীভূত হতে থাকেন। তাঁরা আল্লাহর বিরহে বিরহী মৃত্যুর মাধ্যমে তারা পৃথিবীর সব দুঃখ শোক থেকে নিস্কৃতি লাভ করে আল্লাহর সাথে মিলিত হন। সুফিবাদের এই আদর্শ যুগে-যুগে, দেশে-দেশে মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। বগুড়া জেলা এর ব্যতিক্রম নয়। হযরত শাহ সুফিসুলতান মাহমুদ বল্‌খী থেকে শুরু করে সৈয়দ মোকাররম কালিমী পর্যন্ত যত আল্লাহর ওলী ও কামেল পীর এ অঞ্চলে এসেছিলেন তাঁরা সবাই সত্য, ন্যায় ও মানবতার আদর্শ প্রচার করে গেছেন।

তথ্য নির্দেশঃ

১. A. M. Chowdhury, *Dynastic History of Bengal*, Asiatic Soc., Dhaka, First Pub. 1967, Page 230.

২. D. C. Ganguly, *Ephgraphia Indica*, Voll XXI, Page 211.

৩. A. M. Chowdhury, Journal, Asiatic Soc., Bangladesh, Voll XXII, First Publist 1977, Page 182.

৪. গিরীন্দ্রনাথ দাস, *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা-১৫।

৫. এ. এম. খলীলুর রহমান, *বগুড়ার পীর ফতেহ আলী আক্কালী*, প্রথম প্রকাশ, বগুড়া, আগষ্ট ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ১৪।

৬. এ. বি. এম. জহুরুল হক, সাধারণ সম্পাদক, দক্ষিণ বগুড়া গোরস্তান ও ভাই পাগলা মাজার প্রকল্প সংস্থা, ঠনঠনিয়া, বগুড়া।

৭. গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলাপীর সাহিত্যের কথা, পূর্বোক্ত পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৩২।

৮. পীর করিম পাগলা, পিতা, মদের সরকার, বয়স ৫৮ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা ২য় শ্রেণীপাশ, মহল্লা-খন্দকার টোলা, শেরপুর পৌরসভা, থানা, শেরপুর।

৯. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, জুন ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-১১।

১০. মোঃ দুলাল, পিতাঃ আহসান হাবিব, বয়সঃ ২৯ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস. এস. সি পাশ, পেশাঃ ব্যবসা, গ্রামঃ হিন্দুকান্দি, থানাঃ সারিয়াকান্দি।

১১. ছাবজল হোসেন ফকির, পিতাঃ মোঃ হোসেন আলী ফকির, বয়সঃ ৬৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ নিরক্ষর, পেশাঃ মৎস্য চাষ, গ্রামঃ হিন্দুকান্দি, থানাঃ সারিয়াকান্দি।

১২. মোছাঃ সুরাইয়া খাতুন, পিতাঃ সাধু প্রামাণিক, বয়সঃ ৬৫ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ পঞ্চম শ্রেণী পাশ, গ্রামঃ মহিশুরা (গোপালনগর), ইউনিয়নঃ গোপালনগর, থানাঃ ধুনট।

১৩. গফুর, পিতাঃ মৃত এন্তাজ আলী, বয়সঃ ৫৭ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরক্ষর, পোঃ ও থানা ধুনট।

১৪. মোঃ এনামূল হক বেলাল, পিতাঃ আবদুস সাত্তার, বয়সঃ ৫৭ বৎসর, পেশাঃ স্ট্যাম বিক্রেতা, গাবতলী কোর্ট, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এইচ. এস. সি পাশ, গ্রামঃ বাইগুণী, ইউনিয়নঃ দূর্গাহাটা, থানাঃ গাবতলী।

১৫. মোঃ মাহবুবুর রহমান, পিতাঃ জনাব আলী আহমদ, বয়সঃ ৪৪ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ এস. এস. সি পাশ, পেশাঃ শিক্ষকতা, গ্রামঃ উত্তর দিঘলকান্দি, ডাকঘরঃ বালুয়াহাট, থানাঃ সোনাতলা।

১৬. কে. এম. বেলাল, পিতাঃ মোঃ ফজলার রহমান, বয়সঃ ৪৫ বৎসর, পেশাঃ সাংবাদিকতা, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ বি. এ. পাশ, গ্রামঃ চক্ শুকানগাড়ী, ধূপচাঁচিয়া পৌরসভা, থানাঃ ধূপচাঁচিয়া।

১৭. মোঃ আবদুস সামাদ খন্দোকার, পিতাঃ গোলাম হোসেন খন্দোকার, বয়সঃ ৭২ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ষষ্ঠ শ্রেণী পাশ, গ্রামঃ নারহট্ট, ডাকঘরঃ নারহট্ট, থানাঃ কাহালু।

১৮. মোঃ আছাদুল্লাহ, পিতাঃ মৃত বদরুজ্জামান মুন্সী, বয়সঃ ৪০ বৎসর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ কামেল পাশ, পেশাঃ ব্যবসা, গ্রামঃ পাইকড়, ডাকঘরঃ পাইকড়, থানাঃ কাহালু।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত কতিপয় পোড়ামাটির ফলক

মোসা. আশীয়ারা খাতুন*

Abstract: The terracotta plaques have mainly been used in the walls of edifices for enhancing its beauty. It is very difficult to mention definitely till today the ancient history of this sort of art. The present paper is an expression of a few selected terracotta plaques preserved in the Varendra Research Museum.

'শিল্পকলা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ সুকুমার শিল্প বা কারুশিল্প। শব্দটি মনুষ্য কর্তৃক সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতি ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম থেকে অতিকায় শিল্পকর্ম এর পরিধিভুক্ত। সহজ কথায় বলা যায় কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকা, সুন্দর করে নির্মাণ অর্থাৎ সুন্দর কোনো সৃষ্ট কাজই শিল্পকলা। আর আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মৃৎশিল্প। এদেশের কুমোর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তৈরি করে আসছে মাটির কলস, হাঁড়ি, সরা, বাসন-কোসন, পেয়ালা, সুরাই, মটকা, জালা, পিঠে তৈরির নানা ছাঁচ, উৎসব-পার্বণের জন্য নানা রঙের বাহারি মাটির জিনিস তৈজসপত্র ইত্যাদি। মাটির তৈরি এসব শিল্পকর্মকে আমরা বলি মাটির শিল্প বা মৃৎশিল্প। এ শিল্পের প্রধান উপকরণ হলো মাটি। প্রত্নবিদদের ধারণা নব্য প্রস্তুর যুগ থেকে মানুষ মাটির সামগ্রী তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ ও দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করে আসছে। এর কারণ পাথরের স্বল্পতা, কাদামাটির সহজলভ্যতা এবং নির্মাণে কোনো জটিল কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োজন হতো না। বাংলায় প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক প্রমাণ করে আমাদের দেশে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে সবচেয়ে সুলভ ও সহজ মাধ্যমই ছিল এই কাদামাটি। তবে সব মাটি দিয়ে এ কাজ হয় না। পরিস্কার এঁটেল মাটি দিয়ে আমাদের দেশের কুমোর সম্প্রদায় বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে তাদের হাতের নৈপুণ্য ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারা এ কাজ করে আসছে। এগুলো ছাড়াও আমাদের দেশে এক সময় গড়ে উঠেছিল সুন্দর পোড়ামাটির ফলকের কাজ। এর ইংরেজি নাম 'Terracotta plaques'। টেরাকোটা, ল্যাটিন শব্দ। 'টেরা' অর্থ মাটি আর কোটা অর্থ পোড়ানো। বাংলার অনেক পুরানো শিল্প এই টেরাকোটা। নকশা করা মাটির ফলক সূর্যের তাপে অথবা ইটের মতো আগুনে পুড়িয়ে শক্ত এবং টেকসই করে তৈরি করা হতো এই টেরাকোটা।

মৃৎশিল্পীগণ ছিলেন সমাজের নিচের স্তরের লোক।[১] শহরে বসবাস অপেক্ষা গ্রামীণ জীবনই এদের পছন্দ ছিল। তাই এদের আবাসন স্থানও গ্রাম-গঞ্জে ও শহরের উপকণ্ঠে গড়ে উঠেছিল। লালমাই ও মহাস্থানের আশে পাশে এ শ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। সাধারণ লোকজনের জন্য গৃহসজ্জা তৈরি করা, দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য মৃৎপাত্র নির্মাণ এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন প্রকার খেলনা তৈরি করাই ছিল তাদের পেশা। বংশানুক্রমিকভাবে সৃষ্ট বহু যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও শৈল্পিক ঐতিহ্য দ্বারা তারা এ কাজ করে আসছে। খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় দশ-এগার শতক পর্যন্ত মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সময়ে পুণ্ড্রনগর বা বর্তমান বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত মহাস্থানকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মন্দির, দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব পনেরো শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক পর্যন্ত সময়ে বাংলায় এ নগর গড়ে ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে নগরগুলো থেকে পাওয়া গেছে বেশ কিছু পোড়ামাটির প্রত্নসম্পদ, পাত্র, স্বর্ণের অলংকার, স্বর্ণের

---

* ড. মোসা. আশীয়ারা খাতুন সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

[১] আনিসুজ্জামান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭; পৃ. ১৯৮।

মুদ্রা ও মূর্তি। মহাস্থানগড় খনন কার্যের ফলে এখানে ১৮টি নির্মাণ স্তর উন্মোচিত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নানাধরনের মূল্যবান নিদর্শনাদি। এগুলো থেকে বিভিন্ন যুগের সাংস্কৃতিক ধারা বোঝা যায়।

সোমপুর বিহার যা বর্তমানে শান্তাহার - পার্বতীপুর রেল লাইনের জামালগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। পাহাড়পুরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ হল সোমপুর বিহার। দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্মপালদেব (৭৭০-৮১০ খ্রি.) কর্তৃক বিহারটি নির্মিত। প্রায় ৪০ একর স্থান জুড়ে অবস্থিত এবং প্রায় ১০০ ফুট উচুঁ এ ঢিবিকে স্থানীয় লোকেরা পাহাড় বলে আখ্যায়িত করে। এখানে বৌদ্ধ মন্দিরে পাওয়া গেছে অনেক পোড়ামাটির ফলক। এগুলো আট শতকের অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় বার'শ বছর আগের তৈরি। পাহাড়পুরের আশে-পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক। এখানে খনন কাজ চালিয়ে বিভিন্ন রকম নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন ঐ অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির তথ্য প্রদান করে। প্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ ও ধ্বংসের অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হল কুমিল্লার ময়নামতি। কুমিল্লার ময়নামতিতে উৎখনন কার্য পরিচালনা করে আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কয়েকটি তাম্রশাসন, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, পোড়ামাটির সিল, মূর্তি ইত্যাদি এখানকার জাদুঘরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এসব সামগ্রী থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্বন্ধে জানা যায়।

দিনাজপুর শহর থেকে প্রায় ১৪ মাইল উত্তরে ঢেপা নদীর পশ্চিম তীরে কান্তনগর মন্দির অবস্থিত। দিনাজপুরের প্রখ্যাত জমিদার মহারাজা প্রাণনাথ রায় (মৃত্যু ১৭২২ খ্রি.) মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন এবং তাঁর পুত্র (পোষ্য পুত্র) মহারাজা রামনাথ রায় ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে এর কাজ সমাপ্ত করেন। পোড়ামাটির চিত্র ফলক শিল্পের অতুলনীয় নিদর্শন বহনকারী এই মন্দিরটি উপমহাদেশের স্থাপত্য ও পোড়ামাটির চিত্র শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য কাহিনীগুলো পোড়ামাটির চিত্র ফলকের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে মন্দির গাত্রে শোভা পাচ্ছে। পোড়ামাটির ফলকগুলো থেকে আঠার শতকের বাঙালি সমাজ জীবনের চিত্র বোঝা যায়। আবার পাহাড়পুর বা ময়নামতির মতো সুবৃহৎ বিহার মন্দিরের সুবিস্তৃত প্রাচীর গাত্র আস্তরণের মতো এতো পাথর এবং প্রস্তর স্লাব বাংলাদেশে ছিল না। তাই এগুলো নির্মাণে অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে বড় অবদান ছিল স্থানীয় এই মৃৎশিল্পীদের। এভাবেই এ সমস্ত এলাকার আশে পাশে মৃৎশিল্পীর উদ্ভব ঘটেছিল। মহাস্থানের পোড়ামাটির ফলকগুলো এই মৃৎশিল্পীদেরই কৃতি। তবে মৃৎশিল্পীদের প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আবার দ্রুততার সাথে ফলক নির্মাণ করতে হতো ফলে তারা ফলকের গুণগত মানের দিকে ঠিকমত নজর দিতেও পারতো না। ফলকগুলোর নির্দিষ্ট কোনো মাপ ছিল না আবার সেগুলো বিভিন্ন রকমভাবে পোড়ানো হতো। আবার ফলকের ভেতরের অংশ অনেক সময় ছাঁচের বাইরে বেরিয়ে যেত। প্রত্নানুসন্ধানের ফলে পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকগুলো অধিকাংশই ছাঁচে ঢালা ফলক এবং কিছু কিছু হাতে গড়া। পোড়ামাটির এ সমস্ত শিল্পশৈলীর উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে বলা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব তিন শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় পাঁচ শতকের মধ্যে এগুলো নির্মিত হয়েছিল।

কুমিল্লার ময়নামতি, শালবন বিহার, নওগাঁ জেলার সোমপুর বিহার (বর্তমানে পাহাড়পুর বলে পরিচিত), বগুড়ার মহাস্থানগড়, দিনাজপুরের কান্তনগর মন্দির থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির চিত্রফলকের অস্তিত্ব পালযুগের অনেক কাল আগেও যে প্রচুর পরিমাণে ছিল তার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং ক্রমেই পাওয়া যাচ্ছে।[২] ঐতিহাসিকদের মতে শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির চিত্রফলকও পাওয়া গেছে। তবে তার আগের কথা অবশ্য সঠিকভাবে বলা যায় না। হিন্দুদের মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকের অনুকরণে মুসলিম শাসকদের মসজিদেও পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮ খ্রি.), বাঘা মসজিদ (১৫২৩ খ্রি.), বারবাজারের গোরাই মসজিদে পোড়ামাটির সুন্দর চিত্রফলক ছিল। কুসুম্বা মসজিদের বাইরের দেয়ালে ও মিহরাবে পাথরের উপর পোড়ামাটির চিত্রফলকের অনুকরণে নানা রকম কারুকার্য আছে। সুলতানী আমলে টেরাকোটা শিল্প ও পাথরের উপর কাজ করার গৌরবময় দৃষ্টান্ত ও নৈপুণ্য এ মসজিদে পরিলক্ষিত হয়। আবার বাঘা মসজিদের প্রবেশ পথের পার্শ্বে ও উপরে বিভিন্ন প্যানেলে পোড়ামাটির ফলকে লতাপাতা, ফুল, টব থেকে গজিয়ে উঠা ফলন্ত বৃক্ষের প্রতিকৃতি অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে করা। এক কথায় পোড়ামাটির চিত্রফলক শিল্পের অপূর্ব ও অতুলনীয় নিদর্শন মসজিদের বাইরে ও ভিতরে ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে। মোটকথা মুসলমান শাসকরা মসজিদের মিহরাবে, বাইরের দেয়ালে, প্রবেশ পথের উপরে লতাপাতা, ঝুলন্ত শিকল প্রস্ফুটিত পুষ্প ইত্যাদি পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করত। বরেন্দ্র

---

[২] আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ২৪৫।

গবেষণা জাদুঘরে এ ধরনের অনেক ছোট ছোট নকশা করা পদ্মফুল ও জবা ফুল প্রস্ফুটিত গাছের পোড়ামাটির ফলক সংরক্ষিত আছে।

শক-কুষাণ আমলের (প্রথম থেকে প্রায় চার খ্রিস্টীয় শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) মৃৎফলকগুলোর বিষয়বস্তুতে, অলঙ্করণে, কেশ বিন্যাসে, পরিধেয় বস্ত্রে এবং সাধারণভাবে ও রূপে যে রুচির পরিচয় পাওয়া গেছে তা স্পষ্টতই নগর রুচি। কৃষিজীবী বা ছোট কারুজীবী গ্রামবাসীর গ্রামীণ রুচি নয়। এই নগর রুচিই গুপ্ত আমলের মৃৎশিল্প পর্যন্ত বিস্তৃত।

সাত-আট শতকের পাহাড়পুরের এবং আট-নয় শতকের ময়নামতির পোড়ামাটির শিল্প নিদর্শনগুলো সমগোত্রীয় নয়। ভাবে, রূপে ও রীতিতে পাহাড়পুর ও ময়নামতির পোড়ামাটির ফলকের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক এবং এতে সাধারণ লোকায়ত কৃষি জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য ফলক সারি সারি ভাবে সাজালে মনে হয় মৃৎশিল্পীরা তাদের অনুভূতি ও সচেতন বস্তু অভিজ্ঞতা থেকে লোকায়ত জীবনের এক সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছে।

ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্ত যুগে পোড়ামাটির চিত্র ফলক শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। গুপ্ত যুগের পোড়ামাটির চিত্র ফলকগুলোতে অতি উন্নতমানের শৈল্পিক সৌকর্য দেখা যায়। পরবর্তী কালে এ শিল্পের নৈপুণ্যে কিছু অবনতি দেখা দিলেও প্রাণবন্তর দিক থেকে এগুলো ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তিগুলো ছাঁচে ফেলে তৈরি করা। সেজন্য শিল্পরীতি থেকে মূর্তিগুলোকে প্রাচীন বলে মনে হলেও সেগুলো হয়তো অতটা প্রাচীন নয় বেশ পরবর্তীকালে তৈরি বলে মনে হয়। কিন্তু এই ফলকগুলো ছাঁচে তৈরি হওয়া সত্বেও এগুলো প্রাচীন শিল্পশৈলীর অধিকারী।

বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রদানকৃত এবং জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত প্রায় সহস্রাধিক পোড়ামাটির ফলক বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। পোড়ামাটির ফলকগুলো আনুমানিক ছয় শতক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের। পোড়ামাটির ফলকগুলোতে সূক্ষ্ম গঠন নৈপুণ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফলকগুলোর অবয়ব মোটেই সমানুপাতিক নয়। আবার এগুলোর শৈল্পিক উৎকর্ষ খুব উচুঁ মানেরও নয়। তবে পোড়ামাটির ফলকগুলো দেখে মনে হয় তখনকার দিনের সহজ সরল গ্রামীণ শিল্পীরা সহজলভ্য পুকুর বা বিলের এঁটেল মাটি দিয়ে এগুলো তৈরি করেছে। সেখানে শিল্প চাতুর্যের এবং জ্যামিতিক পরিমাপের অভাব থাকতে পারে তবে জীবনের প্রতি গভীর অনুভূতি ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রাচুর্য সেই অভাবকে পূরণ করে দিয়েছে বলে মনে হয়। আর সহজলভ্য কাদামাটি ও স্থানীয় শিল্পী দ্বারা তৈরি এসব চিত্রফলকে তৎকালীন সমাজ-জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। তবে ফলকগুলোতে বৈচিত্র্য ও বর্ণনা সৌষ্ঠবে এক অপূর্ব দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে নিয়ম-কানুনের অভাব এবং সঠিক কলাকৌশল প্রয়োগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জীবনাবেগের প্রাচুর্য ও সহজ প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় চিত্রফলকগুলোর মধ্যে যে প্রাণপ্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা সত্যিই অতুলনীয়। এগুলোতে তৎকালীন গ্রাম-বাঙলার মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দেবতা ও অপদেবতার প্রতি তাদের বিশ্বাস এবং পাশাপাশি অবস্থানরত প্রাণীকূল ও উদ্ভিদ জগতের একটি প্রাণবন্ত ও উজ্জ্বলরূপ পাওয়া যায়।

পোড়ামাটির ফলকগুলো দেখে মনে হয় ধর্মীয় তাৎপর্য প্রদর্শনের নিমিত্তে এগুলো নির্মিত হয়নি। তবে এখানে শিবের বিভিন্ন রূপ - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর বোধিসত্ব, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতির পোড়ামাটির ফলকের মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও নানারকমের লতাপাতা ও ফুলের মধ্যে পদ্মফুলের প্রাধান্য বেশি দেখা যায়। প্রাণীজগতের চিত্রগুলোর মধ্যে হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃষ, মহিষ, হরিণ, সর্প, রাজহাঁস, ময়ূর ইত্যাদির চিত্রগুলো পরিলক্ষিত হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খার যে আলেখ্য চিত্রগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে, তা সত্যই অপূর্ব ও প্রাণবন্ত। পূজারত ব্রাহ্মণ, স্ত্রী-পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী তীরন্দাজ, শিকারের মুহূর্তে শবর-শবরী, নৃত্যরত পুরুষ-নারী প্রভৃতি চিত্রফলকগুলোতে বাঙালি সমাজ জীবনের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা যেমন বাস্তবধর্মী তেমন হৃদয়গ্রাহী। মোটকথা এসব পোড়ামাটির ফলকগুলোতে গ্রাম-বাঙলার মানুষের জীবন যাত্রার কিছু উল্লেখযোগ্য দিক স্থান পেয়েছে। এতে সেকালের গ্রাম-বাঙলার লোক শিল্পের এক বাস্তব পরিচয় ফুটে উঠেছে। সেই সাথে ফলকগুলোতে সেকালের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের আলোখ্যও পরিলক্ষিত হয়।

বরন্দ্রে গবেষণা জাদুঘর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত ও সংরক্ষিত কয়েকটি পোড়ামাটির ফলকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

(ফলক নং ১ : VRM No. ৯৫/২৫; চিত্র নং-১) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক ছয় শতকের। ফলকটির দৈর্ঘ্য ৪৯ সে.মি. এবং প্রস্থ ৪৫ সে.মি., বেধ ৩ সে.মি.। ফলকটি মহাস্থান জাদুঘর থেকে সংগৃহীত।

ফলকটিতে খালি গায়ে নেংটি পরিহিত দু'জন কর্মরত বোঝাবহনকারী শ্রমিকের দৃশ্য লক্ষ্যণীয়। ফলকটির কিছু কিছু অংশ ভেঙ্গে গেছে। এটি সে সময়ের শ্রমিক শ্রেণীর পরিধেয় আবরণের মূর্ত প্রতীক। এখনও গ্রাম-বাংলার শ্রমিকগণ অর্দ্ধ-উলঙ্গ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে।

(ফলক নং ২ : VRM No. ২০১০/৭৫; চিত্র নং-২) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক নয়-দশ শতকের অর্থাৎ পাল যুগের। ফলকটির দৈর্ঘ্য বা পায়ের উচ্চতা ১১ সে.মি. ও পায়ের ঘের ১৭.৫ সে.মি.। ফলকটি গকুল মন্দির, মহাস্থান, বগুড়া থেকে আলহাজ্ব মো. আব্দুস সোবহান কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। পোড়ামাটির ফলকটি বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্ন পা। এটি একটি টেরাকোটা মূর্তির পদযুগলের ভগ্ন নিম্নাংশ। শিল্পী অতি দক্ষতার সাথে খর্বাকৃতি (foreshorten) রীতিতে বাস্তবায়িত করেছেন। যদিও এটি চিত্রশিল্পে পর্যবেক্ষণ করা যায় তবুও টেরাকোটা শিল্পে এর উপস্থিতি সত্যই চমকপ্রদ। সারনাথে রক্ষিত মূর্তিগুলোর প্রভাব পাল যুগের এ শিল্পে দেখা যায়। অর্থাৎ পোড়ামাটির ফলকটি সারনাথরীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। দু'টি স্তম্ভের ন্যায় সমান্তরাল পদযুগলের উপর দণ্ডায়মান ভগ্ন পায়ের পোড়ামাটির মূর্তি।

(ফলক নং ৩ : VRM No. ২১৯৪; চিত্র নং-৩) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক নয় শতকের। ফলকটির দৈর্ঘ্য ২৬ সে.মি., প্রস্থ ২১ সে.মি. ও বেধ ৫ সে.মি.। ফলকটি পাহাড়পুর থেকে সংগৃহীত। ফলকটিতে একটি সুসজ্জিত নরমূর্তি নৃত্যরতা অবস্থায় সুশোভিত। উদ্‌গত চক্ষুতারকা বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ নাসা ও তীক্ষ্ণ কর্ণ এবং কর্ণে দুল, কোমরে কোমরবন্ধ, গলায় মালা, অলংকৃত হস্তের অধিকারী মূর্তিটিতে পরিলক্ষিত। মূর্তিটি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান।

(ফলক নং ৪ : VRM No. ২০৩০; চিত্র নং-৪) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক নয় শতকের। ফলকটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২২ সে.মি., প্রস্থে ১৬.৬ সে.মি. এবং বেধ ৬ সে.মি.। এটি পাহাড়পুর থেকে সংগৃহীত। উঁচু ঢিবির উপর দণ্ডায়মান টিয়া পাখিটির মুখে গম বা যবের দানা সম্বলিত সুন্দর পোড়ামাটির ফলক। পাখিটির শরীরের উপর ডানাগুলো খাঁজকাটা অবস্থায় বিছিয়ে দিয়েছে।

(ফলক নং ৫ : VRM No. ২২১০; চিত্র নং-৫) : পোড়ামাটির ফলকটি VRM -এর নথিতে লিখিত আনুমানিক নয় শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২৮ সে.মি., প্রস্থে ২১ সে.মি. ও বেধ ৬ সে.মি.। ফলকটি পাহাড়পুর থেকে সংগৃহীত। পোড়ামাটির ফলকটিতে উদ্‌গত চক্ষু তারকা বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ নাসা ও তীক্ষ্ণ কর্ণ, নগ্ন শরীর, গলায় মালা, কুন্তল, মাথায় মুকুট পরিহিত, একহাতে ঢাল এবং অন্য হাতে তরবারি নিয়ে অতি ভঙ্গ অবস্থায় একজন যোদ্ধা পরিলক্ষিত। ফলকটিতে উৎকীর্ণ পুরুষ মূর্তির গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন-ভূষণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। মূর্তিটির ভঙ্গীর মধ্যে কোনো লাবণ্য বা সুষমা নেই এবং অন্তর্নিহিত কোনো ভাব বা চিন্তা মুখশ্রীতে ফুটে উঠেনি। মনে হয় মূর্তিটিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি উচ্চশিল্পের প্রাণ সম্পূর্ণ অভাব।

(ফলক নং ৬ : VRM No. ২০৩৫; চিত্র নং-৬) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক নয় শতকের। সাধারণত এ চার শতকের (নয়, দশ, এগার ও বার) - শিল্পকে পাল যুগের শিল্প নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পোড়ামাটির ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৩৪ সে.মি., প্রস্থে ২১.৩ সে.মি. ও বেধ ৭.২ সে.মি.। ফলকটি পাহাড়পুর থেকে সংগৃহীত। উদ্‌গত চক্ষুতারকা বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ নাসা ও তীক্ষ্ণ কর্ণ সুসজ্জিত ছোড়া হাতে যোদ্ধার নৃত্যরত পোড়ামাটির ফলক। ফলকটিতে উৎকীর্ণ নরমূর্তির গলায় মালা, কানে দুল, হাতে বালা, পায়ে মল ও বাজুবন্ধন; গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন-ভূষণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। এ মূর্তিটিও ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে তৈরি।

(ফলক নং ৭ : VRM No. ২১৮৯; চিত্র নং-৭) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক নয় শতকের। পোড়ামাটির ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৩৬.৫ সে.মি., প্রস্থে ২৬.৫ সে.মি. ও বেধ ৫.৫ সে.মি.। ফলকটিতে একজন শবর শিকারের বেশে উপস্থাপিত। ডান হাতে ধনুক, বাম হাতে তূণ থেকে তীর বের করার দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক। ফলকটিতে উদ্‌গত চক্ষুতারকা বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ নাসা ও তীক্ষ্ণ কর্ণ, নগ্ন গায়ে, মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, হাতে বালা ও বাজু বন্ধন, নেংটি পরিহিত এবং গঠনে অতি সাঁধারণ দৃশ্য লক্ষণীয়।

(ফলক নং ৮ : VRM No. ২৯০২; চিত্র নং-৮) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক নয় শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২১৬ সে.মি., প্রস্থে ১৭ সে.মি. ও বেধ ৫.৫ সে.মি.। মান্ডুইল, গোদাগাড়ী রাজশাহী থেকে পোড়ামাটির ফলকটি সংগৃহীত। পোড়ামাটির ফলকে একজন পুরুষ নৃত্যরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। এক হাত উপরে, অন্য হাত বুকের কাছে, উদ্‌গত চক্ষু তারকা বিশিষ্ট, গলায় মালা, কানে দুল, মাথায় মুকুট পরিহিত, খালি গায়ে গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন-ভূষণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ অবস্থায় নৃত্যরত একজন পুরুষের দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক।

(ফলক নং ৯ : VRM No. ৩০৪০; চিত্র নং-৯) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতের শতকের। ফলকটি দৈর্ঘ্যে ২৩ সে.মি. এবং প্রস্থে ২১.৩ সে.মি. ও বেধ ৩ সে.মি.। ফলকটি মি. তৈহিদুল চৌধুরী কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। পোড়ামাটির ফলকটিতে তের মাথা বিশিষ্ট অনন্ত নাগের পাঁচ ভাঁজের মধ্যে বিষ্ণুকে শয্যারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। সর্পটি তার মুখ দিয়ে অলৌকিক ক্ষমতা বলে ফনা বের করে ছত্রী আকারে বিষ্ণুকে রক্ষা করছে।

(ফলক নং ১০ : VRM No. ৩৩০৭; চিত্র নং-১০) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতের শতকের। ফলকটি দৈর্ঘ্যে ১২ সে.মি., প্রস্থে ১৭ সে.মি. এবং বেধ ৩ সে.মি.। ফলকটি গোয়ালকান্দি, বাঘমারা, রাজশাহী থেকে সংগৃহীত। পদ্মফুল সুশোভিত অ্যাক্যান্থাস নকশা হতে উদ্গত লতাপাতা বা পুষ্পকার হতে উত্থিত লতাগুল্ম সমন্বয়ে গঠিত সুসমঞ্জস্য পোড়ামাটির ফলক। সে সময়ে ধর্মীয় ও নান্দনিক কারণে লতাপাতা ও পদ্মফুল প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়। ফলকে উৎকীর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্যে অর্ধ-পুষ্পের সম্মিলিত রূপ। ফুলের বিন্যস্তরূপ এবং আবর্তমোতিফ লক্ষণীয়।

(ফলক নং ১১ : VRM No. ২৯৬১; চিত্র নং-১১) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতের শতকের। ফলকটি দৈর্ঘ্যে ১৭ সে.মি., প্রস্থে ১৯ সে.মি. এবং বেধ ৩.৫ সে.মি.। ফলকটি লালোর, সিংড়া, নাটোর থেকে সংগৃহীত। পদ্ম পুষ্প সুশোভিত সুন্দর পোড়ামাটির ফলক। এ ধরনের ফলকও ধর্মীয় কারণে প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

(ফলক নং ১২ : VRM No. ৩৩৯৮; চিত্র নং-১২) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতের-আঠার শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৮ সে.মি., প্রস্থে ১০ সে.মি. এবং বেধ ৩.৭ সে.মি.। ফলকটি কোণাকোণি ২৫ সে.মি. ও ১৮ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (রাজবাড়ি, নওগাঁ) মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। এ ধরনের ফলক বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে সংযোজিত ফলকে উৎকীর্ণ এ ধরনের মূর্তি দেখা যায়। কোণাকৃতি পোড়ামাটির বহুপত্রী ফলকের মধ্যে দণ্ডায়মান শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তি; উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত, কিরীট, কুন্তল, বনমালা পরিহিত উর্দ্ধে মস্তকোপরি প্রস্ফুটিত পদ্ম সম্বলিত পোড়ামাটির বিষ্ণুমূর্তির বামন অবতার। বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তি সম্বলিত প্রস্তরখণ্ড অনেক পাওয়া গেছে। এটি বিষ্ণুর বামন অবতারের মূর্তি বলে মনে হয়। এখানে বিষ্ণুর চার হস্তে গদা-চক্র-শঙ্খ পদ্মধারী এবং একটি পা স্বর্গলোকে, আরেকটি মর্তলোকে এবং অন্যটি বলিরাজের মাথার উপর লক্ষণীয়।

(ফলক নং ১৩ : VRM No.. ৩৩৯২; চিত্র নং-১৩) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতের-আঠার শতকের। পোড়ামাটির ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৯.৫ সে.মি., প্রস্থে ১২.৩ সে.মি. এবং বেধ ৩.৫ সে.মি.। কোণাকৃতি ফলকটির পরিমাপ কোণাকোণি ২৭ সে.মি. ও ৯ সে.মি.। ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (রাজবাড়ি, নওগাঁ) মি. রিয়াজ উদ্দিন কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। একটি পঞ্চ ভাজবিশিষ্ট খিলানের মধ্যে খোদিত, ছাঁচে নির্মিত খিলানটির বহির্ভাগ অলঙ্কৃত। খিলানের উভয় পার্শ্বে পিলাস্টার রয়েছে। মা যোশধা ছেলে কৃষ্ণকে শাস্তি প্রদানের দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক।

(ফলক নং ১৪ : VRM No. ৩০৪৭; চিত্র নং-১৪) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটি দৈর্ঘ্যে ১৫ সে.মি., প্রস্থে ১৫ সে.মি. এবং বেধ ৩ সে.মি.। ফুলের বর্ধিত অংশের মাপ ৩.৫ সে.মি.। ফলকটি মঠপুকুর, পবা, রাজশাহী থেকে সংগৃহীত। ফলকটিতে বর্তুলাকার যপমালার গুটি পরিবেশিত অবস্থায় কড়ি অলংকরণে অলংকৃত। সেসময় ধর্মীয় ও নান্দনিক কারণে এ ধরনের ফলক প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

(ফলক নং ১৫ : VRM No. ৩৩৬৭; চিত্র নং-১৫) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৮ সে.মি. ও প্রস্থে ১৫ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি মি. অনিমেষ লাহেরী কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। এটি তিনি নামকান, বাঘমারা, রাজশাহী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। পোড়ামাটির ফলকটিতে সিংহের পিঠে আরোহ দুর্গার মূর্তি লক্ষণীয়। দুর্গার ডান হাতে ঢাল ও বাম হাতে তলোয়ার এবং এক পা সিংহের পিঠের উপর, অন্য পা সিংহের লেজের উপর স্থাপিত। দুর্গার গলায় বনমালা, কানে কর্ণাভরণ, মাথায় মুকুট, দু'হাতে বর্ম পরিহিত, ফলকটির দু'পার্শ্বে দু'টি সুশোভিত পদ্মফুল সম্বলিত সুন্দর পোড়ামাটির ফলক। সহজ প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতায় ফলকের মধ্যে যে প্রাণপ্রাচুর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়।

(ফলক নং ১৬ : VRM No. ৩৩৫৯; চিত্র নং- ১৬) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটি দৈর্ঘ্যে ২৬ সে.মি. এবং প্রস্থে ২৩ সে.মি.। পোড়ামাটির এ ফলকটি মি. অনিমেষ লাহেরী কর্তৃক নামকান, বাঘমারা, রাজশাহী থেকে সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। পোড়ামাটির ফলকটিতে হংসের পিঠে উপবিষ্ট চতুর্মাথা ব্রহ্মা। যার এক হাতে তরবারী এবং অন্য হাতে ঢাল এবং বাহুতে অঙ্গদ। পিছনে তীর ধনুক হাতে

ধানুকী। ফলকটিতে উৎকীর্ণ মূর্তির গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন-ভূষণ নেই, ভঙ্গীর মধ্যে কোনো সুষমা নেই এবং অন্তর্নিহিত কোনো ভাব বা চিন্তা মুখশ্রীতে ফুটে উঠেনি।

(ফলক নং ১৭ : VRM No. ৪৯০৯; চিত্র নং-১৭) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতের-আঠার শতকের। পোড়ামাটির ফলকটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২০.৬ সে.মি., প্রস্থে ৭ সে.মি. এবং বেধ ৩ সে.মি.। ফলকটি ডা. আহসানউল্লাহ কর্তৃক সমাজ গ্রাম, চাটমোহর, পাবনা থেকে সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। খাঁজকাটা খিলানের মধ্যে ঝুলন্ত অলংকৃত শিকল ঘন্টার মৎসা সম্বলিত বাতির পোড়ামাটির ফলক। ধর্মীয় এবং নান্দনিক কারণে এ ধরনের পোড়ামাটির ফলক প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

(ফলক নং ১৮ : VRM No. ১৬; চিত্র নং-১৮) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২৩ সে.মি., প্রস্থে ৪ সে.মি. এবং বেধ ৩ সে.মি.। ফলকটি মঠপুকুর, পবা, রাজশাহী থেকে সংগৃহীত। ফলকটিতে পেচানো লতাপাতার মোতিফ্ উৎকীর্ণ। দ্রাক্ষ লতার সঙ্গে এগুলোর মিল পাওয়া যায়। এর দৃশ্য মনোরম।

(ফলক নং ১৯ : VRM No. ৩৭০২; চিত্র নং-১৯) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৮ সে.মি., প্রস্থে ৩ সে.মি. এবং বেধ ২ সে.মি.। ফলকটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী দিলরুবা খাতুন কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। জবা ফুলের গাছে ফুটন্ত আটটি জবা এবং সম্মুখভাগে একটি ফুলের কুড়ি সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক। বাংলার আনাচে-কানাচে এ জাতীয় ফুলের গাছের নজির অহরহ পাওয়া যায়। হিন্দুদের ধর্মীয় কাজে জবা ফুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিল্পী প্রস্ফুটিত ফুল ও কুড়ি উৎকীর্ণে সফলতার পরিচয় দিয়েছেন।

(ফলক নং ২০ : VRM No. ৩৫০৮; চিত্র নং-২০) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটি দৈর্ঘ্যে ২৭ সে.মি., প্রস্থে ১৯ সে.মি. এবং বেধ ৩ সে.মি.। কোণাকৃতি ফলকটির কোণাকোণি পরিমাপ ২০ সে.মি. ও ১৩ সে.মি.। ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের (রাজবাড়ি, নওগাঁ) চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। এ ধরনের কোণাকৃতি পোড়ামাটির ফলক কোনো বিশেষ জায়গায় ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। কোণাকৃতি পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে লতাপাতা সজ্জিত ফলকের মধ্যে কৃষ্ণ ও বলরামকে জৈনক সাধু পুরুষের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে। লতা-পাতা সজ্জিত গাছের উপরে উপবিষ্ট জৈনক সাধু অথবা কোনো দেবী এক হাতে চক্র অন্য হাতে গদার দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক। মূর্তিগুলির দৈহিক গঠন, অবস্থান ও ভঙ্গি এবং বসনের বিন্যাস এক বিশেষ ধরনের শিল্পরীতির অনুসরণে পরিকল্পিত ও রূপায়িত।

(ফলক নং ২১ : VRM No. ১৩৩১; চিত্র নং-২১) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৭.৫ সে.মি., প্রস্থে ১১.৬ সে.মি. এবং বেধ ৩.৭ সে.মি.। ব্রিটিশ অফিসার Mr. J.C. French কর্তৃক পোড়ামাটির ফলকটি সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। পোড়ামাটির ফলকটি বলরাম, রাধা ও কৃষ্ণের কোঠরগত প্যানেল। ভাই, ভাবী ও দেবরের মূর্তি ফলকের মধ্যে ঢাল-তলোয়ারসহ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে কৃষ্ণকে বাঁশি বাজানো এবং রাধাকে নৃত্যরত অবস্থায় ফলকটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে। বলরামের হাতে কি রয়েছে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। রাধা-কৃষ্ণের জনপ্রিয় ঔপাখ্যানিক কাহিনী ফলকে স্থান পেয়েছে।

(ফলক নং ২২ : VRM No. ৩৩৯০; চিত্র নং-২২) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক সতের-আঠার শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৯ সে.মি., প্রস্থে ১২ সে.মি. এবং বেধ ৪ সে.মি.। কোণাকৃতি ফলকের কোণাকোণি মাপ ২৫ সে.মি. ও ১৮ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের (রাজবাড়ি, নওগাঁ) চেয়ারম্যান মি. রিয়াজ উদ্দিন সরদার কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। অলংকৃত খাঁজকাটা পোড়ামাটির ফলকের মধ্যে মহিষের পিঠে উপবিষ্ট যম (হিন্দু শাস্ত্রমতে জীবন নাশকারী) এর দৃশ্য লক্ষণীয়। এ ধরনের পোড়ামাটির ফলকও বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো বলে মনে হয়। পাহাড়পুর থেকে এ ধরনের দেব-দেবী, কৃষ্ণ-বলরাম, যম, কুবের, গণেশ ইত্যাদির পোড়ামাটির ফলকের মূর্তি পাওয়া গেছে। পোড়ামাটির ফলকে বিশদ শিরোভূষণ পরিহিত, অলংকৃত হস্ত, ঢাল-তলোয়ারসহ যোদ্ধা দেখা যাচ্ছে। মনে হয় মূর্তিটির মস্তক বিশদ শিরোভূষণে সজ্জিত।

(ফলক নং ২৩ : VRM No. ৩৩৬৬; চিত্র নং- ২৩) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। পোড়ামাটির ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৫.৫ সে.মি., প্রস্থে ১৪ সে.মি. এবং বেধ ৬ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি নামকান, বাঘমারা, রাজশাহী থেকে মি. অনিমেষ লাহেরী কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। ডান হাতে ধনুক, সদ্য জ্যা-যুক্ত তীর, সামনের দিকে ঝুঁকে আক্রমণের ভঙ্গিতে একজন মহিলা যোদ্ধার মূর্তি সম্বলিত

পোড়ামাটির ফলক। পোড়ামাটির ফলকে উৎকীর্ণ বিশদ শিরোভূষণ, উদ্‌গত চক্ষুতারকা বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণকর্ণ, গঠন অতি সাধারণ, পরিধেয় বসন-ভূষণ নেই। মনে হয় মূর্তিটিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি উচ্চ শিল্পের প্রাণ সম্পূর্ণ অভাব।

(ফলক নং ২৪ : VRM No. ৬৭৮ (ঋ); চিত্র নং-২৪) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২১ সে.মি., প্রস্থে ১৩.৫ সে.মি. এবং বেধ ৪.৪ সে.মি. (অসমান)। পোড়ামাটির ফলকটি প্রমথ নাথ মুন্সি কর্তৃক পানিসরা, শেরপুর, বগুড়া (শিব মন্দির) থেকে সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। ফুল ও লতাপাতায় সজ্জিত পোড়ামাটির ফলক। এ ধরনের ফলক ধর্মীয় ও নান্দনিক কারণে প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

(ফলক নং ২৫ : VRM No. ৩৩৬৫; চিত্র নং-২৫) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৬ সে.মি., প্রস্থে ১৩ সে.মি. এবং বেধ ৪.৯ সে.মি.। নামকান, বাঘমারা, রাজশাহী থেকে মি. অনিমেষ লাহেরী কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট (কৌমারি) ধনুহস্তে বীরদর্পে অগ্রসরগামী কুমারীর মূর্তি সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক। মনে হয় মূর্তিটিতে সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি উচ্চ শিল্পের প্রাণ সম্পূর্ণ অভাব। মূর্তিটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠবহীন এবং পরিধেয় বসন-ভূষণ নেই। মূর্তিটিতে এক হাতে ঢাল অন্য হাতে তরবারি সম্বলিত ময়ূরের পিঠে উপবিষ্ট কুমারীর পোড়ামাটির ফলক। মূর্তিটির ভঙ্গীর মধ্যে কোনো লাবণ্য বা সুষমা নেই এবং অন্তর্নিহিত কোনো ভাব বা চিন্তা মুখশ্রীতে ফুটে উঠেনি।

(ফলক নং ২৬ : VRM No. ১১৪৫; চিত্র নং-২৬) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক আঠার শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৯ সে.মি., প্রস্থে ১৪ সে.মি. এবং বেধ ৪ সে.মি.। ফলকটি কোথায় থেকে এবং কে সংগ্রহ করেছেন তার উল্লেখ নেই। পোড়ামাটির ফলকটিতে ফুল ও লতাপাতার মোতিফ্ উৎকীর্ণ। সম্ভবত ধর্মীয় ও নান্দনিক কারণে এ ধরনের পোড়ামাটির ফলক সে সময়ে প্রাধান্য পেয়েছে বলে মনে হয়।

(ফলক নং ২৭ : VRM No. ৩৫১৫; চিত্র নং-২৭) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক উনিশ শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৯ সে.মি., প্রস্থে ১১ সে.মি. এবং বেধ ৪ সে.মি.। কোণাকৃতি ফলকের কোণাকোণি মাপ ২৫.২ সে.মি. ও ১৯ সে.মি। পোড়ামাটির ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান (রাজবাড়ি, নওগাঁ) মি. রিয়াজউদ্দিন কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। খাঁজকাটা পদ্মফুল সম্বলিত কোঠরগত প্যানেলের মধ্যে কু-লক্ষ্মি দেবি গোধিকার পৃষ্ঠে উপবিষ্ট দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক। ফলকটিতে লক্ষ্মির দু'হাতে দু'টি পদ্মধারী, গলায় বনমালা, সাধারণ বসন-ভূষণ লক্ষণীয়। অলংকার শোভিত সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহ সম্বলিত পোড়ামাটির ফলকটি দেখে মনে হয় সৌন্দর্যানুভূতি শিল্পের প্রাণ সম্পূর্ণ অভাব।

(ফলক নং ২৮ : VRM No. ৩৪৯৮; চিত্র নং-২৮) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক উনিশ শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২০.৫ সে.মি., প্রস্থে ১১.২ সে.মি. এবং বেধ ৩.৫ সে.মি.। কোণাকৃতি ফলকটির কোণাকোণি মাপ ২৪.৫ সে.মি. ও ২২.২ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের (রাজবাড়ি, নওগাঁ) চেয়ারম্যান মি. রিয়াজউদ্দিন কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। খাঁজকাটা পদ্মফুল সম্বলিত কুলঙ্গির মধ্যে কাছিমের পিঠে উপবিষ্ট বিষ্ণুর চূর্ণ- অবতারের দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক। ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তিটির গলায় বনমালা, বাহুতে অঙ্গদ, মস্তকে শিরোভূষণ, হস্তধৃত প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের স্বাভাবিক আকৃতি বিশিষ্ট এবং এক পা ময়ূয়ের পিঠে উপবিষ্ট, অন্য পা নিচে লক্ষণীয়।

(ফলক নং ২৯ : VRM No. ৩৫০৪; চিত্র নং-২৯) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক উনিশ শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২১.২ সে.মি., প্রস্থে ১২.৬ সে.মি. এবং বেধ ৩.৮ সে.মি.। কোণাকৃতি এ ফলকটির কোণাকোণি পরিমাপ ২৮ সে.মি. ও ২১ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের (রাজবাড়ি, নওগাঁ) চেয়ারম্যান মি. রিয়াজউদ্দিন কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। খাঁজকাটা অলংকৃত ফলকের মধ্যে চতুর্হস্ত বিশিষ্ট কালিমূর্তি দণ্ডায়মান। বাম পার্শ্বের হাতে উপরে খর্গ, নিচে সর্প, অন্য হাতে হাতী, গলায় নরমুণ্ডের মালা, মাথায় মুকুট পরিহিত। কোমড়ে কোমড় বন্ধনী, ধুতির কুচি দু'পার্শ্বে নেমে যাওয়ার দৃশ্য সম্বলিত পোড়ামাটির ফলক। হিন্দুদের শক্তিশালী দেবতার মধ্যে কালিমূর্তি অন্যতম।

(ফলক নং ৩০ : VRM No. ৩৫১৪; চিত্র নং-৩০) : পোড়ামাটির ফলকটি আনুমানিক উনিশ শতকের। ফলকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২০.৫ সে.মি., প্রস্থে ১১.৫ সে.মি. এবং বেধ ৩.৬ সে.মি.। পোড়ামাটির ফলকটি ৬ নং বলিহার ইউনিয়নের (রাজবাড়ি, নওগাঁ) চেয়ারম্যান মি. রিয়াজউদ্দিন কর্তৃক সংগৃহীত এবং বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে প্রত্যার্পিত। বহুপত্রী কুলঙ্গী দু'ভাগে বিভক্ত। উপরে উপবিষ্ট দেবি এবং নিচের সারিতে চতুর্মূর্তি লক্ষণীয়। বাম পার্শ্বে হাতির পিঠে ইন্দ্র, ষাঁড়ের পিঠে শিব, হংসের পিঠে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু গরুড়ের উপর উপবিষ্ট।

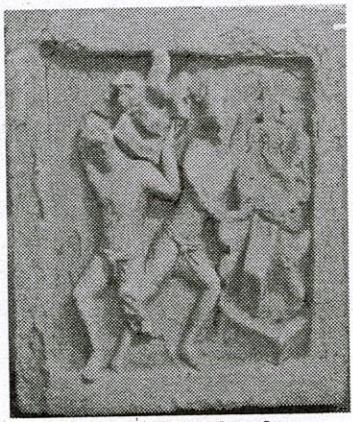
পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লেখিত পোড়ামাটির ফলকগুলো গ্রাম্য মৃৎশিল্পীরা সুলভ্য আঁঠাল মাটি দিয়ে আনন্দের ছলে যে রূপ সৃষ্টি করেছে তাতে অবসরপুষ্ট গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনের পরিমিত সৌষ্ঠব বা মার্জিত রুচির পরিচয়, উচ্চস্তরের ভাবানুভূতি, জটিল মননক্রিয়ার পরিচয় আশা করা অন্যায়। তবে ফলকগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য, রচনা বিন্যাস, গঠনপ্রণালী, শৈলী ও কারুকার্য এবং সৌন্দর্য বিকাশের দিক দিয়ে বিচার করলে ফলকগুলোর মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ করা যায়। কিন্তু এই প্রভেদ কতটা স্থান বা কালের প্রভাবে আবার কতটা শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি বা অন্যকোন কারণে হয়েছে তা বলা কঠিন। আবার অলংকার ও পোশাক পরিচ্ছদের রূপায়নে আঙ্গিকগত ও রীতিগত পরিপূর্ণতা লক্ষণীয়। দেহ ভঙ্গিতে ঈষৎ আড়ষ্টতা, মূর্তি, জীবজন্তু, পদ্মফুল, লতাপাতা প্রভৃতি শিল্পরীতির গতিশীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য স্পষ্ট এবং বলিষ্ট প্রকাশভঙ্গি। পোড়ামাটির ফলকে ও মূর্তিতে আছে কৃষি নির্ভর লোকজীবনের বা লোকশিল্পের নিদর্শন। আর এ শিল্পের উৎস ছিল সমাজ কাঠামোর নিমস্তরের অবজ্ঞাত কুম্ভকার শ্রেণী। তবে এ নিদর্শনগুলো থেকে সে-কালের সাধারণ লোকের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনা, কৃষ্ণ কাহিনী বিভিন্ন জনপ্রিয় ঔপাখ্যানিক উপাদান পোড়ামাটির ফলকে স্থান পেয়েছে। অধিকন্ত বাংলার প্রান্তসীমায় বসবাসকারী উপজাতীয় লোকজনের বিচিত্র রূপ এবং জন্তু জগতের বিভিন্ন উপাদান। বিবর্তনের দিক দিয়ে এ শিল্প নিদর্শনগুলোর মূল্য খুব বেশি না হলেও বিশ্লেষণের দিক হতে এ শিল্পের ইতিহাস আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

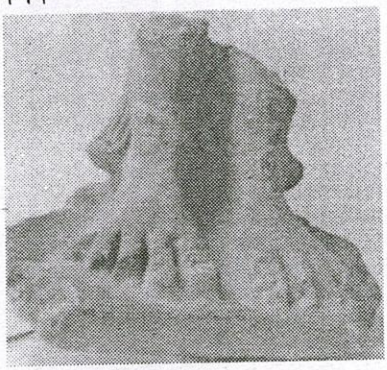
১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০২।
২. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩২১।
৩. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩২১।
৪. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, *বাঙলাদেশের প্রত্নসম্পদ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৪।
৫. সোহরাব উদ্দীন সৌরভ, *সোমপুর মহাবিহারের পোড়ামাটির ফলকে জীব বৈচিত্র্য*, ইতিহাস একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯।
৬. Zulekha Haque *Terracotta Decoration of Late Mediaeval Bengal: Portrayal of a Society*, Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1980.
৭. P.C. Sen *Mahasthan and its Environs*, Rajshahi : Varendra Research Museum, 1929.
৮. Shahanara Husain "The Terracotta Plaques from Paharpur", *JASP*, 8, No.2 (1963).
৯. do- "The Terracotta Find-spots of Pre-Muslim Bengal", *JASP*, 15, No.2 (1970).
১০. R.C. Majumdar, *History of Ancient Bengal*, Calcutta : G. Bharadwaj, 1974.
১১. Muhammad Hafizullah Khan *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal*, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1988.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বরেন্দ্র জাদুঘরের জনাব মো. মনিরুল হক, উপ-পরিচালক এবং জনাব মো. আব্দুস সামাদ মন্ডল, সাবেক উপ-পরিচালক মৌলিক তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন।

পোড়ামাটির ফলকের নিদর্শন



চিত্র নং-১ ঃ লেংটি পরিহিত শ্রমিক



চিত্র নং-২ ঃ বৌদ্ধ মূর্তির ভগ্ন পদযুগল



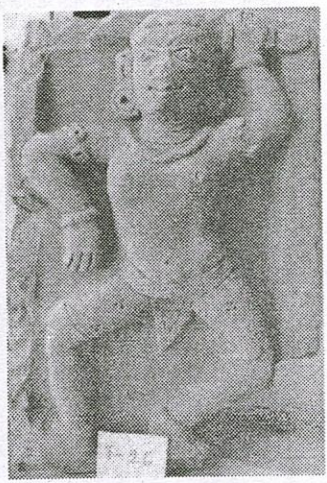
চিত্র নং-৩ ঃ নৃত্যরত নরমূর্তি



চিত্র নং-৪ ঃ শস্য মুখে টিয়া পাখি



চিত্র নং-৫ ঃ তরবারী হাতে যোদ্ধা



চিত্র নং-৬ ঃ নৃত্যরত যোদ্ধা



চিত্র নং-৭ ঃ শিকারের বেশে শবর



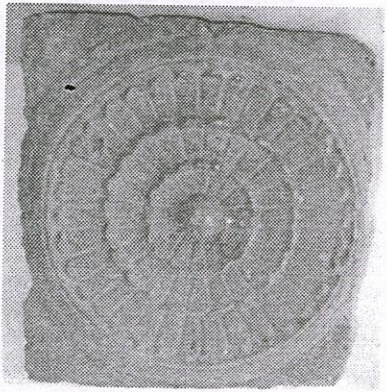
চিত্র নং-৮ ঃ নৃত্যরত পুরুষ



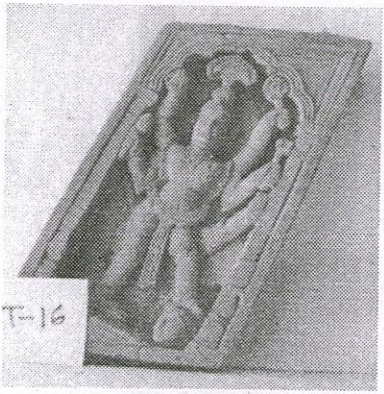
চিত্র নং-৯ ঃ অনন্ত নাগের পাঁচ ভাজের মধ্যে শয্যারত বিষ্ণু



চিত্র নং-১০ ঃ লতাগুল্ম



চিত্র নং-১১ ঃ সুশোভিত পদ্ম



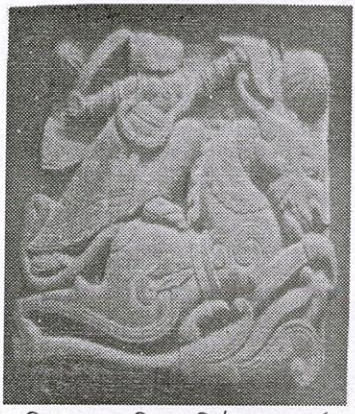
চিত্র নং-১২ ঃ বিষ্ণুর বামন অবতার



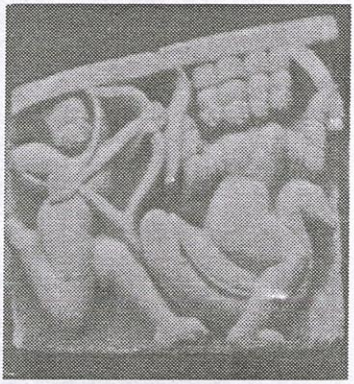
চিত্র নং-১৩ ঃ কৃষ্ণ ও ঘোষধা



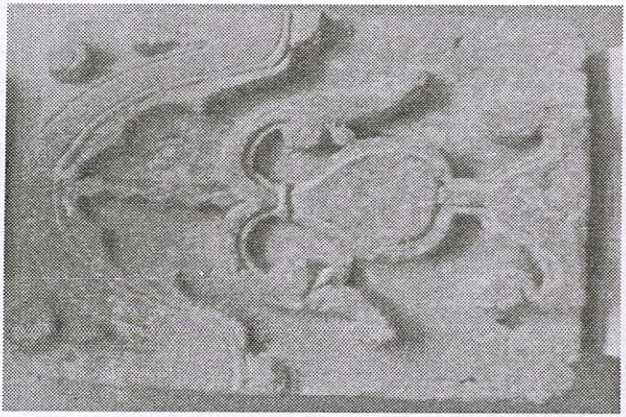
চিত্র নং-১৪ ঃ বর্তুলাকার কড়ি



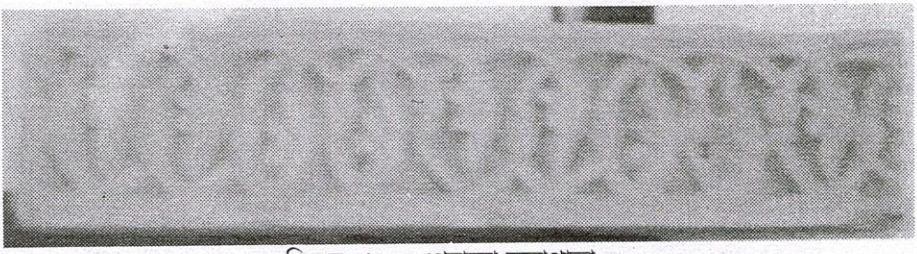
চিত্র নং-১৫ ঃ সিংহের পিঠে আরোহ দূর্গা



চিত্র নং-১৬ ঃ হংসের পিঠে ধানুকীসহ
চতুর্মাথা ব্রক্ষা



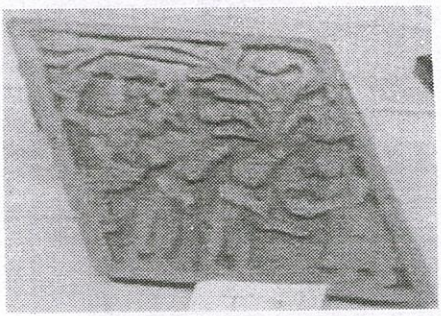
চিত্র নং-১৭ ঃ শিকল ঘন্টা সম্বলিত বাতি



চিত্র নং-১৮ ঃ পেচানো লতাপাতা



চিত্র নং-১৯ ঃ প্রস্ফুটিত জবা



চিত্র নং-২০ ঃ কৃষ্ণ ও বলরাম



চিত্র নং-২১ ঃ রাধা, কৃষ্ণ ও বলরাম



চিত্র নং-২২ ঃ মহিষের পিঠে যম



চিত্র নং-২৩ ঃ যোদ্ধারত নারী



চিত্র নং-২৪ ঃ ফুল ও লতাপাতা



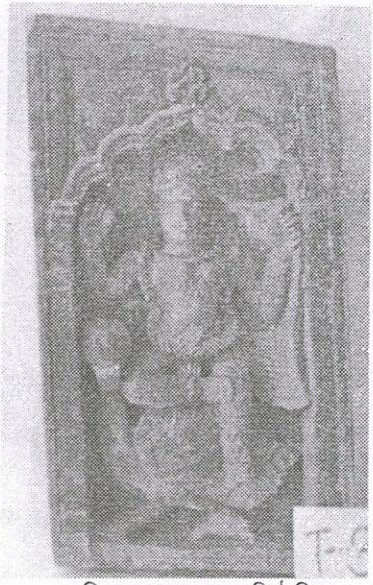
চিত্র নং-২৫ ঃ ময়ূরের পিঠে কুমারী



চিত্র নং-২৬ ঃ ফুল ও লতাপাতা



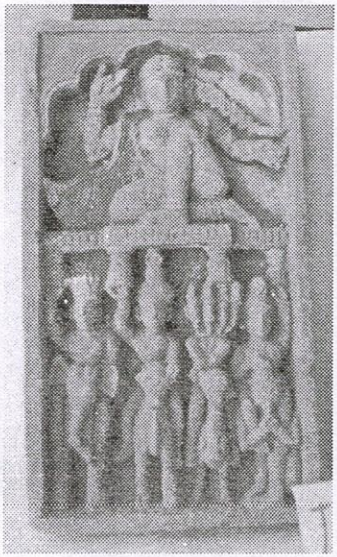
চিত্র নং-২৭ ঃ গোধিকার পিঠে কু-লক্ষ্মি



চিত্র নং-২৮ ঃ ময়ূরের পিঠে বিষ্ণু



চিত্র নং-২৯ ঃ চতুর্হস্ত কালিমূর্তি



চিত্র নং-৩০ ঃ হাতির পিঠে ইন্দ্র, ষাড়ের পিঠে শিব,
হংসের পিঠে ব্রহ্মা এবং গরুড়ের পিঠে বিষ্ণু

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র : সমকালীন প্রতিক্রিয়া

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়*

Abstract: Bamkimchandra Chattopadhyay is merely acclaimed for his fictional works than his work as an editor of a periodical. His edited periodical 'Bangladarshan' represented intellectual exclellence and creative literary work. The periodical also influenced nationwide patriotism and nationalism. The role Bamkimchandra played in the periodical is the subject of this article.

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্রের প্রকাশ শুরু। যত দিন যেতে থাকে ততই বাড়তে থাকে সংবাদ-সাময়িক পত্রের সংখ্যা। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল সংবাদ পরিবেশন, জনমত গঠন অথবা কোন বিশেষ ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন। সভা-সমিতির মুখপত্র হিসেবে বেশ কিছু পত্রিকা বেরিয়েছিল সে সময়ে। সাহিত্যচর্চার লক্ষ্য নিয়ে বা সাহিত্যকে পুষ্ট করার মানসিকতা নিয়ে বাঙালিরা পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *বিবিধার্থসংগ্রহ* (১৮৫১), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের *সংবাদপ্রভাকর*-এর মাসিক সংস্করণ (১৮৫৩), কিম্বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের *কবিতা কুসুমাবলী*-র (১৮৬১) কথা প্রসঙ্গত মনে আসে।

ইতিমধ্যে বাংলায় শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিতে স্নাত একদল যুবকের আবির্ভাব হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এই তরুণ শিক্ষিত সমাজের মনের খোরাক মেটানোর মতো তেমন কোন পত্রিকার আবির্ভাব উনিশ শতকে সত্তরের বছরগুলির আগে হয়নি। এই-ধরনের পত্রিকার অভাব একালে অনেকেই অনুভব করেছিলেন। এই অভাব পূরণের লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম্লাতক শিক্ষিত-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মনের এই আকাঙ্খার কথা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে চিঠিতে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে লিখলেন

My Dear Sir,

Berhampore
The 14th March 1872

...I Wish you every success in your project, I have myself projected a Bengalee Magazine with the object of making it a medium of communication and sympathy between the educated and uneducated classes. You rightly say that the English for good or for evil has become our vernacular; and this tends to daily to widen the gulf between the higher and lower ranks of Bengalee society. This I think, is not exactly what it ought to be; I think that we ought to

* ড. অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রিডার, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

deanglisize ourselves, so to a certain extend and to speak to the masses in the language which they understand, I therefore project a Bengali Magazine but this is only half the work we have to do. No purely vernacular organ can completely represent the Bengali culture of the day. Just as we aught to address ourselves to the masses of our own race of our country, we have also to make ourselves intelligable to the other Indian races, and to the governing race there is no hope for India. Until the Bengali and Punjabi understand and influence each other, and can bring their joint influence to bear upon the Englishman. This can be done only through the medium of the English……

…..After this I need not tell you that I shall not want in inclination to co-operate with you, and if my literary services are worth, enlisting on your side they are at your disposal. It is true I am likely to be a little over-worked at present, owing not to my literary engagements, but to a reduction in the number of officers at your station, but I will nevertheless make time both for your magazine and mine…….[1]

এই চিঠিটি লেখার কয়েকদিন পরে প্রস্তাবিত পত্রিকাটির একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

বিজ্ঞাপন

বঙ্গদর্শন

মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন।

বঙ্গদর্শন আগামী ১লা বৈশাখ হইতে প্রচারিত হইবে।

নিম্নলিখিত মহাশয়গণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি. এল।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি.এ।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম.এ, বি. এল।

শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি.এ।

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বি. এল।

ও অন্যান্য মহোদয়গণ বঙ্গদর্শনে নিয়মিত রূপে লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

ডাক মাসুল ছাড়া বঙ্গদর্শনের মূল্য

অগ্রিম।	পশ্চাৎ দেয়।
বার্ষিক ৩	৪ /॥.
ষান্মসিক ১॥.	২ /॥.
ত্রৈমাসিক ১ ।/ ।.	১ ।.

প্রত্যেক খণ্ড ॥. আনা

১ নং পিপুলপটী লেন
ভবানীপুর, কলিকাতা।
১ লা চৈত্র ১২৭৮

শ্রীব্রজমাধব বসু কার্য্যাধ্যক্ষ[২]

বিলেতের বিখ্যাত পত্রিকা *এডিনবরা রিভিউ*-কে হিসেবে সামনে রেখে *বঙ্গদর্শন*-এর পরিকল্পনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। উপরের বিজ্ঞাপনটি *এডুকেশন গেজেট* এ প্রকাশিত হবার কয়েকদিন পরেই প্রকাশিত হল বঙ্গিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন*। পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা'-য় তিনি জানালেন

> আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিতে যত্ন করিব।
>
> ...এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে তাঁহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্ত্তাবহস্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক। তাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা করেন যে, এরূপ বার্ত্তাবহের কতকদূর অভাব আছে। সেই অভাব নিরাকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য। আমরা যে কোন বিষয়ে যে কাহারো রচনা, পাঠোপযোগী হইলে সাদরে গ্রহণ করিব। এই পত্র, কোন বিশেষ পক্ষের সমর্থন জন্য বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সৃষ্ট হয় নাই।
>
> ...যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য। যাহাতে সাধারণের উন্নতি নাই, তাহাতে কাহারও উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না... যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সংবর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।[৩]

প্রথম প্রকাশের পর *বঙ্গদর্শন* বাঙালি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রথম মুদ্রণের হাজার কপি দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংখ্যাটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। *বঙ্গদর্শন* কিভাবে সদর ছেড়ে বাঙালি অন্দরমহলের হৃদয়মন জয় করে নিয়েছিল সে কথা রবীন্দ্রনাথ অনন্য সুন্দর ভঙ্গিতে বলে গেছেন। পত্রিকাটি পেয়ে অভিভূত সরকারি অনুবাদক মন্তব্য করলেন

> A very superior literary Magazine and Review. Both the editor and contributors are among the ablest of Bengali writers. [4]

বঙ্গদর্শন-এর প্রথম সমালোচনাটি সম্ভবত প্রকাশিত হয় সমকালের বিখ্যাত পত্রিকা *সোমপ্রকাশ*-এ। আলোচনা প্রসঙ্গে পত্রিকাটি মন্তব্য করে --

> আমরা ইহার গুণ দোষ উভয়ের পরিমাণ করিয়া দেখিলাম, গুণের অংশটি গুরু হইয়া উঠিল। এখানি যে প্রণালীতে লিখিত হইতেছে তদ্দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, ইহা ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়া বঙ্গসমাজের সবিশেষ উপকার সাধনে সমর্থ হইবে ।[৫]

পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি পেয়ে ২২ বৈশাখ ১২৭৯-তে *এডুকেশন গেজেট* লিখল

> এই পত্রের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধনামা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রমুখে আপন নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোন কোন অত্যুৎকৃষ্ট ইংলণ্ডীয় সাময়িক পত্রের অনুকরণ করিয়াছেন, এবং স্বকীয় পত্রের প্রতি বহুসংখ্যক কৃতবিদ্য ব্যক্তির কৌতূহল আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠকবর্গ দেখিয়া থাকিবেন বঙ্গদর্শন আমাদিগের হস্তগত হইবার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গ ভাষানুরাগী সুবিচক্ষণ পত্রপ্রেরকেরা ইহার আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সাময়িক পত্রের পক্ষে এটি সামান্য গৌরব নহে। অধিকতর গৌরব এবং আমাদিগের সুখের বিষয় এই যে, বঙ্গদর্শনের সৌষ্ঠব এবং সারবত্তা বিদ্যানুরাগী পাঠকমণ্ডলীর প্রীতিকর হইয়াছে। অতএব আমরা একাগ্রমনে আশীর্ব্বাদ করিলাম ইনি চিরজীবী হউন।[৬]

বঙ্গদর্শন প্রকাশ করে শুধু অবিমিশ্র সমাদরই বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছিলেন একথা মনে করা ঠিক নয়। সমকালীন পত্রপত্রিকাগুলির একাংশ এর দোষ দেখাতে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ বলল *বঙ্গদর্শন*-এর ভাষা ভুলে ভরা, কেউ বলল প্রকাশিত লেখাগুলির বিচ্যুতির কথা। সবচেয়ে কঠোরভাবে সমালোচনা করলেন *সোমপ্রকাশ* ও *এডুকেশন গেজেট*-এর অজ্ঞাতনামা দুই সমালোচক। এই দুটি সমালোচনা শুধু একই সময়ের নয়, দু-চার দিনের মধ্যে দুটিরই প্রকাশ। *সোমপ্রকাশ*-এর সমালোচনাটির কথা প্রথমে একটু বলে নেওয়া যাক। ১২৭৯-র, ১১ বৈশাখ *বঙ্গদর্শন*-এর কথা বলতে গিয়ে 'শ্রী' নামান্তরালে এক ব্যক্তি লিখলেন

যে সমুদয় ব্যক্তি বঙ্গদর্শন সম্পাদনকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গসমাজে অপ্রসিদ্ধ নহেন। হঁহাদিগের অনেকেই লেখনীর বলে সহৃদয়গণের নিকট বিপুল প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। ঈদৃশ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যে সমবেতচেষ্ট হইয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সম্পাদানার্থ অগ্রসর হইয়াছেন, এটী নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় সন্দেহ নাই। সুলেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের রসময়ী লেখনী বিনির্গত হইবে বলিয়া অনেকেই সোৎসুক চিত্তে ইহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। বৈশাখের প্রথম দিবসে সেই অভীষ্ট বঙ্গদর্শন কুতূহলপর পাঠকগণের সমক্ষে উপনীত হইল। সকলেই উৎফুল্ল নয়ন হইয়া আগ্রহ সহকারে বঙ্গদর্শন পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। আমরাও সেই আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গদর্শনখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিলাম; কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, আমাদিগের মন আশানুরূপ পরিতৃপ্ত হইল না। বঙ্গদর্শনে অতৃপ্তির অনেকগুলি কারণ লক্ষিত হইল। এই কারণগুলি তিরোহিত না হইলে বঙ্গদর্শন কোনকালে আদরণীয় হইতে পারিবে না। এতন্নিবন্ধন অদ্য আমরা বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বঙ্গদর্শন রয়েল আটপেজী ফর্ম্মার ৪৮ পৃষ্ঠা পরিমিত। বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাগুলি সচরাচর যেরূপ আকারের হইয়া থাকে, বঙ্গদর্শন তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে বৃহৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী পত্রিকাসমূহের অনুরূপ হয় নাই। এ অংশে বঙ্গদর্শনের আরো পরিবর্দ্ধিত করা উচিত ছিল।

বঙ্গদর্শনের প্রস্তাবিত সংখ্যায় পত্র সূচনা, ভারতকলঙ্ক, কামিনীকুসুম, বিষবৃক্ষ, আমরা বড়লোক, সঙ্গীত, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল এবং উদ্দীপনা এই আটটি বিষয় বর্ণিত আছে। লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে অনেকগুলি পত্রিকানুরূপ হয় নাই। পত্রসূচনাটি অনেকাংশে যুক্তিপূর্ণ হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালীগণের বাঙ্গালা পত্রিকা পাঠে অনাস্থা, তাহার কারণ, বঙ্গদর্শনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি পত্রসূচনাতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। ভারতকলঙ্কে হিন্দুজাতির বীরত্ব, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, অনাস্থা, অনৈক্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রস্তাবে লেখক যে সমস্ত স্বমত পরিপোষক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তৎসমুদয় যুক্তিবহির্ভূত হয় নাই। আমরা অনেকাংশে ইহার অনুমোদন করিতেছি কিন্তু লেখক, মীবারবাসীগণ ভিন্ন আর সমুদয় হিন্দুকেই যে স্বাধীনতায় অনাস্থাবান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এটী আমরা কোনও প্রকারে স্বীকার করিতে পারিলাম না। আর্য্যজাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার অনেক গুণগান আছে।

কামিনীকুসুম পদ্যময়। সচরাচর বাঙ্গালা পত্রিকাতে যে সমস্ত পদ্য দৃষ্ট হয় কামিনীকুসুম, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। বিষবৃক্ষ একটা ধারাবাহিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এটি লিখিতেছেন। ইহার কিয়দংশ মাত্র প্রস্তাবিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগ্রন্থনচাতুরী সাধারণের অবিদিত নাই। তাঁহার উপন্যাস সকলেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষবৃক্ষের প্রারম্ভ দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্টবোধ হইল, বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যে উপন্যাস পাঠে পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর প্রদীপ্ত হয়, তাহাতেই যথোচিত রূপে উপাখ্যান গ্রন্থনের চাতুর্য্য আছে, এটি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উপাখ্যান যোজনার কৌশল বিকশিত না হইলে পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপনের সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বিষবৃক্ষের এইকৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই সমাপ্তি ফল নির্দ্দেশ করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সূচনাতেই আখ্যায়িকার ফল সমুদয় খুলিয়া বলিলে পাঠকের পাঠেচ্ছা বলবতী হওয়া সম্ভাবিত নহে। আদৌ উত্তরোত্তর উদ্ভাবনীশক্তি প্রদর্শন করিয়া পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ কর্ত্তব্য; পরিশেষে যখন প্রারম্ভ নিহিত বীজ ফলনোন্মুখ হইবার সময় উপস্থিত হইবে, তখনই সেই ফল নির্দ্দেশ করিয়া আখ্যায়িকার উপসংহার করা বিধেয়। কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক, এই চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বীজ অঙ্কুরিত না হইতে কি তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া আড়ম্বর

করা বিধেয়? এরূপ করিলে কি বক্তার শূন্যহৃদয়তা প্রকাশ পায়না? বিষবৃক্ষের এইরূপ গল্প বন্ধন প্রণালী নিরতিশয় অসহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের এদোষ মার্জ্জনীয় নহে।

'আমরা বড়লোক' প্রস্তাবে বঙ্গদেশীয় পরিচ্ছদের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। লেখক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের একেবারে অননুমোদনীয় নহে। কিন্তু তিনি যেরূপ রসিকতা ও বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অরুচিকর হইয়াছে। রসিকতা প্রদর্শন সময়েও ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। অধৈর্য্য বিলসিত রসিকতা অসামাজিকতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমরা দু:খিত হইলাম, বঙ্গদর্শন এরূপ অসামাজিকতা দোষে দূষিত হইয়াছে। সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। সচরাচর সঙ্গীত সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, এ প্রস্তাবটিও তাহাদিগের অন্যতম সহোদর। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ও উদ্দীপনা প্রস্তাব দুটা মন্দ হয় নাই। লেখক, ভারতবর্ষীয়গণের উদ্দীপনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে যথার্থ কথা বলিয়াছেন কিন্তু ভারতবর্ষীয়গণ যে একেবারে উদ্দীপনা বিরহিত ছিলেন, এটি আমরা কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। যাঁহারা আর্য্যজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বীকার করিবেন যে পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বক্তৃতাশক্তি (এলোকোয়েন্স) শূন্য ছিলেন না।

বঙ্গদর্শন যে যে বিষয়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমরা একে একে নির্দ্দেশ করিলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি লিখিত বিষয় সমূহের অনেকগুলি বঙ্গদর্শনের অনুরূপ হয় নাই। আমরা বড়লোক, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল প্রভৃতি বিষয় বঙ্গদর্শনে শোভা পায়না। এরূপ সামান্য বিষয় এক্ষণে অনেক বাঙ্গালা পত্রিকাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক রহস্য গবেষণা সম্বলিত ইতিহাস আর্য্যগণের প্রকৃত পুরাবৃত্ত, লোকবিশ্রুত দেশীয় ব্যক্তিগণের জীবনচরিত প্রভৃতি বিষয়ই বঙ্গদর্শনের অনুরূপ। এইরূপ বিষয় লিপিবদ্ধ হইলে বঙ্গদর্শন সকলের নিকট সবিশেষ আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। অন্যথা বঙ্গদর্শন সাধারণ বাঙ্গালা পত্রিকা অপেক্ষা উচ্চ আসন পরিগ্রহ করিতে পারিবে না।

এক্ষণে বঙ্গদর্শনের ভাষার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। বঙ্গদর্শনের ভাষা সাধারণত: অনুৎকৃষ্ট হয় নাই কিন্তু ইহাতে অনেকগুলি হৃদয়ভেদী দোষ দৃষ্ট হইল। বঙ্গদর্শনের স্থানে স্থানেযেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সাধারণ লোকেও তাহা প্রয়োগ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকে। 'বিবরিত' প্রভৃতি কতকগুলি এ্যন্ত ক্রিয়ার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে। এগুলি বাঙ্গালায় প্রচারদ্রুপ নহে। এই এ্যন্ত ক্রিয়া প্রয়োগ করিলেও শ্রুতিমধুর হয়না। বিবরিত স্থলে 'বিবৃত' প্রয়োগ করাই অপেক্ষাকৃত যুক্তিসিদ্ধ। 'সাবধানী' 'একেবারে' 'কেবলমাত্র' এই পদগুলি দুষ্ট। এইগুলির পরিবর্ত্তে 'সাবধান' 'একবারে' 'কেবল' অথবা 'মাত্র' প্রয়োগ করা বিধেয়। 'কেবলমাত্র' এই দুটি কথা একবারে প্রয়োগ করা কোনও মতে যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা বড়লোক প্রস্তাবে লেখক 'সাবধানী' পদটি কি প্রকারে সিদ্ধ করিলেন, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। বিজ্ঞ ব্যক্তির এইরূপ চাঞ্চল্য অসমীক্ষ্যকারিতা প্রদর্শন নিরতিশয় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। বিষবৃক্ষ আখ্যায়িকার স্থলে 'গুরুসাহেবী' বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইয়াছে। 'হাসিতেছে, ছুটিতেছে, নাচিতেছে, ঠ্যাঙ্গানো হইতেছে' প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি একস্থলে এরূপ অনুচিতরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে পাঠ করিলে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যায় না। এই আখ্যায়িকার লেখক অনেকস্থলে ব্যাকরণ ও ভাষার মস্তকে পদাঘাত করিয়া যাহা মনে আসিয়াছে, মুদ্রিত নয়নে তাহাই লিখিয়াছেন। 'সরলতা চমৎকারা' কিরূপ বাঙ্গালা তাহা আমরা বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দশমবর্ষীয় বালকও এইরূপ বাঙ্গালা ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে। লেখক ব্যাকরণবিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে যাইয়া ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই মুণ্ড নিপাত

করিতেছেন। 'পদ্মপলাশনয়নী'কোন ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হইয়াছে? এইরূপ গৃহপুষ্ট ব্যাকরণের আঘাতে ক্ষীণাঙ্গী বাঙ্গালাভাষাকে প্রহার করিলে আর রক্ষা নাই। 'পদ্মপলাশনয়না'-ই বিশুদ্ধ পদ 'ন দ্ব্যাধিক স্বরান্নাসিকোদর বর্জ্জাৎ' সূত্র ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছে। মুগ্ধবোধ টীকাকার, দুর্গাদাসও ইহার পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক এই মতকে পদদলিত করিয়া বিলক্ষণ রূপে স্বীয় স্ত্রীত্যবিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'শ্যামাঙ্গিনী' পদটীও দুষ্ট। বহুক্ষণ ব্যাকরণের আরাধনা করিলে, এই পদটী সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ব্যাঙ্গালা কি সংস্কৃতে কোথাও দৃষ্ট হয়না। 'শ্যামাঙ্গিনী' স্থলে শ্যামাঙ্গী লিখাই সঙ্গত। কাব্য নির্ণয়কার 'চ্যুত সংস্কৃতি' দোষের উদাহরণ স্থলে 'শ্যামাঙ্গিনী' পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে 'শ্যামাঙ্গিনী' বিশুদ্ধ তাহা নহে।

বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে উদাত্ত ও সমাসবহুল পদের সহিত সাধারণ ব্যবহার্য্য শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপ ভঙ্গ প্রক্রমতা নিতান্ত দোষবহ। আমরা উদাহরণস্থলে 'মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ' বাক্যটা গ্রহণ করিলাম। 'মসীনিন্দিত' পদের সহিত 'গা' শব্দটা প্রযুক্ত হওয়াতে ভাষার কিরূপ লালিত্য বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা সহৃদয় পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন। 'তিনি খাওয়া দাওয়া করিয়া দুগ্ধফেণনিভ পর্য্যঙ্কে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দুইজন অসূর্য্যম্পশ্যা কামিনী কুলিশ পাতোপমরবে ঝগড়া করিতে করিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।' এইরূপ বাঙ্গালা কর্ণে যেরূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে 'মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ'-ও সেইরূপ অমৃত বর্ষণ করিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যাহারা সুলেখক বলিয়া গণ্য, লোকে যাহাদিগের রচনার অনুকরণে ব্যগ্র, তাঁহাগিগের এইরূপ ভাষা ব্যবহার করা-কি বিধেয়? ইহাতে কি গাত্রে উষ্ণবারি নিক্ষিপ্ত হয়না? বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সুলেখক বলিয়া যশোলাভ করিয়াছিলেন, আক্ষেপের বিষয় এক বঙ্গদর্শনের প্রান্তরে তাঁহাদিগের সেই কীর্ত্তি মলিন হইল?

বঙ্গদর্শনে অস্পষ্টতা প্রভৃতি দোষও বিলক্ষণ দৃষ্ট হইল। 'ভারতকলঙ্ক' প্রস্তাবের 'ভারতবর্ষীয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণানুসন্ধান করিলে তাহা দুর্জ্ঞেয়ও নহে।' 'আরবেরা যেরূপ বিফলযত্ন হইয়াছিল গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তদ্রুপ।' 'নিঃশেষ বিজিত হয়।' প্রভৃতি কিরূপ বিশদ বাঙ্গালা তাহা সহৃদয়গণ বিবেচনা করিবেন। আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, এইরূপ অবিশব্দ বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইলে ভাষার অনুমাত্র উন্নতি হইবে না। যিনি মনের কথা সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে না পারেন, তাঁহার লেখনী ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। উল্লিখিত তিনটী বাক্যের এইরূপ পরিবর্ত্তন হইলে ভাষা অপেক্ষাকৃত বিষদ হইত। যথা 'ভারতবর্ষীয়গণের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার কারণ দুর্জ্ঞেয় নহে।' 'আরব্যদিগের ন্যায় গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরাও বিফলযত্ন হইয়াছিল।' 'সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়।' ভাষার এইরূপ অস্পষ্টতা বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। বঙ্গদর্শনের স্থল বিশেষে ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এগুলি অবশ্য দোষের মধ্যে পরিগণিত। 'ফেসিয়ন ও পবলিক ডিনারে'-র কি বাঙ্গালা শব্দ নাই ? নাটক কিম্বা প্রহসনে যদি কোন ইংরাজী প্রিয় সৌখীন পুরুষের মুখ হইতে এই কথাগুলি নির্গত হইত, তাহা হইলে এটী দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। কিন্তু বঙ্গদর্শনে যেরূপভাবে এই কথাগুলি প্রযুক্তি হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য তাহা দোষ বলিয়া গণনা করিতে হইবে। যে ইংরেজী শব্দগুলির বাঙ্গালা হয় নাই অথচ ঐ ইংরেজী শব্দগুলিই সর্বদা চলিত বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই ইংরেজী শব্দ বাঙ্গালার দুই এক স্থলে প্রযুক্ত হইলে ভাষার তাদৃশ ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহার বাঙ্গালা আছে, তথাবিধ ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা কোনও প্রকারে সঙ্গত নহে। যাঁহারা এইরূপ পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তাঁহারা মাতৃভাষার হন্তা সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য্য ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। বড়লোকের লিখিত বলিয়া কেহ

যেন এই রূপ ভাষার অনুকরণ না করেন। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা রচনা বিষয়ে যেরূপ চাপল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য দোষ বলিয়া গণনা করা উচিত। রচনাগত দোষ সংশোধন করা লেখকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথায় তাঁহারা ভবিষ্যতে সুলেখক পদবাচ্য হইতে পারিবেন না।

উপসংহার সময়ে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য, যে কেহ যেন আমাদিগকে লেখকগণের বিদ্বেষ্টা বিবেচনা না করেন। আমরা বিদ্বেষের বশীভূত হইয়া দোষ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই নাই। অমনোযোগিতা নিবন্ধনই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, বঙ্গদর্শনে লেখকগণ রচনা বিষয়ে নিতান্ত অধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ভবিষ্যতে সাবধান হইয়া লিখুন, বঙ্গদর্শন আদরনীয় হইবে, তাঁহাদিগের কীর্ত্তিও উজ্জ্বলভাব ধারণ করিবে। বঙ্গদর্শনে বর্ণ বিন্যাস ঘটিত দোষ (স্পৃহনীয় প্রভৃতি) দৃষ্ট হইল। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।[৭]

সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যভূষণ পণ্ডিত মানুষ। বাংলা ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলবে এটাই ছিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত। এই রীতির ব্যতিক্রম দেখেই *বঙ্গদর্শন*-এর ভাষার ত্রুটি নির্দেশে পত্রিকাটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর একটি কথাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সমালোচনা কালেও তাঁর আবির্ভাবকে তেমন প্রসন্ন মনে অভ্যর্থনা জানায়নি *সোমপ্রকাশ*। *সোমপ্রকাশ*-এ দীর্ঘ এই সমালোচনাটি প্রকাশের তিন-চার দিনের মধ্যে *এডুকেশন গেজেট*-এ 'একজন ছিদ্রান্বেষক' লিখিত একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিটিতে ছিদ্রান্বেষক লেখেন

মহাশয়, আপনিদেখিয়া থাকিবেন 'বঙ্গদর্শন' নামে একখানি নূতন মাসিকপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানি শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত, আর আর কতকগুলি কৃতবিদ্য মহোদয় দ্বারা লিখিত, এবং সাপ্তাহিক সম্বাদযন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পত্রখানিযে অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, এমন পত্র যে বাঙ্গালায় আর কখন হয় নাই, বলা বাহুল্য মাত্র, ইহাতে যে আমাদিগের দেশের অনেক উপকার দর্শিবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই; ইহার প্রবন্ধ সমূহের উপর লেখকবৃন্দের প্রতিভা যে বিলক্ষণরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাও বলা নিস্প্রয়োজন। ইহার অনেক গুণ আছে, পাঠকমাত্রেই তাহাদেখিতে পাইবেন; ইহার কতকগুলি দোষ আছে তাহাই প্রকাশ করা এইপত্রখানির উদ্দেশ্য।

বঙ্গদর্শন-এর যে সব দোষ 'ছিদ্রান্বেষক'-এর চোখে পড়েছে সে গুলি হল --

[১। বাক্যশুদ্ধি।]

২।১।২৮ -- ২* । 'বাঙ্গালিরা-স্থলভুক্ত করিয়াছেন'। করিয়াছেন ক্রিয়ার কর্ম্ম কি ?

৪।১।২৬ -- ২৭। 'উচ্চশ্রেনীর সহিত যদি পার্থক্য জন্মিল'। কাহার ?

৪।...।৮। 'উভয়ে পার্থক্য ছিল'। উভয়ের পার্থক্য ছিল।

৬।২।২। -- ৪। 'অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা (?) ভিন্ন সাধারণের বোধগম্য বা পাঠ্য হয়না'। কি

৯।১।১৫ -- ১৯। 'কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষের জয়ের জন্য -- ...ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারেন নাই'। 'ভারতবর্ষের জয়ের জন্য' আবশ্যক ছিল না।

১০।১।১। -- ৩। তদদ্দ হইতে -- বৎসর পরে' ইহার -- বৎসর পরে।

১১।২।১৫ -- ১৮। "অতএব সক্ষম হইলেও হিন্দুর -- সম্ভাবনা (?) ছিল না'। 'হিন্দুদিগের' লেখা উচিত ছিল।

১৪।১।১৪। 'এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে'। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

২৩।১।৬ -- ৭। 'অবিরল মুদিতোস্মুখ নেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল।'

মুদিতোস্মুখ নেত্রে অবিরল বারিধারা পড়িতেছিল।

২৮।১।২ -- ২৪। 'রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়'। কে ? কে? শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।' কে ?

৩১।২।১-৩। 'যে যখন আসিয়া তখনি তাহাদের বস্ত্রাদির অনুকরণ করি'। তখনি 'তাহার'।

৪০।১।৮ -- ৯। 'তাহা দেখিয়া বিস্মৃত হইতে হয় যে, কি জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন'। জঘন্য বাঙ্গালা।

৪২।২।২৭। 'মনুষ্য জাতি তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে'। লইয়াছে, হওয়া উচিত।

৪৩।১।২৭ -- ৩০। 'আমি জানি যে, মনুষ্যদিগের স্বভাব যে, তাহার যে কাজ করে'। 'যে' র শ্রাদ্ধ।

* প্রথম অঙ্কে পত্র, দ্বিতীয় অঙ্কে স্তম্ভ, তৃতীয় অঙ্কে পংক্তি বুঝিতে হইবে। স.

[২। অন্যান্য প্রকারের কতকগুলি ভুল।]

৬।১।১৮। 'আমরা যে কোন বিষয়ে। বিজ্ঞাপনীতে বলা হইয়াছিল 'ধর্ম্ম বিষয়ে বাদানুবাদ করা হইবে না'।

৮।১।১৬। 'ইতিহাসবেত্তারা'। ইতিহাসবেত্তারাও।

৮।২।৩১ -- ৩৩। 'সত্য ভীত'। এই কথাটির অর্থ সত্য প্রকাশ করিতে ভীত এরূপ কখনই হইতে পারে না, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝায়।

১৬।১।১৭ -- ১৮। 'জাতি প্রতিষ্ঠা বলবৎ ছিল'। বলবতী হইবে।

১৬।১।৩৪ সমস্ত ভারতভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের

১৬।২।১ -- ২} ন্যায়, নানা জাতি নানা সমাজে পরিপূর্ণ' এক মধুচক্রে কি নানা জাতীয় মক্ষিকা থাকে ? সকলেই এক জাতীয় কিন্তু ভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত।

২৪।২।২৭। 'কটাক্ষ্য'। কটাক্ষ।

৩২।১।২৮। 'অন্তজ'। কথাটী অন্ত্যজ।

৩১।২।৬। 'কাহাকেও'। কাহাকে।

৩৪।২।২৯। 'লোকেই'। লোকেরই।

৩৯।২।২৮। 'সুভোক্ষ্য'। সুভক্ষ্য।

৪৪।১।১০। 'চেয়ার হইতে লাফ দিয়া'। কিন্তু সভাপতি মহাশয় লাঙ্গুলাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪৪।২।৫ -- ৬। 'যে যে দিগে পারিলেন সে সেই দিগে ধাবিত হইলেন'। যে পারিলেন ?

[৩। ঐক্যাভাব।]

একস্থলে 'পোষাক' অন্য স্থলে 'পোশাক' 'মাকসমূলর'; 'মাক্ষমূলর', 'খৃষ্ট' 'খ্রীষ্ট', 'ফরাসী -- প্রষীয়', 'ফরাসি -- প্রষ্ট্রীয় ইত্যাদি।

[৪। ছাপার ভুল।]

'প্রসংশা' 'সমূহ' 'বারণ' 'রাগিণী' 'চতুষ্পদ' 'কুলতিলক' 'গঙ্গীত' ইত্যাদি। একখানি সর্ব্বজনসমাদৃত মাসিক পত্রে এত ছাপার ভুল থাকা উচিত নহে। ইংরাজী মাসিক পত্রসমূহেতে এরূপ ভুল দেখিতে পাওয়া যায় না।

[৫। বিরাম চিহ্ন।]

বঙ্গদর্শনে বিরামচিহ্ন বিষয়ে অত্যন্ত অসাবধানতা দেখানো হইয়াছে। এই অসাবধানতা প্রযুক্ত কোন কোন স্থলে অর্থের অনেক বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। যে, এই কথাটীর কোন স্থলে পূর্ব্বে কোন স্থলে পরে কমা দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন স্থলে বা একেবারেই দেওয়া হয় নাই।

বিভিন্ন দোষত্রুটি দেখানো ছাড়াও 'ছিদ্রান্বেষক' *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত লেখাগুলি নিয়েও আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি লেখেন --

এবারকার বঙ্গদর্শনে আটটি মাত্র প্রবন্ধ আছে।

১। পত্রসূচনা। এই প্রবন্ধটী খুব ভাল নয়, খুব মন্দও নয়। মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি অতি উত্তম কথা আছে। 'আমরা নানারূপ সাফাই এর চেষ্টায় বেড়াইতেছি, বাঙ্গালা পড়িয়া কবুলজবাব কেন দিব' ? এইটী আদালতী ভাষা, সকলের বোধগম্য নহে, সম্পাদক মহাশয় যখন সকলের জন্য লিখিতেছেন, এইপ্রকার ভাষা না ব্যবহার করাই উচিত।

২। ভারতকলঙ্ক। এটি উঁচুদরের প্রবন্ধ। ইহাতে বিলক্ষণ বিদ্যাপ্রকাশ হইয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে ঐক্যাভাব দোষ আছে।

৩। কামিনীকুসুম। ...এই সুমিষ্ট কবিতাটি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বারা বিরচিত হইয়াছে...'পড়িতে দেখিতে ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে,' এই পংক্তিতে একটি অক্ষর বেশী হইয়াছে।

৪। বিষবৃক্ষ। উপন্যাসটি অতি উত্তম হইয়াছে। ইহা পরিশেষে বঙ্কিমবাবুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থরূপে সমাদৃত হইতে পারে। মাঝে মাঝে বিলক্ষণ বর্ণনাশক্তির প্রকাশ পাইয়াছে।

৫। আমরা বড়লোক। এই প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে না দিলেই ভাল হইত। ইহা দৈনিক সম্বাদপত্রের উপযুক্ত নয়...।

৬। সঙ্গীত। প্রবন্ধটি উত্তম, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নয়।

৭। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল। ইহাতে বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৮। উদ্দীপনা। সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বোধ করি বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ লেখা আর বাহির হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনী হইতে কবিতারূপে যে স্থানটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে উহা যথার্থই কাব্য। পত্রখানি দীর্ঘজীবী হয় আমাদিগের এই বাসনা।

ভবানীপুর,
১৫ই এপ্রিল [একজন ছিদ্রান্বেষক][৮]

বঙ্গদর্শন-এর প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার বেশ কিছুদিন পরে ২৫.১০.১৮৭২ এর *এডুকেশন গেজেট*-এ 'শ্রী বানরাচার্য্য ক্ষুদ্রলাঙ্গুল' নামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' নামক লেখাটিকে এই চিঠিতে অশালীন ভাবে আক্রমণ করা হয়।[৯]

বিষয়টি *এডুকেশন গেজেট*-এর সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাল লাগেনি। এইজন্য ১নভেম্বর ১৮৭২ এর *এডুকেশন গেজেট*-এর প্রথম সম্পাদকীয়তে পাঠকের কাছে প্রার্থনা করে তিনি লিখলেন

গতবারের পত্রিকা সম্পাদন সময়ে আমরা বিষয়ান্তরে নিতান্ত ব্যস্ত ছিলাম। সেই প্রযুক্ত প্রাপ্ত পত্র প্রকাশ করিবার ভার একজন কর্ম্মচারীর উপরে অর্পণ করিয়াছিলাম। পত্র প্রচারিত হইলে দেখিলাম বৃহল্লাঙ্গুল নামে একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানির আনুপূর্ব্বিক পড়িয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলাম। পত্রপ্রেরক বঙ্গদর্শনের ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল নামক প্রবন্ধের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিতে পারেন নাই এমন নহে, তিনি সে প্রবন্ধ লেখককে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ অনেক কটু কষায় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ পত্র আমাদের কাগজে প্রচারিত হইয়াছে, আমরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছি। আমাদের অনিচ্ছাক্রমে পাঠকবর্গের এই যে রুচিপীড়া হইয়াছে, তন্নিমিত্ত পাঠকবর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। পত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে, এখন ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন উপায়ন্তর নাই।[১০]

একই সময় প্রকাশিত একই লেখা সম্পর্কে দুই সমালোচকের মতভেদ (যেমন- বিষবৃক্ষ সম্পর্কে মন্তব্য) বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে পড়েছিল সন্দেহ নেই। *এডুকেশন গেজেট*-এর পত্রলেখকের কিছু বক্তব্যকে বঙ্কিমচন্দ্র

মান্যতাও দিয়েছিলেন। পত্রিকা পাঠানো সত্ত্বেও কৃষ্ণদাস পালের *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এ *বঙ্গদর্শন*-এর কোন আলোচনা প্রকাশিত না হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।ক্ষোভের কথা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায়। *সোমপ্রকাশ*-এ প্রকাশিত সমালোচনাটি বঙ্কিমকে কতখানি ব্যথিত এবং বিচলিত করেছিল তারও প্রমাণ পাই ঐ চিঠিতেই। বহরমপুর থেকে ১৮৭২-এ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি লেখেন--

> I was rather dissappointed to find the Patriot contained no review of it, ...
>
> My pot-bellied reviewer comes out strong under the disguise of an anonymous correspondent... as he did on previous occassions when he had to review my books. On this occassion however it is possible that the writer is a genuine correspondent, for the review has very much the appearance of having being written by some lad who has yet his Entrance Exaniations test to pass. [11]

শম্ভুচন্দ্রকে লেখা এই চিঠিতে *সোমপ্রকাশ*-এর সমালোচককে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ বালক বলে কটাক্ষ করলেও, এটির অনেক বক্তব্য যে যথার্থ তা-ও প্রকারান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আগেই বলেছি, *বঙ্গদর্শন*-এর প্রথম সংখ্যাটি আশাতীত সমাদৃত হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র এটির পুনর্মুদ্রণ করেন। পুনর্মুদ্রণের সময় *সোমপ্রকাশ*-এ নির্দেশিত অনেকগুলি ত্রুটি সংশোধনের চিহ্ন গবেষকদের চোখ এড়ায়নি। *সোমপ্রকাশ*-এ প্রকাশিত সমালোচনা অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র এর প্রথম সংখ্যাটি নানাভাবে সংশোধন করেছিলেন

> 'বিবরিত' পদটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল আট পাতার প্রথম কলামে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ইতিবৃত্ত লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন।" পুনর্মুদ্রিত প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবরিত' স্থলে 'বিবৃত' করেন।
>
> 'সাবধানী' পদটি 'আমরা বড়লোক' প্রবন্ধের অন্তর্গত। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নয়। পদটি বঙ্গদর্শনের ৩১ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে মুদ্রিত। এটিও বঙ্কিমচন্দ্র সোমপ্রকাশের নির্দেশ অনুসারে সংশোধন করেন। প্রথমে ছিল "আমরা বাঙ্গালী জাতি-- অতি সাবধানী-- বিবেচক-- বিপদ অথবা উৎপাতের উদ্যমেই পলায়ন করিতে অতিশয় পটু।" বঙ্কিমচন্দ্র সংশোধন করে 'অতি সাবধান' করেন।

'একেবারে' পদটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে ব্যবহৃত। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা বা সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই পদটি ব্যবহৃত পত্রিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে। কথাটি ছিল "কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবেনা।" সংশোধিত মুদ্রণে 'একেবারে' স্থলে'একবারে' হয়েছে। সোমপ্রকাশ বলেছিল 'কেবলমাত্র' পদটি দুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিষবৃক্ষ উপন্যাসে প্রথম পরিচ্ছেদের কয়েকস্থলে 'কেবলমাত্র' প্রয়োগ করেছিলেন বঙ্গদর্শনের ২১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলামে। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে লিখেছিলেন "গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী কিছুই লক্ষ্য হয়না। কেবলমাত্র বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরক খচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র বর্জ্জন বিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিত ছিল। স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়না। কেবলমাত্র নব-বারি সমাগম প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল।" সোমপ্রকাশের সমালোচনা মেনে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বত্র 'কেবলমাত্র' 'মাত্র' বাদ দিয়ে 'কেবল' রাখেন। এখানে একস্থলে 'একেবারে' পদটি ছিল সেটিও সংশোধন করা হয়। [১২]

সোমপ্রকাশ বা অন্যান্য পত্রপত্রিকা *বঙ্গদর্শন*-এর যত সমালোচনাই করুক, পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তেই থাকে। শিক্ষিত বাঙালি সমাজ তাদের মনের খোরাক এই প্রথম নিয়মিতভাবে পত্রিকার মধ্যে দিয়ে পেতে শুরু করেন। শিক্ষিত মহলের এই সমাদরের ফলে পত্রিকাটির বিক্রিও বাড়তে থাকে। ১২৭৯-র শ্রাবণ সংখ্যা থেকে প্রতি মাসে বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকাটির ১৫০০ কপি ছাপার ব্যবস্থা করেন। দু-মাস যেতে না যেতে ১২৭৯-র কার্তিক থেকে মুদ্রণ সংখ্যা বাড়িয়ে করতে হয় ১৬০০। সমাদর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটিতে প্রকাশিত নানা লেখা নিয়ে শুরু হয়ে গেল বিতর্ক । বিতর্কের সূত্রপাত *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে। ১২৭৯-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে *বঙ্গদর্শন*-এ এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে বেরোতে শুরু করে। আলোচনাকালে ভবভূতি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কোন কোন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বললেন 'বিদ্যাসাগর অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও লোকহিতৈষী' হলেও 'তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ' নন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে ভবভূতির যে সমালোচনা তিনি করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে তা 'কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ'। আক্ষেপ করে তিনি বললেন 'বিদ্যাসাগরও যদি সমর্থ হইলেন না তবে, যদুবাবু, মাধুবাবু তাহার কি বুঝিবেন।' বিদ্যাসাগরের মতে কবিত্বশক্তির দিক থেকে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর ভবভূতির স্থান। এই মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। তিনি মনে করতেন ভবভূতি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ভারতবর্ষীয় কবিদের মধ্যে কালিদাস ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নন। *বঙ্গদর্শন*-এ এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পরই এটি নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। *এডুকেশনগেজেট* পত্রিকায় পর পর বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে (৩১.৪.১৮৭২,৭.৬.১৮৭২,২১.০৬.১৮৭২ ইত্যাদি)। এই সব সমালোচনায় বিচলিত না হয়ে শ্রাবণ ১২৭৯-ও *বঙ্গদর্শন*-এ বিদ্যাসাগরকে আবার কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন বঙ্কিমচন্দ্র। বললেন 'বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তরামচরিতের অর্থ বুঝাইতে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতার কার্য হইতেছে, তথাপি কবির গৌরবার্থ আমাদিগকে সে দোষও স্বীকার করিতে হইল' (উত্তরচরিত *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ ১২৭৯)।

এই সব চাপানউতোর দেখে *হালিশহর* পত্রিকার (শ্রাবণ ১২৭৯) জনৈক লেখক প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হলেন। তীব্রভাষায় নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি লিখলেন --

> পাঠক! আমাদের অনুরোধে না হউক, অন্তত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মান রক্ষার জন্য একবার 'বঙ্গদর্শনের'সেই দূষিত অংশটা পাঠ করিয়াদেখিবেন যে, এই বাতুলের অর্থ সঙ্গত না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থ সঙ্গত?... সমালোচক মহাশয়! বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্বোধ নহেন, সংস্কৃতেও উঁহার কিছু কিছু অধিকার আছে।...কিন্তু উহার গুহাবিহারী সিংহসম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুচ্ছদেশে দংশন করিতে ত্রুটি করেন নাই। দুঃখের বিষয় সিংহ একবার চক্ষুরুন্মীলনও করিল না। বোধ হয় অমন শত সহস্র দংশ মশক সিংহের পুচ্ছ দংশন করিতেছে। পুচ্ছ লোমে আবৃত, দন্তই ভগ্ন হয়। সিংহের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধিও সম্ভাবনা কি? --

এই ধরনের আক্রমণেও বঙ্কিমচন্দ্রের কোন প্রতিক্রিয়া হল না, নিজের মতে তিনি স্থির রইলেন। ১২৭৯-এর ভাদ্র সংখ্যা *বঙ্গদর্শন*-এ ভবভূতি প্রসঙ্গে আবার বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ পেল। *হালিশহর* পত্রিকার সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রকে আবার আক্রমণ করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিচলিত হলেন না । তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২২ বৈশাখে, চিত্তরঞ্জন দাশ-এর *নারায়ণ* পত্রিকায় 'বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত নামে একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সহৃদয়তা ও সাহস'-এর ভূয়সী প্রসংসা করেন ।

বঙ্গদর্শন-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত আরেকটিলেখা নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রান্ত হতে হয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর 'আকাঙ্ক্ষা' নামে কবিতাটি 'সুন্দরী ও সুন্দর-এর কথোপকথন' ছলে লিখিত। এই কবিতাটিকে আক্রমণ করে ৮ আষাঢ়, ১২৭৯-র এডুকেশন গেজেট-এ শিবনাথ শাস্ত্রী একটি চিঠি লেখেন --

অনেকদিন হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের নীতি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। সাহিত্য সম্বন্ধে দেশের লোকের রুচি বিকৃত দেখিয়া বড় দু:খিত হইয়াছি। বিজ্ঞান ধর্মনীতি ইতিহাস এ সকল লোকের প্রিয় নয়। কিন্তু অশ্লীল নাটক, কদর্য নভেল এ সকল বাজারে পড়িতে পায় না। কেযে নাটক কিম্বা নভেল লেখে না আমি ভাবিয়া পাইনা। যার একটু লিখিবার ক্ষমতা আছে এইদিকে ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে।

এ কবিতার পক্ষেও ঠিক এইরূপ। যাহা কিছু সারগর্ভ, যাহাতে চিন্তা আবশ্যক করে, যাহার নীতি তাহা পবিত্র লোকের ভাল লাগেনা। কিন্তু যাহার ভাব লজ্জাজনক, তাহাই সকলের প্রিয়। কতকগুলি প্রসিদ্ধ ক্ষমতাশালী লেখকের অসাবধানতা এই রুচি বিকৃত হওয়ার কারণ। কোন জাতির রুচি গঠন করিবার বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন লেখকদিগের অনেক কর্ত্তৃত্ব। তাঁহারা মনে করিলে সেই রুচি পরিশুদ্ধ কিম্বা বিকৃত করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদের অসাবধানতা নিবন্ধন যদি দেশের রুচি মলিন হইয়া যায়, তাঁহারা সে জন্য দায়ী। একবার রুচি বিকৃত হইলে আমার মত পয়সার কাঙ্গালীরা কলম ধরিয়া সেই বিকৃতরুচি আরও বর্দ্ধিত করিতে থাকে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বঙ্গদর্শন যখন প্রথমে বাহির হইবার কথা হয়, তখন আমি ইহার একজন প্রসিদ্ধ লেখককে (তিনি কবিতা লিখিতে পারেন) বলিয়াছিলাম, যে, আপনাদের কর্ত্তব্য আমাদের জাতির এই রুচির পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু বঙ্গ দর্শনের দুই খণ্ড ত প্রকাশিত হইয়াছে। আমি দেখিয়া বড় দু:খিত হইয়াছি। ইহার অপরাপর বিষয়ের কথা বলিতে চাহিনা, কিন্তু ইহাতে যে কবিতাটি প্রকাশ পাইয়াছে, আমার মতে তাহাতে এই বিকৃত রুচির অত্যন্ত পোষাকতা করে। কোন্ ভাব হৃদয়ে উদয় করা, কি শিক্ষা দেওয়া এ কবিতার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিনা। প্রণয় বর্ণনা করিতে হইলে রাধাকৃষ্ণের মাখামাখির মত না করিলে হয় না। আমার বিশেষ এ বিষয়ে বলিবার কারণ এই আমি কতকগুলি স্ত্রীলোককে আগ্রহের সহিত বঙ্গদর্শন পড়িতে দেখিয়াছি। প্রণয়ের এইরূপ নীচ ও কদর্য্যভাব কি স্ত্রীলোকদের মনে কেন, পুরুষেরই বা মনে বাড়িতে দেওয়া উচিত ? আমার কবি ভায়ারা মনে করেন যে ফলারের পাতের মত মাখা চোকা না করিলে আর রসিকতা হয় না। যাহা হউক, বঙ্গ দর্শনের অনুকরণ করিয়া একটী কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন। আমার গদ্য পত্রখানি ইচ্ছা করিলে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু অস্বাক্ষরিত পত্র লেখা আমার মত নয়, সুতরাং আমার সম্পূর্ণ নাম দিয়াই প্রকাশ করিবেন।

সুন্দরী ।

১

কেন না হইলি তুই সাধের ধুচুনি?
রে প্রাণ রতন!
প্রতিদিন করে ধরে,লয়ে প্রেম
সরোদধে,
সোহাগেতে ডোবাতাম সাধের ধুচুনি।
রে প্রাণ রতন !

২

কেন না হইলি তুই দুধের ব্যাসালি
রে প্রাণ বল্লভ!
দুধ হয়ে তোর কোলে, পড়িতাম
কুতুহলে,
প্রেমভরে চোঁ চোঁ করে পাড়িতাম গালি ,
রে প্রাণবল্লভ !

৩

কেন না হইলি তুই মোর ছড়া হাঁড়ি।
রে হৃদয় সখা !
না পোহাতে বিভাবরী, তোরে বামকরে
ধরি,
আনন্দে দিতাম ছড়া ঘুরে সারা বাড়ী।
রে হৃদয় সখা !

৪

কেন না হইলি তুই মোর ছেঁড়া কাঁথা
রে প্রাণ কানাই
আমি সুতারূপ নিয়ে, তোর অঙ্গে
মিশাইয়ে,
বলিতাম কাণে কত প্রণয়ের কথা!
রে প্রাণ কানাই !

৫

কেন না হইলি তুই সলিতার কানি,
হৃদয় ভূষণ!
সোহাগেতে পাক দিয়ে, আনিতাম পাকাইয়ে
হৃদি দীপ রেখে হে ঢালিতাম আনি।
হৃদয়ভূষণ !

সুন্দর ।

১

কেন না হইনু হায় ! সাধের ধুচুনি,
রে প্রাণ প্রতিমে।
তোর ও কমল করে, আনন্দে বিহার করে,
সার্থক ধুচুনি জন্ম হইতে যে ধনি !
রে প্রাণ প্রতিমে !

২

কেন না হইনু তোর দুধের ব্যাসালি
রে মঞ্জু হাসিনি !
ছ্যাঁক ছোঁক প্রেমালাপে, নিবাইয়ে মনস্তাপে,
বাহিরে কেবল আমি থাকিতাম কালি!
রে মঞ্জু হাসিনি !

৩

কেন না হইনু হায়। তোর ছড়াহাঁড়ি,
রে প্রাণ প্রেয়সি!
করিয়া তোমার করে,ছ্যাড়াক্ ছ্যাড়াক্ স্বরে,
করিতাম প্রেমগীত প্রাতে গলা ছাড়ি।
রে প্রাণ প্রেয়সি!

৪

কেন না হইনু আমি তোর ছেঁড়া কাঁথা,
রে প্রাণ তোষিণী ?
সোহাগে তোমাকে নিয়ে, নিজ ছিদ্র ঢাকা
দিয়ে,
আদর পেতাম কত হায় যথা তথা।
রে প্রাণতোষিনী ?

৫

কেন না হইনু তোর সলিতার কানি,
রে সুধাভাষিণি !
ও সুগোল উরু পরে, লুটিতাম
প্রেমভরে,
করিতাম রোম ধরে কত টানাটানি,
রে সুধাভাষিণি !

আকাশবাণী ।

১

কেন না হইলি তোরা বাঙ্গালার কবি
সুন্দরী সুন্দর ।
উচিত রসেরঢেউ, খেয়ে না বাঁচিত
কেউ,
হতভোম্বা সরস্বতী যেন আঁকা ছবি।
সুন্দরী সুন্দর!

২

বঙ্গদর্শনের কেন হলি না লেখক ?
সুন্দরী সুন্দর।
রসের করিতা করে, নিতে মন প্রাণ
হ'রে
কত বাবু ভেয়ে পড়ে মিটাতেন সক্ !

৪ঠা আষাঢ়, ১২৭৯
বহুবাজার

শ্রী শিবনাথ ভট্টাচার্য্য

এই লেখাটির প্রতিবাদ করে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'বঙ্গদর্শনের প্রতিকূলে যে কতিপয় রহস্যসূচক পদ্য প্রকটিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে আমরা হর্ষে বিষাদিত হইলাম। যেহেতু রত্নগর্ভ রত্নাকরকে লবণাক্ত সলিলজনিত দোষে দূষিত করা হইয়াছে।'[১৪]

শিবনাথেরলেখাটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি একটি দানপত্র করে সঞ্জীবচন্দ্রকে এই স্বত্ব দান করেন। *বঙ্গদর্শন*-এর পুনরুজ্জীবনের একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। বঙ্কিমচন্দ্র কথা প্রসঙ্গে নতুন করে প্রকাশিত *বঙ্গদর্শন*-এ শিবনাথ শাস্ত্রীকে লিখতে না দেওয়ার দাবি জানান। নবীনচন্দ্র লিখেছেন।

আমি বলিলাম।'আপনি এত লোকের মাথায় লঙ্কার হাঁড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী সুন্দর' কবিতাটির একটি বিদ্রূপাত্মক করিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত?' তিনি বলিলেন 'বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) করিয়াছিল।'

বঙ্গদর্শন-এর একাদশ সংখ্যায় (ফাল্গুন ১২৭৯) যে দশটি লেখা প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে আটটিই বঙ্কিমচন্দ্রের। এছাড়াও এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রাপ্ত গ্রন্থের 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' গুলিও তিনিই করেছিলেন। এই সংখ্যাটির একটি প্রশংসাসূচক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি *হিন্দু পেট্রিয়ট*-এ পাই।

> We have received the Bangadursana for the current Bengalee Month. It is as full of matter as it is replete with interest. As the story of the Visavrikha is advancing, it's interest is accumulating. The paper on Dust, while it posseses to give the theory of Professor Tyndal on the subject, is written with great good humour. The satire on the `Babu' is excuisite, though we must confess, it is not quite deserved. The verses `Ekdin' are however sweetest of all. They are calculated to touch a tender chord in many a bareaved heart. He alone can realize the Poete's feeling, who has been in his sad position.[16]

নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বঙ্গদর্শন এগোতে থাকে, এর নামও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের কাগজ যে বাংলায় আগে বেরোয়নি তাও মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হন। সমালোচকের সংখ্যা সমকালে বেশি হলেও, *বঙ্গদর্শন*-এর অনুরাগীও ছিলেন বেশ কিছু। এমনই একজন অনুরাগী কেশবচন্দ্র সেন। *সুলভ সমাচার*-এ *বঙ্গদর্শন*-এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কিছু প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবগুলি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন কিনা তা অবশ্য আমাদের জানা নেই। *সুলভ সমাচার*-এ তিনি লেখেন --

> বিখ্যাত পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' বর্ত্তমান বৎসর হইতে সম্পাদক বঙ্কিমবাবুর নৈহাটির কাঁঠালপাড়াস্থ বাটি হইতে বাহির হইতেছে। ইহার দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম খণ্ড আমরা পাইয়াছি। গত বৎসর অপেক্ষা ইহার বাহ্য আকার কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যা হউক, সেজন্য বড় যায় আসে না, ইহার গুণেই সকলে মোহিত আছেন। ইহা যে কেবল দেশীয় ভাষার স্রোতকে ফিরাইয়া দিবে তাহা নহে, কিন্তু কৃতবিদ্য সভ্যমণ্ডলীর নীতির আদর্শকেও দিন দিন উন্নত করিয়া তুলিবে। এবং ইহা দ্বারা আমাদের দেশের সাহিত্য সমাজের যে গৌরববৃদ্ধি হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এখন লেখকগণ ঐক্যবাক্য হইয়া কাগজখানির শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। ঘরে ঘরে কোন গণ্ডগোল বিবাদ বিচ্ছেদ না হয়। ইহাই আমাদের প্রার্থনা। বাঙ্গালী ভায়ারা একত্র মিলে মিশে কাজ করিতে পারেন না, সেইজন্য আমাদের বড় ভয় হয়। তাঁহাদের নূতন বন্দোবস্তে একটি বিষয়ে কিছু অসুবিধা হইল। কলিকাতার গ্রাহকগণকে ডাকমাশুল দিয়া কাগজ লইতে হইবে। ইহা অপেক্ষা যদি দুইজন লোক ট্রেনে আসিয়া মাসে মাসে সকলের বাড়িতে উহা বিতরণ করিয়া যায়, তাহা হইলেই ভাল হয়। সহরের মধ্যেই অনেক গ্রাহক আছেন। এবং এই স্থান হইতে কাগজ বাহির হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে তাঁহারা বিবেচনা করিবেন। পত্রিকার আকার গতবর্ষে যে রূপ ছিল সেইরূপ সুন্দর করিতে চেষ্টা করিবেন।[১৭]

দ্বিতীয় বছরের কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর আবার রঙ্গমঞ্চে 'শ্রী:'র আবির্ভাব। *সোমপ্রকাশ*-এ নতুন করে তিনি *বঙ্গদর্শন*-এর কুৎসা শুরু করেন। এবারের কুৎসাটি আগেরটিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। বিষবৃক্ষ-কে অপাঠ্য উপন্যাস এবং *বঙ্গদর্শন*-কে বাংলা ভাষার কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করতে অজ্ঞাতনামা এই মানুষটি বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হননি। ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে*সোমপ্রকাশ-এ তিনি লিখলেন* --

সম্প্রতি শ্রাবণ মাসের "বঙ্গদর্শন" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেরূপ হইয়া থাকে, এখানি পাঠ করিয়াও সুখিত হইতে পারিলাম না। এবারকার "বঙ্গদর্শনে" যে সমুদায় দোষ দৃষ্ট হইল, এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় তাহা প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শনে ১। জন স্টুয়ার্ট মিল। ২। হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় । ৩। জাতিভেদ। ৪। চন্দ্রশেখর। ৫। স্বপ্ন প্রয়াণ ৬। গর্দ্দভ। ৭। প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এই সাতটী বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়গুলির কোন কোনটীতে অতিব্যাপ্তি কোন কোনটীতে বা অব্যাপ্তি দোষ দৃষ্ট হইল। "জন স্টুয়ার্ট মিল" প্রস্তাবটী "যেন তেন প্রকারেণ" করিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক, উপসংহার সময়ে জীবনচরিত সংগ্রহের প্রথা অনুসারে মিলের সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলের জীবনী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই জন্মেনা। এরূপ অব্যাপ্তি নিতান্ত দোষাবহ সন্দেহ নাই। "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" প্রস্তাবে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের উদগার করা হইয়াছে মাত্র। সামরিক পত্রিকায় এরূপ "চর্ব্বিত চর্ব্বণ" শোভা পায়না। রামদাসবাবু, "হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়" লিখিয়া বঙ্গীয় সমাজের কি উপকার সাধন করিলেন তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। ...

"চন্দ্রশেখর" ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী হইতে এটী বিনির্গত হইতেছে। প্রস্তাবিত সংখ্যক *বঙ্গদর্শনে* চন্দ্রশেখরের "শৈবলিনী" "দলনীবেগম" ও "লরেন্স ফস্টর" নামে তিনটী পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত "বিষবৃক্ষ"র প্রারম্ভেই যেরূপ মুক্তহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখরে" সেরূপ করা হয় নাই। গ্রন্থনের সূচনায় সমুদয় কথা খুলিয়া বলিলে যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় না, বিষবৃক্ষ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ বঙ্কিমবাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ "অপাঠ্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার বিষবৃক্ষও সেইরূপ "অপাঠ্য" হইয়াছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, চন্দ্রশেখরের অতি অল্প অংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং আমরা ইহার গ্রন্থন-চাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। উপাখ্যানের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার শৈবলিনীকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই শৈবলিনী-চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিমবাবু যেরূপ জঘন্যভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থা বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটী বঙ্কিম বাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনা-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসগ্রন্থনচতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষী স্বরূপ।

"চন্দ্রশেখরে" বঙ্কিম বাবু স্বীয় ইংরাজী বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছেন। এতন্নিবন্ধনই লরেন্স ফস্টরের ইংরাজী কথার "ছড়াছড়ি" হইয়াছে।

...কেবল যে "চন্দ্রশেখরে'ই ইংরেজীর "ছড়াছড়ি" হইয়াছে এরূপ নয়। ইংরেজী বঙ্গদর্শনের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার বহু সংখ্যা প্রস্তাবেই ইংরেজী ভাব, ইংরেজী ভঙ্গী দেখিতে পাইবে। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা কথা খুঁজিতে গলদঘর্ম্ম কলেবর হইতে হয় বলিয়া ইংরেজী কথাগুলিই বাঙ্গালার অস্থিতে প্রবেশিত করা হয়। এটী বঙ্গভাষার দুর্ভাগ্য। বাঙ্গালা ভাষাকে "বেওয়ারিস" পাইয়া সকলে ইহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। অধিক কি লোকপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবুও ইহাকে ফিরিঙ্গী ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্গদর্শনের একস্থলে উক্ত হইয়াছেঃ "এখন আব্‌সোলিউটিস্ট" বলিয়া কাঁহারও পরিচয় দিলে তাঁহার এক প্রকার নিন্দা করা হয়।" অন্য স্থলে লিখিত হইয়াছে -- "অর্থশাস্ত্র "ল অব্ সাপ্লাই এণ্ড ডিম্যাণ্ড" নামক বিধান কেবল পণ্য দ্রব্যের প্রতিই বর্ত্তে এমত নহে"। পাঠকগণ ! বঙ্গদর্শন লেখকদিগের বাঙ্গালা ভাষা নৈপুণ্য দর্শন করুন। আপনারা ইদানীন্তন নব্য সম্প্রদায়কেই (ইহাঁরা বাঙ্গালা কথায় ইংরেজী ব্যবহার করেন বলিয়া) নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু বঙ্গদর্শনের

লব্ধ প্রতিষ্ঠলেখকদিগের লিখনভঙ্গী দর্শনে বুঝিতে পারিবেন, বড় লোকের মধ্যেও এ রোগ আছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কথা যথাযথরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালা লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার প্রদর্শন করিলে কি স্বীয় শূন্যহৃদয়তা ও অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না ? যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া ইংরেজীর শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা কি সুলেখক পদবাচ্য ? তাঁহাদিগের ইংরেজীর কৃতদাস বলিলেও অসঙ্গত হয়না। সত্য কথা বলিতে কি, "বঙ্গদর্শন" বঙ্গভাষার কলঙ্কস্বরূপ হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গভাষায় অঙ্গবৈকল্য সাধন করেন, ভবিষ্যবংশীয়গণ তাঁহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবেন না। "স্বপ্নপ্রয়াণ" পদ্যময়। এরূপ জঘন্য পদ্য ইতিপূর্ব্বে আর আমাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। ইহার ছন্দ যেরূপ শ্রুতিকটু বর্ণনাও সেইরূপ ইতর ভাবাপন্ন।

বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য !!! "গর্দ্দভ স্তোত্রটী" তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করিনা। গর্দ্দভ বুদ্ধি যখন যাহার ঘাড়ে চাপে সে সময়ে তিনি যে গর্দ্দভবৎ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন গর্দ্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দ্দভের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য্য। গর্দ্দভ বঙ্গদর্শনকে নিজের বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার মনোরঞ্জনার্থ স্তব না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইতে হয়। পরিহাস দূরে থাকুক, বঙ্গদর্শন যাহাদিগকে গর্দ্দভ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন, স্বয়ংও তাহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ বঙ্গদর্শনেরলেখকগণ অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত, সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগকে এইরূপ উপহাস করা যারপরনাই অন্যায় হইয়াছে! বঙ্গদর্শন, স্তোত্রের একস্থলে বলিয়াছেন[১৭]"তুমি কখন ঘাস খাও কখন ঠেঙ্গা খাও, কখন গ্রন্থকারের মাথা খাও, হে লোমশ! কোনটী সুভক্ষ্য অর্ব্বাচীনকে বলিয়া দাও।" বলা বাহুল্য, ইহাতে বঙ্গদর্শনের গর্দ্দভ বুদ্ধিই পরিস্ফুট হইতেছে। "প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়" বঙ্গদর্শনের ন্যায় আর কেহ আগ্রহ সহকারে গ্রন্থকারদিগের "মুণ্ড ভক্ষণ" করেন কিনা সন্দেহ।

উপসংহার সময়ে বক্তব্য এই: "বঙ্গদর্শন" প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় নিতান্ত চপলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ (দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ব্যতীত) প্রচারিত হয়, তৎসমুদয় অপদার্থ। কোন গ্রন্থকারকে রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার ভয় দেখান, কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ অকর্ম্মণ্য ও অপাঠ্য বলেন। এরূপ উষ্ণতার পরিচয় দেওয়া ধীর জনোচিত কার্য্য নহে। বঙ্গদর্শন কেবল পরের দোষ খুঁড়িয়াই বেড়ান, কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। অপদার্থ উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটী উপন্যাস শেষ হইলেই অমনি আর একটীর জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাতেই আমাদিগের বাক্যের যথার্থ প্রতীত হইবে। বস্তুত বঙ্গদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের আদর ভাজন হইতে পারে নাই। যাহারা নিজের দোষ সংশোধন না করিয়া কেবল পরের দোষগ্রাহী হয়,সামাজিকগণ, তাহাদিগকে "অপদার্থ" ব্যতিরিক্ত অন্য নামে অভিহিত করেন না। সম্পাদক যেন অত:পর সাবধান হইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করেন।[১৮]

এই ধরনের আক্রমণ *বঙ্গদর্শন* পাঠকদের কারো কারো ভাললাগেনি। 'শ্রীঃ' স্বাক্ষরিত পত্রলেখকের উক্তিগুলির তীব্র প্রতিবাদ জানান কলকাতার চড়কডাঙার এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। তাঁর দীর্ঘ চিঠিটি *সোমপ্রকাশ*-এ প্রকাশিত হয়। আক্ষেপের সঙ্গে তিনিলেখেন--

> কুক্ষণে বঙ্গদর্শন "বিদ্বেষভাব পরবশ" জনসমাকীর্ণ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সমালোচনা শুনিতে শুনিতে শ্রবণবিবর কলুষিত হইল। যখনই কেহ কোন প্রস্তাব না পান "বঙ্গদর্শনের" খানিকটা নিন্দাবাদ করিয়া বা তৎ সম্পাদককে গালি দিয়া চিত্তপ্রসাদন করেন।[১৯]

'শ্রীঃ'র মতো পত্রলেখককে তিনি 'বোধান্ধ ও পরযশোহসহিষ্ণু' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে 'ভারতকলঙ্ক', 'উদ্দীপনা', 'উত্তরচরিত', 'ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত','বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাংখ্যদর্শন', 'সাম্য', 'ধর্ম্মনীতি', এই ধরনের প্রবন্ধ বাংলায় অতি বিরল। এগুলির মতো উন্নতভাব ও লিপিপ্রণালী বাংলায় দুর্লভ। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বলেন 'লেখার পারিপাট্যে "বঙ্গদর্শন" অতুল্য ও অননুকরণীয়। বঙ্গভাষায় যে কয়েকখানি সাময়িকপত্র দৃষ্ট হয় কেহ ইহার সমকক্ষ বা নিকটস্থ হইতে পারে না'। শ্রীঃ *বঙ্গদর্শন*-কে বাংলা ভাষার কলঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত করেন তা আগেই বলেছি। এর প্রতিবাদ করে এই পত্রলেখক একে বঙ্গভাষার 'শিরোভূষণ' হিসেবে চিহ্নিত করেন। 'শ্রীঃ' *চন্দ্রশেখর* সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন এই মুহূর্তে তার প্রতিবাদে ইচ্ছুক নন বলে এই পত্রলেখক জানান, কারণ এটি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। 'শ্রীঃ'র মতে 'বিষবৃক্ষ অপাঠ্য'। এর আলোচনাও বারান্তরে এই সমালোচক করবেন বলে জানিয়েছেন। তবে মুক্ত কণ্ঠে একথা বলেছেন 'বঙ্গভাষায় যত উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখা হইয়াছে "বিষবৃক্ষ" তাহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বরং কোন কোন অংশে তদপেক্ষা মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী।' বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা রীতির প্রশংসা করে তিনি বলেন -- বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেন তার একবর্ণও মিথ্যা নয়। বাংলায় যে সব বই ছাপা হয়, তার অধিকাংশ অপাঠ্য। তবে ভাল বই-এর প্রশংসা করতেও বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতস্তত করেন না, তাও তিনি স্বীকার করেছেন। দীর্ঘ পত্রের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে তিনি জানান

> তিনিযেরূপ বিদ্যাবান ও লিপিকুশল বঙ্গভূমি তাঁহার নিকট অনেক আশা করেন। নিন্দুকে যাহা বলে বলুক তাহাতে তাঁহার উদার হৃদয় যেন একবার মাত্রও বিচলিত না হয়। তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তৎসম্পাদনার্থ পূর্ব্বের ন্যায় অবহিত চিত্ত থাকুন। বঙ্কিম বাবু ও বঙ্গদর্শনের অন্যান্য লেখকবর্গের "জয় জয়কার হইক"। তাঁহারা বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা দেখিয়া তৎসংস্কারার্থ কটিবদ্ধ হইয়াছেন তন্নিমিত্ত আমরা তাঁহাদিগের মঙ্গলাচরণ করিতেছি। তাঁহাদিগের লেখনীর উপর (সচন্দন) পুষ্পবৃষ্টি হইক।[২০]

পরের সপ্তাহের *সোমপ্রকাশ*-এ এর একটি উত্তর বেরোয়। চিঠির শিরোদেশে পত্রলেখক যে লাইনটি উদ্ধৃত করেন সেটি এইরকম 'যে জানে না এবং শিখে না কিন্তু জানায় যে আমি জানি, তাহার মূর্খতা কখনও ঘোচে না।' মূল চিঠিতে তিনি বলেন কতকগুলি অসার কথার প্রতিবাদ জানানো কলহপটু লোকের স্বভাব। এরা যা মনে আসে তাই লিখে নিজের পাণ্ডিত্য দেখায়। এই ধরনের পত্রলেখককে তিনি 'কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ' বলে অভিহিত করেন। পত্রলেখকের প্রতি তাঁর অভিযোগ তিনি শুধু অসার কথায়ই চিঠিটি ভরান নি, এটির মধ্যে চাটুকারিতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। তাঁর বিভিন্ন মত খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন--

> পত্র প্রেরকের মতে বঙ্গদর্শন বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ। যাহাদিগের রুচি বিকৃত তাহাদিগের লেখনী হইতে যে প্রকার অজ্ঞাতসুলভ অদ্ভুত বাক্য নির্গত হইবে তাহা আশ্চর্য্যের নহে। বঙ্গদর্শন কিসে বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ হইল, তাহা আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হওয়াতে ভাষার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত অবনতি হইবারই সূত্রপাত হইয়াছে। গৃহপুষ্ট ব্যাকরণ যাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন যাঁহাদিগের রসময়ী লেখনী হইতে একেবারে কেবল মাত্র সরলতা চমৎকারা সাবধানী, শ্যামাঙ্গিনী, মহতী আত্মগরিমা প্রভৃতি বাক্যসমূহ অবিশ্রান্ত নির্গত হয়, পত্রপ্রেরকের ন্যায় স্থূলদর্শী হীনবুদ্ধি লোকের নিকটেই তাঁহারা ভাষার আদর্শভূত সংস্কারক !!! কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সামাজিকগণ সমক্ষে তথাবিধ ব্যক্তিগণ ভাষার অমর্য্যাদাকারক ব্যতিরিক্ত অন্য নামে পরিচিত হইবেন না।[২১]

বঙ্গদর্শন-এর ভাষায় ইংরেজি শব্দের বাড়াবাড়ির সমালোচনাও করেন শ্রীঃ। এ সম্পর্কে পত্রলেখকের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, ইংরেজি থেকে ভাব সংগ্রহ করে বাংলা ভাষার পুষ্টি সাধন করা দোষের নয়। না হলেও, বঙ্গদর্শন-এ যেরকম ইংরেজি শব্দের বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তা অমার্জনীয়। কঠোর ভাষায় তিনি বলেন--

> ইংরাজী হইতে ভাব (বাক্যগত গূঢ় তাৎপর্য্য) সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সম্পাদন দূষণীয় নয়, ইহা আমরা স্বীকার করিতেছি। ...বঙ্গদর্শনে যেভাবে ইংরাজী শব্দের "ছড়াছড়ি" করা

হয়, তাহা অত্যন্ত দূষণীয় ও অমার্জ্জনীয়। যাঁহারা "অবসোলিউটিস্ট" "পাবলিক ডিনর" "ফেসিয়ান" "পলিগেমী" প্রভৃতি বাঙ্গালা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের বাঙ্গালী লেখক বলিয়া পরিচয় দেওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগলভতা প্রদর্শন মাত্র। উল্লিখিত ইংরেজী শব্দগুলি বঙ্গভাষায় গ্রথিত হইলে কি ভাষার উৎকর্ষ হইবে? আমরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছি, যাঁহারা এইরূপ যথেচ্ছাচার প্রদর্শন করেন তাঁহারা মাতৃভাষার হন্তা এবং যাঁহারা এইরূপ অমানুষদিগকে প্রণয় দান করেন তাঁহারা মাতৃহত্যাজনিত অপরাধে অপরাধী। পত্র প্রেরকের মতে "অবসোলিউটিস্ট' বলা দোষের নয়, ফাদার বলাই দূষনীয়, জগদীশ্বর এই কাণ্ডজ্ঞানশূন্য দুর্দ্ধর্ষদিগের হস্ত হইতে ক্ষীণাঙ্গী বঙ্গভাষাকে রক্ষা করুন। [২২]

বঙ্গদর্শন-এর সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সমর্থনে 'কস্যচিৎ বঙ্গদর্শন পাঠকস্য'-র মতামতকে অস্বীকার করে তিনি বলেন *বঙ্গদর্শন*-এর সমালোচনায় 'অধীরতা'-র পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচনা করার সময় 'ধীরতা সহকারে দোষ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য'। *বঙ্গদর্শন*-এর সমালোচনায় এই ধীরতার অভাবের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। *বঙ্গদর্শন* অনুরাগী পাঠককে তিনি "মহান্ধ পক্ষপাতী' বলে অভিহিত করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর বক্তব্য--

আমরা বিদ্বেষভাবের বশীভূত হইয়া বঙ্গদর্শনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। পত্র প্রেরক অকারণে আমাদিগকে "পর যশোহসহিষ্ণু নিন্দুক" বলিয়া নিতান্ত অমানুষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন দোষ পরিত্যক্ত সুসংস্কৃত ভাষার অনুগামী হয় ইহাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। সমালোচন স্থলে দোষ প্রদর্শন করিলেই যদি নিন্দক হইতে হয়, তাহা হইলে কোন সমালোচকই এই দোষ স্পর্শ শূন্য নহেন পত্র প্রেরক পরমসেব্য বঙ্কিম বাবু ত বিশিষ্টরূপে উক্ত বিশেষণ ভাজন হইবেন। ফলে পত্র প্রেরক না জানিয়া অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে এই পত্রের শীর্ষ লিখিত প্রবাদ বাক্যটীকেই অন্বর্থ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।[২৩]

'শ্রীঃ' নামক *বঙ্গদর্শন*-এর এই অজ্ঞাতনামা সমালোচক *বঙ্গদর্শন*-এর কোন গুণই খুঁজে পাননি। বরং যত দিন গেছে তাঁর স্বর কঠোরথেকে কঠোরতর হয়েছে। একটি বিশেষ পত্রিকার নিন্দা-প্রশংসায় *সোমপ্রকাশ*-এর এতখানি জড়িয়ে পড়া ঠিক নয় বিবেচনা করে সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এ বিষয়ে নিজের মত প্রকাশ করে ঘটনাটির ইতি টানতে চাইলেন। 'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা' নামক একটি লেখায় পত্রিকাটি সম্পর্কে নিজের বক্তব্য অকপটে জানালেন--

কএক সপ্তাহকাল বঙ্গদর্শনের প্রশংসা ও নিন্দা পূর্ণ এত প্রেরিত পত্র আমাদিগের হস্তে আসিতেছে আমরা যদি সমুদায়গুলি মুদ্রিত ও প্রচারিত করি, সোমপ্রকাশে অন্য বিষয়ের স্থান সমাবেশ হয় না। বঙ্গদর্শনের এরূপ শত্রট্ট ও মিত্র বৃদ্ধির কারণ কি? আমরা চিন্তা করিয়া দেখিলাম বঙ্গদর্শন কাহাকে মানুষ জ্ঞান করেন না, সকলেরই নিন্দা করেন, উহাই তাঁহার শত্রট্ট ও মিত্র উভয় বৃদ্ধিরই একমাত্র কারণ। আমাদিগের সমাজের অধিকাংশ লোকের রুচি আজিও সংস্কৃত হয় নাই। অনেকে অন্যের নিন্দা ভাল বাসেন। যে লেখায় পরের নিন্দা থাকে, তাঁহারা আদর পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গ দর্শনের লেখকেরা বুদ্ধিমান লোক, তাঁহারা সমাজের এই গতিটী সুন্দররূপে বুঝিয়া লইয়াছেন। লোকে তুষ্ট হইবে বলিয়া তাঁহারা বঙ্গদর্শনকে বড়লোকের নিন্দা পরিহাস ও গালি বর্ষণাদি দ্বারা পরিপূরিত করিয়া থাকেন। উহাতে বড় লোকের ক্ষতি নাই। ... এই নিন্দায় বঙ্গদর্শনের লেখকদিগের গ্রাহক বৃদ্ধি হইয়া স্বার্থ সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা সমাজের একটী মহৎ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বঙ্গদর্শন পাঠে লোকের রুচির সংস্কার না হইয়া রুচি বিকার জন্মিতে চলিল। যে সকল লোকের পরনিন্দা শ্রবণে অনুরাগ ও প্রবৃত্তি আছে তাহা উদ্দীপিত হইয়া উঠিবে। সাময়িক পত্র সম্পাদকদিগের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত এরূপ ব্যবহার একান্ত অনুচিত। যাহাতে দেশের লোকের রুচি সংশোধন হয়, তাঁহাদিগের সেই চেষ্টা পাওয়াই কর্ত্তব্য। বঙ্গদর্শনের লেখকেরা বিপরীত পথগামী হইয়াছেন। তাঁহারা লোকের কুপ্রবৃত্তির যে প্রকার উদ্দীপন করিয়া

দিতেছেন, তাহাতে তাহাদিগের পিলোড়ি দণ্ড হওয়া উচিত। ইউরোপ খণ্ডে হইলে ঠিক পিলোড়ি দণ্ড না হউক ঐরূপ একটী দণ্ড হইত সন্দেহ নাই। যাহাদিগের রুচি মার্জ্জিত হইয়াছে তাঁহারা বঙ্গদর্শনের এই দোষ দর্শন করিয়া শত্রু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা এই দোষ প্রদর্শন করিয়া বঙ্গদর্শনকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা পাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সেই চেষ্টা সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধের ন্যায় বিফল হইতেছে।

বঙ্গদর্শন হইতে সমাজের কেবল যে এক রুচি বিপর্য্যয়রূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা নহে, বাঙ্গালা ভাষা ও রচনা প্রণালীরও মহৎ অনিষ্ট হইতেছে। বঙ্গদর্শন লেখকেরা ভাবেন, মুখে বলিয়াও থাকেন আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথোপকথন করি, ঐ ভাষা লেখাতেও যত প্রচলিত হইবে ততই ভাষার উন্নতি সাধিত হইবে কিন্তু ওদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, দীর্ঘ সমাসাশ্রিত সংস্কৃত শব্দও তাঁহাদের নিকট হতমান নহে। উভয়েরই সমান সম্মান আছে, কিন্তু কোন্ স্থলে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লেখকদিগের জানা নাই। তাহাতে বঙ্গদর্শনের লেখা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। যদি সকলে এই লেখার অনুকরণ করেন বাঙ্গালা ভাষাটী অদ্ভুত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। আমরা বঙ্গদর্শন প্রসাদে বাঙ্গালা ভাষার যে অপূর্ব্ব আকার লাভের সম্ভাবনা করিতেছি, পাঠকগণ আমাদিগের প্রদর্শিত দুই তিনটী উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই অনায়াসে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষার নিয়ম এই যদি আমরা চলিত শব্দ প্রয়োগ করি তাহা হইলেই ভাষার শোভা হইয়া থাকে। আর যদি সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা হয়, পূর্ব্বাপর সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। শব শব্দের পর দাহ শব্দ ও মড়া শব্দের পরে পোড়ান শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভাষার সৌষ্ঠব ও শোভা সম্পাদিত হয়। কিন্তু আমরা যদি শব পোড়ান ও মড়া দাহ এই রূপ প্রয়োগ করি পাঠকগণ বস্তুত তাহা কেমন কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। একগালে চুন ও একগালে কালি দিলে, সেই দিব্য মুর্ত্তিটি দেখিতে যেমন সুন্দর হয়, শব পোড়ানো ও মড়া দাহ প্রয়োগ করিলে পাঠকগণ শুনিতে কি সেইরূপ মধুর হয় না? বঙ্গদর্শনেরলেখকগণ মাতৃভাষাকে এই দিব্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইতে উদ্যত হইয়াছেন !![২৪]

সোমপ্রকাশ-এর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় দ্বারকানাথ বিদ্যভূষণ *বঙ্গদর্শন*, বিশেষ করে এর ভাষা সম্পর্কে কতখানি বিরূপ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার মাধুর্য, ওজস্বিতা তাঁর পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি। যে কারণে এই ধরনের কঠোর মন্তব্য করতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের প্রকাশ থেকে *সোমপ্রকাশ* তাঁর সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব পোষণ করত, পরবর্তীকালেও তার যে কোন পরিবর্তন হয় নি, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না।

বঙ্গদর্শন-এর দ্বিতীয় বর্ষের ভাদ্র সংখ্যাটি সম্পর্কে উনিশ শতকের বিখ্যাত সংবাদ পত্র *ভারত সংস্কারক* মন্তব্য করে--

ইহাতে ১০টী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে চঞ্চল জগৎটী বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়, অতি সরল ভাষায় লিখিত। বঙ্গদর্শনের এরূপ প্রস্তাব সাধারণের বিজ্ঞান শিক্ষা পক্ষে বিশেষ উপকারী। চন্দ্রশেখরের শেষ না দেখিলে এবারকার অংশটীর বিষয়ে আমরা মত ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। কমলাকান্তের দপ্তরটী অদ্ভুত কল্পনা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মরণার্থ পদদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটীই প্রশংসনীয়। অতলস্পর্শের যুক্তি স্বল্পগাধ বোধ হইল। মেঘটী গর্দ্দভ লেখকেরই। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষে পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু 'সুখ স্বাধীনতার পরিমাপক' এ মতটী দূষণীয়। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণাধিকারের সময়টীর বিষয়ে ঠিক সিদ্ধান্ত বোধ হইল না, লেখক এ বিষয়ে আরো বলিবার আশ্বাস দিয়াছেন আমরা তাহা শুনিতে পাই।[২৫]

অনেক চেষ্টা করে পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকদের দিয়ে বাংলার জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয়ের আলোচনা যোগ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র *বঙ্গদর্শন*-কে অধিকাংশ মানুষের গ্রহণযোগ্য করেতোলেন। এতে ইতিহাস,

সমাজতত্ত্ব, সঙ্গীত, দর্শন ইত্যাদি নিয়ে যেমন প্রবন্ধ বেরিয়েছে, তেমনি বেরিয়েছে সাহিত্য নিয়ে। *বঙ্গদর্শন*-এর পিছনে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক সময় দিতে হত। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে তিনি বলেছিলেন--

> আমি খুব ভাল করিয়া "রিভাইজ" না করিয়া কাহারও কপি প্রেসে দিতাম না। চন্দ্রনাথের শকুন্তলা দেখেছে তো? চন্দ্র একেবারে "বাঙ্গালা অক্ষরে ইংরেজি" লিখেছেন-- খুব খাটতে হয়েছিল।

একদিকে ইংরেজি আর একদিকে সংস্কৃতের অত্যাচার থেকে রচনাকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রকে সচেষ্ট থাকতে হত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় 'ভারতমহিলা' প্রবন্ধটি *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশের জন্য দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* সম্পাদনার শেষ বছর এটি। প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন--

> তুমি এমন বাংলা লিখিতে শিখিলে কী করিয়া? আমি বলিলাম, "আমী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের চেলা" তিনি বলিলেন, ওঃ। তাই বটে। নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাংলা বাহির হইবে না।[২৬]

প্রথম প্রায় তিন বছর খুব উৎসাহ নিয়ে তিনি *বঙ্গদর্শন* পরিচালনা করতেন। কিন্তু ১২৮১ বঙ্গাব্দের শেষের দিকে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত বঙ্কিমচন্দ্র পত্রিকা সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হন। ১২৭৯-র পৌষ মাস থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থের যে সব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা তিনি প্রকাশ করতেন, দু'বছর চালানোর পর ১২৮১-র মাঘ মাস থেকে এই বিভাগটি তিনি বন্ধও করে দেন। বন্ধ করার তিনটি কারণ দেখান তিনি ১. পত্রিকার ক্ষুদ্র আকার , ২. অবকাশের অভাব, এবং ৩. 'অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা এরূপ গুরুতর যন্ত্রণা, যে তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছুই আমাদের আর স্মরণ হয় না।'

১২৮২-র প্রায় সূচনা থেকে *বঙ্গদর্শন*-এর প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে ওঠে। আগের বছরগুলির তুলনায় তাঁর লেখার পরিমাণও কমে যায়। এই বছরের আষাঢ় মাস থেকে তাঁর ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *শৈশব সহচরী* ধারাবাহিক ভাবে বেরোতে শুরু করে । এটির প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের মানসিক উদারতার পরিচয়বাহী কারণ এতে বিধবা বিবাহের সমর্থন মেলে। কর্মব্যস্ততার কারণে পত্রিকার প্রকাশ বিলম্বিত হতে থাকায় তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বলতে শুরু করেন *বঙ্গদর্শন* বন্ধ হয়ে গেছে। এই রটনা কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের *সাধারণী* তে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে--

> *বঙ্গদর্শন* সম্পাদকের অসুস্থতা নিবন্ধন ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের *বঙ্গ* দর্শন প্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে। অনর্থক "রসাভাষপ্রিয়" লোকে রটনা করিতেছে, যে বঙ্গদর্শন উঠিয়া গিয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। সপ্তাহ মধ্যে ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবে। পৌষ মাসের মধ্যে পৌষ সংখ্যা পর্য্যন্ত নিশ্চয় বাহির হইবে।[২৭]

সাধারণী-র প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও *বঙ্গদর্শন* বঙ্কিমের সম্পাদনা কালে আর কখনোই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নি। ১৮৭৬ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যখন একটি বড় লেখা নিয়ে তাঁর কাছে যান 'তখন তাঁহার চতুর্থ সালের বঙ্গদর্শন ন মাস বাহির হয় নাই।' ভাল প্রবন্ধেরও অভাব। যে কারণে হরপ্রসাদের প্রবন্ধটি পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র খুশি হন এবং এটি *বঙ্গদর্শন*-এর মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশও করেন। 'ভারত মহিলা' নামে হরপ্রসাদের এই লেখাটি যথেষ্ট সমাদৃত হয়। কিন্তু পত্রিকা চালানোর উৎসাহ বঙ্কিমচন্দ্র তখন হারিয়ে ফেলেছেন তাই ১২৮২-র চৈত্র মাসে 'বঙ্গদর্শন-এর বিদায় গ্রহণ' নামে রচনায় সবাইকে জানিয়ে দিলেন--'আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।' তাই বলে এই পত্রিকা যে আবার বেরোবে না এমন কথা কিন্তু তিনি বললেন না । বঙ্গর্দন-এর বিদায় গ্রহণে কিছু মানুষ নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিলেন, তবে দু:খিতও কম মানুষ হন নি। সাহেবি কাগজ *ক্যালকাটা রিভিউ*, এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলে-- এটির প্রকাশকালে শিক্ষিত মার্জিত রুচিসম্পন্ন লোকের মনের খোরাক যোগানোর মত একটি পত্রিকাও বাংলায় ছিলনা, যে কারণে প্রকাশের পরেই বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এটি দাগ কাটে। প্রথম আবির্ভাবের মাত্র চার বছর পরে এটির বিদায় সংবাদ দুঃখের সঙ্গে তাদের প্রকাশ করতে হচ্ছে। বাংলা সাহিত্যের এই সময়কালথেকে পত্রিকা প্রকাশের যে তাগিদ দেখা গেছে তার ফলে অসংখ্য পত্রিকার জন্ম হয়েছে। *ক্যালকাটা রিভিউ*-এর মতে, বঙ্কিমের এই পত্রিকাটির অনুসরণে এত কাগজের আবির্ভাব-এটি

মনে রাখার মত একটি ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করে পত্রিকাটি বলে-- এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। পত্রিকাটির মূল্য জনসাধারণ স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারাও বার বার উল্লেখ করেছেসে কথার। *বঙ্গদর্শনের* অবদানকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকৃতি জানানোর পাশাপাশি কিছু সীমাবদ্ধতার কথা বলতেও সমালোচক দ্বিধা করেন নি--

> The Vanga Darsana had, no doubt, its shortcomings, foremost among which were a little want of grace, a spirit of absolutism, and a courseness of humour not unlike that which characterised the literature of England immediately before the days of Addison and Steele. There is some excuse for all this in the present state of Bengali literature and general intellectual culture. But even if no excuse had existed, the shortcomings could not have detracted materially from the excellence of the Vanga Darsana. Its merits greatly out numbered its defects. [28]

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-এর বিদায় গ্রহণে *ক্যালকাটা রিভিউ* দুঃখ প্রকাশ করেছে।সেই সঙ্গে আন্তরিকভাবে আশা করেছে যে তিনি এটিকে আবারও পুনর্জীবিত করবেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ' এর আগে যা বলেছিলেন, পত্রিকাটি তা মেনে নিতে পারেনি। সমালোচক বলেছেন ইংলন্ডের প্রথম সাময়িক পত্র *এডিনবরা রিভিউ* আজও আছে। যদিও তার পাশাপাশি অন্য অনেক পত্রিকাও বর্তমান। এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত না হতে পারার পক্ষে প্রধান যুক্তি। সমালোচক তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই বলে--

> The literary public, who are our Judges in the cause, must find our aforesaid plea good and valid, and the said Babu Bankima Chandra would do well so to conduct himself in this present matter as not to incur the costs of an 'injunction' for the production of a commodity which is undeniably ours, but which he has most wrongfully concealed from us with a view of rendering the decree to be obtained by us useless and infructuous. [29]

শুধু *ক্যালকাটা রিভিউ*-এর অজ্ঞাতনামা লেখকই নন, *বঙ্গদর্শন* বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আরও অনেকেই দুঃখ পেয়েছিলেন। *বান্ধব* সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তিনি তাঁর পত্রিকায় 'বঙ্গদর্শন-এর বিদায়' নামে একটি দীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন। স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানান

> বাঙ্গালী বঙ্গদর্শনে সুখী ছিল; বঙ্গদর্শনের বিয়োগ অথবা বিচ্ছেদ তাহার নিকট দুঃখপ্রদ এবং অগ্রহণীয় হইয়া উঠিয়াছে।[৩০]

বঙ্গদর্শন সর্বস্তরের শিক্ষিত বাঙালিকে কিভাবে তৃপ্ত করত তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ--

> বঙ্গদেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা অর্দ্ধ-অবলা, যাঁহারা স্বভাবতঃ চিন্তায় অসমর্থ, এবং শিক্ষার ন্যূনতাদি কারণে চিন্তার উদ্দীপক বিষয় মাত্রেই সুতরাং বিরক্ত, এই চারি বৎসরকাল একমাত্র বঙ্গদর্শনটিই মৃদু মদিরার ন্যায় তাঁহাদিগের অবলম্ব ছিল। বঙ্গদর্শন দার্শনিক তত্ত্বের গূঢ় সংবাদ লইয়া কিরূপ ব্যায়াম করিতেন, তাহা তাঁহারা ভাবিতেন না, বঙ্গদর্শন ভবভূতি প্রভৃতি কবির কাব্য সমালোচনা প্রসঙ্গে কিরূপ পাণ্ডিত্য, স্বাদগ্রাহিতা ও মনস্বিতা প্রদর্শন করিতেন, তাহা তাঁহারা গণনায় আনিতেন না, বঙ্গদর্শন সূর্যমুখী ও প্রতাপ প্রভৃতির অতিমানুষ সৌন্দর্য্যময় অপূর্ব্ব চিত্র সকল আঁকিতে গিয়া কিরূপ কবিত্ব, নৈপুণ্য এবং কল্পনার কিরূপ লীলাখেলা দেখাইতেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে চাহিতেন না কিন্তু বঙ্গদর্শনে ললিতলবঙ্গলতা,

> কুন্দনন্দিনী ও শৈবলিনী প্রভৃতি কামিনীর যে কাহিনীটুকু থাকিত, তাহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত রহিতেন। সুকুমারমতি বালক বালিকারা ধাত্রীমাতার চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া যেরূপ তৃষিত কর্ণে রাজকন্যা ও মন্ত্রিকন্যার কাহিনী শুনে, তাঁহারাও বঙ্গদর্শনের চতুঃপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া শুধু সেইরূপ কাহিনী শুনিতেন। কাহিনীর পর পর ঘটনা অবগত হওয়ার জন্য তাঁহারা যথার্থই আকুল হইয়া থাকিতেন, এবং কাহিনী শুনিয়াই এই কন্টকময় পৃথিবীর সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। যে বার বঙ্গদর্শনে কোন কাহিনী না থাকিত, সেবার তাঁহাদিগের ক্রোধ, ক্ষোভ ও মনস্তাপের আর সীমা থাকিত না। [৩১]

এছাড়া 'বঙ্গদেশে' যাঁরা 'রসিক' বলে পরিচিত, ছাত্রমহলে, বিয়ের বাসরে, নতুন গ্রন্থকারদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন রসেরস্রোত বইয়ে দিতে ভালবাসেন, তাঁরা বিজ্ঞানরহস্যের অংশগুলিকে বিষচক্ষে দেখতেন বটে *বঙ্গদর্শন*-এর অন্যান্য গভীরতত্ত্বও তাঁদেও কষ্ট দিত, তবে বঙ্গদর্শন-এর উপন্যাসের নায়িকারা তাঁদের যেমন প্রিয় ছিলেন তেমনি ব্যঙ্গপূর্ণ রচনাগুলিও ছিল তাঁদের খুবই পছন্দের। সুশিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক ও সুরুচিসম্পন্ন বাঙালি, যাঁদের চিন্তা ভাবনার গভীরতা সাহিত্য ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে, *বঙ্গদর্শন*- তাঁদের অপরিহার্য সুহৃৎ-এর মতো ছিল 'এইসমুদয়শ্রেণির বাঙ্গালিই বঙ্গদর্শনের বিয়োগে... প্রিয়বিয়োগ দুঃখ অনুভব করিতেছেন।' লেখকের মতে ইংরেজিতে অনেক উপন্যাস, প্রবন্ধ, তত্ত্ব লেখা হয়েছে কিন্তু সেগুলি বাঙালির নিজস্ব নয়। *বঙ্গদর্শন* চার বছর ধরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যেসেবা করেগেছে তা অতি উচ্চমানের, এই পত্রিকা বাংলা ভাষা ও সহিত্যকে যেন নতুন জন্ম দান করেছেন। তাই, 'আজি উহার তিরোধানে আমরা এইরূপ তীব্র দুঃখে দুঃখিত।' লেখক আশা করেছেন খুব দ্রুত *বঙ্গদর্শন* 'পুনর্জ্জীবিত' হবে, এর প্রাণপুরুষেরা আবার কলম ধরতে যত্নশীল হবেন। তাঁর স্পষ্ট মত--

> বাঙ্গালায় আজিও সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ জন্মে নাই, আজি পর্য্যন্তও বাঙ্গালার অভাব ও প্রভাবের সীমারেখা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গদর্শনের মত প্রতিভান্বিত সহায়কে বিদায় দিতে সমর্থ হইব না আমরা সকল সহিতে পারি, সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা অক্ষুব্ধ হৃদয়ে ভোগ করিতে পারি, কিন্তু জননী, জন্মভূমি, এবং জন্মভাষার কাতর মূর্ত্তি ও হীনদশা চক্ষে দেখিতে পারিনা। [৩২]

মাত্র চার বছরের সম্পাদনা জীবন বঙ্কিমচন্দ্রের। পরবর্তীকালে আর কখনও কোন পত্রিকা-সম্পাদনার সরাসরি দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেননি। যদিও আমরা জানি *বঙ্গদর্শন*-এর পুনঃপ্রকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের একটা বড় ভূমিকা ছিল। কিন্তু তবু সঞ্জীবচন্দ্র বা তাঁর পরবর্তী সম্পাদকেদের কালে *বঙ্গদর্শন* পূর্বের সেইগৌরব ফিরে পায়নি। তাই পরবর্তীকালে বঙ্কিমের মতো একজন সম্পাদকের অভাব বাঙালি বার বার অনুভব করেছে। দ্বিতীয়বার *বঙ্গদর্শন* প্রকাশের পর এর অবস্থা দেখে কিছুদিন পরে *সুলভ সমাচার* এটিকে উঠিয়ে দেবার পরামর্শ দেয়। দ্বিতীয়বার যখন এটি বন্ধ হয়ে যায় তখন *সুলভ সমাচার বলে* -- 'বঙ্কিমবাবু যদি চাকরি ত্যাগ করিয়া ইহাতে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন তবেই চলিতে পারে, তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় দেখা যায় না।' [৩৩]

বঙ্কিমের মতো লেখকের গুণে একসময় কাগজটির বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয় ছিল, তাও *সুলভ সমাচার* পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। বঙ্কিম সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এর মতো পত্রিকার অভাব সমকালে দাঁড়িয়ে *সুলভ সমাচাব* হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে।

বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু সম্পাদক হিসেবে এই একটি পত্রিকার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র কোন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তার যে বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথ করে গেছেন তার কথা উল্লেখ না করলে এই আলোচনা থাকবে নিতান্তই অসম্পূর্ণ। *বঙ্গদর্শন*-এর কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানান শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য সাধন আজকের দিনে প্রধান মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মিলন সাধন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সম্ভব তা উল্লেখ করে তিনি বলেন--

যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গ দেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল ? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল ? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসী কে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্য্যমুখী কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই-যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থানীয় সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে।[৩৪]

শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, উনিশ শতকের আর এক কৃতী বাঙালি রমেশচন্দ্র দত্তও সম্পাদক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা না করে পারেননি। লালবিহারী দে সম্পাদিত *'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'*-এ ধারাবাহিকভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের যে ইতিহাসলেখেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতেদেরি হয়নি। গ্রন্থটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরের বছর। ১৮৭২-এ প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের *বঙ্গদর্শন* তাঁর সম্পাদনা গুণে খুব দ্রুত শুধু জনপ্রিয়ই নয় প্রশংসিতও হয়ে ওঠে তা তিনি স্বীকার করেছেন।[৩৫]

বঙ্গদর্শন, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা অভাবনীয়। পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে নিন্দা প্রশংসার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। সে ঝড়ের বেগ আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়েছে। যত দিন গেছে বাঙালি বুঝতে পেরেছে এই পত্রিকাটির মূল্য, এর অভিনবত্ব। সম্পাদক হিসেবে বঙ্কিমের অতুলনীয় প্রতিভা। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন-এর ভাষা দেখিয়ে সেদিন উচ্চকিত হয়েছিলেন একদল মানুষ, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার সূত্রে, অন্য কোন কারণে নয়। সব মিলিয়ে বলতে পারি উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকা জগতে *বঙ্গদর্শন* একক এবং অনন্য।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ

১. *Bankim Rachanabali* Ed. By Jogesh Chandra Bagal (Calcutta 1990) p.170-71.
২. *এডুকেশন গেজেট*, ২৯.৩.১৮৭২
৩. বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা- *বঙ্গদর্শন, বৈশাখ*, ১২৭৯
৪. Bengal Library Catalogue (B.L.C) 30.6.1872.
৫. *সোমপ্রকাশ*, ২০.৪.১৮৭২
৬. *এডুকেশন গেজেট*, ২২ বৈশাখ, ১২৭৯
৭. *সোমপ্রকাশ*, ১১ বৈশাখ ১২৭৯, বিনয় ঘোষ-এর 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' চুতর্থ খণ্ড থেকে উদ্ধৃত, কলকাতা, ১৯৬৬
৮. *এডুকেশন গেজেট*, ২৬.৪.১৮৭২

৯. আক্রমণের নমুনা-- 'পাঠক। মনুষ্যেরা কি নির্ব্বোধ পশু। এত দিন বিবাহের অর্থ বুঝিতে পারে নাই। বৃহল্লাঙ্গুল বুঝাইয়া না দিলে বোধ হয় আরও কত দিন ভ্রমে পড়িয়া থাকিতে হইত ?
১০. প্রথম সম্পাদকীয় -- *এডুকেশন গেজেট*, ১.১১.১৮৭২
১১. *Bankim Rachanabali*- Ed. By jogesh Chandra Bagal, Calcutta. 1990. pp. 172-73
১২. *বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী* -- অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ১৩৫
১৩. শিবনাথ ভট্টাচার্য্য -- *এডুকেশন গেজেট*, ৮ আষাঢ় ১২৭৯
১৪. *এডুকেশন গেজেট*, ২৯ আষাঢ়, ১২৭৯
১৫. বঙ্কিম বিতর্ক -- মৃদুলকান্তি বসু, *দেশ*- সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৫, পৃ. ১৭৮-৭৯
১৬. *Hindoo Pairiot,* 24.3.1873
১৭. *সুলভ সমাচার*, ১৮ বৈশাখ, ১২৮০
১৮. 'বঙ্গদর্শন' -- *সোমপ্রকাশ*, ২১ শ্রাবণ, ১২৮০
১৯. *সোমপ্রকাশ* ৩ ভাদ্র ১২৮০, বিনয় ঘোষের পুর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৫৭
২০. ঐ, পৃ. ৬৬১
২১. *সোমপ্রকাশ* ১০ ভাদ্র, ১২৮০
২২. ঐ
২৩. ঐ
২৪. 'বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গসমাজের উপকার অথবা অপকার হইবার সম্ভাবনা?' - *সোমপ্রকাশ*, ভাদ্র, ১২৮০, বিনয় ঘোষের পুর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৬৫-৬৬
২৫. পুস্তক সমালোচনা-- *ভারত সংস্কারক*, ২৮ ভাদ্র, ১২৮০
২৬. ভূমিকা-- *বঙ্গদর্শন পরম্পরা*, ভবতোষ দত্ত, নৈহাটি, ২০০৬ পৃ. ২০
২৭. *সাধারণী*, ৬ অগ্রহায়ণ, ১২৮২ (২২.১১.৭৫)
২৮. *Calcutta Review,* Vol. 63, 1876, p.25
২৯. ঐ
৩০. 'বঙ্গদর্শনের বিদায়'-- *বান্ধব*, আষাঢ়, ১২৮৩
৩১. ঐ
৩২. ঐ
৩৩. *সুলভ সমাচার*, ৭ বৈশাখ, ১২৮৬
৩৪. *বঙ্কিমচন্দ্র* -- *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* (সংকলয়িতা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য), (বিশ্বভারতী), কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ৮৬-৮৭
৩৫. *The Literature of Bengal,*- R.C. Dutt, 2nd Edition, Calcutta, 1895,p.224

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

কালিদাসের নাটক : সৃজনকৌশল

হোসনে আরা আরজু*

Abstract : Kalidasa is an eminent dramatist in Sanskrit literature. The trio plays named *Malavikagnimitram, Vikramorvashiyam* and *Avijnanshakuntalam* are the most popular in terms of artistic perfection. This paper attempts to discuss Kalidasa's use of artistic elements and successful handling of the dramatic situation in these three plays.

ভূমিকা

প্রাচীন ভারতে কবিপ্রতিভার বিচারে কালিদাসের কাছাকাছি আসতে পারেন এমন দ্বিতীয় কোনো প্রতিভাধর কবি নেই। কালিদাসের আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে বিশ্বের সুধীজনের হৃদয়ে। কালিদাস বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। একই সঙ্গে যেমন মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য তথা গীতিকাব্য রচনায় সকলকে অতিক্রম করেছেন; তেমনি নাটক রচনাতেও লাভ করেছেন চরম সার্থকতা। কালিদাসের প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রকটিত হয়েছে।

কালিদাস রচিত নাটকের সংখ্যা মাত্র তিনটি। সম্ভবত রচনার কালানুক্রমিকভাবে এগুলোকে এভাবে সাজানো যায়: *মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্* এবং *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*। কালিদাসের প্রেম-ভাবনার ক্রমপরিণতির স্তর এবং নাট্যপ্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখে মনে হয় যে, মহাকবি কালিদাসের নাট্যপ্রতিভার বীজ *মালবিকাগ্নিমিত্র*-এ উপ্ত হয়েছে, *বিক্রমোর্বশীয়*-এ অঙ্কুরিত হয়েছে এবং *অভিজ্ঞানশকুন্তল*-এ পল্লবিত হয়ে পরিণত হয়েছে পুষ্পপত্রসমৃদ্ধ বিশাল মহীরূহে। প্রখ্যাত জার্মান মনীষী গ্যোটে (Goethe) *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* পাঠ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন :

> Would'st thou the young year's blossoms and the
> Fruits of its decline,
> And all by which the soul is charmed, enraptured,
> feasted, fed,
> Would'st thou the Earth and Heauen itself in one sole
> name combine?
> I name thee, O sakutala! and all at once is said.[1]

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* কালিদাসের প্রথম বয়সের রচনা। প্রথম রচনার বিনম্র বিনয় সেই ইঙ্গিতই বহন করে।[২] তাছাড়া *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* ও *বিক্রমোর্বশীয়ম্* নাটকের ভাষা ও

---

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

[১] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক, *কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* (কলকাতা:সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬), পৃ. ১৫।

[২] প্রসূন বসু, সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১১তম খণ্ড, "কালিদাস, মালবিকাগ্নিমিত্রম্" (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ. ২৫৯ ।

কাব্যকুশলতার সাথে তুলনাতেও *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* যে প্রথম জীবনের রচনা তাই অনুমিত হয়। কালিদাসরচিত পঞ্চাঙ্ক নাটক *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মালবিক নাটকের নায়িকা অপূর্ব সুন্দরী মালবিকা রাজ-অন্তঃপুরের পরিচারিকা। রানী সবসময়ই মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের চোখের আড়ালে রাখার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মালবিকা আসলে রাজকন্যা, দস্যুহস্তে পড়ে ঘটনাচক্রে বিদিশারাজের অন্তঃপুরে এসে পৌঁছেছেন। নাটকের শেষ অগ্নিমিত্র ও মালবিকার পরিণয়ে।

কালিদাসের দ্বিতীয় নাটক বিক্রমোর্বশীয়। পঞ্চমাঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটি বৈদিক সাহিত্য, ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে বর্ণিত পুরূরবা ও উর্বশীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত। মূলকাহিনী হলো: স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গে মর্ত্যের রাজা পুরূরবার সাক্ষাৎ হলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং তাদের মিলন ঘটে। উর্বশী পুরূরবার বিয়োগান্ত পুরাবৃত্তকে কালিদাস তাঁর এই নাটকে মিলন পর্যবসায়ী করে তুলেছেন। উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ, সঙ্গমনীয় মণির অবতারণা প্রভৃতি ঘটনা নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ কালিদাসের সর্বশেষ তথা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবদিক থেকে পরিণত রচনা। নাট্যকলার বৈচিত্র্যে, কাব্যশিল্পের মাধুর্য্যে, প্রেমের পবিত্রতায় কালিদাস তাঁর নাটকটিকে সমগ্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। তাই বলা হয়েছে 'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। মহাভারতে বর্ণিত দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীকে উপজীব্য করেই নাটকটি সাত অঙ্কে রচিত হয়েছে। হস্তিনাপুর অধিপতি দুষ্মন্ত মৃগয়ায় এসে হিমগিরি উপত্যকার কণ্বাশ্রমে কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হন। শকুন্তলাও অনুরাগিণী হন। উভয়ের গান্ধর্ব বিবাহ হয়। তারপর দুর্বাসার অভিশাপ। শুকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা এবং দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। শেষে মারীচাশ্রমে পুত্র সর্বদমনসহ দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন।

কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণ

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের কাহিনী কাল্পনিক, তবে ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে নামসাদৃশ্য বজায় রেখে এতে ইতিহাসের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্র ঐতিহাসিক শুঙ্গ-বংশজাত এবং যবনদের সঙ্গে যোগাযোগ ঐতিহাসিক এক তথ্যের ইঙ্গিত দেয়। বিক্রমোর্বশীয় নাটকের অঙ্কুর বেদে ও বিস্তারের সূত্র পুরাণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু নাটকের কাহিনী কালিদাসেরই পরিকল্পিত। *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্* কাহিনীর বীজ অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য এবং মহাভারতে পাওয়া যায়। কিন্তু কালিদাস তাতে নতুন বিষয় যোগ করেছেন এবং পরিণতিতে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়েছেন। অতএব তাঁর তিনটি নাটকের কাহিনীই পূর্ব প্রচলিত হলেও, নাট্যাকৃতিতে স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের কাহিনী দ্রুতলয়ে সংঘটিত ঘটনা প্রবাহের এক জীবন্ত চিত্র, যা রঙে, রসে ও বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত। নাটকে রাজ-প্রাসাদের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিফলিত হয়েছে রাজান্তঃপুরের অভ্যন্তরীণ রঙ্গরসের নিখুঁত ছবি। লাবণ্যময়ী নায়িকা মালবিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা, প্রেমিক-প্রেমিকার হাব-ভাব-বিলাস, আবেগ-চঞ্চল প্রণয়-চিত্র এবং চরিত্র চিত্রণেও কবির দক্ষতা প্রশংসনীয়। অগ্নিমিত্র বা মালবিকা নায়ক বা নায়িকা হিসেবে উচ্চস্তরের না হলেও নাট্যকাহিনীর উপযোগী করেই নাট্যকার তাদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিদূষকের কৌতুক-প্রিয়তা ও ভোজন-রসিকতা, ধারিণীর রাজমহিষী সুলভ আত্ম-মর্যাদা, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা ইরাবতীর প্রতিনায়িকাসুলভ প্রগল্‌ভতা ও ঈর্ষাকাতরতা প্রভৃতি নাট্যকারের প্রতিভা-স্পর্শে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

বিক্রমোর্বশীয়ম নাটকে উর্বশীর প্রতি ইন্দ্রের অনুগ্রহ, সঙ্গমনীয় মণির অবতারণা প্রভৃতি ঘটনা ঋগ্বেদ-পুরাণাদিতে অনুপস্থিত। নায়ক পুরূরবাকে নাট্যকার বীররূপে, আদর্শ প্রেমিকরূপে এবং পুত্রবৎসল পিতারূপে চিত্রিত করেছেন। রাজার প্রেমের গভীরতা ছিল বলেই তাঁর জন্য স্বর্গবিহারিণী উর্বশী স্বর্গের মায়া কাটিয়ে মর্ত্যমানবের প্রেমে বাঁধা পড়েছিলেন। তবে প্রতিনায়িকা ঔশীনরীর কাছে নায়িকা হিসেবে উর্বশী যেন কিছুটা নিষ্প্রভ। চতুর্থাঙ্কে উর্বশীর বিরহে প্রেমোন্মত্ত পুরূরবার মর্মস্পর্শী বিলাপ সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অরণ্যের বৃক্ষলতা, পশু-পাখি যেন তাঁর প্রেমিক দৃষ্টিতে উর্বশীরূপে প্রতিভাত।

গীতিকাব্যের চমৎকারিত্বে ও হৃদয়াভাবের ঐকান্তিকতায় চতুর্থাঙ্কটি পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ কালিদাসের কালজয়ী সৃষ্টি। নায়িকা চরিত্রের ক্রমিক পরিণতি এখানে লক্ষণীয়। সরলা, লজ্জানম্রা তপোবনবালা শকুন্তলা পঞ্চমাঙ্কের প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে পরিপূর্ণা, সপ্তমাঙ্কে বিরহব্রতচারিণী, আদর্শ সহধর্মিণী। কবিকল্পিত দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত নাটককে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। মর্ত্যের চঞ্চল প্রণয় ও রূপের কামজ মোহকে অভিশাপের মাধ্যমে বিচ্ছেদের বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করে কবি প্রেমকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের মঙ্গলমাধুর্যে উন্নীত করেছেন। চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যে তপোবন প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার নিবিড় অন্তরঙ্গতার চিত্র ফুটে উঠেছে। আজন্ম পরিচিত তপোবন প্রকৃতিকে, আবাল্যের সহচরী অভিন্ন হৃদয় অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে, মাতৃহারা হরিণশিশুকে ছেড়ে যেতে শকুন্তলার হৃদয়ভেদী ক্রন্দন, সখীদ্বয়ের বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর প্লাবন, মহর্ষি কণ্বের বাষ্পস্তম্ভিত কণ্ঠে কন্যার প্রতি গৃহীসুলভ উপদেশ ও শোকাকুল দৃষ্টি সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। করুণ রসের এই অভিব্যক্তি এই নাটকের চুতর্থাঙ্ককে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তাই বলা হয়:

কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্র রম্যা শকুন্তলা।
তত্রাপি চ চতুর্থোঽঙ্কো যত্র যাতি শকুন্তলা ॥

পঞ্চমাঙ্কটিও কালিদাসের নাট্যকুশলতায় সমৃদ্ধ। তাই অনেকে এই অঙ্কটির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন:

'পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ'। চরম নাটকীয় উৎকণ্ঠা, নায়ক-নায়িকার হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নায়িকা-চরিত্রের পূর্ণতা নাটকের এই অংশটিকে নাটকীয় উৎকর্ষে মণ্ডিত করেছে। চরিত্র-চিত্রণেও নাট্যকারের দক্ষতা অসামান্য। ধীরোদাত্ত দুষ্মন্ত আদর্শ রাজা ও প্রেমিক। শকুন্তলা প্রেমমুগ্ধা, সপ্তমাঙ্কে তিনিই আবার মাতৃত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল। ব্রহ্মতেজের প্রতিমূর্তি মহর্ষি কণ্ব আজীবন ব্রহ্মচারী হয়েও গৃহস্থের কর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ। প্রিয়ংবদা বাক্‌চতুরা ও হাস্যপরিহাসপ্রিয়া। অনসূয়া স্বল্পভাষিণী ও দূরদর্শিনী। বিদূষকের অনুপস্থিতিই নাটকের ব্যাপ্তিতে অধিকতর সহায়ক হয়েছে। নায়ক-নায়িকার প্রথমাঙ্কগত মিলন সপ্তমাঙ্কে শাশ্বত মিলনে পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্য্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গ-তপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক।[৩]

তিনটি নাটকেই কাহিনীর আঙ্গিকগত মিল লক্ষণীয়। অগ্নিমিত্র, পুরূরবা ও দুষ্মন্ত এই তিন নায়কই বহুবল্লভ রাজা এবং তিন জনই ঠিক তরুণ নন বরং তাঁদের প্রৌঢ় বলা যেতে পারে। নায়িকাদের মধ্যে উর্বশী প্রৌঢ়া, মালবিকা আর শকুন্তলা যুবতী। মালবিকা, শকুন্তলা দুজনেই অনাঘ্রাত কুসুম তবে একজন রাজান্তঃপুরলালিতা অন্যজন আশ্রমলালিতা। তিনজন নায়ক প্রত্যেকেই নবীনা নায়িকার প্রতি গভীর প্রেমে আসক্ত। নায়িকার মধ্যে মালবিকা ললিত-কলাদিতে নিপুণা তবে মাধুর্যে হয়তো উদ্যানলতা আশ্রমলতার কাছে পরাজিতা।[৪] উর্বশী প্রাচীনা হলেও অপ্সরা বলেই চিরযৌবনা। সবনাটকেই পূর্বরাগের ব্যাপারে নায়কেরাই অগ্রবর্তী। প্রতিনায়িকারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রণয়কাহিনীর সংঘাতে জড়িত। মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রৌঢ়া ও প্রগল্‌ভা রানী ধারিণী ও ইরাবতী এবং বিক্রমে ঔশীনরী উপস্থিত। অভিজ্ঞানশকুন্তলায়ম্ নাটকে হংসপদিকা ও বসুমতীর উল্লেখ এবং তাদের আত্মনিবেদ ও প্রেমের লাঞ্ছনার

---

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩১৪ বা.স.), পৃ. ৩৪ ।

[৪] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক; *কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

"শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ ॥"১/১৬

কথা উচ্চারিত হয়েছে। ধারিণীর মালবিকার প্রতি সহানুভূতি ও স্বামীর প্রেমপাত্রী হওয়ার পরেও মহানুভবতা, তার অপত্যস্নেহ ইত্যাদি কঠোর-কোমলের সমন্বয়ে চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে। ইরাবতীর রোষ, দুঃখ, বেদনা সর্বশেষে নিরুপায়ের আত্মসমর্পণ আমাদের হৃদয়কে সচকিত করে। ঔশীনরীর রানীর ন্যায় পদমর্যাদাবোধ আছে। প্রণয়ী নায়কের প্রধান সহায় তাঁর বয়স্য বিদূষক। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে কালিদাস বিদূষকের যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন অন্যত্র তা দুর্লভ। বিদূষকের চরিত্র এতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নাটকটির চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে খ্যাতিমান সমালোচকের উক্তি:

> The Malavika is not a love drama of the savapnavasavadatta to which it has a superficial resemblance, but which possesses of far mone serious interest. It is a lighthearted comedy of court-life in five acts, in which love is a pretty game and in which the hero need not be if heroic proportion, nor the heroine anything but a charming and attractive maiden--- The former is a care-free out courteous gentleman, on whom the burden of kingly resporisbility sits, but lightly, Who in no longer young but no loss ardent, who is an ideal Daksina Nayaka possessing a great capacity for falling in out of love; while the later is a faintly drawn ingenue with nothing but good looks and willingness to be loved by the incorrigible king lover--- The characterisation is sharp and clear nad the expression polished elegant and even dainty--- judged by its own standard, there is nothing immature, clumsy or turgid in the drama.[৫]

বিক্রমে বিদূষক চরিত্র জীবন্ত মনে হয়, তার বোকামি, ভাঁড়ামি নাটকের ক্ষেত্রে উপযোগী চরিত্রই হয়েছে। প্রত্যেকটি নাটকের নায়িকার সঙ্গে তার সঙ্গিনী বা সখীরা আছে। মালবিকার সহচরী কৌশিকীর চরিত্র অতি উদার প্রকৃতির। সে একজন ভিক্ষুকী, বহুবিদ্যার অধিকারিণী, রোগে শোকে দুঃখে শান্তিদায়িনী। উর্বশীর সঙ্গী চিত্রলেখা এবং শকুন্তলার সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা। এরা দুজনেই শকুন্তলার হিতৈষিণী, কিন্তু দুজনের স্বভাবের পার্থক্য আছে—প্রিয়ভাষী প্রিয়ংবদা একটু যেন চালাক ও চটপটে, অনুসূয়া মৃদু এবং দূরদর্শিনী।[৬] নায়ক-নায়িকা ছাড়া অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র-চিত্রণেও কালিদাস কম কৃতিত্ব দেখান নি। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকে গণদাস সর্বকালের শিক্ষকের আদর্শ হিসেবে হতে পারেন অভিনন্দ্য ও স্মর্তব্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে বনবাসী কণ্বের মধ্যে পালিতা কন্যার জন্য পিতৃহৃদয়ের যে শুভকামনা ও তার বিচ্ছেদে যে বেদনাবিধুরতা দেখিয়েছেন তা অনবদ্য। ঋষি হয়েও তিনি কন্যার পতিগৃহে যাত্রাকালে ব্যাকুল হয়ে বলেছেন:

বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমপি স্নেহাদরণৌকসঃ।
পীড্যণ্ডে গৃহিনঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।[৭]

মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজা মালবিকাকে চিত্রে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু মালবিকার আকুলতা ছিল কম। বিক্রমোর্বশীয়তে রাজার সুন্দরী পত্নী থাকতেও তিনি অপ্সরার প্রতি আসক্ত। পুরূরবার সাথে উর্বশীর এই প্রেমকে বলে Love at first sight. দুষ্মন্তও শকুন্তলাকে দেখলেন তরুচর্যায় রতা, এখানেও প্রথম দর্শনেই প্রেম। পুরূরবা উর্বশীকে দেখলেন মূর্ছিত অবস্থায়, ঐ সুপ্ত সৌন্দর্য পুরূরবার মনে বপন করল প্রণয়বীজ। অগ্নিমিত্র মালবিকার প্রতি আকৃষ্ট হলেন চিত্র দেখে। তারপর চলল

---

[5] S.N. Dasgupta and S.K. De, *A History of Sanskrit Literatu* (Kolkata: University of Kolkata, 1970, pp. 136-137.

[৬] সুকুমার সেন, *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস* (কলকাতা: গ্রন্থপ্রকাশ, ১৩৬৮ বা.স.), পৃ. ৩০৫ ।

[৭] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক; *কালিদাস, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, পৃ. ২৭৮।

চাক্ষুস দেখার আয়োজন। উর্বশীর আবেগোষ্ণ অনিয়ন্ত্রিত ভালবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে কিন্তু অপ্সরার প্রেম স্বর্গীয় হলেও মর্ত্যের মানবোচিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতায় বলেছেন—নহ মাতা, নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।[৮] বিদূষক ঠিকই বলেছে: "অপ্সরাদের কাণ্ড মানুষের মতো নয়।" তাই তার প্রেমে না আছে সংযম না আছে মাতৃত্বের গৌবর– আছে কেবল স্বার্থপরতা। পুরূরবার প্রেমিক সত্তার পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর রাজোচিত মহিমা প্রেম পরবশ্যতার জন্য ক্ষুণ্ন হয়েছে। কিন্তু বহুবল্লভ নায়কের জীবনে বিরহের দুঃখভোগ দেখিয়ে কালিদাস কামকে প্রেমের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। শকুন্তলার মধ্যেও প্রেয়সীর প্রণয়লীলায় যেটুকু মাদকতা ছিল দুঃখতাপে দগ্ধ করে কবি শেষ অঙ্কে তার মধ্যে জননীর কল্যাণমূর্তিকে বিকশিত করেছেন। প্রেমের কবি কালিদাস সৌন্দর্যের কবিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নিসর্গ প্রীতি

প্রকৃতির কবি কালিদাস। তাঁর প্রতিটি নাটকেই প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার পরিচয় মেলে। কালিদাসের নাটকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী যেমন বিশেষ ভূমিকা রাখে, প্রকৃতিও তেমনি বিশেষ পাত্র। বিক্রমোর্বশীয় নাটকে উর্বশী অভিমানভরে অকলুষবনে প্রবেশ করলে লতায় পরিণত হয়। পুরূরবা উর্বশীর জন্য দিগ্‌দিগন্তে উন্মত্তপ্রায় হয়ে অন্বেষণ করতে লাগলেন। রাজা করুণ গাথা গেয়ে গেয়ে ময়ূর, কোকিল, হংস, চক্রবাক, ভ্রমর, হস্তী, পর্বত, নদী, হরিণ সকলের কাছেই উর্বশীর অনুসন্ধান করলেন। উর্বশী বিরহে পুরূরবা প্রকৃতি ও মানুষের পার্থক্য করতে পারেননি। ঐ প্রমত্তগাথা সংস্কৃত সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। পুরূরবার এই করুণগাথা ভাগবতের কৃষ্ণ-বিরহে রাধিকাবিলাপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থাঙ্কে শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যে তপোবন প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার নিবিড় অন্তরঙ্গতার চিত্র ফুটে উঠেছে। শকুন্তলার বিদায়কালে সমস্ত প্রকৃতিতে মর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়েছে। মৃগ, পশু, বৃক্ষ, লতা, পুষ্পগুচ্ছ সকলেই শকুন্তলার বিদায়ে জাগরিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। কণ্বঋষি সকল বনবাসী বন্ধুকে বিদায় দিতে বললে তারা কোকিলের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিতে এবং অশ্রুবন্যাসিক্ত বিদায় সঙ্গীত গাইছে এইভাবে "কোকিলবরং সূচয়িত্বা।" সমস্ত মূক প্রকৃতিতে আজ অনুভূতি জাগরিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপকনাট্য রচিত হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্য সাধন করাইয়া লওয়া, এ তো অন্যত্র দেখি নাই।[৯]

'বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকের চতুর্থ অঙ্ক এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রন্থে গীতিকাব্যিক আবেদন এবং পরের গ্রন্থে প্রকৃতির সজীবতা বিস্ময়কর। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে প্রকৃতিও যেন মানুষেরই মতো চেতনা-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। তিনটি নাটকের মধ্যে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ আর বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকে ঘটনাসূত্রে বাঁধা পড়েছে স্বর্গ আর মর্ত্য। মালবিকাগ্নিমিত্রের মঞ্চ একান্তভাবে মর্ত্যেই। বিক্রমোর্বশীর স্বর্গটুকু মর্ত্যগন্ধী, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে মর্ত্যটুকুও স্বর্গগন্ধী। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে স্বর্গমর্ত্য আর ফলফুল কীভাবে মিশেছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের পটভূমিতে আছে একদিকে তপোবন, অপরদিকে পার্শ্বচিত্রে রয়েছে রাজসভা। কালিদাসের এক একটি নাটকের স্বাদ এক এক রকম। মালবিকাগ্নিমিত্র রাজসভার নাটক, বিক্রমোর্বশীয়ম্

---

[৮] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৪র্থ খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪৭ বা.স.), পৃ. ৮২-৮৪।

[৯] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য*, পৃ. ৪৩ ।

লোকসভাব নাটক, আর অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ সুধীসভার নাটক। কালিদাস তাঁর তিনটি নাটক পরিকল্পনায় বিভিন্নরুচির মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন। তাই কালিদাস গণদাসের মুখ দিয়ে বলেছেন: "নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধনম্।"[১০] কালিদাসের নাটকে প্রকৃতির যেমন ভূমিকা আছে তেমনি আছে অতিপ্রাকৃতের ভূমিকা। শকুন্তলা নিজেই অপ্সরা সম্ভূতা। আশ্রমের বিঘ্ন ঘটিয়েছে রাক্ষস ও দৈত্যরা। দুষ্মন্তের বিস্মৃতির কারণ দুর্বাসার শাপ। এক জ্যোতির্মূর্তি হেমকূট পর্বতে নিয়ে গেলেন প্রত্যাখ্যাতা কন্যাকে। অপ্সরা সানুমতী তিরস্করিণী বিদ্যায় দুষ্মন্তের পশ্চাত্তাপ প্রত্যক্ষ করছেন। মাতলি স্বর্গ থেকে দুষ্মন্তের অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন কাছে থেকে, কিন্তু তাঁকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। দুষ্মন্ত স্বর্গে যাচ্ছে আবার স্বর্গ থেকে ফিরছেন আকাশ পথে। সর্সদমনের রক্ষাকবচ বাবা-মা ছাড়া অন্যে স্পর্শ করলে সাপ হয়ে কামড়াবে, এই সব হলো অতিপ্রাকৃত। বিক্রমোর্বশীয়তেও স্বর্গ, মর্ত্য, উর্বশীর লতায় পরিণত হওয়া, মণির স্পর্শে উর্বশীর আবার স্বদেহে ফিরে আসা এসবই অতিপ্রাকৃত। বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ দুটো নাটকেই কালিদাস 'অভিশাপ'কে কাজে লাগিয়েছেন নাট্যবিবর্তনে। নায়িকাদ্বয় উর্বশী ও শকুন্তলা উভয়েই অভিশপ্ত, মালবিকা অভিশপ্তা না হলেও তার সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ছিল: "এক বৎসর পরিচারিকাভাবে থাকার পর সে উপযুক্ত ভর্তৃগামিনী হবে।"[১১]

বিক্রমে ইন্দ্রসভায় লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে পুরূরবার প্রেমে গভীরভাবে মগ্না উর্বশী "পুরূষোত্তম'–এর নাম করতে গিয়ে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করে ফেলায় আচার্য ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অভিশাপ দেন–"স্বর্গে তার স্থান হবে না"–বলে। ইন্দ্র অনুকম্পা করে শাপকে বরে পরিণত করেন।

অভিশাপ ও দৈবনির্বন্ধ

অভিজ্ঞানশকুন্তলায় 'দুর্বাসার অভিশাপ' নাটকটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।[১২] কবিকল্পিত দুর্বাসার অভিশাপ বৃত্তান্ত নাটকটিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। মর্ত্যের চঞ্চল প্রণয়কে, রূপের কামজ মোহকে অভিশাপের মাধ্যমে বিচ্ছেদের বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করে মহাকবি প্রেমকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মঙ্গল মাধুর্যে উন্নীত করেছেন। এই অভিশাপের কাহিনী দুটিই কালিদাসের নিজেরই কল্পিত এবং এর সাথে কালিদাসের জীবনদর্শনও জড়িত।

কালিদাসের যে কলানৈপুণ্য এবং শাস্ত্রজ্ঞানের সুষ্ঠু কাব্যিক প্রয়োগ আমরা পাই তা অতি উচ্চমানের। মঞ্চপ্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থ অঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য ও গীতের এরূপ সমন্বয় অন্য কোনো নাটকে দেখা যায় না। প্রাকৃত গানগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে নাট্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও নাট্যপ্রয়োগের এরূপ পরিকল্পনা এক অভিনব সংযোজন। পরবর্তীকালের অনেক নাট্যকার এই অঙ্কের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সমগ্র চতুর্থ অঙ্ক বিরহে উন্মত্ত রাজার প্রেম প্রলাপোক্তিতে পরিপূর্ণ। বিশ্বসাহিত্যে এর সমতুল্য গীতি উচ্ছ্বাস দুর্লভ। চতুর্থ অঙ্গে অপভ্রংশে রচিত অনেকগুলি গান আছে—এই গানগুলো ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাজার হৃদয়ার্তি মুগ্ধ করে। রাজা কখনও প্রিয়াবিরহ-দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন, কখনও পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গকে অথবা অচেতন পদার্থকে উপলক্ষ করে তার প্রিয়ার সংবাদ পেতে চাইছেন। এভাবে প্রেমোন্মত্ত রাজা কখনও নাচছেন,

---

[১০] প্রসূন বসু, সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১১তম খণ্ড পৃ. ২৬১।

[১১] প্রসূন বসু, সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৩০২।
"সংবৎসরমাত্রমিয়ং প্রেষ্য ভাবমনুভূয় ততঃ সদৃশভর্তৃগামিনী ভবিষ্যতীতি"।

[১২] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক, *কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, পৃ. ২৪৮:
"বিচিন্তয়ন্তী যমনন্যমনসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপচ্ছিতম্ ।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব" ॥ ৪/১

কখনও গাইছেন, কাঁদছেন, হাসছেন, কখনও আবার নিজের ধ্বনির প্রতিধ্বনিকে প্রত্যুত্তর ভেবে উৎকর্ণ হচ্ছেন। সুকুমার সেনের মতে এটি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের এক মাত্র গীতিনাট্য। তিনি আরও বলেছেন:

> সেকালের কথ্যভাষায় গানের সবচেয়ে পুরাতন এবং খাঁটি নিদর্শন বিক্রমোর্বশীয়ের চতুর্থ অঙ্কেই পাইতেছি। এই গানগুলি অপভ্রংশ ভাষার সবচেয়ে পুরানো নিদর্শনও বটে।[১৩]

সুমুকার সেন কালিদাসের এই নাটকে রূপকথার ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করেছেন; তাঁর মতে: উর্বশীর লতারূপ ধারণ ও মণিস্পর্শে মানবীত্ব প্রাপ্তি আর পাখির মণিহরণ রূপকথার মোটিফেরই মতো।[১৪]

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রস্তাবনাতে আমরা নটীর মুখে গান শুনতে পাই। আবার পঞ্চমাঙ্কের সূচনাতেই কবি এমন একটি সংগীত সংযোজন করেছেন যা মুহূর্তে এই অঙ্কের মূল বিষয়বস্তুর মর্মোদ্ঘাটন করে। গানটি প্রাকৃতে লেখা :

অহিনবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং
কমলবসইমেত্তনিব্বুদো মহুঅর বিমহরিও সি নং কহঙ॥ ৫/১
নব মধুলোভি ওগো মধুকর চূতমঞ্জরী চুমি,
কমল-নিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ কেমনে ভুলিলে তুমি।[১৫]

এই গান শুনেই রাজার মনে অকারণ উৎকণ্ঠার জাগরণ ঘটল। তিনি ভাবলেন :

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥ ৫/২[১৬]

কালিদাসের প্রত্যেকটি নাটকের নান্দী শ্লোকে অষ্টমূর্তিধর শিব আরাধিত হয়েছেন। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের মঙ্গলশ্লোকে বলা হয়েছে :

একৈশ্বর্যে স্থিতোঽপি প্রণতবহুফলে যঃ স্বয়ং কৃত্তিবাসাঃ
কান্তাসংমিশ্রদেহেঽপ্যবিষয়মনসাং যঃ পরস্তাদ্ যতীনাম্।
অষ্টাভির্যস্য কৃৎস্নং জগদপি তনুভির্বিভ্রতো নাভিমানঃ
সন্মার্গালোকনায় ব্যপনয়তু স বস্তামসীং বৃত্তিমীশঃ ॥ ১/১[১৭]

আবার বিক্রমোবর্শীয়ম্ নাটকেও মঙ্গলশ্লোকে শিবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছেন:

বেদান্তেষু যমাহুবেকপুরুষং ব্যাপ্য স্থিতং রোদসী
যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ।
অন্তর্যশ্চর্মুমুক্ষুভির্নিয়মিত প্রাণাদিভির্মৃগ্যতে
স স্থাণুঃ স্থিরভক্তিযোগসুলভো নিঃশ্রেয়সায়াস্তু বঃ ॥১/১[১৮]

---

[১৩] সুকুমার সেন, *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ২৯৯ ।
[১৪] সুকুমার সেন, *ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ২৯৯।
[১৫] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক ,*কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, পৃ. ৩১৯।
[১৬] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক ,*কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, পৃ. ৩১৯।
[১৭] প্রসূন বসু, সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১১তম খণ্ড, পৃ ২৫৯।
[১৮] প্রসূন বসু, সম্পাদক, *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১১তম খণ্ড, পৃ. ১৯১।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের মঙ্গল শ্লোকে কালিদাস প্রত্যক্ষ অষ্টমূর্তিধর শিবের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং অন্তিম ভরতবাক্যেও শিবের কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করেছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে নান্দীতে বলা হয়েছে:

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ ॥ ১/১[১৯]

তিনটি নাটকেরই মঙ্গল শ্লোক দেখে বোঝা যায় যে, কালিদাস শিবভক্ত ছিলেন। নান্দী ছাড়াও এসব নাটকের মধ্যে কিছু কিছু দৃশ্যের মিল পাওয়া যায়। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে রাজা দুষ্মন্ত প্রথম ও তৃতীয় অঙ্কে আড়াল থেকে শকুন্তলা ও তার সখীদের আলাপচারিতা শুনছিলেন। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকে রাজা অগ্নিমিত্র প্রমদবনে ও সমুদ্রগৃহে আড়াল থেকে মালবিকা ও বকুলবলিকার সংলাপ শুনেছেন। আবার অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ তৃতীয় অঙ্কে গৌতমীর উপস্থিতি প্রেমিকযুগলের মিলনে বাধা সৃষ্টি করেছিল, আর মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ ইরাবতীর উপস্থিতি নায়ক-নায়িকার আলিঙ্গনে অন্তরায় হয়েছে। মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ মিলনের প্রতিবন্ধকতা হলেও দুই রানী ধারিণী আর ইরাবতীর সম্মতিক্রমেই নায়ক-নায়িকার মিলন হয়। বিক্রমোর্বশীয়ম্-এ ঔশীনরী কুপিতা হলেও উর্বশীকে শেষ পর্যন্ত বরণ করে নেন ব্রতানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ দুষ্মন্তের মহিষী মঞ্চে আসেননি, তার শুধু দীর্ঘশ্বাসের খবর পাওয়া যায়। বিক্রমোর্বশীয়ম্ আর অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ কবি হেমকুট পর্বতকে মঞ্চ করেছেন, প্রথমটিতে মিলনের দ্বিতীয়টিতে বিরহরে পর মিলনের। দুটি নাটকেই প্রকৃতির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে তবে প্রথমটিতে দ্বিতীয়টির মতো মানুষ আর প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের রমণীয় চিত্র নেই।

পুত্রজন্ম বা পুত্রের উপস্থিতি বা বীরত্বের মাধ্যমে মূল কাহিনীর সংঘাত অতিক্রম ও মঙ্গলময় মিলনের পরিণতি প্রদর্শিত। মালবিকাগ্নিমিত্রম্-এ রাজপুত্রের যুদ্ধবিজয়ের সংবাদ-বিক্রমে আয়ুর উপস্থিতি এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এ ভরতের সঙ্গে দুষ্মন্তের পরিচয়ের মাধ্যমে নাট্যকাহিনীর সমাপ্তি প্রদর্শিত।

নাট্য-পরিণতি

মালবিকাগ্নিমিত্র রাজপরিবারের প্রণয়লীলা অবলম্বনে রচিত নাটক। এখানে আচরণের আপাত শিথিলতা থাকলেও তাতে এমন কিছু সামাজিক অধঃপতন সূচিত হয় না। দ্বিতীয়ত, এ নাটকের পটভূমি বহুকর্মময় রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ, জীবনদর্শনের গভীরতার কোনো ব্যঞ্জনা এখানে কবির আকাঙ্ক্ষিত নয়। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে দাম্পত্য জীবনেরই আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং যে সৌন্দর্য সম্ভোগের পরিণতি মঙ্গলের ইঙ্গিত থাকে না, তাকেই অভিশপ্ত বা ব্যর্থ বলে দেখিয়েছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের পটভূমিতে রয়েছে একদিকে তপোবন, অপরদিকে রাজসভা। কালিদাসের অপরাপর নাটকেও উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে পাওয়া যায় গার্হস্থ্য জীবনের অপূর্ব চিত্র। সমকালীন আদর্শ পারিবারিক কাঠামোর একটা আদর্শ নিদর্শন শকুন্তলার প্রতি কণ্বের উপদেশে প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও সমকালীন সমাজজীবনে অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে কালিদাসের বিভিন্ন কাব্য-নাটকে।

কালিদাস বিরচিত মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—তিনটি নাটকই রোমান্টিক প্রেমমূলক ও মিলনান্তক। নাট্যকাররূপে কালিদাসের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করেও বলা চলে কালিদাস জীবনের জটিল সমস্যার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এবং ভাগ্যবিপর্যয় দুঃখের চিত্র অঙ্কনে বিরত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে, কর্মফল, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মানবজীবনে এক শুভ

---

[১৯] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক ,*কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, পৃ. ১৩৭।

দৈবের প্রভাব কল্পনা করে সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর নাটকে কখনও বিয়োগান্ত বিপর্যয় দেখা দেয়নি, তার কারণ মঞ্চে মৃত্যু, হত্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি দুঃখদায়ী ঘটনার প্রদর্শন সেকালে নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য এই সীমাবদ্ধতাই তাঁকে স্বক্ষেত্রে চরম সার্থকতা এনে দিয়েছে। যার ফলে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর মতো বিশ্ববন্দিত এক নাট্যরচনার স্রষ্টারূপে তিনি কালজয়ী অমরত্বের অধিকারী হতে পেরেছেন। কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, প্রণয় ও সামাজিক আদর্শবোধের সংঘাত, রচনাশৈলীর উৎকর্ষ প্রভৃতি বিচারে নাট্যকারের শিল্পকুশলতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

সন্ধি বিচার

কালিদাসের নাটকে সন্ধি বিচারের প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনটি নাটকেই নাট্য-সন্ধির স্ফূর্তি ঘটেছে। প্রথমে মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের সন্ধি শৈলী সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। সংস্কৃত নাটকে প্রচলিত পাঁচ প্রকার সন্ধির আদলে কালিদাসের নাটকগুলো আলোচনা করা হলো।

ক. মুখ সন্ধিঃ প্রণয়ঘটিত পরিণয় মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাটকের বিষয়বস্তু এবং অগ্নিমিত্র ও মালবিকার স্থায়ী দাম্পত্য-মিলন বা বিবাহ এ নাটকের পরিণতি। চিত্রে মালবিকাকে দেখার পর তাকে বাস্তবে দেখার জন্য অগ্নিমিত্রের ইচ্ছা, এবং এর মধ্যে দিয়ে উপ্ত হয়েছে এই নাটকের বীজ। বকুলাবলিকার কাছ থেকে জানা গেল, পাটরানী ধারিণী চান না যে মালবিকা রাজার দৃষ্টিতে পড়ুক। রাজাকে মালবিকাদর্শনের জন্য গৌতমের যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া তা হলো নাটকের 'প্রারম্ভ' বা সূচনা। নাট্যাচার্যাদ্বয়ের রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের বিচার প্রার্থনা, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য রাজা অগ্নিমিত্র ও মালবিকার দর্শকসম্মুখে উপস্থিতির সম্ভাবনা অগ্নিমিত্রের মতো দর্শকচিত্তেরও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। বীজ ও প্রারম্ভের রসসম্ভাবনাময় প্রথম অঙ্কের অংশটুকু নাটকের 'মুখ' সন্ধি।

খ. প্রতিমুখ সন্ধি : নায়কের নায়িকা দর্শনের মাধ্যম প্রতিযোগিতার ব্যাপারে ধারিণীর অনিচ্ছা প্রকাশে বীজটি হয়ে ওঠে ধ্বংসপ্রায়। গণদাশকে তিনি একান্তে জানিয়ে দিলেন যে, 'বন্ধ হোক এ অর্থহীন প্রচেষ্টা'। ধারিণীর এ উক্তি থেকেই আরম্ভ 'প্রতিমুখ' সন্ধির। এর পরিধি সম্পূর্ণ দ্বিতীয় অঙ্ক। গণদাসকে উত্তেজিত করে গৌতম এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যে ধারিণীর পক্ষে অভিনয় বা নৃত্য-প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্ভব হলো না। দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনাপর্বেই নৃত্য পরিবেশনের জন্য মালবিকা এসে দাঁড়ালে মালবিকার প্রতি অগ্নিমিত্রের আকর্ষণ বেড়ে যায় প্রচণ্ডভাবে। নাট্যবীজ তখন আর অদৃশ্য থাকলো না, সেটা লুপ্তও নয়; দৃষ্ট, বাস্তব এবং সজীব। তখনই বীজের উত্তরণ ঘটল অর্থপ্রকৃতির 'বিন্দু'তে। নায়িকার নৃত্যপরিবেশনসহ তাকে নায়কের সামনে মঞ্চে আনয়নে গৌতমের যে সার্বিক প্রচেষ্টা তা 'প্রযত্ন' নামক অবস্থা।

গ. গর্ভসন্ধিঃ তৃতীয় অঙ্কে সমগ্র নাট্যঘটনায় দেখা দেয় আশা-নিরাশা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সার্বিক পরিবেশ বিপর্যস্ত। প্রেমের অনুকূল বাতাবরণে একান্তে একে অপরকে পাওয়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা সবই হলো হতাশয় পরিণত। এ ভাবে আশা-নিরাশা, মুখ্য ফলোপায়ের পুনঃপুন হ্রাস, বৃদ্ধি ও অন্বেষণ, বীজের কখনো প্রাপ্তি, কখনো অপ্রাপ্তি, আবার অন্বেষণ প্রভৃতি নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় সম্পূর্ণ তৃতীয় অঙ্ক 'গর্ভসন্ধি'। অর্থপ্রকৃতি 'পতাকা', অশোক-দোহদ অনুষ্ঠানে সংঘটিত হয়েছে।

ঘ. বিমর্শ সন্ধিঃ গর্ভসন্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বীজার্থ চতুর্থ অঙ্কের প্রথমেই দেখা যায় প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত। এই অঙ্কের সম্পূর্ণ অংশই 'বিমর্শ' সন্ধি। রাজা ও বিদূষকের কথোকথনে বিদূষকের কাছে মালবিকার দুরবস্থার কথা জানা যায়। গৌতম মালবিকাকে উদ্ধার করে তাঁর সাথে রাজার সম্মিলন ঘটালেন সমুদ্রগৃহে। বীজ যেন এবার বৃদ্ধি পেয়ে বৃক্ষে পরিণত। কিন্তু হঠাৎ সেখানে ইরাবতীর উপস্থিতিতে সব এলমোলো হয়ে গেল। সকল আশারই পরিসমাপ্তি, বীজের ধ্বংস অনিবার্য। বিমর্শ সন্ধির অন্তিমে এভাবে ফলাগমের প্রোজ্জ্বল প্রত্যাশা নিয়ে নিয়ে পরিসমাপ্ত হল চতুর্থ অঙ্ক। গৌতমের সর্পদৃষ্টের অভিনয়ের অংশটুকু 'প্রকরী' নামক অর্থপ্রকৃতি।

ঙ. **নির্বহণ সন্ধিঃ** পঞ্চম অঙ্কের সর্বত্র 'নির্বহণ' সন্ধির ব্যাপ্তি। তারপর অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবে উপঢৌকন হিসেবে প্রেরিত বিদর্ভদেশের দুই শিল্পী কন্যার উপস্থিতি মালবিকার সত্য পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলো যে মালবিকা কেবল বিদর্ভের রাজকন্যাই নন, অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিবাহের জন্য তিনি পূর্বনির্বাচিতা। সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হল অগ্নিমিত্র ও ধারিণীর পুত্র বসুমিত্রের বিজয়বার্তা। তখন পুত্রগরবে গরবিনী সাতিশয় আহ্লাদিত ধারিণী পরম সন্তোষের সঙ্গেই মালবিকাকে অর্পণ করলেন অগ্নিমিত্রের হাতে। নায়ক-নায়িকা পরস্পরের কাঙ্ক্ষিত মিলনে হলেন পরম সুখী ও তৃপ্ত, তেমনি দর্শকও তাদের কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত ফলদর্শনে তুষ্ট হলেন। নাট্যকাহিনীর অর্থপ্রকৃতি 'কার্য' এবং সমস্ত ফলের উদয়ে নায়ক-নায়িকার মিলনে নাট্যের সার্বিক প্রক্রিয়ার যথার্থ পরিসমাপ্তি হয়েছে। তাই এ অংশকে বলা যায় কার্য ও ফলযোগের মিলনে বৃত্তবন্ধের 'নির্বহণ' সন্ধি।

বিক্রমোর্বশীয়তে নাট্যবস্তুর বিবর্তনের পঞ্চসন্ধিই এখানে সুবিন্যস্ত হয়েছে। মুখসন্ধিতে নায়িকাকে নায়কের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং উভয়ের প্রেম সঞ্চার হয়েছে। সাক্ষাতের পূর্বে নায়িকা অপ্সরাদের মুখে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ রত্ন বলে উল্লেখিত হওয়ায় বীজের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। উভয়ের সাক্ষাতের মাধ্যমে সে বীজ উপ্ত হয়েছে। এই অংশ প্রথম অঙ্ক জুড়ে বিস্তারিত, এবং দ্বিতীয় অঙ্কের প্রবেশক পর্যন্ত এর পরিধি। দ্বিতীয় অঙ্ক জুড়ে প্রতিমুখসন্ধি, তৃতীয় অঙ্কের প্রথমাংশ পর্যন্ত তার পরিধি। বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে, যা বিদূষক, চিত্রলেখা এবং চেটীর মুখে আলোচিত কথায়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় শ্লোকে 'প্রযত্ন' দ্যোতিত হয়েছে। সিদ্ধিপথের অন্বেষণ, এবং ইন্দ্রের আহ্বানে উর্বশীর প্রস্থান ইত্যাদি হল 'বিন্দু'। প্রতিমুখ যেখানে শেষ হল সেখান থেকেই গর্ভসন্ধির শুরু, এবং রাজমহিষীর প্রস্থান পর্যন্ত তার ব্যপ্তি। বীজাঙ্কুরের পরিণতি উর্বশীর স্বীকারোক্তিতে প্রকাশিত। 'বিমর্শ' সন্ধির শুরু ঔশীনরীর প্রস্থানের পর উর্বশীর প্রবেশের পর থেকে চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি পর্যন্ত। সম্পূর্ণ পঞ্চমাঙ্ক জুড়ে রয়েছে 'নির্বহণ' সন্ধি। এই অঙ্কে সমস্ত আয়োজন পতি, পত্নী ও পুত্রের মিলনে পরিণতি লাভ করেছে।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার প্রেমকাহিনীই শকুন্তলা নাটকের বিষয়বস্তু হলেও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার স্থায়ী দাম্পত্য মিলনই নাটকের মূল লক্ষ্য এবং এটিই নাটকের ফল বা কার্য। কালিদাস দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মধ্যে দিয়ে মানব-মানবীর চিরন্তন আকর্ষণ ও চিরন্তন প্রেমকে উপজীব্য করে একটি সার্থক প্রণয়-নাট্য নির্মাণ করেছেন। 'শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য' শান্ত এই আশ্রমভূমি, কিন্তু বাহু স্পন্দিত, এখানে এর ফল কোথায়?[২০] নায়ক দুষ্মন্ত কর্তৃক এই উক্তির মাঝ দিয়ে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের 'বীজ' উপ্ত হয়েছে।

'ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র'—'ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই খোলা' এই বলে রাজা স্ত্রীলাভের এক অদম্য কৌতূহল নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তারপর জলসেচনরত শকুন্তলাকে অবলোকন এবং মুনিকন্যাদের সঙ্গে রাজার কথোপকথন থেকে হস্তিবৃত্তান্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথমাঙ্কের ঘটনাবলিতে মুখ্য ফল লাভের আশা কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নায়ক-নায়িকার প্রণয়ের পরিণতির বহু সম্ভাবনাময় 'বীজ' দুষ্মন্তের বাহু স্পন্দনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

নায়ক-নায়িকার অনুরাগ সৃষ্টির হেতু হিসেবে যে নাটকীয় ক্রিয়া তা 'আরম্ভ' নামক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রথমাঙ্কের হস্তিবৃত্তান্ত পর্যন্ত অংশ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্-এর 'মুখসন্ধি'। প্রথমাঙ্কের হস্তিবৃত্তান্ত থেকে সমস্ত দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাবলী 'প্রতিমুখ' সন্ধির অন্তর্গত। প্রতিমুখ সন্ধির অর্থপ্রকৃতি বিন্দু, কার্যাবস্থা প্রযত্ন। হস্তীবৃত্তান্ত থেকে দ্বিতীয়াঙ্কে মাধব্যের মৃগয়া সম্পর্কিত আলোচনায় রাজার উক্তি এবং মাধব্যকে যখন বললেন 'অনবাপ্তঃ চক্ষুফলো২সি' তুমি তোমার চোখের ফল লাভ করনি, তখন বিন্দুরূপী বৃত্তের সূচনা হয় রাজার শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রচেষ্টাকে 'প্রযত্ন'-রূপ কার্যাবস্থা বলা হয়।

---

[২০] সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী, সম্পাদক, *কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলম্*, পৃ. ১৩৭।

এখানে গর্ভসন্ধির অংশ তৃতীয় অঙ্কের প্রথম থেকে পঞ্চম অঙ্কে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার "ঠিক আছে, যদি সত্য সত্যই আপনি আমাকে পরস্ত্রী মনে করে এই ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এই অভিজ্ঞান দেখিয়ে আপনার সন্দেহ দূর করছি।" এই উক্তিতে শেষ হয়েছে।

'বিমর্ষ' সন্ধিতে মুখ্যফলের উপায় গর্ভসন্ধি অপেক্ষা প্রোজ্জ্বল। পঞ্চম অঙ্কের অভিজ্ঞান অঙ্গুরিয়কের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ থেকে ষষ্ঠ অঙ্কের শেষ পর্যন্ত বিমর্ষ সন্ধির বিস্তৃতি। স্মৃতি ফিরে আসার পর পূর্বকথা মনে পড়ায় নায়ক-নায়িকার মিলন অবশ্যম্ভাবী, নায়ক-নায়িকার মিলনের প্রত্যাশিত ফলপ্রাপ্তির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'বিমর্ষ' সন্ধির অবসান। মারীচ-আশ্রমে নায়ক-নায়িকার পুনর্মিলন, পুত্রসহ স্থায়ী দাম্পত্য মিলন। সমস্ত সপ্তম অঙ্ক জুড়েই নির্বহণ সন্ধির আয়োজন।

উপসংহার

আলোচনার উপান্তে বলা যেতে পারে যে, মহাকবি কালিদাস তার সৃষ্ট নাটকে যে বহুমাতৃক শিল্পগুণ জারিত করেছেন, তা যেমন প্রশংসার দাবিদার, তেমনি নাট্যোৎকর্ষের ক্ষেত্রে আদর্শস্বরূপ। তাঁর এই আঙ্গিক বিবর্ধনকৌশল যুগ যুগ ধরে নাট্যপ্রেমী দর্শক শ্রোতার হৃদয়কে নাট্যরসে দ্রবীভূত করে আসছে। নাটকের মধ্যে নাটকীয়তা, শ্লেষ, সংঘাত, নাট্যোৎকণ্ঠা প্রভৃতির সৃজনবিন্যাসে তিনি ছিলেন সমধিক পারদর্শী।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

নজরুল-সংগীতে রাগ-বৈচিত্র্য

কৃষ্ণপদ মণ্ডল*

Abstract: Nazrul's songs are principally dependent on *ragas*. He has used in his songs common and rare *ragas* from North and South Indian Music. Nazrul Islam will remain ever unforgettable in the creation of *ragas* in Indian Classical Music. The paper discusses the ability of the musicians of classical music to understand and appreciate the different forms of classical music such as Dhrupada, Kheyal, Tappa, and Thumri.

ভূমিকা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) রচিত তিন সহস্রাধিক গানের রাগ-অভিব্যক্তি পর্যালোচনা নান্দনিক দিক থেকে আপেক্ষিক হলেও তা বিস্ময়কর।[১] এগুলি বিভিন্ন গীত-শৈলী হিশেবে বাংলা গানে বিশেষভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ঘিরে স্বাধীকারের চেতনায় নজরুল বিদ্রোহী কবি হিশেবে যেভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি ভারতীয় সংগীত ধারার প্রাচীনতম অনুরণন রাগরূপকে তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যেও সস্তা জনপ্রিয়তাকে উপেক্ষা করে সত্যিকারের সংগীত-সাধকের অবস্থান রয়েছে। 'রুবাইয়াৎ-ই ওমর খৈয়াম' গ্রন্থের অনুবাদের ভূমিকায় ১৯৩৩ সালের দিকে তিনি লিখেছিলেন 'কাব্যলোকের গুলিস্তান থেকে সঙ্গীত লোকের রাগিণী-দ্বীপে আমার দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। সঙ্গীত লক্ষ্মী আর কাব্য-লক্ষ্মী দুই বোন বলেই এদের মধ্যে এত রেষারেষি। একজনকে পেয়ে গেলে আরেক জন বাপের বাড়ি চলে যান। দুই জনকে খুশি করে রাখার মতো শক্তি রবীন্দ্রনাথের মতো লোকেরই আছে। আমার সে সম্বলও নেই শক্তিও নেই।'[২] সংগীত লোকের দ্বীপান্তরে রাগসংগীতই যে তাঁর আরাধ্য। আর রাগসংগীতের বন্দিশে (কণ্ঠসংগীতে) কাব্যিক সুষমা এবং সুরবৈচিত্র্য সমান গুরুত্ব বহনতা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চাঙ্গসংগীতের (গীত, বাদ্য ও নৃত্য শৈলীর) সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন এমন গুণী শিল্পীরা যেমন বৈষয়িক জগৎ থেকে নির্লিপ্ত থাকেন কবির অবস্থাও তদ্রূপ। যেকারণে যে-কোনো সংগীতজ্ঞের সাধনা এবং অর্জিত দর্শনও বিস্ময়কর। নজরুলের রাগ-সৃষ্টির বিষয় থেকে তাঁর সাংগীতিক অভিধার গভীরতা সম্পর্কে আমরা অনুমান করতে পারি। তাঁর রাগপ্রধান গানের সংখ্যা নির্ধারণ না করেও আমরা বলতে পারি , প্রত্যেক গানের স্থায়ী এবং প্রথম অন্তরা দিয়েই সংশ্লিষ্ট রাগের অতি উচ্চমানের রাগসংগীত শৈলীর (খেয়াল) বন্দিশ পরিবেশন সম্ভব। তবে, নজরুল তাঁর সকল গানে এককভাবে সুর-সংযোজন করেননি। নজরুলসহ প্রায় অর্ধশতাধিক সুরকারের বিষয়ে জানা যায়। সুরকারদের মধ্যে অধিকাংশ গ্রামোফোন কোম্পানির সাথে জড়িত বা ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ও বিভিন্নভাবে নজরুলের গানে সুর-সংযোজন করেছেন।[৩] এই সকল গানের সুর-সংযোজনে নজরুলের ইচ্ছা-অনিচ্ছার গুরুত্ব বাদ দিলেও সংগীতজ্ঞ-গীতিকার হিশেবে রাগনির্ধারণের বিষয়টি অনেকাংশেই তাঁর ওপর নির্ভর করেছে। কোনো কোনো গানের সুর নির্দেশনার বিষয়ে অন্যান্য সুরকারদের বক্তব্য থেকেও এবিষয়ে সামান্য ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর গানের বিষয়-বৈচিত্র্যের পাশাপাশি রাগের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটেছে, বিশেষ করে

* ড. কৃষ্ণপদ মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়।

রাগসংগীত শৈলীর বন্দিশে সুদক্ষ শিল্পীর কণ্ঠে এর রেকর্ড রয়েছে। রাগসংগীত শৈলীর বন্দিশ রচনাও সহজ কাজ নয়। কেবল স্থায়ী ও একটি অন্তরার সীমিত কয়েকটি লাইনের মধ্যে এধরনের বাণীর পরিপূর্ণতা ও রাগভাবের সাথে সমৃদ্ধ বন্দিশ রচনা কেবল রাগসংগীতে অভিজ্ঞ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। বিশেষ করে রাগের ব্যক্তিত্বকে অনুধাবন না করে বন্দিশ রচনা যথোচিত হতে পারে না। নজরুল রচিত রাগসংগীতের বিভিন্ন শৈলীর বাংলা বন্দিশগুলি বাণী ও সুর উভয় দিক থেকে মৌলিক। তাঁর রাগপ্রধান গানগুলি স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এর কাঠামোতে সৃষ্ট। প্রাচীন ধ্রুপদ শৈলীতেও একই ধরনের গঠন-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু ধ্রুপদ শৈলীর গান এবং নজরুলে রাগপ্রধান আধুনিক গান, পরিবেশনার ঢঙ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। নজরুল তাঁর সমগ্র গানের মধ্যে প্রায় একশত রাগাশ্রিত গানের সুর করেছেন।[৪] রাগাশ্রিত গানের সুর-সংযোজন করতে হলে সংশ্লিষ্ট রাগটি পরিবেশনার মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তিনি কিভাবে অন্যান্য সুরকার ও শিল্পীদের তাঁর গানের সুর-নির্দেশনা দিতেন সে বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে। এছাড়া তিনি কতগুলি রাগ সৃষ্টি করেছেন এবং কতগুলি গানের সুর-সংযোজন করেছেন এবিষয়ে গবেষণাসমৃদ্ধ তথ্য অদ্যাবধি নেই। তাঁর সৃষ্ট রাগের স্বরূপ (চলন) নিয়ে খেয়াল বন্দিশ রচনার প্রয়াশ লক্ষণীয়। রাগ-সৃষ্টির মূল্যায়নে নজরুলের ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যে ব্যতিক্রমি সংযোজন আমাদের রোমাঞ্চিত করে। এই প্রবন্ধে তাঁর রাগসংগীত শৈলীর ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরি বন্দিশ, সৃষ্ট রাগ-বৈশিষ্ট্য; রাগপ্রধান গানের গায়কী ইত্যাদি আলোচ্য।

নজরুল-মানস

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯) নজরুল একজন সক্রিয় কিশোর সৈনিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) সময় যখন তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ঠিক এই সময়েই (৯ জুলাই ১৯৪২) নজরুল দুর্ভাগ্যবশত হঠাৎ অসুস্থতার কারণে তাঁর সংগীত সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পন্ন করতে পারেননি। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের মতো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিভক্তির টানাপোড়েনে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার বিকাশ, বিশেষ করে রাগসংগীত চর্চার পরিবেশ যথেষ্ট বিঘ্নিত ছিল। এই সময়ের প্রাত্যহিক জীবন এবং মানসিক যন্ত্রণা শিল্পীদের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরপর ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভক্তিতে নজরুল পাকিস্তান সরকারের কাছে সমাদৃত হতে পারেননি তাঁর অসংখ্য হিন্দু-সংস্কৃতির গানের কারণে। এমন কি স্বাধীন বাংলাদেশেও অদ্যাবধি এই গান গুলি অঘোষিতভাবে বেতার, টেলিভিশনে উপেক্ষিত হচ্ছে। অসুস্থ অবস্থায় ভারতে থাকলেও সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান তাঁর গান গুলির গবেষণামূলক সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কেবল ব্যক্তি উদ্যোগে বা ছোটখাটো নামমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে তাঁর গানের চর্চা চলেছে। জাতিগত বিভক্তির কারণে এমন একজন অসাম্প্রদায়িক কবি তাঁর সংগীত সৃষ্টির সংরক্ষণেও অবহেলিত হলেন এটা সমগ্র ভারতবাসীর জন্য লজ্জার বিষয়। তাঁর হিন্দু-সংস্কৃতির অসংখ্য গীতি-নকশা, মুসলিম জাগরণের অনেক লেখা সাম্প্রদায়িক কারণে অপাঙ্‌ক্তেয় ও হারিয়ে গেল। তবে কিছু কিছু সংগীতভক্ত/শিল্পীর দ্বারা তাঁর সংগীত বিষয়ক সৃষ্টি আংশিকভাবে হলেও সংরক্ষিত রইলো। আজকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিশেবে তাঁর সম্মাননা পাওয়া রাজনৈতিক উদারতা হলেও এক অর্থে এতে তাঁকে সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ করা হয়েছে এবং তাঁকে অবমূল্যায়নকারীর সংখ্যাও কম নয়। আশার কথা দেরিতে হলেও বাংলাদেশ সরকার 'নজরুল ইন্সটিটিউট' (১৯৮৫) প্রতিষ্ঠা করে তাঁর সৃষ্টিকর্মের গবেষণামূলক সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছে।

৩০-র দশকে নজরুলের গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও সংগীতজ্ঞ গুণীদের দ্বারা তিনি বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছেন। যাঁরা নজরুলের রাগসংগীত শৈলীতে রচিত বন্দিশগুলি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না তাঁরা সাধারণত গজল, কাওয়ালি, ভজন, দেশাত্মবোধক, কোরাস ও মার্চ-সংগীত ইত্যাদি গানের হালকা রাগের বিষয়ে আলোচনা করে সস্তা জনপ্রিয়তার আলোকে তাঁকে মূল্যায়ন করলেন। অন্যদিকে নজরুল প্রতিভার সূক্ষ্ম রাগ-অভিব্যক্তিতে অনেকেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। একথা হয়তো অস্বীকার করা যায় না যে, নজরুল ফরমাশি গান বা হালকা অঙ্গের গানের মাধ্যমেও কিছুটা

জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আর্থিক দৈন্য কাটিয়ে ওঠার জন্য হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ও সৃষ্টিশীলতার হাতিয়ার হিশেবে নিজস্ব সংগীতধারা ব্যাপকভাবে পরিচিতি এনে দিয়েছিল।

নজরুলের নতুন নতুন রাগ সৃষ্টির উন্মাদনা প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে বেতারে যোগদানের সময় থেকে। হারামনি, মেলমিলন ও নবরাগমালিকা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্টিশীলতার অভিনব প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি হারিয়ে যাওয়া রাগের অনুসন্ধানে সংগীত জগতের সাধক হিশেবে সৃষ্টি নৈপুণ্যে ঈর্ষান্বিত সফলতা অর্জন করেন। নজরুলের রাগসংগীত চর্চার ধারাবাহিকতা ওস্তাদ জমির উদ্দিন খানের কাছে কতটুকু হয়েছিল তা সম্পূর্ণ জানা না গেলেও 'সুর ও শ্রুতি'র আবিষ্কারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়। 'সুর ও শ্রুতি'র অধিকাংশ লক্ষণগীত পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে রচিত। ২৭টি গানের মধ্যে ১৭টি লক্ষণগীতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের 'চতুর' ভণিতা পাওয়া যায়। এছাড়া সৈন্ধবী, বারোয়াঁ, মধুমাত, সাবন্ত সারং, নায়কী কানাড়া রাগ গুলির বন্দিশে ভণিতা না থাকলেও বন্দিশগুলি স্বরলিপিসহ ভাতখণ্ডে রচিত 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'য় (৬ষ্ঠ খণ্ড, হিন্দি) রয়েছে।[৫] পণ্ডিত ভাতখণ্ডে 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা'য় স্ব-রচিত বন্দিশ ছাড়াও অনেক বন্দিশের সংগ্রহ স্বরলিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। ধারণা করা যেতে পারে নজরুল এসকল বন্দিশের গায়কীসমৃদ্ধ ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তবে এর মধ্যে বেশ অল্পপ্রচলিত রাগ গুলির গায়কী/স্বরূপ অভিজ্ঞ গুরু বা শিক্ষক ছাড়া শেখা সম্ভব নয়। আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো নজরুল সম্ভবত ভাতখণ্ডে রচিত রাগ-রাগাঙ্গ বিষয়ে আলোচিত গ্রন্থ 'ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্র (১ম-৪র্থ খণ্ড হিন্দি)' সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। সুর ও শ্রুতিতে একই ঠাটের অনেকগুলি রাগের বিষয়ে রাগাঙ্গ রাগের বর্গীকরণের মতো আলোচনা থেকে তা অনুমান করা যায়।

নজরুল বাংলা ভাষায় রাগসংগীত চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অনেক সমালোচক নজরুলের গানে রবীন্দ্রনাথের মতো ভাঙ্গা খেয়াল আবিষ্কারের কল্পনা করেন। রবীন্দ্র নাথের ভাঙ্গা খেয়াল বাণীর মৌলিকত্বের গৌরবে অত্যন্ত চমৎকার। এই বন্দিশগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট রাগের অতি উচ্চমানের ভাব-ভাষা সমৃদ্ধ গান সম্পর্কে রাগসংগীত শিল্পীরা অবহিত আছেন। নজরুল, কবি গুরুর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং বন্দিশ রচনায় স্বীয় মেধা-মননে একটি আধুনিক ও ব্যতিক্রম ধারার সৃষ্টি করেছেন। নজরুলের বন্দিশগুলির মৌলিকত্ব ও ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরি শৈলীর গায়কীর বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে। সৈনিক জীবন শেষে ১৯২০ সালের প্রথম দিকে নজরুল কলকাতায় অবস্থান শুরু করেন। এই সময়ে নজরুল তাঁর বিভিন্ন গানের সুরে যে সকল অপ্রচলিত ও প্রচলিত রাগের প্রয়োগ করেছেন তা প্রাতকালীন সূর্যোদয়ের আভাসের মতো রাগ-সৃষ্টির পূর্বলক্ষণ হিশেবে বিবেচনা করা যায়। এই সময়েই তিনি (১৯২২) 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' গানটিতে 'মালকোঁশ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিণ্ডোল-শ্রী-পঞ্চম-নটনারায়ণ' ইত্যাদি রাগ, 'রাগমালা' শৈলীর আঙ্গিকে ব্যবহার করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এমন অসাধারণ সুর-রূপটি আজ আর সংরক্ষিত নেই।[৬] নজরুল প্রথম জীবনে রবীন্দ্র সংগীতের গায়ক হিশেবেও রাগস্নাত হয়েছিলেন। আর বিভিন্ন রাগের মিশ্রণক্রিয়া পরবর্তীতে তাঁকে রাগ সৃষ্টির মতো বিষয়ে উজ্জীবিত করেছিল। ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাঁর গানের বিভিন্ন রাগের মিশ্রণক্রিয়ার জন্য দিলীপ কুমার রায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার প্রমুখ সংগীতগুণী বিভিন্ন সমাবেশে ও পত্রপত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা করেন। যদিও এসময়ে তাঁর রাগসংগীত শৈলীর বেশ কিছু গানও বিখ্যাত হয়েছিল তবু ধূর্জটিপ্রসাদের মতো সংগীতগুণী নজরুলের বিরূপ ও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।[৭]

নজরুল রাগসংগীতের অধিকাংশ শৈলীতে বাংলা ভাষায় সাবলীলভাবে বন্দিশ রচনা করেছেন এবং শিল্পী, গবেষক ও শ্রোতার কাছে সমাদৃত হয়েছেন। ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, দিপালী তালুকদার, গীতা বসু, শৈল দেবী, কমলা ঝরিয়া, সত্যেন ঘোষাল, দেবেন বিশ্বাস, কমল দাশগুপ্ত প্রমুখ রাগসংগীতের বিশেষজ্ঞ শিল্পীরা বিশুদ্ধ রাগের বন্দিশগুলি গেয়েছেন। বিশেষ করে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর মতো শিল্পী রাগপ্রধান গানের ছোট পরিসরে যে তৃপ্ত হতে পারেননি -একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তিনি রাগপ্রধানগানও খেয়াল শৈলীর গায়কীসমৃদ্ধ করেছেন। যে-কারণে কোনো কোনো

সমালোচক বিশুদ্ধ রাগে নিবদ্ধ খেয়াল বন্দিশকে খেয়াল গান না বলে খেয়াল অঙ্গের গান হিশেবে ব্যখ্যা করার চেষ্টা করেন। অনুরূপভাবে ধ্রুপদ ও ঠুমরি বন্দিশকে রাগসংগীতের শৈলী হিশেবে উল্লেখ না করে সংশ্লিষ্ট অঙ্গের গান বলে থাকেন –যা বিবেচ্য নয়। রাগপ্রধান গান এবং বিশুদ্ধ রাগসংগীত শৈলীর গানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আধুনিক কালেও বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত পুরাতন তিন/সাড়েতিন মিনিটের রাগসংগীত শৈলীর বন্দিশ তিন ঘণ্টা পরিবেশনে যেমন কোনো বাধা নেই, তেমনি নজরুলের বন্দিশগুলি গায়কীসমৃদ্ধ করে দীর্ঘ সময় পরিবেশনে বাধা থাকার কথা নয়। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, নজরুল-সংগীতে বিশেষজ্ঞ শিল্পীরা রাগসংগীতের চর্চা করলেও এবিষয়ে গণ্ডিবদ্ধ রয়েছেন। তাঁরা সম্ভবত বিরূপ সমালোচনার ভয়ে বিশুদ্ধ রাগের বন্দিশগুলি সংশ্লিষ্ট শৈলীর গায়কীসমৃদ্ধ করতে পারছেন না। সমসাময়িক রাগসংগীত শিল্পী যাঁরা নজরুলের বিভিন্ন শৈলীর গান গেয়েছেন তাঁদের গাওয়া রেকর্ড অবলম্বনে নজরুল-সংগীতের গায়কীর বিষয়ে স্বতন্ত্র গবেষণাকর্ম হতে পারে। রাগপ্রধান গানের রাগরূপ বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ গবেষক ও শিল্পীর অভাব লক্ষণীয়। কিছুদিন আগেও অর্থাৎ বাংলাদেশে 'নজরুল ইন্সটিটিউট' স্থাপিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে নজরুলের গানের প্রমিত সুরের অপব্যখ্যা করা হয়েছে। নজরুল-সংগীতের বিশাল ভাণ্ডার থেকে যাঁরা সাবলীলভাবে বিভিন্ন ধরনের গান গেয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই শিল্পীসমাজে প্রতিহিংসাপরায়ণের কারণে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়েছেন। অথচ সব ধরনের শিল্পীর গায়কী নিয়েই নজরুল-সংগীতের স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছে। নজরুল-সংগীতের রাগবৈচিত্র্য কোনো একক শিল্পী বা সুরকারের ওপর নির্ভরশীল নয়। যেসকল সুরকার নজরুলের গানে একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তনে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের কাণ্ডারি ছিলেন নজরুল। রবীন্দ্র এবং নজরুল উভয় ধারারই কোনো কোনো শিল্পীর বিরূপ সমালোচনা সুধি সমাজে রয়েছে, আবার এঁদের ভক্ত ও বাস্তব উত্তরসুরি একেবারে কম নয়। একথা আংশিক সত্য যে, কোনো বিদেশি প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের কোনো প্রতিভাকে মর্যদা প্রদান না করলে আমরা সেই প্রতিভার যৎসামান্যই মূল্যায়ন করে থাকি।

নজরুল তাঁর অনেক গানে প্রচলিত অপ্রচলিত রাগে সুর-সংযোজন করেছেন। অন্যান্য সুরকার বিভিন্নভাবে সহায়তা ও রাগনির্দেশনা পেয়েছেন, এবিষয়ে সুরকাদের স্মৃতিচারণার অনেক উদ্ধৃতিও দেওয়া সম্ভব। ব্যস্ততার কারণে তাঁর গানের সুরে কখনো কখনো অন্যান্য সুরকারদের হয়তো সামান্য সুর পরিবর্তন করতে হয়েছে একথাও আমরা জানি। কিন্তু এর পরেও নজরুলের গান একটি স্বতন্ত্র ধারা হিশেবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছিল প্রথম থেকেই, -এর একটি কারণ তাঁর গানের সুরে রয়েছে রাগ-রঞ্জকতার উদার সমীকরণ এবং বিশিষ্ট গায়কী বা ঢঙ্গ। রাগসংগীত শিল্পীরা এই একটি জায়গায় এসে নিজেদের সকল সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে মিশে যান। অন্যান্য সুরকারদের নজরুল সহযোদ্ধার মতো ভেবেছেন। কখনো কখনো তিনি একই গানের একাধিক সুর করেছেন। অন্যান্য সুরকার বা নিজের সুরের রেকর্ডকৃত সুর অপছন্দ হলেও তা জনসাধারণের কাছে রাগ-ব্যক্তিত্বের কারণে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়নি বা জনপ্রিয়তার কারণে একাধিক সুর প্রচলিত রয়েছে। কেননা সুরের ঝরণায় রাগের মতো সৃষ্টিশীল উপাদান এবং জনপ্রিয়তা সব দুর্বলাতাকে ধুয়ে মুছে একাকার করে দিয়েছে। তবে যেসকল গানে একাধিক সুর-সংযোজন হয়েছে সেগুলির অধিকাংশই (রাগ) হালকা প্রকৃতির।[৮] কোনো কোনো সময় শিল্পীর সুর-বিচ্যুতিকে নজরুল রসিকতা দিয়ে ঢেকেছেন। আধুনিক কালে, নজরুলের রাগভাবনার বিষয়ে কোনো কোনো গবেষকের কাল্পনিক ও উদ্ভট লেখা পড়েও রাগসংগীত বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত হবেন। যদি এই সকল রাগের আলোচনা অন্তত কিছু সংখ্যক নজরুল-সংগীত শিল্পী বুঝতে পারতেন তাহলে তাঁরা প্রাণভরে হাসতে পারতেন। 'নজরুলের রাগভাবনা'য় খাম্বাজ রাগ সম্পর্কে এধরনের উদ্ভট কল্পনা রয়েছে।[৯] তবে নজরুলের গানে বিশেষ করে রাগসংগীত শৈলীর বন্দিশে গায়কীর স্বাধীনতা অর্জন সকল শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়।

নজরুল-সংগীতের জনপ্রিয়তা অর্জনে নজরুল মানসের বিশেষ কিছু লক্ষণ উল্লেখনীয়। যদিও তাঁর সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন বিষয়ে বিচ্ছুরিত হয়েছে। কিন্তু সংগীত সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ছিল। তাঁন নিজের কথায়, ' কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, তাই আমি সহজভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু

সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।' ১৯৩৮ সালে, অর্থাৎ তাঁর রাগ সৃষ্টির মতো মননশীল কর্মে যখন তিনি সাধনালব্ধ, তখন দৈনিক কৃষক পত্রিকার অফিসে জন-সাহিত্য-সংসদের উদ্বোধনের সময় সভাপতির ভাষণে তিনি উপর্যুক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। এরপর আর মাত্র কয়েক বছর তাঁর সৃজনী-শক্তি (৯জুলাই ১৯৪২) বজায় ছিল। সংগীত বিষয়ে নজরুল-মানসের পর্যায় গুলি নিম্নলিখিতভাবে বলা যায়।

প্রথম পর্যায়ঃ

ক. ১৯২০-২৯ সাল পর্যন্ত হালকা বাগ ব্যবহার ও লঘুসংগীত অঙ্গের গান রচনায় জনপ্রিয়তা অর্জন।

খ. গীতিকার, সুরকার, শিল্পী ও সকল সহযোগীদের সমন্বয়ে সৃষ্টিশীলতার নবীন রূপকার হিশেবে নিজের অবস্থান তৈরি।

গ.বিভিন্ন নাটকের গানে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার পরিচয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ

ক. রাগসংগীতের বিভিন্ন শৈলীর বন্দিশ রচনা।

খ. আকাশবাণীর হারামনি, নবরাগমালিকা ও মেলমিলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লুপ্তপ্রায় রাগের অনুষ্ঠান প্রযোজনা।

গ. সৃষ্ট রাগ ও রাগপ্রধান গানের গীতশৈলীর উন্মেষ।

প্রথম পর্যায়ে নজরুল নিজেকে সাময়িকভাবে সংগীত জগতের মননশীল চাহিদার আলোকে ব্যাপৃত রেখেছেন। সংগীত জগতের নবীন সূর্য হিশেবে তিনি দিগন্ত প্রসারী বৈচিত্র্য আলো-ছায়ার মতো ছড়াতে শুরু করেছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শে তাঁর কবি-আত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। কারাগারে বসে স্বদেশপ্রেমের গান রচনা তাঁকে অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছে। তখন রাগসংগীতের সূক্ষ্ম রস-নির্যাসের আগ্রহ থাকলেও প্রকাশের সীমাবদ্ধতা ছিল। ভারতীয় চলচ্চিত্রের গানের সুরে প্রথম দিকে বিভিন্ন রাগের প্রয়োগ হয়েছে। নজরুল নাটক ও চলচ্চিত্রের গানেও যুগোপযোগী বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিষয়টির অবতারণা করেছেন। আর রাগ-সৃষ্টির মতো অভিজ্ঞান কেবল বই থেকে পাওয়া সম্ভব নয় এটি তিনি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যেসকল সুরকার ও শিল্পী তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন সবাই নজরুলের উদারতায় মন্ত্রমুগ্ধ ছিলেন। এছাড়া বেতার ও গ্রামোফোন কোম্পানির সুবাদে একই রাগ বার বার শোনার সুযোগ নজরুলের রাগ-অভিজ্ঞানের বড়ো সঞ্চয় হিশেবে কাজ করেছে এমন অনুমান করা যায়। তাঁর সৃজনশীল দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাগের বন্দিশ রচনা রাগসংগীতের শিল্পীদের গভীরভাবে সম্মোহিত করে। এসময়ে লুপ্তপ্রায় রাগের অনুসন্ধানে এসে তিনি নতুন নতুন রাগসৃষ্টির মতো রসদ পেয়েছেন এবং তা সাফল্যের সাথে বাণী ও সুরবদ্ধ করেছেন।

উচ্চাঙ্গসংগীতের বিভিন্ন শৈলীর বন্দিশ রচনা ও প্রায়োগিক সমস্যা

নজরুল ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি ও টপ্পা ইত্যাদি রাগসংগীত শৈলীর বন্দিশ রচনা করেছেন। অনেকে উচ্চাঙ্গসংগীতের সকল শৈলীকে এক অর্থে 'ধ্রুপদীসংগীত' বলেন যা ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইল হিশেবে গ্রহণযোগ্য। এই সকল শৈলীর বন্দিশগুলিকে রাগসংগীতে অনভিজ্ঞ সংগীত-সমালোচকগণ সংশ্লিষ্ট অঙ্গের গান (যেমন ধ্রুপদ-অঙ্গ, খেয়াল-অঙ্গ, ঠুমরি-অঙ্গ) হিশেবে গণ্ডিবদ্ধ করার চেষ্টা করছেন এবং শৈলীর গুরুত্ব না বুঝে আদি রেকর্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চান। তাঁরা ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরি শৈলীর গায়কী সম্পর্কে যে সচেতন নন একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া, সম্ভবত নজরুলের সংখ্যাধিক্য রাগপ্রধান গানের সাথে এগুলিকে পৃথকভাবে বোঝোতেই তাঁরা এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু উচ্চাঙ্গসংগীতে অঙ্গ বলতে কোনো শৈলীর গানের (বন্দিশের) অভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশও বোঝায় যেমন- তানঅঙ্গ; আর এই তানের অনেক ঢঙ বা প্রকার আছে (সপাট-তান, আকার-তান, কুট-তান, সরগম-তান, বোলতান, গমক-তান ইত্যাদি) আবার আলাপ বা বিস্তারের অনেকগুলি প্রায়োগিক বিষয় রয়েছে । একজন উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পীর কাছে কোনো শৈলীর বন্দিশের গুরুত্ব অপরিসীম, কেননা অধিকাংশ বন্দিশের

সুর ও ভাবের মধ্যে রাগের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন-ভাবে থাকে। এবং উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী মাত্রেই জানেন যে কতো গুরুত্বের সাথে একটি বন্দিশ শিখতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট রাগ আয়ত্তে আনতে গুরুর সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। সুতরাং খেয়াল গানকে ক্ষুদ্রার্থে খেয়াল অঙ্গের বা খেয়ালের মতো বলার কোনো অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। এবং শৈলীর গুরুত্ব সমুন্নত রেখে গায়কীর ঢঙকে বোঝানোর জন্য খেয়াল শৈলীর বন্দিশ/গান অবশ্যই বলা যায়। তেমনি ধ্রুপদ শৈলীর গানকে ধ্রুপদ অঙ্গের না বলে ধ্রুপদ গানই বলা উচিত। আর তৎকালীন তিন মিনিটের রেকর্ডকৃত কোনো রাগের বন্দিশ তিন ঘণ্টা গাইতে কোনো রকম বাধা আছে এমনও নয়। প্রাচীন অনেক হিন্দি বন্দিশের এধরনের তিন/চার মিনিটের রেকর্ড রয়েছে যেগুলি রাগসংগীত শিল্পীগণ দীর্ঘ সময় গেয়ে থাকেন। একজন উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পী নজরুলের একটি ধ্রুপদ গান (বন্দিশ) অথবা খেয়াল গান (বন্দিশ) সংশ্লিষ্ঠ রাগের আলাপসহ দীর্ঘ সময় নিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। যদিও আদি রেকর্ডের তিন/পাঁচ মিনিটের গাওয়া রেকর্ডের হুবহু অনুকরণ করা সম্ভব কিন্তু একজন রাগসংগীত-শিল্পী এতে কখনো তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এখানে এধরনের পরিবেশনার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অর্থাৎ বন্দিশের মূল সুর(রাগ-স্বরূপ/রাগ-ভাব) ঠিক রেখে দীর্ঘ সময় ধরে রাগটি পরিবেশন করা যাবে কিনা এই বিষয়টির স্পষ্ঠ ব্যাখ্যা করা উচিত। কেননা এধরনের পরিবেশনায় প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধের সাথে শৈলীগত বৈশিষ্ট্য এবং দক্ষ শিল্পীর সমন্বয় হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে যা নজরুলসংগীতের গায়কীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

প্রথমত: এধরনের পরিবেশনায় একজন শিল্পী বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন; আবার এর বিপরীত ক্রিয়াও হতে পারে। নজরুল রচিত সীমিত সংখ্যক উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শৈলীর বন্দিশ রয়েছে, এই বিষয়টি প্রচারে আসা উচিত এবং দক্ষ শিল্পীর কণ্ঠে গায়কী-সমৃদ্ধ করে তা রেকর্ড করা যেতে পারে। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পীদের সম্মেলন/সমাবেশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রাগের বন্দিশগুলির গায়কীর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। গায়কীসমৃদ্ধ এসকল বন্দিশের সঠিক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের জন্য নতুন প্রজন্ম রাগসংগীত চর্চায় বিশেষভাবে আগ্রহী হবে এবং নজরুলের রাগসংগীত ধারার গান স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত হওয়ার সুযোগ প্রসারিত হবে।

দ্বিতীয়ত: রাগসংগীতে অভিজ্ঞ শিল্পীগণ বিষয়টি সাদরে গ্রহণ করলেও সাধারণ শ্রোতা বা আধুনিক প্রজন্মের নজরুল-সংগীত শিল্পীগণ বিষয়টিকে স্বরলিপি বহির্ভূত করার জন্য দোষারোপ করবেন কিনা? উচ্চাঙ্গসংগীতের বন্দিশের অতিরিক্ত ক্রিয়াদি স্বরলিপি করে বোঝানো সম্ভব নয়। এবিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণা বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং প্রয়োজনে গবেষণা বিভাগের বিষয়-ভিত্তিক রিসোর্স পারসনের (বিশেষজ্ঞ) পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকা উচিত। বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও নজরুল ইন্সটিটিউটের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে এমন আশা করা যায়। এবিষয়ে আকাশবাণী বা ভারতীয় টিভি চ্যানেলসহ বিদেশে সম্প্রচারিত চ্যানেলগুলিকেও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

তৃতীয়ত: যাঁরা ভাবেন খেয়াল বা ধ্রুপদের বন্দিশ বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত নয়, তাঁদের গোঁড়ামি বা অস্পৃশ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী? ভারতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় রগসংগীত চর্চার বিষয়ে বিশেষ করে উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় রাগসংগীতের বিভিন্ন শৈলীতে অনেক ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে প্রচার করা যেতে পারে। আধুনিক সময়ে অনেক বিশিষ্ট শিল্পী যাঁরা দেশের বাইরে অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা বিভিন্ন ভাষার মানুষের জন্য তাৎক্ষণিক অনুবাদ করেও বন্দিশ পরিবেশন করে থাকেন। ভাষার অনুপ্রবেশ রাগসংগীতের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনা। অষ্টাদশ শতক থেকে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীতের শৈলীগুলিতে ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ নবজাগরণ পর্বের সূচনা করেছে।

চতুর্থত: গায়কীতে সুর ও বাণীর নান্দনিকতা সমুন্নত না রেখে একজন রাগসংগীত-শিল্পী বন্দিশ গুলি পরিবেশন করলে নজরুলসংগীতের সুরবিকৃতি ঘটানোর দোষে তিনি অভিযুক্ত হবেন কিনা? কেননা, কোনো কোনো রাগসংগীত শিল্পীর কণ্ঠে বাণীর অস্পষ্টতা অথবা তালের 'সমে' আসার জন্য বাক্যের আংশিক প্রয়োগ বা কোনো শব্দের (বাণীর) আংশিক প্রয়োগ প্রায়ই শোনা যায় যা ভাব-অর্থের দিক থেকে

বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে। সংগীতের এই নান্দনিক দিক সম্পর্কে অনেক শিল্পীই সচেতন নন। এমন কি অতি সাধারণ গানেও এধরনের অপপ্রয়োগ দেখা যায়। আবার ভুল স্বরলিপির কারণে অথবা সংশ্লিষ্ট রাগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় রাগের স্বরূপ বিঘ্নিত হয়। বন্দিশের নান্দনিকতা শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে স্পষ্ট এবং শ্রুতিমধুর করা বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে বোল-আলপ, বোল-তান এবং তিহাই ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রত্যেক শব্দের অর্থ যে গুরুত্বপূর্ণ সেবিষয়ে সচেতন থাকা উচিত।

পঞ্চমত: শিল্পী সংশ্লিষ্ট রাগে দক্ষ কিনা বা পরিবেশনার মান নির্ণয় না করে অথবা শৈলীগত বৈশিষ্ট্য সমুন্নত আছে কিনা তা বিচার না করেই সমালোচকগণ বলতে পারেন আদি রেকর্ডের অতিরিক্ত বা স্বরলিপি বহির্ভূত এমন ক্রিয়া যথোচিত নয়। এমন পরিস্থিতির মোকাবিলায় যথাযথ যুক্তিগ্রাহ্য সংশোধন ও সমাধান করা উচিত। হাজার হাজার কণ্ঠসংগীত শিল্পীর মধ্যে উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী সীমিত সংখ্যক। উচ্চাঙ্গসংগীত বুঝতে পারা এবং ভালো লাগার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। স্বরলিপির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সম্যক ধারণা থাকা উচিত। উচ্চাঙ্গসংগীতের কোনো কোনো রাগে ব্যবহৃত গমক, স্বরের আন্দোলন, বিভিন্ন রাগে শ্রুতিভিত্তিক স্বর প্রয়াগ সর্বোপরি রাগের ভাব বা ব্যক্তিত্ব স্বরলিপিতে বোঝানো সম্ভব নয়। যে-কারণে নজরুল-সংগীতের বন্দিশের রেকর্ড গুরুত্বপূর্ণ এবং গায়কীর জন্য গুরু/শিক্ষকের কাছে তালিম অত্যাবশ্যক।

নজরুল স্বয়ং বেণুকা (নজরুল-সঙ্গীত স্বরলিপি) খণ্ডের ভূমিকায় বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ, খেয়াল গান সম্পর্কে তাঁর মতামত স্পষ্ট করেছেন। তিনি শুধু বাংলা ভাষার ধ্রুপদ বা খেয়ালের বন্দিশের সার্থক রচয়িতা নন। রাগসংগীতের বিভিন্ন শৈলী এবং অঙ্গের বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় বিশেষ করে কেবল স্বরলিপির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় নজরুলের রাগ-অভিজ্ঞান সীমিতভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, রাগের ব্যক্তিত্বকে ঠিক রাখার জন্য শিল্পীর সাধনা এবং গুরুর কাছে তালিম গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শিল্পীগণ এগিয়ে এলে নজরুল সংগীতের শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন সহজ হবে এবং বন্দিশগুলি অন্যান্য ভাষার মানুষের কাছেও সমাদৃত হবে এমন আশা করা যায়। নিচে নজরুল রচিত কয়েকটি শৈলীর বন্দিশের উদাহরণ দেওয়া হলো।

ধ্রুপদ

রাগের নাম	গানের/বন্দিশের প্রথম পঙক্তি	তাল	শিল্পী	মন্তব্য
শ্রী	হেপ্রবল দর্পহারী	সুর-ফাঁক	ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	নজরুলের সুরে প্রথম বাংলা ধ্রুপদ গান।
রুদ্রভৈরব	এসো শংকর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর	সুর-ফাঁক		নজরুল-সৃষ্ট রাগ ও ধ্রুপদ শৈলীর বন্দিশ
বাগেশ্রী	জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী	চৌতাল		ধ্রুপদ গান
ভৈরবী	প্রভাত বীণা তব বাজে	তেওড়া		ধ্রুপদ গান
মালকোঁশ	গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু	তেওড়া		ধ্রুপদ গান
আনন্দ-ভৈরব	জয়, আনন্দ-ভৈরব ডমরু পিনাক পাণি,	তেওড়া		ধ্রুপদ গান

খেয়াল

রাগের নাম	গানের/বন্দিশের প্রথম পঙক্তি	তাল	শিল্পী	রেকর্ড/মন্তব্য
ললিত	পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে	ত্রিতাল	জ্ঞান গোস্বামী	এন১৭৩১৯ জুলাই ১৯৩৯
দেশী	এসো প্রিয় আরো কাছে	ত্রিতাল	প্রফেসর জ্ঞান গোস্বামী	এন২৭০৬৩ ডিসেম্বর ১৯৪০
বাহার	পিউ পিউ বোলে পাপিয়া	ত্রিতাল	কুমারী দীপালি তালুকদার	এন১৭৪৩৫
আনন্দী	দূর বেণু কুঞ্জে বাজে মুরলী	ত্রিতাল	কুমারী দীপালি তালুকদার	এন১৭৪৩৫ মার্চ ১৯৪০
নটমল্হার	রুম ঝুম বাদল আজি বরষে	ত্রিতাল	মিস্ কমলা (ঝরিয়া)	এন৭০১৫ আগষ্ট ১৯৩২
চন্দ্রকোঁশ	বন পথে কে যায়	ত্রিতাল		অখণ্ড নজরুল গীতিতে প্রাপ্ত
মালকোঁশ	শোন লো বাঁশিতে ডাকে	ত্রিতাল		অখণ্ড নজরুল গীতিতে প্রাপ্ত
জৌনপুরী	মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম	ত্রিতাল	জ্ঞান গোস্বামী	এন১৭৩১৯ জুলাই ১৯৩৯
সুরমল্হার	এ ঘন ঘোর রাতে	ত্রিতাল	জ্ঞান গোস্বামী	এন১৭৪০৬ জানুয়ারি ১৯৪০
দেশ	কেন করুণ সুরে	একতাল	কমলা ঝরিয়া	এইচ.এম.ভি. এন৭০০১ জুন ১৯৩২
নটবেহাগ	রুমঝুম রুমঝুম নুপূর বোলে	ত্রিতাল	কুমারী দীপালি তালুকদার	এইচ.এম.ভি. এন১৭১৯৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

ঠুমরি ও টপ্পা শৈলীর বন্দিশ হিশেবে 'নজরুল সঙ্গীত সমগ্র' (সম্পাদক, রশিদুন্ নবী, প্রকাশক নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০০৬) গ্রন্থের আলোকে উল্লেখনীয়।

রাগের নাম	গানের বাণী	তাল ও শৈলী
খাম্বাজ	ফিরে গেছে সই এসে (নন্দকুমার)	দাদরা (ঠুমরি)
মিশ্র গারা	প্রিয় যাই যাই বলো না	দাদরা (ঠুমরি)
খাম্বাজ	পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম	যৎ (ঠুমরি)
খাম্বাজ-পিলু	ঐ পথ চেয়ে থাকি আর কত বনমালী	কাহারবা (ঠুমরি)
জয়জয়ন্তী	আমার শ্যামা মায়ের	যৎ (টপ্পা) এইচ.এম.ভি. এন৯৯৪৭ অক্টোবর ১৯৩৭

উপর্যুক্ত বিভিন্ন শৈলীর বন্দিশগুলি বিশুদ্ধভাবে গায়কী-সমৃদ্ধ হলে নজরুল-সংগীতের রাগ-অভিব্যক্তি সমুন্নত থাকবে এমন আশা করা যায়। তবে শিল্পীর দুর্বলতাকে কখনো প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাগসংগীতের সকল বন্দিশ সংশ্লিষ্ট শৈলীর ঢংয়ে পরিবেশন না করে কেবল বন্দিশ পরিবেশন করলে উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পীর কাছে যথোচিত বিবেচিত হয় না।

মৌলিক বন্দিশ রচনা

বন্দিশের মৌলিকত্বের বিষয়ে নজরুল অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাঁর প্রতিটি গানে(বন্দিশে) ব্যবহৃত রাগ, রাগের অনুকূলে বাণীর ভাব, বাণীর প্রতিটি শব্দের সুরব্যঞ্জনা বিশেষভাবে স্মরণীয়। যেমন ললিত রাগের 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে' বন্দিশটিকে অনেকেই হিন্দি বন্দিশের (পিউ পিউ রটত পাপিয়রা বোলে) অনুবাদ বা অনুকরণ বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো নজরুল রচিত রাগের অনুকূলে এমন সুন্দর মৌলিক রচনা অন্য কোনো ভাষাতেও সম্ভবত আর নেই বা রচিত হবে না। যাঁরা রাগসংগীত-শিল্পী নন তাঁরা ললিত রাগের দশটি বন্দিশ শুনলে একই রকম সুর বলবেন এবং এটাই স্বাভাবিক। তবে অন্যান্য ভাষার বন্দিশের অর্থ জানলে তুলনামূলকভাবে বাণীর নান্দনিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন। নিচে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠে রেকর্ডকৃত (এইচএমভি রেকর্ড নং এন১৭৩১৯) নজরুল রচিত বন্দিশ এবং হিন্দি বন্দিশ তুলনার জন্য উদ্ধৃত হলো।

পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে
কৃষ্ণচূড়া বনে ফাগুন সমীরণে
ঝুরে ফুল বন পথতলে।
নিশি পোহায়ে যায় কাহার লাগি
নয়নে নাহি ঘুম বসিয়া জাগি
আমারি মত হায় চাহিয়া আশাপথ
নিশীথের চাঁদ পড়ে গগনে ঢলে।[১০]

ললিত রাগে হিন্দি ভাষায় রচিত বন্দিশটি অতি পরিচিত।

পিয়ু পিয়ু রটত পাপিয়া বোলে
ঔর কোয়েলিয়া সকুন দেত মোরে
পিয়ুকে মিলন কে আজ।
ঝিংগর ঝিংগর দাদুর বোলে
মুরবা বোলে বন বনকে
অওয়ন সুনি মনরঙ্গ পীতম কী
মগন ভয়ে সব ধড়কে জিয়রা।[১১]

ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তক মালিকা যে স্বরলিপি রয়েছে এবং নজরুল ইন্সস্টিটিউট প্রকশিত স্বরলিপিতে সুরের পার্থক্যও লক্ষণীয়। আবার ছায়ানট রাগে 'রিনিকি ঝিনিকি' রাগপ্রধান গানের সাথে হিন্দি খেয়াল বন্দিশ 'ঝননঁ ঝনন ঝন' এর তুলনা অনেকেই করেন যা আঙ্গিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নজরুল রচিত গানে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ রয়েছে আর হিন্দি বন্দিশের কেবল স্থায়ী ও অন্তরা রয়েছে। উদ্ধৃত (নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সম্পাদনা– রশিদুন নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ৮৭-৮৮):

রিনিকি ঝিনিকি ঝিনিরিনি রিনি ঝিনিঝিনি বাজে পায়েলা বাজে
নওল কিশোরী ধায় অভিসারে ভবন তেয়াগি' বন-মাঝে ॥
বারণ করে তায়
লতিকা ধরি' পায়
ভাব-বিলাসিনী না মানে গুরুজন-ভয় লাজে ॥
আবেশ বিহ্বল এলোমেলো কুন্তল ছায়া-নটিনী চলে
মধুকর গুঞ্জে মাধবী কুঞ্জে কুসুম দীপালি জ্বলে।
সে রূপ হেরি' হায়
মুরলী থামিয়া যায়
পথ ভোলা শশী কাননে এলো যেন রাধা-সাজে ॥

তবে এই গানের স্থায়ী এবং দুটি অন্তরাই খেয়াল বন্দিশের সুরের অনুকরণ রয়েছে বলা যায়।

হিন্দি বন্দিশের কথা। উদ্ধৃত (রাগবিজ্ঞান, পার্ট-৪ (হিন্দি), পণ্ডিত বিনায়করাও পাটবর্ধন, নিজস্ব প্রকাশনা, পৃ. ৭-৮)।

ঝানন ঝানন ঝননননন ঝননন বাজে বিছুবা বাজে
পিয়াকে মিলনাকো চালি যাতো আপনে মন্দরসোঁ বার ।।
পুজা করনকো নিকসি ঘরসোঁ
হো অকেলি নার চৌকি ইনায়ত বার বার মাই ।।

রাগপ্রধান গান ও নজরুল-সৃষ্ট রাগ

নজরুল-সংগীতের রাগপ্রধান গান উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পীদের জন্য একটি বড় সঞ্চয়। বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের শিল্পীরা উচ্চাঙ্গসংগীতের সাথে ঘনিষ্ট হচ্ছেন এই রাগপ্রধান গানের সুরে। তাঁদের উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী হিশেবে গড়ে ওঠার অন্যতম অনুপ্রেরণা হলো নজরুল-সংগীত। নজরুল তাঁর সৃষ্ট রাগ গুলি রাগপ্রধান গানের আঙ্গিক বা গঠন-বৈশিষ্ট্য নিয়ে সাজিয়েছেন। তাঁর রাগপ্রধান বৈশিষ্ট্যের কোনো কোনো গানের আদি রেকর্ডে রাগের অনুকুলে আলাপচারিতা বা সংক্ষিপ্ত আকারে কয়েকটি তান শোনা যায়। বাণীর নান্দনিক বিবেচনায় আলাপচারিতা সময়ের সীমাবদ্ধতায় অবশ্যই রাগপ্রধান গানের মধ্যে স্বীকার্য। তবে তানের ক্ষেত্রে একটু জটিলতা সৃষ্টি করে, কেননা তান-অঙ্গ খেয়াল শৈলীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত। আর যে-সকল শিল্পী খেয়াল গান করেন, তাঁরা নজরুলের রাগপ্রধান গানের রেকর্ডেও স্বভাবসুলভ বিবেচনায় দু'চারটে তান করেছেন এমন ভাবা অযৌক্তিক হবে না। একারণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের গায়কী সত্ত্বেও রাগপ্রধান গান এবং খেয়াল শৈলীর গান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। নজরুল-সৃষ্ট প্রত্যেক রাগের মধ্যেই স্বীয় বর্ণনা এবং গায়কী অনুযায়ী একাধিক রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাবের বিষয় সুস্পষ্ট। প্রচলিত, অল্প-প্রচলিত এবং অপ্রচলিত রাগ-স্বরূপের অংশবিশেষের সমন্বয়েই রাগগুলি সৃষ্টি হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। যেমন 'অরু' রাগের নাম চর্যাপদেও পাওয়া যায় যা গবেষকগণ 'অরুণ' বলে থাকেন, কিন্তু স্বরূপ অপ্রচলিত। নজরুল-সৃষ্ট 'অরুণভৈরব' রাগের সাথে কি প্রাচীন অরুণ রাগের কোনো সম্পৃক্ততা আছে? 'অরুণ' এবং 'রঞ্জনী' রাগের মিশ্রণে 'অরুণরঞ্জনী' রাগস্বরূপ হয়েছে কিনা–এর কোনো সমর্থনযোগ্য উত্তর আবিস্কৃত হয়নি। কেবল 'রঞ্জনী' (সা রা জ্ঞা ক্ষা ধা র্সা) নামে দক্ষিণ ভারতে একটি রাগ প্রচলিত লয়েছে। অপ্রচলিত অরুণ রাগের সাথে রঞ্জনীর(শিবরঞ্জনী, দেবরঞ্জনী, মধুরঞ্জনী, শ্রীরঞ্জনী ইত্যাদি) কোন প্রকারের স্বরাংশ-বিশেষের মিশ্রণ ঘটেছে তা সবার পক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। আশাবরী এবং ভৈরবী নামকরণ থেকে আশাভৈরবী নজরুল-সৃষ্ট রাগ রয়েছে। আধুনিককালে প্রচলিত 'কোমল ঋষভ আশাবরী' ও 'আশাভৈরবী'র স্বরসমূহে কোনো পার্থক্য নেই। তবে নজরুল-সৃষ্ট রাগটিতে আরোহক্রম কোমল ঋষভ আশাবরী রাগের মতো হলেও অবরোহক্রম উত্তরাঙ্গে গুণকলী রাগের মতো বর্ণিত রয়েছে।

সৃষ্ট রাগের গানগুলির মধ্যে ঘুরে ফিরে কয়েকটি মাত্র শোনা যায় এবং সেগুলি কেবল স্বরলিপি-নির্ভর। সৃষ্ট সকল গানের স্বরলিপি সুলভ হলেও সম্ভবত রাগ-ভীতি এবং গায়কীর বিশুদ্ধতার দিক বিবেচনা করে শিল্পীরা গাওয়া থেকে বিরত থাকেন। যে-কারণে গান গুলির আলাপচারিতাও রাগ-বৈশিষ্ট্যের অনুকুলে অনেকটা দুর্বল বা অনুপস্থিত। সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'নজরুল সৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ' গ্রন্থে সৃষ্ট-রাগ গুলির স্বরূপ নিয়ে খেয়াল বন্দিশ রচনা ও এ গুলির স্বরলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন।[১২] কিন্তু রাগের পরিবেশনার জন্য খেয়াল বন্দিশের স্বরলিপি যে যথেষ্ট নয় তা অনস্বীকার্য। অনেক অপ্রচলিত বা অল্পপ্রচলিত রাগের স্বরূপ নিয়ে বন্দিশের স্বরলিপি পাওয়া যায়। এসকল রাগ ইচ্ছা করলেই গাওয়া সম্ভব হয়না। এছাড়া শামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহ আরো অনেকেই অল্পপ্রচলিত কোনো কোনো রাগকে নজরুল-সৃষ্ট হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিষয়টির গবেষণামূলক তথ্য সংযোজনের প্রয়োজন রয়েছে।

নজরুল বেতারে যোগদানের সময় থেকে হারামনি, মেলমিলন ও নবরাগমালিকা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিশীলতার অভিনব প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নজরুল এসকল অনুষ্ঠানে সহযোগিতার জন্য সুরেশ চক্রবর্তী এবং শিল্পী হিশেবে গীতা বসু ও শৈল দেবীকে সর্বাধিক নিয়েছেন বলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রাগুক্ত বইয়ের ভূমিকায় আমরা জানতে পারছি। অনুষ্ঠান গুলির প্রচার সম্পর্কিত তথ্য থেকেও এমন জানা

যায়। এগুলির রেকর্ড পাওয়া গেলে নজরুল সৃষ্ট রাগের গায়কীসহ একটি পরিপূর্ণ স্বরূপ আমরা পেতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর কোনো অডিও রেকর্ড আমরা উদ্ধার করতে পরিনি। যাঁরা সরাসরি এই সকল অনুষ্ঠনের সাথে শিল্পী হিশেবে কাজ করেছেন তাঁদের কণ্ঠে নতুন করে রেকর্ড করতে পারলেও নজরুল সৃষ্ট রাগের গায়কীসমৃদ্ধ স্বরূপের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পাওয়া যেতো। সম্প্রতি ব্রহ্মমোহন ঠাকুর নজরুল সৃষ্ট রাগের অডিও টেপ গীতা বসুর কণ্ঠে ধারণ করেছেন বলে জানিয়েছেন (বেতারে নজরুল পৃষ্ঠা ৯১–৯৩। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে ব্রহ্মমোহন ঠাকুর পরলোকগমন করায় এ সম্ভাবনাও স্তিমিত?)। কিন্তু এ রেকর্ড যে স্বরলিপির ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে সেই স্বরলিপি গ্রন্থ জগৎ ঘটক মহাশয়ের করা যা নজরুলের অসুস্থ হওয়ার প্রায় তিন দশক পরে প্রকাশিত। তথ্যের দিক থেকে নজরুল সৃষ্ট প্রায় সকল রাগের গানের স্বরলিপি জগৎ ঘটকের নবরাগ ও বেণুকা স্বরলিপি খণ্ডে রয়েছে। এই স্বরলিপি খণ্ড দুটির গুরুত্ব তাই অপরিসীম, যদিও স্বরলিপি থেকে রাগ-স্বরূপ আবিষ্কার অনেকাংশে জটিল যা ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

নজরুল সৃষ্ট রাগ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমাদের স্বরলিপির ওপর নির্ভর করতে হবে। এছাড়া গায়কীসমৃদ্ধ খেয়াল বন্দিশের রেকর্ড যা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেছেন তা যথেষ্ট সহায়ক হবে, একথা সকল রাগসংগীত শিল্পীই স্বীকার করবেন। রাগের ঢঙ গুরুর কাছে না শিখে কেবল মাত্র স্বরলিপি থেকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তার ওপর কোনো সৃষ্ট রাগের ধারণাকে গায়কী সমৃদ্ধ করতে হলে রাগ স্রষ্টার কাছে তালিম গ্রহণ অথবা উক্ত রাগের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। নজরুল, সৃষ্ট রাগের ক্ষেত্রে রাগপ্রধান গানের শৈলীকে বেছে নিয়েছেন যা ভারতীয় উচ্চাংগসংগীতের একটি ব্যতিক্রমি ভাবনা। তাঁর সৃষ্ট রাগের আলোচনার মধ্যদিয়ে আরো অনেক ব্যতক্রমী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো। তবে কোনো নতুন রাগ, রাগসংগীতের শিল্পীদের আরাধ্য না হলে বিশেষভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করতে পারে না। ভারতবর্ষের অনেক গুণী শিল্পীদেরই সৃষ্ট রাগের বিষয়ে জানতে পারা গেলেও সকল রাগ যে প্রচারে নেই একথা সবাই স্বীকার করবেন। শুধু নতুন সৃষ্ট রাগ কেন প্রকৃতপক্ষে যে কেনো অপ্রচলিত বা অল্প-প্রচলিত রাগ, প্রচারের জন্য উপযুক্ত উত্তরসূরী না থাকলে বা গায়কীসমৃদ্ধ রেকর্ড না থাকলে তা কালের গর্ভে বিলীন হতে বাধ্য।

নজরুল সৃষ্ট রাগে হিন্দুস্থানি সংগীতের রাগ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এমন কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে যা একটি নতুন বৈশিষ্ট্য হিশেবে গ্রহণযোগ্য। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি যা বেণুকা রাগের গানের সুরে রয়েছে। যেমন, কোনো রাগে একটি স্বরের দু'টি স্বরূপ (শুদ্ধ ও প্রতিস্বর) কোমল ও তীব্র ব্যবহৃত হলে, সাধারণত আরোহে শুদ্ধ স্বর-স্বরূপ এবং অবরোহে কোমল স্বর-স্বরপ প্রয়োগ হয়। যেমন, বৃন্দাবনী সারং (ন,ণ), যোগ(গ,জ্ঞ), খাম্বাজ(ন,ণ), শুদ্ধসারং(ক্ষ,ম) ইত্যাদি রাগে একই স্বরের আরোহে শুদ্ধ বা তীব্র স্বর-স্বরূপ এবং অবরোহণে কোমল স্বর-স্বরূপ প্রয়োগ হয়েছে। তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও রয়েছে, আর এগুলি রাগ-বাচক প্রয়োগ এমন বিবেচনা কর যায়। যেমন, বাহার, জয়জয়বন্তী ও শাহানা রাগের উভয় নিষাদের (ন,ণ) ব্যবহার। এছাড়া যৌগিক রাগের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম নিয়মটি প্রযোজ্য, –যেমন বসন্ত-বাহার। কিন্তু নজরুল-সৃষ্ট বেণুকা রাগে সব সময় আরোহে কোমল নিষাদ (ণ) এবং অবরোহে শুদ্ধ নিষাদ (ন) ব্যবহৃত হয়েছে যা প্রচলিত রাগ-বৈশিষ্ট্যের একটি মৌলিক সৃষ্টি-নৈপুণ্য বলা যায়।[১৩]

নজরুল-সৃষ্ট কোনো কোনো রাগের চলনে প্রচলিত রাগের ছোট ছোট অংশ কিভাবে আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়ে গাওয়া যাবে তা বর্ণনা করা আছে। অর্থাৎ ২/১টি ছাড়া প্রায় প্রত্যেক গানেই মিশ্রিত রাগগুলির বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাগ গুলি জানা থাকলে সৃষ্ট রাগটির পরিবেশনার মান সমুন্নত রাখা মোটেই কঠিন নয়। যেমন রুদ্র ভৈরব রাগটি পরিবেশনে ভৈরব রাগাঙ্গ এবং কৌশ রাগাঙ্গের ধারণা থাকা আবশ্যক। কোনো কোনো সৃষ্ট-রাগকে অল্প-প্রচলিত রাগের স্বরূপ বলে মনে হয়, যেমন নির্ঝরিণী রাগের 'রুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ কে বাজায়' গানটি বঙ্গাল ভৈরবের স্বর-স্বরূপ বলে মনে হয়। কিন্তু উত্তরাঙ্গের অবরোহক্রম অনেকটা বাঙ্গাল ভৈরবের মতো নয়। আবার 'শ্রী' অঙ্গের অল্প-প্রচলিত ব্যতিক্রমি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেশগৌড় রাগে 'দেশ গৌড় বিজয়ে দেবরাজ' গানটি গাওয়া যে সহজ নয় একথা রাগসংগীত শিল্পী মত্রেই স্বীকার করবেন। কেননা এই রাগের পূর্বাঙ্গে পর পর দুটি স্বর গা ও মা বর্জিত,

এছাড়া ঋা - পা এবং পা-ঋা স্বর-সংগতির আরোহ এবং অবরোহক্রম গাওয়া তেমন সহজ নয়। নজরুল আরো অনেক অল্প-প্রচলিত রাগ নবরাগ মালিকা ও বেণুকা খণ্ডে স্বরলিপিবদ্ধ করেছেন; যেমন- ধানেশ্রী, সরপরদা, বড়হংসসারং, শিবমতভৈরব, বঙ্গাল, সামন্তসারং, দরবারিটোড়ী, গৌরী(দু'টি প্রকার), খটটোড়ী, নীলাম্বরী, দেবগান্ধার, রক্তহংস-সারং, নাগসরাবলী ইত্যাদি। প্রচলিত 'রূপমঞ্জরী' রাগেকে নজরুল সৃষ্ট বলে কোনো কোনো গবেষক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভাতখণ্ডের ক্রমিক পুস্তক মালিকায় (৬ষ্ঠ খণ্ড) 'রূপমঞ্জরী মল্হার' রাগের বন্দিশের স্বরলিপি ও স্বরূপ আলোচিত রয়েছে। ভাতখণ্ডের এই বইটি মারাঠী ভাষায় ১৯০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উল্লেখ্য মল্হার রাগাঙ্গের অংশটুকু বাদ দিলে রূপমঞ্জরী রাগের স্বরূপ আবিষ্কার কোনো জটিল বিষয় নয়। হতে পারে নজরুল-সৃষ্ট রূপমঞ্জরী রাগের স্বরূপ ভিন্ন। কেননা একই নামে এ ধরনের একাধিক অনেক রাগ-স্বরূপ প্রচলিত রয়েছে। যেমন, চন্দ্রকোঁশ, বিভাস, গুণকলী, পটমঞ্জরী, দুর্গা ইত্যাদি -রাগের একাধিক স্বরূপ প্রচলিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নজরুল-সংগীতের রাগপ্রধান গানে প্রচলিত রাগের ঢঙ্গ বিশুদ্ধভাবে অথবা রাগ গুলির মিশ্রণ-ক্রিয়া আমাদের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত শৈলীর রস-ভাব ব্যক্ত করে, যে-কারণে নজরুল মানসের রাগ-অভিব্যক্তি আশ্চর্যজনকভাবে অসীম।

উপসংহার

ভারতীয় সংগীতের একটি বিশাল নান্দনিক জগতের ভাণ্ডার হলো রাগ। নজরুল, উত্তর-ভারতীয় এবং দক্ষিণ-ভারতীয় উভয় ধারা থেকে এর বৈচিত্র্য-রসদ গ্রহণ করেছেন। প্রচলিত, অল্প-প্রচলিত, অপ্রচলিত শতাধিক রাগ ও স্বীয় রাগ সৃষ্টির উন্মাদনায় নিজেকে উজার করে দিয়েছেন তাঁর রচনায়। সহযোগী সুরকারদের সমন্বয় করেছেন স্বীয় প্রতিভা বলে। সহস্রাধিক রাগ প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু একজন শিল্পীর সাধনা ও উৎকর্ষ অর্জিত হয় রাগের পরিবেশনার ওপর নির্ভর করে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করতে পারলে রাগ সৃষ্টির মতো বিশাল জগতের সন্ধান বা আবিষ্কারে কেউ মনোনিবেশ করতে পারেন না। নজরুল-সংগীতে সুর ও বাণীর অসাধারণ যুগোত্তীর্ণ সমন্বয় ঘটেছে রাগের ভাব ও রসের গতিশীল অনুভূতিতে। বিষয়-বৈচিত্র্য ও সুর-অঙ্গিকে নজরুল-সংগীত বিচিত্রভাবে রাগানুসন্ধানে রূপায়িত। রাগসংগীতের হিন্দি বন্দিশের কাব্যিক দুর্বলতা বা দৈন্যকে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় তুলে ধরেছিলেন যা নান্দনিক দিক থেকে অতুলনীয়। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর রচিত রাগসংগীতের বন্দিশগুলির বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে এর পরিবেশনা বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে ধারণ করেছেন, যা হিন্দুস্থানি সংগীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

তথ্যসূত্র

১. রশিদুন নবী, সম্পাদকীয়. *নজরুল সঙ্গীত সমগ্র*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। এই সংস্করণের সূচিপত্রে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ৩১৬৩টি গানের প্রথম পঙ্‌ক্তির উল্লেখ আছে, এর মধ্যে ৩০৭৯টি গানের বাণী দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৪টি গান উদ্ধার বা সংগ্রহ না হওয়ায় সেগুলির বাণী দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে এত অধিক সংখ্যক নজরুল সঙ্গীতের বাণী সংবলিত সংকলন ইতঃপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি। পৃ. ১০।

২. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুলের রাগভাবনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০০০। পৃ. ৩৩-৩৪।

৩. প্রদীপ কুমার নন্দী, '*নজরুলের গান: সুরকার প্রসঙ্গ*' বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগে ড. কৃষ্ণপদ মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য অধ্যয়নরত। তাঁর গবেষণায় ৫৬ জন সুরকারের নাম পাওয়া যায়। সেমিনারে আলোচিত এর মধ্যে 'মুসলিম বন্ধুদ্বয়' সুরকারের নাম ওস্তাদ জমির উদ্দিন ও তসের আলী বলে জনিয়েছেন আলোচক আব্দুল মালেক খান (অবসর প্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার এবং খণ্ডকালীন শিক্ষক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, রা. বি.)। সেই হিশেবে ৫৭ জন সুরকারের নাম পাওয়া যায়।

৪. ড. পদ্মিনী দে, সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, রা.বি নজরুল সুরারোপিত ৭৪টি রাগাশ্রিত গানের বিষয়ে গবেষণা করেছেন।

৫.পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা ৬ষ্ঠ খণ্ড* হিন্দি সংগীত কর্যালয়, হাথরস প্রকাশিত, পৃ.১১৬, ১৩৪, ১৬৪, ১৮৬, ২৪৪।

৬. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুলের রাগভাবনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ১১।

৭. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুলের রাগভাবনা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ. ২৮।

৮. প্রদীপ ুমার নন্দী, পিএইচ.ডি. গবেষক, নাট্যকলা ও সংগীত বিভাগ, রা. বি.'নজরুলের গান: সুরকার প্রসঙ্গ' গবেষণায় একই গানের একাধিক সুর অধ্যায়ে ৩৪টি গানের একাধিক সুর আবিষ্কার করেছেন।

৯. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *'নজরুলের রাগভবনা'* বইয়ের ১৩ তম পৃষ্ঠায় খাম্বাজ রাগের বিষয়ে নজরুলের একটি আদি ভাবনা ব্যক্ত করেছেন যা নজরুলের রাগভাবনার মধ্যেই শুধু নয় হিন্দুস্থানি সংগীতেও অত্যন্ত ব্যতিক্রমী মানতেই হয়। বইয়ের অনুলিখন- "আমার কোন কুলে আজ" গানের মূল সুরটি রয়েছে 'নজরুল স্বরলিপি' গ্রন্থে। পরবর্তীকালে ধীরেন দাসের রেকর্ডে সুরটি কিছুটা পবির্তিত হয়েছে। বর্তমানে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া সুরটিই প্রচলিত। যাই হোক, মূল সুরে (স্বরলিপি অনুযায়ী) দেখতে পাচ্ছি যে স্থায়ী ও অন্তরাতে খাম্বাজ রয়েছে প্রচলিত ছক অনুযায়ী। কিন্তু কড়ি মধ্যমের ব্যতিক্রমী প্রয়োগও রয়েছে (কাণ্ডারী করি = রগ-ম-প-ক্ষ-প)। সর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রম ঘটেছে এই যে, সমগ্র গানটিতে কোথাও কোমল নিখাদ প্রযুক্ত হয়নি -যা খাম্বাজের একটি প্রধান স্বর। এখানে নজরুল পুরাতনপন্থী। আদিতে খাম্বাজে কোমল নিখাদ ব্যবহৃত হত না। সঞ্চারী অংশে পিলুর আবির্ভাব প্রবলভাবে লক্ষণীয়। আবার আভোগে খাম্বাজ ফিরে এসেছে। গানের শেষ অংশে 'অলকা' শব্দের সুরে গায়কীর প্রয়োগে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার বৈচিত্র্য-সঞ্চারী। ষষ্ঠ গান "ছাড়িতে পরাণ নাহি চায়" সুরমুকুর গ্রন্থে রয়েছে। এখানে সুর নিদের্শ 'জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ' থাকলেও সুরটি পুরোপুরি 'খাম্বাজ' অনুসারী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রতিভা বসু কবির প্রশিক্ষণে গানটি রেকর্ড করেছিলেন। রেকর্ডেও সুর খাম্বাজ অনুসারী ও বুলেটিনেও খাম্বাজ নির্দেশিত হয়েছে। অনেক নজরুলগীতির সুর-নির্দেশ বিভ্রান্তিজনক। যাই হোক, এ গানটিতে অবশ্য কোমল নিখাদ সামান্য ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ এখানেও খাম্বাজ রাগে তিনি পুরাতনপন্থী। উপর্যুক্ত অংশে বইয়ের কোনো তথ্যসূত্র নেই। আর যেসকল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তাহলো-

ক) খাম্বাজ রাগের প্রাচীনত্ব বিষয়ে নজরুলের অভিমত কি?

খ) অপ্রকাশিত নজরুল (আব্দুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত) গ্রন্থে খাম্বাজ রাগ সম্পর্কে নজরুলের ভাবনা নিশ্চয়ই গতানুগতিক অর্থাৎ প্রচলিত উভয় নিষাদযুক্ত। যদি এর অতিরিক্ত কোন তথ্য এই রাগের বিষয়ে থাকে তাহলে সেই তথ্যটি কোথায়?।

গ) কেবল মাত্র শুদ্ধ নি সহযোগে খাম্বাজ রাগের কি কোনো রেকর্ড বা গ্রন্থগত এধরনের তথ্য আছে? রেকর্ড থাকলে এর শিল্পী কে এবং তিনি কোন ঘরানার? ..ইত্যাদি।

১০. সালাউদ্দিন আহমেদ, *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি ১৮শ খণ্ড*, প্রকাশক নজরুল ইন্সষ্টিটিউট, ঢাকা)

১১. পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *ক্রমিক পুস্তক মালিকা ৪র্থ খণ্ড*, হাথরস প্রকাশনী, বেনারস, ইউ.পি. ভারত পৃ.৩৯৯-৪০০)।

১২. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *'নজরুলসৃষ্ট রাগ ও বন্দিশ'* প্রকাশক: কৃষ্ণা মজুমদার, ২০০০।

১৩. কৃষ্ণপদ মণ্ডল, *'নজরুল-সংগীত স্বরলিপিতে রাগ-দর্শন'* , ২য় সংস্করণ, নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০০৯, পৃ. ৯৩।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

লোকক্রীড়ায় বুড়ি-চরিত্র : সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মোবার্‌রা সিদ্দিকা*

Abstract: The types and patterns of children's games are changing in course of time. But critical examination and scrutiny shows that these games have been carrying traces of the past with them. Here we want to discuss particularly those children's games where old women have been portrayed. The purpose of this essay is to determine the position of old women in the ancient society through unveiling the social attitude related to them by analyzing the folk games consisting of dramatic materials like story, plot, character and conflict. Scopes of research are being sought for on some folk games which are still played.

বর্তমান সময়ে ফোকলোর অঙ্গনে শিশুতোষ ফোকলোর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হচ্ছে। শিশুতোষ ফোকলোরের অন্যতম রূপ শিশুর খেলা। লৌকিক ঐতিহ্যে গড়ে ওঠা শিশুদের খেলার স্রষ্টা স্বয়ং শিশু না বয়স্কজন তার বিতর্ক চলতে পারে। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে, এসব খেলায় মানব ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড চিত্র লুকিয়ে আছে। দীর্ঘ কালপরিক্রমায় শিশুদের খেলার রূপ ও কাঠামো পাল্টে যাচ্ছে বটে, কিন্তু যেসব খেলা কালের হাত ধরে বেঁচে রয়েছে, সেগুলোর নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় দেখা গেছে, মানবের অতীত জীবনের নানা ঘটনা এর অঙ্গে ধারণ করে চলেছে। আমাদের আলোচনা শিশুদের সেইসব খেলা নিয়ে যেগুলোতে বৃদ্ধা নারী তথা বুড়ির চরিত্রায়ন ঘটেছে। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও দ্বন্দ্বে অর্থাৎ নাটকীয় উপাদান সমৃদ্ধ লোকক্রীড়া বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুড়ি সম্পর্কিত সমাজ মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি বুড়ির প্রাচীন অবস্থান সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্তমানে ক্রিয়াশীল এমন কিছু লোকক্রীড়া নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রানুসন্ধান চলেছে।

সাধারণত লোকক্রীড়া বলতে লোকসমাজে প্রচলিত ও আঞ্চলিক খেলাকেই বোঝায়। লোকক্রীড়া ঐতিহ্যাশ্রয়ী, এতে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের বালাই নেই। বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পরিশীলিত খেলা বাংলার লোকসমাজে প্রবেশ করেছে। ঐতিহ্যানুগ বাংলার লোকক্রীড়া বলতে গেলে বিলীয়মান প্রায়। শহর থেকে শুরু করে গ্রামগঞ্জের শিশু-কিশোর-যুবক এখন আধুনিকতার প্রভাবে ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ক্যারম ইত্যাদি বিদেশী খেলায় অভ্যস্ত। পূর্বে গ্রাম-বাংলার খেলা মানে হাডু-ডু, গোল্লাছুট, ডাংগুলি বা ছি বুড়ি ইত্যাদি নানা লৌকিক ক্রীড়াকে বোঝাত। এসব খেলায় এদেশের ক্রীড়ামোদিরা আনন্দ খুঁজে পেত। বর্তমানে আধুনিক জীবনযাত্রায় এসব খেলার প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে এখন লোকক্রীড়া বলতে যেটুকু টিকে আছে তা শিশুদের মাঝে, সহজ আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততায় শিশুদের খেলায় তার অস্তিত্বকে প্রকাশ করছে। আমাদের আলোচ্য শিশুখেলা মানে গ্রামীণ সংহত সমাজে

* ড. মোবার্‌রা সিদ্দিকা, সহযোগী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সৃষ্ট শিশুর লৌকিকক্রীড়া; ঐতিহ্য ও আঞ্চলিকতার হাত ধরাধরি করে যেসব খেলা সমকালীন শিশু-কিশোরের আনন্দ-উপভোগের কেন্দ্র।

শিশুদের লোকক্রীড়াকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়, যেমন, ছড়ানির্ভর খেলা, উপকরণনির্ভর খেলা ও নাট্যধর্মী খেলা। আমাদের আলোচ্য বিষয় নাট্যধর্মী লোকক্রীড়া। চরিত্র, সংলাপ ও দ্বন্দ্বমূলক ঘটনায় এজাতীয় খেলাসমূহ নাটকীয় গুণসমৃদ্ধ। সংঘাতপূর্ণ মানবজীবন নাটকের অন্যতম অঙ্গ। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে জীবনযুদ্ধে সে লিপ্ত হয়েছে। কখনো প্রকৃতি, কখনো বন্যপ্রাণীকুল বা কখনো ভিন্নগোষ্ঠী বা স্বজাতির সঙ্গে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জগৎ-জীবনের দ্বান্দ্বিক ঘটনার মধ্যে তাকে আবর্তিত হতে হয়। এই আবর্তনের প্রক্রিয়া সেই যে শুরু হয়েছিল আজ পর্যন্ত তা বিদ্যমান। মানবশিশু প্রাকৃতজনের ক্ষুদ্রসংস্করণ। জীবনযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বের প্রস্তুতি রয়েছে তার খেলার মধ্যে। খেলা মানেই দ্বন্দ্ব,হার-জিত। জয়-পরাজয়ে একপক্ষের আনন্দ আরেক পক্ষের বিষাদ। আনন্দ-বিষাদের প্রতিযোগিতার শিষ্ট নাম খেলা। শিশুর আনন্দ-বিনোদন ঘটে খেলায়, সমবয়সী শিশু-কিশোরের দল একত্রিত হলে নানা বিচিত্র খেলায় মেতে ওঠে। সাধারণদৃষ্টে, এসব খেলা অকারণ,অমূলক, কোলাহল সৃষ্টি মনে হতে পারে। কিন্তু সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিশুর খেলায় শুধু দৈহিক কসরত ও মানসিক বৃদ্ধি নয়, এর মধ্যে রয়েছে সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিচিত্র ইঙ্গিত, রয়েছে 'অতীত ইতিহাসের অজস্রস্মৃতি'।[১]

মানবের অরণ্যাচারী জীবন, মানব সভ্যতার নানা সংঘাতমুখর ঘটনা বা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিকূলতা বা সবল-দুর্বলের পারস্পরিক লড়াই, এককথায়, জীবনের দ্বান্দ্বিকতা নাট্যধর্মী লোকক্রীড়ার প্রাণ। অন্যপক্ষে, নাটকও তাই, মানবজীবনের নিস্তরঙ্গ ঘটনা নয়, দ্বন্দ্বমুখর জীবন নাটকে রূপায়িত হয়। চরিত্র, সংলাপ, অভিনয়ে মানবজীবনসম্পৃক্ত সংকটকে নাটকে উপস্থাপিত করা হয়। কোন কোন লোকক্রীড়া নাটকীয় উপাদানে ভরপুর। শিশু-কিশোরের দল এজাতীয় খেলায় ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করে। নাটকের মত প্লট, চরিত্র, সংলাপ ও অভিনয়ে এসব খেলা সৃজিত। কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই খেলোয়াড়রা নানা ভূমিকায় অবতীণ হয়। শিশুরা অনুকরণপ্রিয়, তারা সব কিছুকে তাদের মত করেই অনুকরণ করে থাকে। আবার অনুকরণ করার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই নাটকের উৎপত্তি।[২] যেমন, বুড়িখেলায় বুড়ি চরিত্রে রূপদানকারী খেলোয়াড়ের শারীরিক ভঙ্গিমাই যথেষ্ট, এতে পোষাক বা চুলের কোনরূপ পরিবর্তন বা প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই । পিঠ কুজো করে হাতে লাঠি নেয়ার ভঙ্গিমায় বুড়ি তার কার্যকলাপ শুরু করে। খেলায় অন্যান্য খেলোয়াড়রা তাকে বুড়ির প্রতীকে গ্রহণ করে।

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে শিশুর সঙ্গে বুড়ির সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। শিশু মায়ের কোলে প্রথম যে বুড়ির সঙ্গে পরিচিত হয় সে হল চাঁদের বুড়ি। এরপর দুরন্ত শিশুকে থামানো বা ভয় দেখানোতে যার আগমন ঘটে সেও বুড়িঃ তবে জুজু বুড়ি বা ছেলেধরা বুড়ি বা ডাইনি বুড়ি। শিশুকে ষষ্ঠীবুড়ির কোপ থেকে রক্ষার জন্যে শিশু জন্মের কয়েকদিনের মধ্যে ষষ্ঠীর আচার পালন করার রীতি বাংলার লোকসমাজে এখনো দেখা যায়। বসন্ত রোগের দেবী সেও বুড়ি, শীতলাবুড়ি। কোন কোন অঞ্চলে ছোট্ট মেয়েশিশুটিকে আদর করে বুড়ি বলে সম্বোধন করা হয়। বুড়ি কথাটা বৃদ্ধা অর্থে ব্যবহৃত হয়। বুড়া+ঈ; সংস্কৃত বৃদ্ধা>প্রাকৃত বুড্ঢী>বাংলায় বুঢ়ী,-ড়ী,-ড়ি,অর্থ–বৃদ্ধা, প্রাচীনা।[৩] বাংলা লোকসংস্কৃতিতে বুড়ি নঞর্থক রূপে চিত্রিত। বুড়িকে নিয়ে প্রবাদ প্রচলিত,"পেট নষ্ট মুড়ি, ঘর নষ্ট বুড়ি"। প্রবাদে বুড়িকে সুখ-শান্তির ঘরে অশান্তি তৈরির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে দেখানো হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বুড়ির অবস্থান একটা বোঝা বা দায় হিসেবে বিবেচিত। একদিন যিনি পরিবারের কর্ত্রী ছিলেন, বয়সের ভারে নাতি-নাতনির সংসারে তিনিই অসহায় কৃপা প্রার্থী হয়ে পড়ে। আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি সদর্থক নয়, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান প্রান্তিক। জেন্ডারের বিবেচনায়ও বুড়ির অবস্থা প্রান্তিকেরও প্রান্তে। একজন বৃদ্ধপুরুষ যেখানে 'সমাজের মাথা' বা 'বটগাছ' আখ্যায়িত হয়, সেখানে বৃদ্ধানারী 'কুটনীবুড়ী' বা ঘরনষ্টকারী বৈ আর কিছু নয়।

বাংলার লোকসমাজে পিতৃতান্ত্রিকজালে বুড়ির প্রতি একপ্রকার বিরোধপূর্ণ মনোভাব তৈরীর প্রচেষ্টা রয়েছে। তাই আমাদের গল্প-কথা-গান-ছড়া-প্রবাদ-খেলায় বুড়ি রসিকতার পাত্রী, কুটনিগিরি তার অন্যতম

কাজ, শিশুরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করে, তার সামাজিক সম্মান তো নেই, তার মৃত্যুতে বেদনা প্রকাশেরও কোন সমব্যথী নেই। এই মানসিকতার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের 'উকুনেবুড়ি', 'পান্তাবুড়ি'নামীয় লোকগল্পে।[৪] লোকগল্প যেমন সমাজ মানসিকতার পরিচয়ধারী, তেমনি সমাজের উপর প্রভাবক হিসেবেও কাজ করে। ঐতিহ্যিক মানসের পরিচয় অনুসন্ধানে এখানে গল্পদুটোর উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়েছে। 'পান্তাবুড়ি'তে বুড়ি এতই অসহায় যে শেষ বয়সে তার কপালে পান্তা ছাড়া আর কিছুই জোটে না। তার নামই হয়ে গেল পান্তাবুড়ি। সেই পান্তাও যখন চোরে চুরি করে, তখন বুড়ি রাজার কাছে বিচার প্রার্থনা করে। রাজা তার অভিযোগ আমলেই নিল না, হেসেই উড়িয়ে দিল। গল্পের এপর্যায়ে বুড়ির প্রতি আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটা লক্ষ্যযোগ্য। রূপকথা বলেই কথা, মানুষ তো এল না, প্রকৃতিই তার দুঃখে সাহায্যের হাত প্রসারিত করল। মাঠের গরু, জড় ক্ষুর, পথের বেল গাছ, ডোবার শিংমাছ অর্থাৎ মনুষ্যেতর সমাজ তার সহায়তায় এগিয়ে আসে। 'উকুনেবুড়ি'তে স্বামী পরিত্যক্তা বুড়ির আশ্রয় জোটে বকের বাড়িতে। সেখানে রান্ধতে গিয়ে আগুনে পুড়ে মরে বুড়ি। বুড়ির মৃত্যু দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক ঘটনা। রূপকথার আঙ্গিকে বুড়ির মৃত্যুকে শোকায়ত করতে গিয়ে রাজা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তার মৃত্যুশোকে স্তম্ভিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে রূপকথার বুননে জাদুময়ী রূপ দিয়ে প্রকৃতিপুঞ্জের অস্বাভাবিক আচরণে র্নিমাণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবের বুড়ি সকলের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। এছাড়া অন্যান্য অনেক লোকগল্পে বুড়ি ব্যাঙ্গাত্মক চরিত্র। গল্পগুলোর ভেতর দিয়ে শিশুমনে বুড়ির যে কাঠামো তৈরি হয়, তা' শিশুর মধ্যে বুড়ির প্রতি ব্যাঙ্গাত্মক ও কৌতুককর মনোভাব সৃষ্টি করে এবং খেলার মধ্যে এ মানসিকতা বাড়তি প্রণোদনা তৈরি করে। তাই গৃহ ও সমাজে নানা প্রকৃতি ও সম্পর্কের মানুষ থাকা সত্বেও বুড়ি হয়েছে খেলার অন্যতম অনুষঙ্গ,তার অনুকরণে ও রূপায়ণে শিশুদের আনন্দ।

লোকক্রীড়ায় বুড়ি একটি অন্যতম চরিত্র। বুড়িকেন্দ্রিক নানা খেলা বাংলায় প্রচলিত। ছি-বুড়ি, বুড়ি কপাটি, বুড়িয়া চু, ছোট বুড়িচ্ছি, বুড়ির পুকুর, কাঠালচুরি, বুড়িখেলা, বুড়ির ঘর পোড়ানো ইত্যাদি নামের লোকখেলা বাংলার শিশু-কিশোরেরা খেলে থাকে। বুড়ি চরিত্রটি খেলার কেন্দ্রবিন্দু। কোন কোন খেলায় বুড়িকে অধিকারে রাখার প্রতিযোগিতা চলে, আবার কোন খেলায় বুড়ি হল অন্যতম প্রতিপক্ষ। বুড়িকে পর্যুদস্ত করতেই খেলার আনন্দ। 'ছি বুড়ি' বা 'ছোট বুড়িচ্ছি'[৫] খেলায় বুড়িপক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে খেলা হয়। এটা সারা বাংলার শিশু-কিশোরের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। কোন কোন স্থানে খেলাটি বৌ-ছি নামেও পরিচিত। খেলাটি স্থান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচলিত থাকলেও খেলার পদ্ধতি অভিন্ন। বুড়িপক্ষ থেকে বুড়ি আলাদা একটি বৃত্তের মধ্যে থাকে। এ খেলায় বুড়িপক্ষ বুড়িকে বৃত্ত থেকে উদ্ধার করা বা বুড়ি প্রতিপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে নিজ দলের খেলোয়াড়ের নিকট ফিরে আসার প্রচেষ্টায় থাকে। ছি-বুড়ি খেলাটিতে দু' সমান সংখ্যক প্রতিযোগী থাকে। বিশ-ত্রিশ হাত দুরত্বে দুটি বৃত্তরেখা টানা হয়। এর একটিতে বুড়ি দাঁড়ায়। বুড়িপক্ষের অপর খেলোয়াড়রা অন্যবৃত্তে দাঁড়ায়। দম রেখে বিপক্ষ দলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বুড়ির বৃত্ত বদলের উপর দলের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা দু'বৃত্তের মাঝামাঝি এলোমেলো ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়িপক্ষীয় খেলোয়াড় দমের ছড়া কেটে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের ছুতে চেষ্টা করে আর ছুতে পারলে বিপক্ষীয় খেলোয়াড়টি মরা যায়. অর্থাৎ চলতি খেলায় অযোগ্য বিবেচিত হয়। যদি বৃত্তের বাইরে দম ফুরিয়ে যায় আর বিপক্ষ ছুঁয়ে দেয় তাহলে বুড়িপক্ষীয় খেলোয়াড়টি বাদ যায়। এভাবে খেলা চলতে থাকে। বিপক্ষকে বুড়িপক্ষ ঘায়েল করার অবসরে বুড়ি বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিজ দলের বৃত্তে আসার চেষ্টায় থাকে। আসতে পারলেই বুড়িপক্ষ জিতে যায়।[৬]

খেলাটির সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব নিয়ে পণ্ডিতবর্গ আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনায় খেলাটির নানা দিক উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষ্যযোগ্য। শঙ্কর সেন গুপ্ত এ খেলায় প্রাচীন হিন্দু বিবাহরীতির লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,"এই ধরনের খেলা দেখে মনে হয়,নারীর শ্লীলতা রক্ষার জন্য প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালী নিজেদের সাহস, ধৈর্য্য, সহ্যশক্তি ও বিক্রম প্রকাশের চেষ্টা করতেন এবং বিভিন্ন লোকক্রীড়ার মাধ্যমে তার মহড়া দিতেন"[৭]। এখানে জোরপূর্বক বিবাহ ও তার থেকে রক্ষার কৌশলচর্চার চিত্র রূপ পেয়েছে বলে শঙ্কর সেনের অভিমত। ড. অসীম দাসেরও প্রায় একই মন্তব্য।

তবে তিনি বিষয়টিকে একটু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন। তার ভাষায়,"কন্যা অপহরণের পর কন্যা-পক্ষ ও বর-পক্ষের মধ্যে যে লড়াই সংঘটিত হত আদিমকালের অপহরণমূলক প্রথার বিবাহের সময়ে, সেই যুদ্ধদৃশ্যটিই বহু সহস্র বৎসরের পথ অতিক্রম করে এসেও টিঁকে রয়েছে এই খেলার মধ্যে, কারণ শিশু-কিশোরের কাছে অধিকতর মনোহারী হয়েছে সেটিই এবং ক্রীড়ার মধ্যে সেই অংশটুকুই অনুকরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।"[৮] ছি-বুড়ি কোন কোন অঞ্চলে 'শী বুড়ি' নামে প্রচলিত। লোকবিদ বরুন চক্রবর্ত্তী মনে করেন 'শী বুড়ি 'কে সীতা বুড়িও বলা যেতে পারে। তাঁর মতে, রাবণদের হাত থেকে সীতা বুড়িকে রক্ষা করার চিত্র এই খেলাতে ফুটে ওঠে। তাই তিনি খেলাটির নাম সীতাহরণ খেলা হতে পারে বলে মনে করেন।[৯]

আমরা এখানে বুড়িকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করতে পারি। এ খেলাকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করলে এতে আমরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট দেখতে পাব। আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে এদেশের সমাজ ব্যবস্থায় মাতৃতন্ত্র কোন সময় প্রতিষ্ঠিত ছিল কি-না তার সুস্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় পিতৃতান্ত্রিক ধারার পাশাপাশি একটি মাতৃকেন্দ্রিক ধারা সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান থেকেছে। ভারতীয় তন্ত্রাচার মাতৃকেন্দ্রিক, নারী প্রাধান্য বা শক্তি প্রাধান্য তান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ ধারণায় নারী সক্রিয়, পুরুষ নিষ্ক্রিয়। পিতৃতান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যে নারীর স্থান নিরূপিত হয় শূদ্রশ্রেণীর সঙ্গে। তাই ব্রাহ্মণ্য পিতৃতান্ত্রিক ধারায় নারীর প্রতি যে নঞর্থক মনোভাবের পরিচয় রয়েছে তা তান্ত্রিক ধারণায় রূপ পায় নি। কোসম্বী ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় প্রাক-বৈদিক সিন্ধুসভ্যতায় মাতৃপ্রাধান্যের কথা বলেছিলেন এবং এর বিপরীতে বৈদিক সংস্কৃতি ছিল পিতৃতান্ত্রিক। যদিও গারডা লারনার বলেছেন, পিতৃতন্ত্র শব্দটিতে যেরকম পুরুষের সার্বিক আধিপত্য বোঝায় সেরকম অর্থে পৃথিবীর কোন দেশে কোনো কালে মাতৃতন্ত্র ছিল না।[১০] তবে আমরা কোসাম্বীর মতের সূত্র ধরে লোক ক্রীড়াকে বিচারের পক্ষপাতী। কারণ, লোকক্রীড়াগুলোয় মাতৃধারার পরিচয় সুস্পষ্ট এবং এগুলোতে মাতৃধারার প্রতি পিতৃধারার একটা প্রচণ্ড আক্রোশ ধরা পড়ে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রধান হল বুড়ি বা বৃদ্ধা নারী ; অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আর বয়সে তার সমাজে সেই-ই তো নেতা। ছি-বুড়ি খেলায় তাকে কেন্দ্র করে তার দল ও প্রতিপক্ষ দলের যে মহড়া বলা যায়, তাতে মাতৃপ্রধান সমাজের উপর পিতৃপ্রধান সমাজের আক্রমণ ও প্রতিরোধকেই চিহ্নিত করে। পুরুষপ্রধান সমাজে বয়স্কপুরুষই সম্মান ও জ্ঞানের মূর্তি, অন্যপক্ষে নারীপ্রধান সমাজে বুড়িই মূল চালিকাশক্তি। মূল চালককে হস্তগত করতে পারলেই পুরো দলও করায়ত্তে আসবে। বুড়িকে আয়ত্তে আনার প্রতিযোগিতা বা আক্রমণের ব্যাপারটি খেলার অর্ন্তকাঠামোয় বিদ্যমান। খেলায় বুড়ির দল সবসময় ঘরে বা বৃত্তে থাকে, আর বিপক্ষদলের আক্রমণকে প্রতিহত ও আত্মরক্ষার প্রচেষ্টায় থাকে। তাতে অনুমিত হয় বুড়ির সমাজ বহিরাগত পক্ষ থেকে প্রথমে আক্রমণের শিকার হয় এবং এরপর বুড়ির দল প্রতিরোধে নেমে পড়ে। তাই বুড়িকে ঘিরে খেলার যে আয়োজন ও প্রতিযোগিতা চলে তাতে বুড়ি কেন্দ্রিক সমাজের ক্রমবিবর্তনের একটা পর্যায় এতে রূপায়িত হয়েছে বলে অনুমিত হয়।

কিছু কিছু খেলা রয়েছে যেগুলোতে বুড়ি কেন্দ্রে থাকে বটে কিন্তু বুড়ির কোন সক্রিয়তা থাকে না। যেমন, 'ছিওল খেলা' বা শেকল খেলাটি বুড়িকেন্দ্রিক। খেলাটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে শিশুদের প্রিয় খেলা।[১১]

খেলোয়াড়রা দু'দলে বিভক্ত হয়ে একজনকে বুড়ি নির্বাচন করে। ওঠোনের মাঝখানে পা দিয়ে ছোট একটি গর্ত করে সেখানে বুড়ি বৃদ্ধাঙ্গুল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর যে দল টসে জিতে খেলা শুরু করবে তারা বুড়ির হাত ধরে লম্বা একটা শেকলের মতো হয়ে ঘুরতে থাকে। বিপক্ষদল শেকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে শেকলের খেলোয়াড়দের পাহারা দিতে থাকে যাতে তারা শেকল ছেড়ে পালাতে না পারে । আর বুড়িকেন্দ্রিক দলটি সুযোগ খুঁজতে থাকে বিপক্ষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পালানোর। এ ভাবে শেকলের মাথা থেকে একজন একজন পালাতে থাকে। পালাতে গিয়ে কেউ যদি বিপক্ষের স্পর্শের মধ্যে আসে তাহলে সে বাদ যাবে এবং এতে পয়েন্ট কমে যাবে। এভাবে সবাই পালাতে পারলে খেলা শেষ হয়। শেকল ঘোরার সময় যদি বুড়ির আঙ্গুল গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে আর যদি বিপক্ষের কেউ

মানবশেকলটি স্পর্শ করে তাহলে শেকলের সবাই একসঙ্গে 'মরা' হবে। যতক্ষণ বুড়ির হাতে সৃষ্ট বন্ধনে খেলোয়াড়রা থাকে ততক্ষণ বিপক্ষ তাদেরকে স্পর্শ করে না, করলেই বিপক্ষের খেলোয়াড়টি 'মরা' (চলতি খেলায় খেলোয়াড়ের সক্রিয়তা হারানো) হবে। এখানে যাদু বিশ্বাসজাত ক্রিয়ার প্রকাশ রয়েছে। স্পর্শমূলক জাদুর কারণে বিপক্ষের কাউকে ছুলেই সে মারা পড়ছে। এই ছোঁয়া বা স্পর্শকে প্রতিপক্ষকে হত বা বিনাশ করার প্রতীকী ইঙ্গিতও হতে পারে। কোন কোন খেলায় খেলা আরম্ভের আগেই কোন গাছ,পাথর, বস্তু বা কোন খেলোয়াড় বা কোন নির্দিষ্ট স্থানকে 'বুড়ি' কল্পনা করে নির্দিষ্ট করা হয়। বুড়িকে স্পর্শ করে থাকলে খেলোয়াড়টি নিরাপদ, তাকে খেলায় 'মরা' করা যায় না। পল্লব সেনগুপ্ত খেলায় বুড়ির অবস্থান বা বুড়িকে ছুঁয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেছেন, "এই 'বুড়ি' ব্যাপারটাও এক ধরনের আদিম কালগত সংস্কারের অনুক্রমণ। 'বুড়ি' যে সাজে, সে তো ঐ প্রবল ছুটোছুটির মধ্যেও একমাত্র খেলুড়ে যাকে 'থুবড়ি খেয়ে' বসে থাকতে হয়। ...'বুড়ি' হল নিরাপদ আশ্রয়; স্যাংচুয়ারি,তথা হোলি প্লেস ; বা হোলি পার্সন। যা বা যাকে স্পর্শ করে থাকতে পারলে কোন বিপদ আপদ ছুঁতে সক্ষম হবে না, এমন সংস্কারই খেলার মধ্যে 'বুড়ি'-কে উপস্থিত করেছে।"[১২] খেলাটিতে বুড়ি চরিত্র বাদে অন্য কোন চরিত্র নেই। এখানে দু'দলের দ্বন্দ্ব শেকল থেকে মুক্তির বিষয়ে। বুড়িকেন্দ্রিক দলটি কোণঠাসা বা বন্দী, আর বিপক্ষদল পাহারারত আক্রমণকারী বলা যায়। তাই বুড়ির দল বন্দী অবস্থা থেকে পালানোর সুযোগ খুঁজছে আর আক্রমণকারী দলটি বুড়ির দুর্গে পৌঁছতে না পারলেও তাদেরকে নজরবন্দী করে রেখেছে এবং বন্দীদের পালানোর সময় আক্রমণ করছে। খেলাগুলো আমাদের এমন কোন এক অজানা সময়ের মূক চিত্র ধারণ করে আছে, যা ভবিষ্যতের গভীর গবেষণার দাবি রাখে। কারণ,"লোকক্রীড়ার এক সিংহভাগ অধিকার করে আছে অনুকৃতি, এই অনুকৃতি কখনও সমাজ জীবনের, কখনওবা আরণ্যক জীবনের। আবার কখনও ফেলে আসা সুদূর অতীত জীবনের"।[১৩]

আমাদের কিছু কিছু লোকক্রীড়ায় বুড়ির প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ প্রকাশমান। 'বুড়ির কাঁঠাল চুরি', 'বুড়ির ধানক্ষেত' বা 'ছোটপুকুর' বা 'বুড়ির ঘর পোড়ানো' ইত্যাদি খেলায় বুড়ির যে অবস্থান বা বুড়ির সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তাতে বুড়ি সম্পর্কে একধরনের অশ্রদ্ধামূলক ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস বিদ্যমান। এছাড়া বিজিতের প্রতি বিজয়ীদলের সবসময় নঞর্থক প্রচারণার প্রচেষ্টা থাকে। এ চেষ্টায় হীন মনোভাব, হিংসা, ক্ষোভ বা বিদ্বেষ স্থান পায়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যের পর নারী বা বুড়ির প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচারণার অংশ বুড়িমূলক লোকক্রীড়া। নাট্যাঙ্গিক বুড়িকেন্দ্রিক খেলাগুলোয় উর্পযুক্ত বক্তব্যের সমর্থন মেলে। 'কাঁঠাল কাঁঠাল'[১৪] খেলাটি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। খেলাটি শিশু-কিশোরদের নিকট খুবই জনপ্রিয়। কিঞ্চিৎ পার্থক্য ব্যতিরেকে খেলাটি বাংলার প্রায় সব অঞ্চলে অভিন্ন নিয়মে খেলা হয়। এটি একটি নাট্যমূলক লোকক্রীড়া। খেলায় কিছু চরিত্র থাকে, যেমন–বুড়ি, বুড়ির কাঠাঁলগাছ, চোর, কাঁঠাল ও বুড়ির কুকুর। খেলোয়াড়দের মধ্যে যে একটু লম্বা তাকে কাঠাঁল গাছ চরিত্রে নেয়া হয়। সে দু'হাত মাথার উপর রেখে দাঁড়ায়। অন্যান্য ছোট ছোট খেলোয়াড়রা কাঁঠাল হয়ে গাছের হাত ধরে ঝুলে থাকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ি তার কাঁঠাল গাছ পাহারা দিতে থাকে কখন তার কাঁঠাল পাকবে এই আশায়। অন্যদিকে চোর রূপী খেলোয়াড়টি বুড়ির অনুপস্থিতিতে কাঁঠাল চুরির পরিকল্পনা করে। বুড়ি প্রতিদিন কাঁঠাল টিপে দেখে পেকেছে কি-না আর মুখে সংলাপ আওড়ায়, "দেখি, আমার কাঁঠাল পাইকছে কি-না"। বুড়ি কাঁঠাল পাকার অপেক্ষায় থাকে। প্রতিদিন রাতের বেলা চোর কাঁঠাল চুরি করে আর বুড়ির কুকুর চোরকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়ায়। কুকুরের শব্দে চোর পালায়, আবার আসে। এভাবে বুড়ির সব কাঁঠাল চুরি হয়ে যায়। বুড়ি লাঠি নিয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলে, 'কইরে কাঁঠালগাছ', আর চারপাশে তাকিয়ে দেখে তার সব কাঁঠাল চুরি হয়ে গেছে। এরপর বুড়ি চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আমার সব কাঁঠাল কে চুরি করে নিয়া আইচিস্'। এর পরের কার্যকলাপ হলো কাঁঠালচোর বুড়িকে পাকা কাঁঠাল খাওয়ার দাওয়াত দেয়। কাঁঠাল খেতে গিয়ে বুড়ি বলে 'এই কাঁঠাল কোথায় পাইছো'। তখন চোর বলে,'আমার মায়ের বাড়ি থেকে নিয়া আইছি'। কিন্তু বুড়ি বুঝতে পারে যে, এটা তারই গাছের কাঁঠাল। এরপর বুড়ি লাঠি নিয়ে তাড়া করে। বুড়ির সঙ্গে কাঁঠালরাও চোরকে ধরার চেষ্টা করে। ধরা পড়ার পর পাছায় লাথি মারা হয়। সব কাঠাল চুরি যাওয়ার পর বুড়ি রাগে-ক্ষোভে তার গাছটি কেটে ফেলে। তখন

গাছরূপী খেলোয়াড়টি এমন ভঙ্গি করে যেন গাছটি সত্যিই কাটা পড়ে মাটিতে পড়ে গেল। খেলাটিতে গ্রামীণ জনজীবনেরই বাস্তব ঘটনা নাট্যিক আঙ্গিকে উপস্থাপিত। কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণের বিন্দু হল বুড়ি। চোর কেন শুধু বুড়ির বাড়িতে হানা দেয়। লোককথায়ও বুড়ির খাবার চুরির প্রসঙ্গ এসেছে, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। বুড়ির কাঠাল চুরি করে তাকে নিঃস্ব বানিয়ে শিশুমহল খেলায় আনন্দ উপভোগ করে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাদের চারপাশের ঘটনাপ্রবাহ শিশুমনে যে রেখাপাত করে, তা তারা অভিনয়-অনুকরণের মাধ্যমে চর্চা করে এবং তাতে খেলার আনন্দ খোঁজে। বুড়ি হল সমাজের প্রান্তিকজন। তার জিনিস চুরির ঘটনা খেলায় মজার ব্যাপার হলেও বুড়ি এখানে শোষিত, নিপীড়িত ও পরাভূত। এ খেলায় বুড়ির পরাভবই মুখ্য হয়ে ওঠে। লোকগল্প ও লোকক্রীড়ায় বুড়ির সম্পদ চুরি বা লুণ্ঠন একটি অন্যতম মোটিফ। নিঃস্ব ব্যক্তির সর্বস্ব লুণ্ঠনে কোন আনন্দ নেই। যদি তার উপর কোন ক্ষোভ বা প্রতিহিংসা লালন করা হয়, তাহলেই শুধু তাকে আরো নিঃস্ব করার প্রক্রিয়ায় শান্তি প্রাপ্তি ঘটে। তাই লোকখেলায় বুড়ির অবস্থা দুর্গতির রূপায়ণ কোন প্রাচীন ঘটনাপ্রবাহের চিহ্ন, যা আমরা পিতৃধারার সমাজের হীনবৃত্তি বলে চিহ্নিত করতে পারি।

'বুড়ি খেলা'টিও[১৫] 'কাঁঠাল কাঠাঁল' খেলার মতো বুড়ির সম্পদ চুরির বিষয় নাট্যিক ক্রীড়ায় রূপায়িত। খেলাটি বুড়ি ও তার ধানক্ষেত নিয়ে সংগঠিত হয়। এটি একটি দলবদ্ধ খেলা। প্রথমে একজন খেলোয়াড়কে বুড়ি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ নির্বাচন চলে। প্রথমে সব খেলোয়াড় একসাথে দু'হাতের তালু মেলে ধরে এবং উল্টায়, আবার মেলে আবার উল্টায়। এভাবে কয়েকবার করতে থাকে। যার হাত তালে তালে মেলা বা উল্টানো হয় না সে বুড়ি নির্বাচিত হয়। দলবদ্ধ নাট্যমূলক এ খেলাটি অভিনয়সমৃদ্ধ ও শিশুদের প্রিয়। বুড়ি বাদে বাকি সব খেলোয়াড় একে অপরের হাত বা গলা ধরাধরি করে গোল হয়ে বুড়ির ধানক্ষেতের বেড়া বা ঘেরা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ি ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করে ধান চাষ শুরু করে। প্রথমে সে চারা রোপণের অভিনয় করে। রোপণের পরদিন ঝড় হয় এবং তার ক্ষেতের বেড়া ভেঙে পড়ে যায়। বেড়ারূপী খেলোয়াড়রা মাটিতে বসে বেড়া ভেঙ্গে পড়ার ভঙ্গি করে। বুড়ি এসে দেখে তার বেড়া ভেঙ্গে গেছে এবং বলে'হায় আল্লাহ,আমার বেড়া গুলি সব পড়ি গেছে'। তখন বুড়ি বেড়ার গায়ে লাথি মেরে খাড়া করে দেয়ার অভিনয় করে আর মুখে বলে,'এই বেড়া উঠ্'। এভাবে বেড়া সব দাঁড় করিয়ে দিয়ে বুড়ি বাড়ি ফিরে যায়। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে 'বাড়ি যাই'। তারপর বেশ কিছুদিন পর বুড়ি তার ক্ষেতে এসে দেখে ধান পেকেছে। ঝড় হওয়া বা অনেকদিন পর আসা বা ধান পেকে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাপার বুড়ি স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকে এবং এর মাধ্যমে ঘটনা ও কালক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। এখানে বুড়ির একক অভিনয় সম্পাদিত হয়। বুড়ি বলে, 'ধান তো পেকে গেছে, যাই বাড়ি থেকে কাস্তে নিয়ে আসি'। তখন বেড়ারূপী খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলে 'আজ বুড়ির সব ধান চুরি করব'। তারপর বুড়ি আসার আগেই তারা সব ধান চুরির অভিনয় করে। এখানে বেড়া হওয়া খেলোয়াড়রা মুকাভিনয় সম্পন্ন করে। বুড়ি এসে দেখে তার ধানক্ষেতে ধান নেই এবং বলে,'আমার ধান কে চুরি করে নিয়ে গেল রে'। তারপর বুড়ি সকল খেলোয়াড়কে তাড়া করে। এভাবে দৌড়াদৌড়ি ও ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্য দিয়ে খেলা চলে।

'বেড়ায় ক্ষেত খায়' বাংলা প্রবাদটি সম্ভবত এ লোকক্রীড়ার বিষয় থেকে উদ্ভূত। রক্ষক যখন ভক্ষক চরিত্রে রূপায়িত হয় তখন প্রবাদটির ব্যবহার ঘটে। উপর্যুক্ত খেলায় বুড়ির বেড়াকেই ধান পাকার পর চোরে পরিণত হতে দেখা যায় এবং ধানক্ষেতের রক্ষাকারী বেড়াই সমস্ত ধান চুরি করে। এ খেলায় বুড়ির সম্পদ লুণ্ঠন করে তাকে উৎপীড়ন করার চিত্রই ফুটে ওঠে। বুড়ি যে সামাজিক নিপীড়নের শিকার তার স্পষ্ট রূপ খেলাগুলোয় রয়েছে। বুড়ির সম্পদ লুণ্ঠিত বা চুরি গেলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিচার পাওয়া হয় না। তাই বুড়ি কোথাও কোন বিচার প্রার্থী না হয়ে নিজেই তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। তার এগিয়ে আসাটা খেলায় নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে এবং তা খেলায় মজার ব্যাপার হয়ে ওঠে।

'ছোট পুকুর' [১৬]খেলাটিও বুড়িকেন্দ্রিক এবং নাট্যধর্মী । খেলাটি মূলত একটি পুকুর এবং বুড়িকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে খেলায় একজন বুড়ি নির্বাচিত হয়। তারপর সকল খেলোয়াড় হাত

ধরাধরি করে গোল হয়ে একটা ছোট পুকুরে রূপ নেয়। এরপর পুকুরের পাশ দিয়ে বুড়ি অন্য পুকুরে স্নান করতে যাচ্ছে অভিনয় করে এবং তখন পুকুরবেশী খেলোয়াড়রা জিজ্ঞেস করে, 'বুড়িমা কোথায় যাচ্ছ ?' বুড়ি উত্তর দেয়, 'গোসল করতে'। খেলোয়াড়রা বলে,'আমাগেরে পুকুরে গোসল কর'। বুড়ি বলে, 'তোমাদের পুকুর অনেক ছোট, এত ছোট পুকুরে গোসল করা যাবে না'। তখন খেলোয়াড়রা বলে, আমাদের পুকুরে একটা পাতা ছুড়ে মারো আমরা বড় হয়ে যাবো। তখন বুড়ি একটা পাতা ছুড়ে মারে পুকুরে আর তা' বড় হয়ে যায়। এরপর সকল খেলোয়াড় শেকলের মতো হাত প্রসারিত করে বড় পুকুর হয়ে ওঠে। তারপর বুড়ি তাদের হাতের বাধা দেখিয়ে বলে 'এপাশ দিয়ে যাব', তখন পুকুর বলে 'এপাশে শেয়াল মরা'। বুড়ি যে দিক দিয়েই পুকুরে প্রবেশ করতে চায় পুকুর সেদিকে একের পর এক নানা বাহানার প্রসঙ্গ, কুকুর মরা, বেজি মরা, সাপ মরা বলতে থাকে। তখন বুড়ি জোর করে ঢোকার জন্যে দা দিয়ে কোপ মারার অনুকৃতি করে এবং পুকুরে প্রবেশ করে। তারপর বুড়ি সবার পায়ের কাছে পাতা বা অন্যকিছু রেখে খাবার দেয়ার অভিনয় করে এবং 'এই নাও, তোমাদের খাবার' বলে বেরিয়ে পড়ে। বুড়ি চলে গেলে খেলোয়াড়রা খাবার ফেলে দেবার অভিনয় করে। বুড়ি ফিরে এসে তার খাবারের কথা জিজ্ঞেস করলে তারা 'কুকুরে খেয়েছে' বলে যুক্তি দেয়। বুড়ি বলে, কুকুর তো আমার সঙ্গে ছিল। তখন তারা বলে, শেয়ালে খেয়েছে। বুড়ি বলে, শেয়াল তো আমার সঙ্গে ছিল। এরপর বুড়ি সকলের কাছে আগুন চায়, কিন্তু একজন আরেকজনকে দেখিয়ে দেয়, কেউই আগুন দেয় না। এরপরে আবার বুড়ি সকলের কাছে ঘি চায়, তাও পায় না। যখন বুড়ি জোর করে পুকুরে ঢোকার অভিনয় করে তখনই খেলোয়াড়রা বলতে থাকে, 'আমরা তোমার ভাত খেয়েছি'। এরপর বুড়ি সবাইকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সংলাপ ও অভিনয় খেলাটিতে নাটকীয় আবহ তৈরি করে।

এ খেলায়ও আমরা বুড়ির প্রতিপক্ষ হিসেবে একটা দলকে পাচ্ছি। সম্ভবত তারা পুকুরের মালিক পক্ষ। বুড়ির স্নান করা, তার খাবার খেয়ে নেয়া বা তাকে কোন দানে সহযোগিতা না করা এবং তাদের কার্যকলাপ দেখে ও শুনে শেষে সবাইকে তাড়ানো সবই বুড়ির সঙ্গে বিরুদ্ধপক্ষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করে। সকলের অসহযোগিতা বুড়িকে এখানে একঘরে বা সমাজ বহির্ভূত বলে মনে হয়। বুড়িকে পুকুরে স্নান করার জন্য আহ্বান করে এবং পরে তাকে নিয়ে বিভিন্নভাবে রসিকতা শুরু করে বুড়িকে কৌতুকের পাত্রী করে তুলে। বুড়িকে এখানে জাদু শক্তিসম্পন্ন বলে মনে হয় এবং বিরুদ্ধপক্ষ তার এ ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই ছোট পুকুরে পাতা ছুঁড়ে মারতেই পুকুর বড় হয়ে গেল। খেলাটিতে জয়-পরাজয় নেই, বুড়িকে একটু নাজেহাল করে এবং তার তাড়া খেয়েই খেলার আনন্দ। এসব খেলায় বুড়ির প্রতি কোন সদর্থক ধারণা গড়ে ওঠে না। বুড়িকে প্রতিবেশী বা মানবের আত্মীয় সম্পর্কের কেউ বলে মনে হয় না। বুড়ি এখানে বুড়িই, প্রকৃতি জগতের অন্যান্য প্রাণীর মতো কোন প্রাণী, মানব নয়। তার সঙ্গী বা সহযোদ্ধা কখনো কখনো আরেক প্রাণী কুকুর। বুড়ি মানব সমাজে কোন সহানুভূতির পর্যায়ে পড়ে না, তাকে শেষ পর্যন্ত আবাসসহ পুড়িয়ে নিঃশেষ করার বিষয়টিও খেলায় আনন্দের খোরাক হয়েছে। এতে বুড়ি সম্পর্কীত প্রচলিত সমাজ ধারণার চিত্রটি উন্মোচিত হয়।

'বুড়ির ঘর পোড়ানো'[১৭] নামে একটি খেলা অনুষ্ঠিত হয় বাংলার কোন কোন অঞ্চলে। খেলাটি খুলনা অঞ্চলে এখনো বিদ্যমান। এটি একটি লোকাচারমূলক খেলা। সাধারণত পৌষ সংক্রান্তিতে বুড়ির ঘর পোড়ানো অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বাড়ির চারপাশ শুকনো থাকে। খোলা মাঠে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। খেলার নিয়মানুযায়ী একজনকে বুড়ি কল্পনা করা হয়। বুড়ির প্রতীক হিসেবে খেজুর গাছের শুকনো ডাল, বাঁশ, পাতা ও কঞ্চি দিয়ে একটি ঘর বানানো হয়। এরপর খেজুরের শুকনো ডাল, ফেতরা (খেজুর গাছ পরিস্কার করার পর জালের মত গাছের একপ্রকার চামড়া), আচা বা নারকেলের খোল, বাঁশের খোলা (নতুন বাঁশে একপ্রকার খোল হয়, যেগুলো বাঁশ থেকে আপনি খসে পড়ে) ইত্যাদি কাঁচা লতার মধ্যে একটা একটা করে গেঁথে মশালাকৃতি বানানো হয়। একে খুলনার আঞ্চলিক ভাষায় 'বাল্যে' বলা হয়। এরপর বাল্যে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়। এরকম অনেক মশাল তৈরী করে আগুন লাগিয়ে ঘোরানো হয়, একে 'হাপই ঘোরানো' বলে। কিছুক্ষণ হাপই ঘোরানোর পর বুড়ির ঘরে নিক্ষেপ করে এবং

বুড়ির ঘর পোড়ানো হয়ে গেলে খেলা শেষ হয়। খেলাটি মূলত শুকনো মৌসুমে হয়। এর খেলোয়াড়দের একটু সাহসী ও বয়স্ক হতে হয়। মেয়েরা ও একেবারে অল্পবয়সী শিশুরা এ খেলায় মূল খেলোয়াড়ের ভূমিকায় থাকে না, সহযোগী ও দর্শক হিসেবে তারা অংশগ্রহণ করে। কারণ, খেলাটি আগুন নিয়ে, অদক্ষ খেলোয়াড় কোন অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। বুড়ি এখানে অশুভ শক্তির প্রতীক। বিশ্বাস করা হয় বুড়ির ঘর পোড়ানোতে সমস্ত রোগ-বালাই, মশা-মাছি, পোকা-মাকড় বা অশুভ সমস্ত কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমাদের লোকসংস্কৃতিতে অশুভরূপ বুড়িকে বলে 'ডাইনিবুড়ি'। ডাকিনী শব্দের অধঃপতিত রূপ ডাইনি। বৌদ্ধতন্ত্রে যে ডাকিনী বা ডাইনির কথা বলা হয়েছে, সে রক্ত মাংসের কোন নারী নয়, সে হল এক শক্তি। বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে হিন্দুতন্ত্রেও ডাইনি বা ডাকিনীর উপস্থিতি ঘটে দৈবীশক্তির প্রতীক হিসেবে। তবে হিন্দুতন্ত্রে ডাকিনীকে সুন্দর দেবীমূর্তিতে নয়, এক ভয়ংকর সর্পিনী মূর্তিতে হাজির করা হয়েছে।[১৮]এ ছাড়া ডাকিনী পুরুষবাচক ডাক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। ডাক [তিব্বতি 'বদগ্'-জ্ঞান] জ্ঞানী পুরুষ।[১৯] ডাকিনী. স্ত্রী [ডাক+ইন্(ইনি)+স্ত্রী ঈ]। ডাক শব্দের অর্থ পুরুষের ক্ষেত্রে জ্ঞানী পুরুষ, সেই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ডাকিনীর অর্থ হয় 'উপদ্রব কারিনী নারী'[২০]| এই ডাকিনী শব্দের বাংলা কথ্যরূপ ডাইনী [সং.ডাকিনী >প্রা.ডাইণী >বা.নী অর্থ করা হয়েছে, পিশাচী, পেতনী(সাদৃশ্যে) জাদু বিদ্যা বলে দৃষ্টি মাত্রে শিশুর অনিষ্টকারিণী স্ত্রীলোক।[২১]

নেপালে যারা বামাচারে সিদ্ধ তারা হিন্দুই হোক বা বৌদ্ধই হোক তাদেরকে বলা হয় বীর এবং বড় বড় বীরের নাম বীরেশ্বর বা ডাক।[২২] তিব্বতী ভাষায় ডাক শব্দের অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। ডাকের আরেক অর্থ ডাকতন্ত্রে সিদ্ধ জ্ঞানী। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ডাকিনী অর্থ নারী প্রজ্ঞাবান না হয়ে এর স্থলে হয়েছে পিশাচিনী বা কৃষ্ণ যাদুকরী। তাই মাতৃধারার প্রজ্ঞার অধিকারী বুড়ি বিজয়ী প্রতিপক্ষ পিতৃধারার দলের নিকট হয়ে ওঠেছে অশুভশক্তি ডাইনি বুড়ি। বুড়ির ঘর পোড়ানো খেলাটি আমাদের অনুমানকে সমর্থন করে। এ খেলায় বুড়িকে অকল্যাণ ও অশুভের প্রতীক হিসেবে তার ঘর সমেত আগুনে পুড়িয়ে তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগের প্রচেষ্টা রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক প্রজ্ঞাবান নারীকে ডাইনি অভিধায় পুড়িয়ে মারার নজির রয়েছে। এসব নারীকে তৎকালীন শান্তিদাতা সমাজ কদর্য, কুৎসিৎ, বৃদ্ধ ইত্যাদি সম্ভাষণে ভূষিত করেছিলো।"ষষ্ঠদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যে প্রায় নয় মিলিয়ন মানুষকে ডাকিনী এই ব্যাখ্যায় পুড়িয়ে মারা অথবা হত্যা করা হয়েছে, এর মধ্যে অধিকাংশই নারী। নারীদের মধ্যে প্রধানত যারা বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট বিকাশ দেখিয়েছিলেন অথবা পুরুষের ভোগের পণ্য হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তাদেরকে, অনেকক্ষেত্রে বৃদ্ধ অথবা বিধবা নারী, যিনি যেকোন কারণে একা বসবাস করেন, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাইনি হিসাবে আখ্যা পেতেন"।[২৩] আমাদের লৌকিক ক্রীড়ায় বুড়ির আরেক অর্থ ডাইনী বা অশুভশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছে। ডাইনী কথাটা সেখানে উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু বুড়ির ক্ষেত্রে আরোপিত কর্মকাণ্ডে সেই মানসিকতার পূর্ণরূপ উদ্ভাসিত।

শিশু-কিশোরের ক্রীড়াসমূহ সমাজের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত, এর মধ্যেই তার উদ্ভব ও বিকাশ। ফলে সমাজ মানসিকতা ও তার কার্যপ্রণালীর একটা প্রচ্ছন্ন ছাপ লোকক্রীড়া ধারণ করে থাকে। প্রতিপার্শ্বে জগৎ-জীবনের কোন্ ঘটনা শিশুমনে রেখাপাত করবে তার ইয়ত্তা নেই। শিশুরা নিজেদের মত করেই তাদের খেলাগুলো সৃজন করে। এখানে শিশু মনস্তত্ত্বই কার্যকর হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বিদুষক'[২৪] গল্পটি স্মরণ করা যায়। বিদুষকের কাজ রাজাকে হাসানো আর রঙ্গরস সৃষ্টি করা। এজন্যে প্রয়োজন যথাযথ পরিবেশ ও পরিস্থিতি। হাসি মানুষকে নির্মল করে। কিন্তু বিদুষক গল্পে বিদুষক সেই পরিবেশ ও মানসিক অবস্থাহীনতার কারণে কাঞ্চীর রাজার সঙ্গ ত্যাগ করে। গল্পটির ভাবার্থ অতি গূঢ় ও গম্ভীর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বিদুষক' গল্পে কাঞ্চীর রাজার সাম্রাজ্যবাদী, কর্তৃত্বপরায়ণ ও অমানবিক চরিত্রের ব্যাখ্যানে শিশুদের খেলার প্রসঙ্গ টেনেছেন। কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করে মন্ত্রী ও বিদুষক সহ দেশে ফেরার পথে দেখতে পেলেন একটা আমবাগানে একদল শিশু খেলছে। রাজার আগ্রহ হল তাদের খেলা দেখার। "ছেলেরা দুই সারি পুতুল সাজিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কার যুদ্ধ"। তারা বললে, "কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর"। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কার জিত, কার হার"। ছেলেরা

বুক ফুলিয়ে বললে,"কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার"। শিশুদের খেলায় কাঞ্চীর রাজার পরাজয় দেখে রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে খেলুড়ে শিশুদের কঠোর শাস্তির নির্দেশ দিলেন। কাঞ্চীর রাজাকে চিরস্মরণীয় করে তুলতে শিশুদের অপরাধে পুরো গ্রামবাসীদেরও শাস্তির ব্যবস্থা হলো। বিদুষক রাজার নিষ্ঠুর কার্যকলাপে মর্মাহত হয়ে রাজসভা থেকে বিদায় নিলেন। গল্পটির মর্মার্থ যাই-ই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ কর্তৃত্বকামী রাজার স্বরূপ উন্মোচনে শিশু-কিশোরের খেলার গল্প জুড়েছেন। গল্পটি থেকে শিশুদের খেলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তাদের খেলা মনগড়া, বাস্তবের জগত যেভাবে চলে তার সঙ্গে খেলার সাদৃশ্য সেই অর্থে নেই। তবে তাদের খেলার জগতে বাস্তবের প্রবেশ অপ্রতিরোধ্য, কিঞ্চিৎ কল্পনা, কিঞ্চিৎ শিশুর খেয়াল আর অনিবার্য পাঠান্তরের ধারায় যে কাঠামোটি প্রবহমান তাতে সমাজরূপের প্রকাশটি স্পষ্ট।

সাধারণত শিশুর খেলাকে দেখা হয় তার দৈহিক সুস্থতা ও মানসিক বিকাশের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে। কিন্তু শিশুদের বুড়িকেন্দ্রিক খেলাগুলোয় বৃদ্ধা নারীর যে রূপটি প্রকাশ করে তা আমাদের ভাবনার জগতে প্রাচীন মানব ইতিহাসের কোন এক অজানা সময়ের চিহ্ন হাজির করে, দেয় মাতৃধারার স্বরূপ উন্মোচনের তাগিদ। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি যে বিদ্বেষ মনোভাব তার ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রাত্যাহিক জীবনাচারে লালিত, তার কারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে লোকক্রীড়ায় বুড়ির স্বরূপ সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এখনো অস্পষ্ট। কোসাম্বীর অনুমানের বহু নিদর্শন এখনো বাংলা লোকসংস্কৃতির বিচিত্র শাখায় লক্ষ্যযোগ্য। ভবিষ্যতের ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানই আমাদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সঠিক ও স্থির সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. পল্লব সেনগুপ্ত, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০২) পৃ.২৫২।

২. অজিত কুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস* (কলকাতা, জেনারেল প্রিন্টার্স, ১৯৯৯) পৃ.১।

৩. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,*বঙ্গীয় শব্দকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা,সাহিত্য অকাদেমী,১৯৬৬)পৃ.১৫৯৯।

৪. উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, *টুনটুনির বই* (বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র,২০০১)।

৫. খেলাটি খুলনা অঞ্চলে 'ছোট বুড়িচ্ছি' নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম ও নরসিংদী অঞ্চলে 'ছি-বুড়ি'নামে পরিচিত।

৬. মুহম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, *নরসিংদীর লৌকিক খেলাধুলা* (ঢাকা,বাংলা একাডেমী,১৯৮৮)পৃ.৩৭।

৭. শঙ্কর সেনগুপ্ত, *বাঙালীর খেলাধূলা* (কলকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্, ১৯৭৬) পৃ.৬৩।

৮. অসীম দাস, *বাংলার লৌকিক ক্রীড়ার সামাজিক উৎস* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১) পৃ.৭৬।

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বাঙলার লোকক্রীড়া* (কলকাতা, পুস্তক বিপনি, ২০০১) পৃ.৮৪।

১০ অপু দাস, *বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগঃ নারীবাদীপাঠ* (কলকাতা, বাণীশিল্প, ২০০৬) পৃ.৩০।

১১. খেলাটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত। প্রবন্ধকার শৈশবে খেলাটি খেলেছেন।

১২. পল্লব সেনগুপ্ত, *লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ* (কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ২০০২) পৃ.২৪৮।

১৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী,*পূর্বোক্ত*।

১৪. খেলাটি খুলনা অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত। প্রবন্ধকারের তত্ত্বাবধানে ২০১১ সালে ফোকলোর বিভাগের ২০০৭-৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ১১.১.১১ থেকে ২১.১.১১ তারিখ পর্যন্ত খুলনা জেলার বিভিন্ন থানায় ক্ষেত্র সমীক্ষণ পরিচালিত হয়। নিবন্ধে আলোচিত খেলা সমূহ ঐসময়ে মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত। আরো তথ্য,শিরিনা খাতুন, রোল নং-১৭২৬, *ক্ষেত্রসমীক্ষা ও প্রতিবেদন-২০১০,স্থান-খুলনা*, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৫. *পূর্বোক্ত*।

১৬. *পূর্বোক্ত*।

১৭. পুরঞ্জিত মহালদার, পিতা-মদনমোহন মহলদার, বয়স-২৫, গ্রাম-রংপুর, থানা-ডুমুরিয়া, খুলনা।

[১৮]. দেবব্রত ভট্টাচার্য, *ভারতীয় লোকজীবন ও সাহিত্যে ডাইনিবৃত্তির প্রভাব ও প্রসার* (কলকাতা, পুনশ্চ, ২০০৮) পৃ.৩৯।

[১৯]. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*।পৃ.৯৯৭।

[২০]. *পূর্বোক্ত*। পৃ.৯৯৮।

[২১]. *পূর্বোক্ত*।পৃ.৯৯৬।

[২২]. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'ডাক ও খনার বচন', উদ্ধৃত, বরুণকুমার চক্রবর্তী ও দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত, *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (কলকাতা, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৬) পৃ, ১৩৮।

[২৩]. ফারজানা নাজ, জেন্ডার *শব্দকোষ* (ঢাকা, এ এইচ ডেভেলেপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৯) পৃ.৪৩-৪৪।

[২৪]. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লিপিকা, *রবীন্দ্র রচনাবলী* (কলকাতা, বিশ্বভারতী, ১৪১৫বঙ্গাব্দ) পৃ.৩৪২-৩৪৩।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

সিডর-উত্তর জীবনকৌশলঃ দক্ষিণ জনপদের অভিযোজন প্রেক্ষিত

মোঃ সামসুজ্জোহা*
আবদুল্যাহ আল-মারুফ♣

Abstract: ``SIDR'' is the name of a super cyclone generated in the southern part of Bangladesh. About 15 district destroyed by the effect of this incident and Patuakhali district was most affected among these. This cyclone caused 500 lives in the district of Patuakhali. Moreover, some 250 were missing as well as it injured almost 8,500 people. On target we need to perform more essential research work and take up relevant disaster management programme. Post Sidr life strategy in Patuakhali District of it's effect and find out investigable research work for human adaptation system - is the main goal of this survey. It could be aspect that, this study will feed up effort to establish the coastal community of the southern Bangladesh as well as its stiff disaster management.

ভূমিকা

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলো বাংলাদেশ উপকূলে যে প্রলয়ংকারী রূপ নেয়, তা বিশ্বের অন্যান্য ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি সর্বগ্রাসী। একারণেই প্রায় চার বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিডরের বিপর্যস্ততা উপকূলীয় জনপদের লোকজন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। দেশের জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রগুলোতে এখনো সেই বার্তা প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত প্রাক মৌসুমি ঋতুর এপ্রিল ও মে মাস এবং মৌসুমী ঋতু পরবর্তী সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস, এই সময়কালের মধ্যে বঙ্গোপসাগর এলাকায় ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়গুলো সৃষ্টি হয়। বিশ্বের প্রায় ৭ শতাংশ ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে উদ্ভূত হয় এবং প্রায়শই তা বাংলাদেশকে অতিক্রমণের মাধ্যমে, উচ্চ জনঘনত্বের দেশটিতে মারাত্মক জীবনহানি, সম্পদহানি ও জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (Gray, 1985, NOAA, 2009)। এদেশের উপকূলীয় এলাকায়, ১৯৭০ সালের ১২-১৩ নভেম্বর তারিখে সৃষ্ট, ঘণ্টায় ২২৪ কিমি গতিবেগের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে হতাহত হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ এবং এতে সম্পদহানি ঘটেছে কোটি কোটি টাকার। তাছাড়া ১৯৮৪ সালে প্রায় এগার হাজার এবং ২৯ নভেম্বর

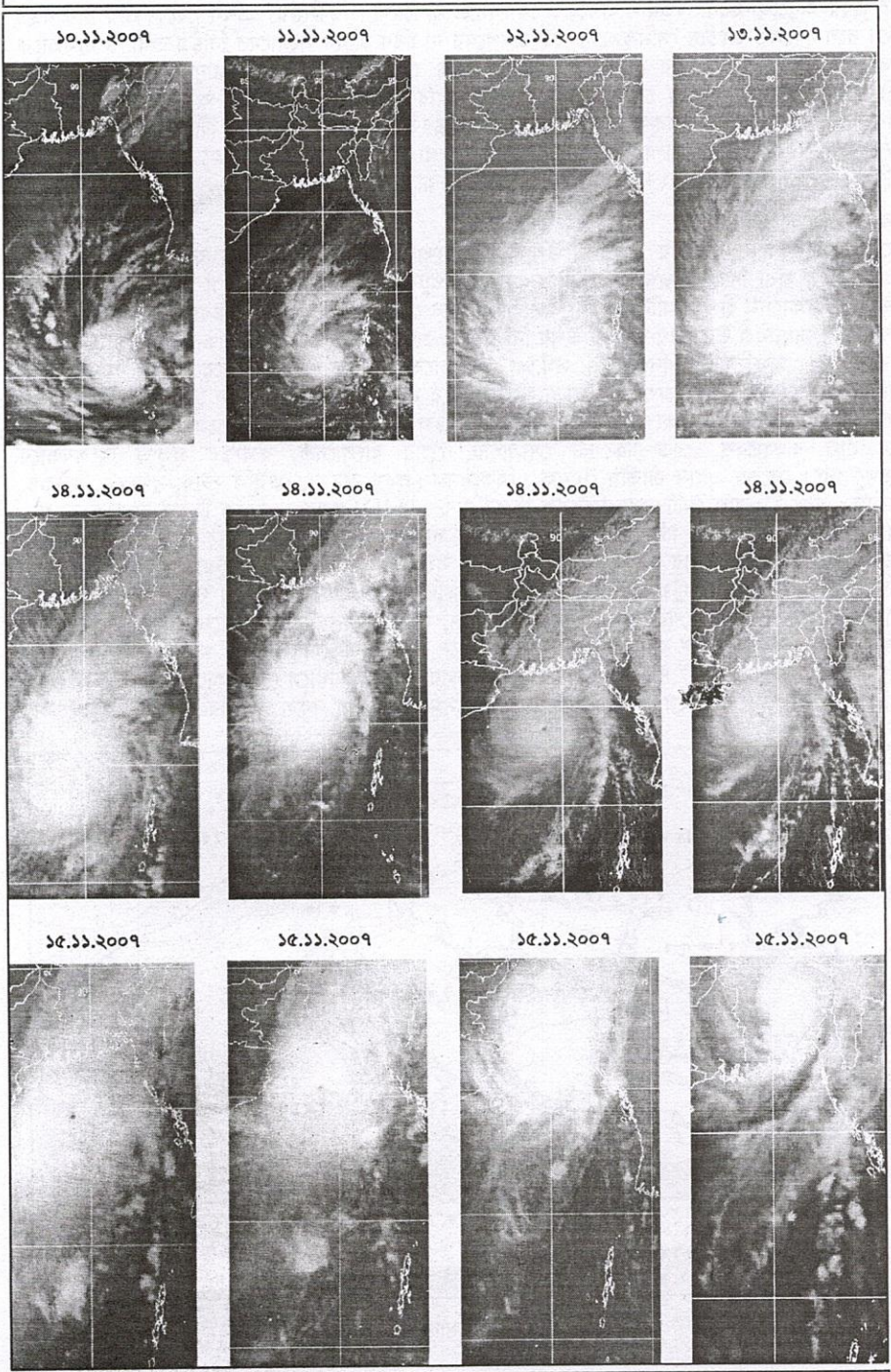
* প্রভাষক, পরিবেশ বিজ্ঞান ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।
♣ প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৮৮ সালের ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ৫ হাজার ৭৮০ জন মানুষ মারা যায়। বিপর্যয়ের দিক দিয়ে অগ্রগণ্য, অর্থাৎ ১৯৭০ সালের পর মারাত্মক ঝড়টি আসে ১৯৯১ সালের ২৯ মে তারিখে। এই ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২২৫ কিমি এবং এতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার লোক মারা যায় (Singh, *et.al.*, 2000)।

'সিডর' - আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্তী ভারত মহাসাগরীয় এলাকায়, বাংলাদেশ উপকূল থেকে প্রায় দেড় হাজার কিমি দূরে ২০০৭ সালের ৯ নভেম্বর লঘুচাপ হিসেবে ধরা পড়ে। লঘুচাপটি সৃষ্টির পাঁচ দিনের মধ্যে "সুপার সাইক্লোনে" পরিণত হয়। এটি ১০ নভেম্বরে সুস্পষ্ট লঘুচাপে রূপ নিয়ে মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করে সাধারণ নিম্নচাপ থেকে গভীর নিম্নচাপে রূপান্তরিত হয় (চিত্র ১)। সাইক্লোনে রূপান্তরণকালীন সময়ে বাংলাদেশ উপকূল থেকে এটির দূরত্ব ছিল প্রায় ১৪০০ কিমি (The Daily Star, 16 November, 2007)। সামুদ্রিক ঝড় 'সিডর' ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূলে আঘাত করার সময় এর বাতাসের গতিবেগ ছিল ২২০-২৪৪ কিমি/ঘণ্টায় (হোসেন, ২০০৮; কাদির, ২০০৮; গমেজ, ২০০৮)। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা জানায়, বাতাসের তীব্রতার দিক থেকে সিডর ছিল ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও প্রলয়ংকারী, চার নম্বর ক্যাটাগরি ভুক্ত একটি ঘূর্ণিঝড় এবং এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬০ থেকে ২৮০ কিলোমিটার। উপগ্রহের চিত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায় দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের পর অর্থাৎ স্থলভাগে প্রায় ৭০০ থেকে ৭৫০ কিমি অতিক্রম করে, সিডর ১৬ নভেম্বর প্রত্যুষে ঘন্টায় ৬৫ কিমি থেকে ৭০ কিমি গতিতে সিলেটের উপর দিয়ে ভারতের মেঘালয়-আসামের দিকে চলে যায় (ADRC, ২০০৯; IMD, ২০০৭; চিত্র-১)। পটুয়াখালী জেলাধীন খেপুপাড়া রাডার স্টেশনে এই ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ রেকর্ড করা হয় ঘন্টায় ২২৩ কিমি। এই ঝড়ে দেশের ক্ষতিগ্রস্ত ১৫ টি উপকূলীয় জেলার মধ্যে ১১ টি জেলার শতকরা ৯৫ ভাগ শষ্য বিনষ্ট, অসংখ্য চিংড়ি ঘের ক্ষতিগ্রস্ত, এবং গবাদিপশু ছাড়াও গৃহ ও বৃক্ষশূণ্য হয়েছে অসংখ্য গ্রাম (হোসেন, ২০০৮)। ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকাসমুহের প্রায় সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো বিকল হয়ে পড়ে। এর ফলে জনজীবনের দুর্ভোগ ছাড়াও উৎপাদনমুখি শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে যায়। দেশের অন্যান্য স্থানের সাথে প্রায় সবরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দক্ষিণের জনপদগুলো। কেবল যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে বিপর্যস্ত জনপদে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

ঘূর্ণিঝড় সিডরোত্তর গত দুই বছরে বেশকিছু গবেষণামূলক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় ২০০৮ সালে 'সিডর ২০০৭' শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষায় সিডরের প্রভাবে পটুয়াখালী জেলায় সৃষ্ট সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির সরকারি হিসেব বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় জীববৈচিত্র্যে সিডর কর্তৃক সৃষ্ট বিপর্যয় কিভাবে টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পুনরুদ্ধার ও অভিযোজিত করা যায় সেই বিষয়ে সম্যক আলোকপাত করা হয়েছে (হেনা ও মান্নান, ২০০৮)। ইসলাম (২০০৯), সুপার সাইক্লোন 'সিডর-২০০৭' উত্তর সামাজিক প্রভাব এবং শিক্ষণ শীর্ষক অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষায় মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি এবং তা প্রশমনের লক্ষ্যে যথাযথ কৌশল নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। ঘূর্ণিঝড় সিডরের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটতে দেখা যায়। এর মরণ ছোবলে বিপন্ন হয় জেলার জন-জীবন, জীব বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ। অতএব প্রয়োজন টেকসই অভিযোজন পন্থা অবলম্বন করা। কাজেই 'সিডরোত্তর জীবনকৌশল দক্ষিণ জনপদের অভিযোজন প্রেক্ষিত' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোজন পন্থা উদ্ভাবনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

চিত্র ১ : উপগ্রহের চিত্রে সিডর: ভয়াল রূপ



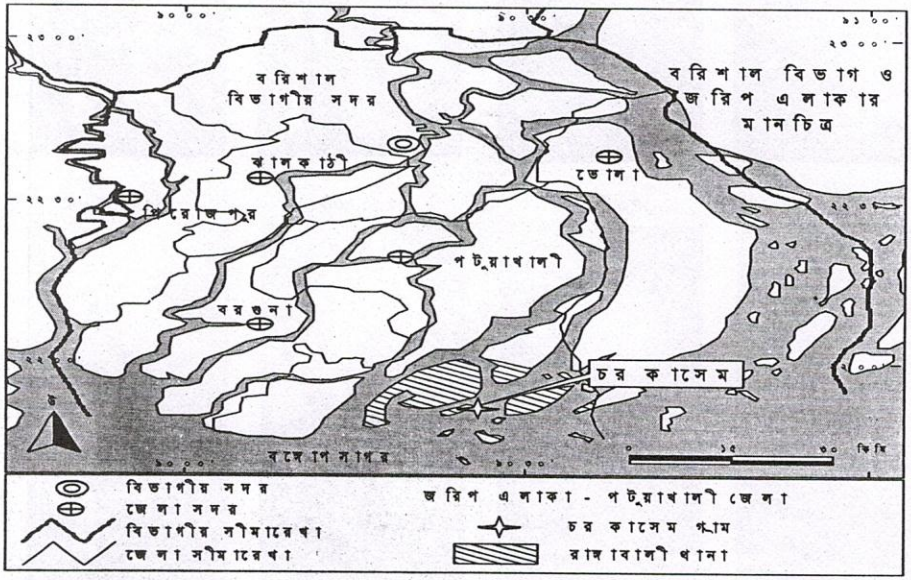
উৎস : Indian Meteorological Department, 2007. Proj: Marcator, Sat: Kalpana-1

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

ইতিপূর্বের অনুচ্ছেদগুলো বর্তমান প্রবন্ধের কেবলমাত্র রূপরেখা। "সিডর" এখন থেকে প্রায় চার বছর আগে বয়ে গেলেও জাতীয় দৈনিকগুলো এই জনপদের নানবিধ জীবন সংগ্রামের বিচিত্র তথ্য ও ব্যর্থতাকে প্রতিনিয়ত তুলে ধরছে। এর বিপরীতে বক্ষমাণ প্রবন্ধ ওই এলকার সংগ্রামী মানুষগুলোর উদ্ভাবনী ও নিজেদের অভিযোজন করার কৌশলকেই বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নিয়েছে। এই অনুসন্ধানমূলক সমীক্ষা পরবর্তীতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী দুর্যোগ প্রশমনে ও জীবন ব্যবস্থার উন্নয়নে সুফল বয়ে আনবে বলে আশা করা যায়। এই গবেষণা কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে উপকূলীয় অঞ্চলে 'ঘূর্ণিঝড় সিডরের প্রভাব এবং মানুষের অভিযোজন প্রক্রিয়া অনুসন্ধান"।

গবেষণা এলাকা ও পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাটি দক্ষিণের 'সিডর' উপদ্রুত পটুয়াখালী জেলায় পরিচালিত হয়েছে। এই জেলা "সিডর"-এর জন্য বিপর্যস্ত জনপদে পরিণত হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার রাঙ্গাবালী থানাধীন চর কাসেম দ্বীপ গ্রামটি গবেষণা এলাকা হিসেবে নেয়া হয়েছে (চিত্র ২ দ্রষ্টব্য)। বক্ষমাণ প্রবন্ধটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়বিধ তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন এনজিও এবং দাতা সংস্থাসমুহের অফিসিয়াল নথিপত্র ও সমীক্ষা এই গবেষণায় পর্যালোচিত হয়েছে। গবেষণা কাজে সহায়তাকারী গুরুত্বপূর্ণ এনজিও এবং দাতা সংস্থাসমুহের মধ্যে ফ্রেন্ডশীপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভলপমেন্ট, এনজিও ফোরাম, গণস্বাক্ষরতা অভিযান, সেন্টার ফর ডিজএ্যাবিলিটি ইন ডেভলপমেন্ট (CDD), ওয়ার্ল্ড ফুড, হীড বাংলাদেশ, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, স্লোব বাংলাদেশ, রূপান্তর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ (প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, যুগান্তর, জনকণ্ঠ, সমকাল) এবং ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (IMD) হতে সংগৃহীত সিডর বিষয়ক সংবাদ, নিবন্ধ, তথ্য ও উপগ্রহের চিত্র এই সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগৃহীত হয়। এছাড়া পটুয়াখালী জেলা প্রশাসন প্রণীত, 'ঘূর্ণিঝড় সিডরে পটুয়াখালী জেলায় সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত তথ্যাবলী এ গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের আদমশুমারী প্রতিবেদন, ২০০১ আনুসারে চর কাসেম দ্বীপে মোট খানার সংখ্যা ২৫টি। তবে প্রত্যক্ষ জরিপে দেখা যায় বর্তমানে এখানে সর্বমোট ৪৩ টি খানা রয়েছে। প্রবন্ধের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে মোট ৪৩টি পরিবারের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে। চর কাসেম (১০০%) থেকে ৪৩টি প্রশ্নমালা পূরণ করা হয়। দ্বীপটি ছোট হওয়ায় সমগ্রভাবে এর সকল পরিবারকে জরিপের আওতায় আনা হয়।



চিত্র ২ : জরিপ এলাকার অবস্থান

পটুয়াখালী জেলার ক্ষয়ক্ষতির চালচিত্র

প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর আঘাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত জেলা হচ্ছে পটুয়াখালী। এ জেলায় মৃতের সংখ্যা মোট ৪৬৬ জনে এবং ২১১ জন নিখোঁজ হয়। এছাড়া মোট ২,৫২,৩০০টি পরিবার এবং ১০,৩৭,৯৯৪ জন মানুষ কম-বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিচের সারণিতে ক্ষতিগ্রস্ত জেলার ক্ষতির একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি ১ ঃ ঘূর্ণিঝড় সিডরে পটুয়াখালী জেলার ক্ষয়ক্ষতি

বিবরণ	পটুয়াখালী	চর কাসেম গ্রাম
সিডর কবলিত পরিবার	২,৫২,৩০০টি	৪৩টি
সিডর কবলিত লোক	১০,৩৭,৯৯৪ জন	১৯৬ জন
মৃতের সংখ্যা	৪৬৬ জন	০৫ জন
আহত	৮,৫০০ জন	৩৭ জন
নিখোঁজ	২১১টি	০২ জন
ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি	১,১৯,৭৮৫টি	৮৩টি
মৃত গবাদিপশুর সংখ্যা	১৭,১৮৪টি	১৫০টি
মৃত হাঁস-মুরগির সংখ্যা	২,৯৭,৩৬৮টি	২৫১৪টি
ক্ষতিগ্রস্ত আবাদি জমির পরিমাণ	৪,৯৩,৫০৫ একর	৮.৩ একর
ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য ঘেরের আয়তন	৫,১৫৯ একর	১৫ একর
বিদ্যুৎ লাইনের উৎপাটন	১০,৮৫৫ টি/মিটার	কোন ব্যবস্থা নাই
ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রের সংখ্যা	৮টি	কোন ব্যবস্থা নাই
ক্ষতিগ্রস্ত ব্রীজ-কালভার্ট	৮৭৭টি	১টি
ক্ষতিগ্রস্ত কার্পেটিং সড়কের দৈর্ঘ্য	২৪৪.৬৪ কিমি	কোন ব্যবস্থা নাই
ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য সড়কের দৈর্ঘ্য	২৮৭.৯৪ কিমি	কোন ব্যবস্থা নাই
ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধের দৈর্ঘ্য	৬৪৫ কিমি	৭.১ কিমি
ক্ষতিগ্রস্ত বনের আয়তন	৭৭৮.৯০ হেক্টর	০.০৯৩ হেক্টর
ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপের সংখ্যা	১,৪৭৫টি	২টি
হাসপাতাল/স্বাস্থকেন্দ্রের ক্ষয়ক্ষতি	৭৪টি	কোন ব্যবস্থা নাই
জেলে বোট/জাল	১০,৮৮৪ জন	১০৩ জন
পুকুর/জলাশয়ের ক্ষতি	২৭,১৮৯টি	৭টি
ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৫৫৮টি	কোন ব্যবস্থা নাই

উৎস: সিডর ২০০৭ ডেটাবেজ, পটুয়াখালী জেলা প্রশাসন, ২০১০ ও প্রত্যক্ষ জরিপ, ২০১১।

সারণি ১ থেকে এটি পরিষ্কার যে ঘূর্ণিঝড় সিডর উল্লেখিত জনপদকে ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত করেছে। পটুয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত সমিতির প্রকাশনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিডরের প্রভাবে তাদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৯৫ কোটি টাকা। এই ক্ষতির কারণে ৬১,৪০৬ জন গ্রাহক বঞ্চিত হয়েছে এবং আজো বহু লোককে সেবার আওতায় আনা যায়নি। পটুয়াখালী জেলার সাতটি উপজেলায় স্বাস্থ্য বিভাগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ টাকার অংকে ছিল প্রায় ৯৮ কোটি টাকা। পটুয়াখালী বন বিভাগ সূত্রে জানা যায় এ বিভাগে মোট ক্ষতিগ্রস্ততার পরিমাণ প্রায় ৩৬৮ কোটি টাকা। পটুয়াখালী জেলা পরিষদের অধীনে অসংখ্য রাস্তা, ব্রীজ, পুল, কালভার্ট, জেটি, যাত্রী ছাউনি, ডাকবাংলো, কোয়ার্টার, গাছপালা এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সিডরের আঘাতে সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পটুয়াখালী জেলা পরিষদের ক্ষয়ক্ষতি ০২-০৪-২০০৮ তারিখ পর্যন্ত অর্থমূল্যে ছিল প্রায় ৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা (সারণি ২)।

সারণি ২ : ঘূর্ণিঝড় সিডরে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের ক্ষতির পরিমাণ

সরকারী দপ্তরের নাম	তথ্য প্রাপ্তির তারিখ	মোট ক্ষতির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৬-০২-২০০৮	৫৫১৭.৪০
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	২৮-০২-২০০৮	৮৯৬.৭৯
মৎস্য বিভাগ	০৬-০২-২০০৮	৮৬০.৮১
বন বিভাগ	০৫-০৪-২০০৮	৩৬৮.০৭
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	২০-০২-২০০৮	২৯৫.০০
গণপূর্ত বিভাগ	২৯-০১-২০০৮	২৮.২৯
স্বাস্থ্য বিভাগ	২২-১২-২০০৭	৯৮.০০
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	২৫-১২-২০০৭	৮২২.৯৫
পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৮-১২-২০০৭	১৬৪৯৪.০০
জেলা পরিষদ	০২-০৪-২০০৮	৫১৫.৫০
সড়ক ও জনপদ বিভাগ	২০-০৩-২০০৮	৬৭৫.০০
শিক্ষা ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৫-০২-২০০৮	৬৩৫.৫০
পুলিশ বিভাগ	০৫-০২-২০০৮	২৩.৮৯

উৎস : পটুয়াখালী জেলা প্রশাসন, ২০১০।

সিডরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, স্লুইজ গেট, ক্লোজার, প্রতিরক্ষা কাজ, অফিস ভবন, কলোনী এবং গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এই ঘূর্ণিঝড়ে পটুয়াখালী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মোট ক্ষতিগ্রস্ততা টাকার অঙ্ক ২৫-১২-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত ছিল প্রায় ৮২৩ কোটি টাকা (সারণি ২)। একই ভাবে জেলার সড়ক জনপদ বিভাগ, পশুসম্পদ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাবস্থা, মৎস্য বিভাগ, প্রকৌশল অধিদপ্তর, পুলিশ বিভাগ, সাধারন প্রশাসন, গণপূর্ত, শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিডরের ধ্বংসযজ্ঞ পর্যালোচনা করে সহজেই এর তীব্রতা ও ক্ষতিকর প্রভাব অনুমান করা যায়। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে এবং বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ক্রমেই দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমাদের নির্ভর করতে হয় বিদেশি ত্রাণের উপরে। অতীতের যেকোন দুর্যোগের তুলনায় ১৫ নভেম্বর ২০০৭ এর ঘূর্ণিঝড় সিডরের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে প্রশাসন, এনজিও ও সাহায্য সংস্থাসমূহকে অধিক বেগ পেতে হয়েছে। এক্কারণে আমাদের প্রয়োজন যথাযথ পূর্ব প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। তাই ঘূর্ণিঝড় পরিস্থিতির সাথে টেকসই অভিযোজন থেকেই আসতে পারে এ ধরনের সকল ক্ষয়ক্ষতির কাঙ্ক্ষিত প্রশমন।

সিডর উপদ্রুত অঞ্চলে মানুষের অভিযোজন

মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সতত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক ও মানবীয় উভয় নিয়ামকের প্রভাবেই সৃষ্টি হতে পারে। সকল প্রকার পারিবেশিক পরিবর্তন মানুষসহ অন্যান্য জীববৈচিত্র্যের জন্য কখনওবা ইতিবাচক অথবা কখনও নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, টেকসই উন্নয়ন দ্বারা সৃষ্ট পরিবর্তনে মানব পরিবেশে উন্নতি সাধিত হয়। আবার প্রকৃতির উপরে ব্যাপক মানব হস্তক্ষেপের প্রতিফলে, সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষসহ আমাদের জীববৈচিত্র্যের আবাসভূমে নেমে আসে ভয়াবহ পারিবেশিক বিপর্যয়। মানুষ এখনও তার প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়নি। সত্যিকার ভাবে বলতে, আদৌ এগুলো যে মানব বশীভূত হবে হবে, এখন পর্যন্ত তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণও মেলেনি। এ সকল বিপর্যস্ততায় (যেমন: ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, টর্নেডো, শৈত্যপ্রবাহ, ভূমিকম্প, সুনামি প্রভৃতি) মানুষকে অবশ্যই অভিযোজিত হতে হবে। 'অভিযোজন' বলতে বোঝায় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলা বা মানিয়ে নেওয়ার মত

বিষয়গুলোকে। অর্থাৎ যে কোন জীবকূল তার বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি বা পরিবেশের সাথে সহাবস্থান বজায় রেখে নিজ অভ্যাসগত রীতি পাল্টানোর মাধ্যমে, সৃষ্ট পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়া বা খাপ খাইয়ে চলাকে বলা হয় অভিযোজন। মানুষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ এবং লোকায়ত জ্ঞান ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে অভিযোজন পন্থা উদ্ভাবন করতে হয়। হঠাৎ করে কোন কিছুকে অভিযোজিত করা সম্ভবপর নয়। এজন্য আবশ্যক দীর্ঘ সময়ের চিন্তা ও বাস্তবায়ন। প্রতিকূলতা থেকেই মানব মনে অভিযোজনের চিন্তা-ধারা জাগ্রত হয়। যেমন: এসব চিন্তা-ধারার প্রতিফলন স্বরূপ মানুষ খরা, লবণাক্ততা বা জোয়ার সহিষ্ণু বীজ বা জাত কিংবা প্লাবিত এলাকায় কিভাবে উঁচু বা ভাসমান স্থাপনা গড়ে বসবাস করা যায় তা আবিষ্কারের চেষ্টা করছে। আর এরূপ সহস্র চেষ্টার অন্তত একটিও যদি সাফল্যের দেখা পায়, তখন এই সফলতাকে পরিবেশবিদ্যার ভাষায় বলা হবে অভিযোজন।

মানুষ বস্তুত অভিযোজন সুলভ প্রাণী। যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সে তার মনন ও মিথজীবিতা (Symbiosis) দিয়ে টিকে আছে। বাংলাদেশের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই দেশটিতে আশঙ্কা রয়েছে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে এর দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল অংশ সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হতে পারে। এর ফলে উদ্ভূত হবে কোটি কেটি জলাবায়ু উদ্বাস্তু। তাছাড়া এদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, খরা, আর্সেনিক ও লবণাক্ততার প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি। নদীমাতৃক আমাদের দেশটির নদীগুলো ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা হারিয়ে ফেলছে নাব্যতা। জীববৈচিত্র্য শূন্য হতে চলা আমাদের বনাঞ্চলকে রক্ষায় এখনই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কাজেই সকল প্রকার বিপর্যয় মোকাবেলায় এই উচ্চ জনঘনত্বের দেশটিতে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিতে হবে যেটিকে তা হচ্ছে 'অভিযোজন'। এ কথা সত্যি যে বিশ্বায়নের এই যুগে, প্রশমণের কলকাঠি বাংলাদেশের হাতে নেই, তবে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা ও এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে 'অভিযোজনই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা'। সিডরের প্রভাবে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা কারও অজানা নয়। আবার ভবিষ্যতে এর অনুরূপ আর একটি ঘূর্ণিঝড়ও আমাদের কাম্য নয়। তবে ভবিষ্যত ক্ষয়ক্ষতির জন্যও আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে করে ঘূর্ণিঝড় আঘাতে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি প্রশমিত করা যায়। এ লক্ষ্যে যে সকল অভিযোজন পন্থা কার্যকর হতে পারে তা নিম্নে আলোচনাসহ উপস্থাপন করা হলো।

ক. গৃহের কাঠামোগত অভিযোজন

সকল প্রকার জনপদের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে গৃহ। একেক অঞ্চলের গৃহ নির্মাণ কৌশলাদিও একেক রকম। সিডর কবলিত চর কাসেম জনপদে খানা জরিপের ক্ষেত্রে গৃহের ধরণ বের করতে চালা:বেড়া:মেঝে - এপদ্ধতির নির্মাণ সমন্বয় ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে শতকরা ২৫ ভাগ গৃহ টিন: টিন: মাটি, ৪৯ ভাগ গৃহ টিন: বাশ বা কাঠ: মাটি, ২৬ ভাগ গৃহ গোলপাতা: খড় বা পাতা: মাটি দ্বারা নির্মিত বাড়ি পাওয়া গেছে। অত্যন্ত দুর্গম ও পল্লী জনপদ হওয়ায় জরিপের ফলাফল এমন হয়েছে। গৃহের আকার বিশ্লেষণ করে শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগ ঘর পাওয়া যায়, যেগুলোর আকৃতি মন্দির সদৃশ (Temple Shape)। মোট ১৮ থেকে ২০ ফুট উচ্চতার এ গৃহগুলোর উপরি অংশের পাটাতনের উপরে ৪ থেকে ৬ ফুট উচ্চতার একটি বা দুইটি কামরা থাকে। ফলস্বরূপ, এ ধরনের ঘর একটু শক্তভাবে তৈরি করা হলে সহজেই জলোচ্ছ্বাসের জোয়ারের সময় পাটাতনের উপরে আশ্রয় বা খাদ্য সহ অন্যান্য সামগ্রী সংরক্ষণ করা যায়। পাকা ঘর ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু, তবে এধরনের জনপদের অধিবাসীরা উল্লেখিত আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জনপদে শতকরা ৯০.৫ ভাগ গৃহ পাওয়া যায় যেগুলো মূলত একতলা অর্থাৎ যাতে কোন মাচা বা পাটাতন ছিলনা। সিডরের পরে এসব এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী অর্থ সাহায্যে ত্রাণের ঘর দেওয়া হয়েছে। ত্রাণের মাধ্যমে ঘর দাতা দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স, সৌদি আরব এবং এনজিও সমূহের মধ্যে এ.সি.আই, আহসানিয়া মিশন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এসকল ঘরও ছিল একতলা, পাটাতনবিহীন এবং এগুলোর নির্মাণ সমন্বয় ছিল; টিন: টিন: মাটি। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব ত্রাণের ঘরে

বাঁশের চাটইয়ের বেড়াও পাওয়া গেছে। ভেড়িবাধের উপরের ঘরগুলো ছাড়া অধিকাংশ ঘরেরই উঁচু বাস্তুভিটা নেই। মাত্র ৫ ভাগ ঘর পাওয়া যায় যেগুলো নিজ জমিতে উঁচু বাস্তুভিটায় ঘর তৈরি করা হয়েছে। এসকল ঘর অপেক্ষাকৃত বড় এবং মন্দির সদৃশ। এ ধরনের ঘরগুলোয় ঘূর্ণিঝড়ে কম ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়েছে। কেননা এসব ঘরের দক্ষিণভাগে থাকে স্বল্প ঢাল বিশিষ্ট বড় চালা। এরূপ চালা কার্যত অধিক বায়ুচাপ সহিষ্ণু এবং আগত বাতাসকে উর্ধ্বমুখি করে দিয়ে ঘরটিকে টিকিয়ে রাখতে পারে। আবার যেসকল বাড়ি নারিকেল, সুপারি, গাব, বট, খেজুর, তাল, বাঁশের সারি প্রভৃতি দিয়ে পরিবেষ্টিত, মোটামুটিভাবে এ ঘূর্ণিঝড়েও টিকে ছিল বলা যায়। কাজেই ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু যে ধরনের গৃহে অভিযোজন করা যেতে পারে; তা হচ্ছেঃ উঁচু বাস্তুভিটায়, নারিকেল-সুপারি গাছ বেষ্টিত, মাঁচা বা পাটাতন ও বায়ুচাপ প্রতিরোধী চালা বিশিষ্ট ঘর। তাছাড়া সামর্থ্য থাকলে পাকা ঘর করলে অধিক সুফল পাওয়া যেতে পারে। কারণ একতলা বা আরও সম্ভব হলে বহুতল গৃহে ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগে গরিব ও দুর্বল গৃহ প্রতিবেশীদের আশ্রয় দেয়া যায়। এই আশ্রয়ে জীবনের নিরাপত্তা অনেক বেশি থাকে। ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের পাশাপাশি সামর্থ্যবানদের মধ্যে গৃহ নির্মাণ ঋণ দিয়ে এরূপ পাকা ঘর তৈরিতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় রাখাইন সংস্কৃতিতে আর এক প্রকার ঘর তৈরির প্রচলন দেখা যায়, যেগুলো শক্ত কাঠের খুঁটির উপরে কাঠের মাঁচা বা পাটাতনের উপরে তৈরি করা হয়। এসব গৃহে সাধারণত কাঠের বেড়া এবং টিনের চালা থাকে। ঘরগুলোর নির্মাণ কৌশল বেশি কঠিন নয় এবং এ ঘরগুলো উঁচু হওয়ায় তা জোয়ার বা প্লাবনের পানিতে অক্ষত থাকে। বাংলাদেশ বন বিভাগের উপকূলীয় অফিস ও কর্মকর্তাদের গৃহগুলোও এ পদ্ধতিতেই তৈরি করা হয়েছে। তবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরূপ গৃহ তৈরির কোন প্রচলন দেখা যায়নি। উপকূলীয় জনসাধারণকে ঘূর্ণিঝড়ের অভিযোজন ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে এরূপ গৃহ তৈরিতে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে। এক কথায় বলা যায়, গৃহ যে ধরনেরই হোকনা কেন তা যেন অন্তত পক্ষে 'ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সহিষ্ণু গৃহ' হয় - এ বিষয়টি হচ্ছে উপকূলীয় গৃহী অভিযোজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

খ. বিকল্প পেশার সংস্থান

সমীক্ষা এলাকা চর কাসেম হচ্ছে বঙ্গোপসাগরীয় একটি পলিজ দ্বীপ। চরাঞ্চলের প্রকৃতি সম্পন্ন এ এলাকাটি মূল রাঙ্গাবালি দ্বীপটি হতে বুড়া গৌরাঙ্গ নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। বড় নদীর দ্বারা বিচ্ছিন্নতা, ভৌগোলিক অবস্থান ও সমুদ্র নৈকট্য প্রভাবিত এ দ্বীপের প্রায় শতভাগ অধিবাসী হচ্ছে মৎস্যজীবী। নিরক্ষর জন-অধ্যুষিত এ দ্বীপে নারী ও শিশুরা পর্যন্ত চিংড়ির রেণু পোনা ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। পুরুষেরা চিংড়ির পোনা ধরার পাশাপাশি ইলিশের নৌকায় কাজ করে। প্রায় ৯০ শতাংশ জেলে পরিবারই দাদন নির্ভর মহাজনের জাল-নৌকার সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে এসব পরিবার মূলত দ্বীপ অনাবাসী মহাজনী সম্প্রদায়ের জেলেমজুর হিসেবে কাজ করে এবং বিনিময়ে মাছ বা নগদ অর্থ পারিশ্রমিক হিসেবে পায়। ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে জাল-নৌকা হারালেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর দায়ভার দরিদ্র জেলেমজুরকেই বহন করতে হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে কাজ করতে হয়। নিজের একটি জাল-নৌকার আশা, আরতে নির্দিষ্ট পরিমাণ মাছ সরবরাহ ও ঋণমুক্তির চাপ প্রভৃতি কারণে জেলেদের অধিকাংশ সময় ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা নিয়েও নদী বা সমুদ্রে অবস্থান করতে হয় এবং পরিণামে অনেক ক্ষেত্রে জীবন ও জীবিকার সরঞ্জামাদি হারানোর মত দুর্দশায় পড়তে হয়। স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের তথ্যমতে, জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত চলে ইলিশ ধরার মৌসুম এবং অগ্রাহায়ণ-পৌষ থেকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত সময়কালকে বলা চলে বাগদা চিংড়ি রেণু সংগ্রহের মৌসুম। দুই মৌসুমের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ কার্তিক থেকে প্রায় বৈশাখ মাস পর্যন্ত জেলেদের কর্মহীন সময় কাটাতে হয়। এ সময়ে অনেকে বাদা নৌকায় কাজ বা মাটি কাটার শ্রমিক অথবা জাল-নৌকা মেরামতে সময় অতিবাহিত করে। জেলেদের অধিকাংশই হচ্ছে ভূমিহীন, ফলে জীবিকার সন্ধানে নদী বা সমুদ্রমুখী হওয়ার বিপরীতে এদের কোন গত্যন্তর থাকেনা। সমীক্ষা এলাকায় কৃষিজীবীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, এলাকা মূলত একটি ফসল বা একবার

ধানের আবাদ হয়। মূলত সেচের অপ্রতুলতা এর প্রধান কারণ। একফসলের চাষাধীন এ অঞ্চলে ফসলের মৌসুমটি হচ্ছে খরিপ মৌসুম (এপ্রিল থেকে নভেম্বর)। ধান চাষের পর কিছু জমিতে কলাই বা খেসারি বোনা হয় নভেম্বর - ডিসেম্বর মাসে এবং এরপরে রবি মৌসুমে (নভেম্বর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের বিরতি শুরু হলে এবং অব্যাহত থাকে মার্চ মাসের শেষাবধি) সামান্য জমিতে আলু, বাদাম, তিল, সবজির চাষ চলে। রবি মৌসুমের এ চাষ ব্যবস্থাকে স্থানীয় ভাষায় "ধুলট" বলা হয়ে থাকে। বৃষ্টি নির্ভর চাষব্যবস্থা হওয়ায় বছরের অবশিষ্ট সময় সেচ ব্যবস্থা যোগানে ব্যর্থ কৃষকরা কর্মহীন বা অন্য কোন অনিয়মিত পেশার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। ফলে এ অঞ্চলে তেমন পেশাগত উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং খানাগুলোর বার্ষিক আয় তেমনভাবে বাড়ছে না। এ অবস্থায় পরিবারগুলো তাদের দরিদ্র দশা হতে বের হয়ে সচ্ছল হতে পারছে না এবং পরিণামে আরও গরিব হয়ে পড়ছে। ঘূর্ণিঝড়ের পর অনেক জেলে জাল-নৌকা হারিয়ে ফেলে এবং কৃষকও জমির ফসল হারিয়ে আরও নিঃস্ব হয়ে যায়। এ নিঃস্বতা পরিবারগুলোকে ঋণগ্রস্ততা, খাদ্যসংকট, হতাশা ও অপুষ্টির শিকার হতে বাধ্য করে এবং এতে তারা শিক্ষার আগ্রহ হারিয়ে সন্তানকে বিদ্যালয়মুখী না করে বরং শ্রমমুখী করতে উৎসাহিত বোধ করে। এভাবে পরিবারগুলো ক্রমেই হতদরিদ্র হয়ে এক সময় শহুরে বস্তিবাসীতে রূপান্তরিত হয়। কাজেই সিডরের অনুরূপ ঘূর্ণি প্রলয়ের পর, প্রতিটি পরিবার হতে অন্তত একজন করে উপার্জমক্ষম ব্যক্তি নির্বাচন করে তাদের দিয়ে ত্রাণ বণ্টন ও উদ্ধার কাজ, পুনর্গঠন বা মেরামত কাজ, মাটি কাটার কাজ, রাস্তা ও বাঁধ তৈরি বা মেরামতের কাজ, স্থলভাগে আটকে যাওয়া জলযান মেরামত ও নামানোর কাজ প্রভৃতি করানো যেতে পারে। এবারের সিডর আগ্রাসন পরবর্তী সময়ে এ ধরনের কাজ লব্ধ পরিবারগুলো দ্রুত স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। অনেক ক্ষেত্রে ত্রাণের বিপরীতে শ্রম বিক্রয়ের সুবিধা প্রাপ্ত পরিবারগুলো আরও সহজে দুর্দশা ও ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিল। অন্তবর্তীকালীন এসব বিকল্প পেশা একদিকে জীবিকা নির্বাহকে সহজ করে দেয় এবং অপর দিকে খানা সদস্যদের দ্রুত পূর্ববর্তী মূল পেশায় প্রত্যবর্তন সহজতর হয়। এই অঞ্চলের কৃষি জমিকে রবি বা শুষ্ক মৌসুমে সেচ সুবিধার আওতায় এনে একে বহুফসলী জমিতে রূপান্তর করা আবশ্যক। এতে করে অঞ্চলটি একটি খাদ্য উদ্বৃত্ত অঞ্চলে পরিণত হতে পারে এবং পরিশেষে এই উদ্বৃত্ত খাদ্যশষ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা গেলে, তা ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী খাদ্যসংকট মোকাবেলায় যুগান্তকারী অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় বিবেচনায় রাখা অত্যাবশ্যক যে, উপকূলীয় এলাকায় ঘের সৃষ্টি করে লবণাক্ত পানির চিংড়ি বা কোড়াল মাছ চাষের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর সতঃস্ফূর্ত মতামত রয়েছে । চর কাসেমে ২৫ শতাংশ কৃষি ভূমিকে দ্বীপবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তর করা হয়েছে। বিগত ৪/৫ বছর ধরে চাষের জমিতে লবণ পানি প্রবেশ করানোর ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা ব্যাপকভাবে অবনমিত হয়েছে। এতে করে কৃষি উৎপাদন দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাসসহ দ্বীপের গরু-মহিষসহ অন্যান্য পশুচারণ ভূমি নষ্ট বা সীমিত হওয়ায়, কৃষিকাজ ও পশুপালন ব্যবস্থা এখন মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে। এ দ্বীপে বর্তমানে যতটুকু জমি রয়েছে তা সুবিধাভোগী বিত্তশালী শহুরে মহাজনদের নিকট থেকে গ্রহন করে, সুষ্ঠভাবে দ্বীপবাসীদের মধ্যে বণ্টন করা হলে এখানেও দ্বীপবাসীর প্রয়োজনীয় খাদ্যশষ্য উৎপাদন করা সম্ভব। সর্বোপরি ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকায় কারগরি শিক্ষার প্রসার ও দক্ষ জনশক্তি গঠন থেকে এ অঞ্চলে পেশাগত যাবতীয় সংকট উত্তরণ করা যেতে পারে।

গ. লোকায়ত জ্ঞানের ব্যবহার

লোকায়ত জ্ঞান (Indigenous Knowledge), মানুষের অভিযোজন বিষয়বস্তুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ গবেষণা কাজে সমীক্ষা এলাকায় ঘূর্ণিঝড় সংশ্লিষ্ট মানব উপলব্ধি, সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ক লোকায়ত জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এসব জ্ঞান স্বদেশজাত ও সম্প্রদায়গত, অর্থাৎ প্রকৃতি ও সংস্কৃতি হতে অর্জিত হওয়ায় অভিযোজন প্রক্রিয়ায় এ জ্ঞান বিশেষ তাৎপর্য রাখে। দ্বীপ রাঙ্গাবালির চর কাসেম সমীক্ষা এলাকার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ গৃহে এক প্রকার কাষ্ঠ নির্মিত ভাসমান উপযোগী সংগ্রাহক দেখতে পাওয়া যায়। খানা প্রধানদের ভাষ্যমতে এ সংগ্রাহক বক্সে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও খাদ্যসামগ্রী ঢুকিয়ে রেখে সংরক্ষণ করা যায়। গৃহের শক্ত খুঁটি বা গাছের সাথে দৃঢ় বাঁধন দ্বারা এই

সংগ্রাহকটিকে আটকে রাখলে, এটি ঘূর্ণিঝড়কালীন সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে অন্যত্র ভেসে বা হারিয়ে যেতে পারে না। নৌকার মিস্ত্রি দ্বারা নৌকা তৈরির পদ্ধতিতে এটি তৈরি করা গেলে এ সংগ্রাহক বক্সটিকে ভাসমান বয়া বা ভেলা হিসেবেও ব্যাবহার করা যায়। সিডরে শতকরা ১০ ভাগ লোকজন এ ধরনের বক্সকে অবলম্বন করে ভেসে থেকে জীবন রক্ষা করেছে বলা জানা যায়। সিডর উপদ্রুত সমীক্ষা এলাকায় শতকরা মাত্র ১২ ভাগ খানা মাটির নিচে গর্ত করে এবং এ গর্তে মাটির বা সিলভারের কলসি অথবা প্লাস্টিকজাত পাত্রের সাহায্যে শুকনো খাবার ও অর্থকড়ি সংরক্ষণ করেছিল। এসব গর্তের গভীরতা ছিল গড়ে দেড় থেকে অড়াই ফুট। ঘূর্ণিঝড় সংক্রমণের ১৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে মাটির গর্ত করা হলে তা অধিক টেকসই হয়। এ অঞ্চলে ঘরের ভিটিকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় 'পোতা'। মাটির পোতায়ও অনেকে গর্ত করে দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণ করে। নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ঘরের মধ্যে গর্ত করে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়। তবে নদী বা সমুদ্র নিকটবর্তী অর্থাৎ যেসব গৃহে পানির স্রোতের আঘাত তীব্রভাবে লাগতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে ঘরের অভ্যন্তরে মাটির গর্তে সম্পদ সংরক্ষণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ তীব্রভাবে আঘাত প্রাপ্ত ঘরের কাঁচা ভিটি স্রোতে ধুয়ে বা ভেঙে যায়। অতএব এরূপ মাটির গর্ত পদ্ধতির সংরক্ষণ কৌশলের ক্ষেত্রে গাছ বেষ্টিত শক্ত মাটির মধ্যে গর্ত করা সবচেয়ে টেকসই বা উপযোগী হয়।

আশ্চর্য হলেও সত্য যে, চর কাসেমে একটিও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নেই (সিডর ২০০৭ ডাটাবেজ)। এই দ্বীপ চরের নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রটির দূরত্ব চর থেকে দেড় বা দুই কিলোমিটার দূরে হলেও মধ্যবর্তী নদী প্রতিবন্ধকতার কারণে (বুড়া গৌরাঙ্গ নদী) দ্বীপবাসী ঐ আশ্রয়কেন্দ্রের সুবিধা গ্রহণ করতে পারেনা। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর স্বল্প ধারণ ক্ষমতা, নিকট প্রতিবেশীদের দ্বারা দ্রুত অবস্থান পূরণ ও প্রভাবশালীদের শক্ত নিয়ন্ত্রণের কারণে সাধারণ ও দূরবর্তী খানার সদস্যরা আশ্রয়কেন্দ্রে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। শতকরা ৬৫ ভাগ দূরবর্তী খানা প্রধানদের প্রশ্নোত্তর থেকে দেখা যায়, তারা মনে করেন আশ্রয় কেন্দ্রে তাদের আশ্রয় পাবার মত কোন ফাঁকা স্থান নেই। যেহেতু সমীক্ষা এলাকাগুলো অধিক জনঘনত্ব বিশিষ্ট এবং এখানে আশ্রয় লাভের অপ্রতুলতা পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান বলে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এরূপ ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকা অধিক মাত্রায় অরক্ষিত (Vulnerable) এবং দুর্যোগপ্রবণ (Disastrous)। তাই এ চরবাসীরা সিডরের পূর্বে নদী পার হতে না পেরে দ্বীপের ম্যানগ্রোভ বনের ধারে শক্ত গাছ ও দুটি মাঝারি ধরনের বটগাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গাছে আশ্রয় নিয়ে মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যেও তারা যেভাবে জীবন রক্ষা করেছে, তা একেবারে চরবাসীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একারণে বলা যায়, দুর্গত এলাকার আশ্রয়কেন্দ্র ও বসতবাড়ির চতুর্পার্শ্বে ঘূর্ণিঝড় সহিষ্ণু বৃক্ষরাজি অধিক মাত্রায় রোপণকরা। এসব বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে বট, গাব, অশত্থ, তেঁতুল ও নারিকেল প্রভৃতি। জনসংখ্যার অনুপাতের ভিত্তিতে এরূপ গাছ রোপণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা হলে মানুষ এগুলোকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় বিকল্প আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। শক্ত গাছে শুধু আশ্রয় নয়, এসব গাছে মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আড়াআড়িভাবে বাক্স বা প্লাস্টিকে ভরে বৃক্ষ ডালে বেঁধেও সংরক্ষণ করা যায়। শক্ত ডালে টেকসই বাঁধনের মাধ্যমে সমীক্ষা এলাকার শতকরা ৪৭ ভাগ খানা তাদের কোন না কোন প্রকার দ্রব্য সংরক্ষণের কথা জানিয়েছে।

উপকূলীয় সক্রিয় বদ্বীপ এলাকায় যেসব উদ্ভিজের আধিক্য লক্ষণীয় তন্মধ্যে হোগলা পাতা অন্যতম। এ পাতা দিয়ে পাটি, বেড়া, হাতপাখা, মাঁচা, শিকা প্রভৃতি তৈরি করা হয়। মহিলারা এসব পাতা দিয়ে দ্রুত শিকা বানাতে পারে এবং শতকরা ৫৫ ভাগ নিম্নবিত্ত পরিবারে এ পাতার তৈরি শিকার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। প্রায় সকল খানার মহিলা সদস্যরা জানায়, এ শিকায় হাড়ি-পতিল পুরে তা শিকা সমেত শক্ত গাছের ডালে বা ঘরের উঁচু খুঁটিতে বাঁধনসহ ঝুলিয়ে রাখলে দ্রব্যসামগ্রী সংরক্ষণে ভাল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেসব পরিবারের পাত্র বা বাক্সের অভাব রয়েছে তারা এই 'শিকা পদ্ধতি' অনুসরণ করেই দ্রব্য সংরক্ষণ করতে পারে। এছাড়া গৃহ বিধ্বস্ত হবার পরে এ পাতা দিয়ে দ্রুত বেড়া গড়ন ও ঘর তৈরির সহজলভ্য উপকরণ হিসেবে ব্যাবহার করা যায়। এ পাতা নদীর খাড়ি, নিচু জলা, চাষের অনুপোযুক্ত জলাবদ্ধ এলাকা, নদীজ জোয়ার-ভাটা সংঘটিত স্থানে, বিশেষ করে সরকারি খাস বা বন

বিভাগের জমিতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, মানুষের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিক মাত্রায় লাগানো যেতে পারে। স্বাদু পানির এই জলজ উদ্ভিদটি প্রাকৃতিক ভাবে সমীক্ষা এলাকাসমূহে স্বাভাবিকভাবে জন্মায়। বর্তমানে এ পাতার অধিক আহরণে সংকটও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতএব, এপাতার সংরক্ষণ, অভিযোজন ও উপযোগিতা নিরূপণে আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

ঘূর্ণিঝড় হতে পারে -- এই প্রসঙ্গে কি বা কোন ধরনের প্রাকৃতিক পূর্বাভাস বুঝতে পারা যায়? এরূপ কারণ অনুসন্ধানে বেশ কিছু নতুন ও চমৎকার তথ্য পাওয়া গেছে। বয়স্ক মানুষ এবং অভিজ্ঞ জেলে ও কৃষকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বানুমান বিষয়ক এ প্রশ্নোত্তরটি অনুসন্ধান করা হয়েছে। অভিজ্ঞ জেলে ও সমুদ্র উপকূলে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর নিকট হতে পাওয়া তথ্য অনুসারে, সাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠলে সামুদ্রিক পাখিরা (যেমন: বদর কবুতর) সদলবলে উপকূলে প্রত্যাবর্তন করে। অনেকে এ থেকে অনুমান করে, ঘূর্ণিঝড় হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের এলোমেলো বায়ু প্রবাহের প্রাক্কালে গুমট আবহাওয়ায়, বিভিন্ন উড়ুক্কু পতঙ্গ এলোমেলোভাবে খোলা আকাশে উড়তে আরম্ভ করে। অনেকে জানায়, এসব উড়ুক্কু পতঙ্গের মধ্যে ডাঁশ মাছি গৃহপালিত পশুর গায়ে আক্রমণ করে। ফলে গৃহপালিত পশুগুলো অর্থাৎ গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি লাফালাফি আরম্ভ করে। বয়স্করা জানায়, ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের গতিপ্রকৃতি সহজে বোঝা যায় না। তবে প্রায় সকলেই মনে করে এ ঝড়ের বাতাস অবশ্যই দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়েই আসে। উত্তাল সাগর ও বিশাল টেউয়ের প্রকৃতিও অধিবাসীদের জানান দেয়, হয়তো ঘূর্ণিঝড় অত্যাসন্ন। জেলেরা এ সময় আঞ্চলিক জোবা-ডালার গোন বিশ্লেষণ অর্থাৎ জোয়ারের প্রকৃতি দেখেও কিছুটা বুঝতে পারে - ঘূর্ণিঝড়ের ফলে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে পানির উচ্চতা কেমন হতে পারে। স্থানীয় ভাষায় জোবা হচ্ছে তেজ কটাল (Spring tides) এবং ডালা হচ্ছে মরা কটাল (Neap tides)। অধিবাসীরা জানায়, জোবার সময়ে জোয়ারের পানির উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, এর ফলে জোয়ারের স্রোত বৃদ্ধিসহ ও প্লাবনের মাত্রা বেড়ে যায়। জোয়ার ও ভাটার মধ্যবর্তী সময়কে জেলেরা গোন বা দুমুইর‍্যা গোন বলে। জেলেরা জানায়, নভেম্বর, ২০০৭ এ সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় সিডর, ডালা ও ভাটার মধ্যবর্তী গোনের সময়ে আসে। এটি জোবা চলাকালীন সময়ে সংঘটিত হলে জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা আরও ভয়াবহ হত, যার ফলে সৃষ্ট বিপর্যয়ের মাত্রা আরও কয়েকগুন বেশি হত বলে জেলেরা আশঙ্কা প্রকাশ করে। অতএব, বলা চলে জোবাকালীন সময়ে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে সতর্কতা ও ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালীভাবে গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা

সিডর উপদ্রুত সমীক্ষা এলাকাসমূহে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিশেষ ভাল দিক খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তা হচ্ছে গ্রামবাসী বিশেষ করে প্রতিবেশিদের মধ্যকার পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, প্রায় শতভাগ গ্রামবাসী ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে একে অন্যের ভগ্ন ঘর পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সাহায্য-সহযোগিতা করে। তাছাড়া শতকরা ৩৮ ভাগ পরিবার অপর অভুক্ত পরিবারকে নিজ উদ্বৃত্ত খাবার দিয়ে সাহায্য করার কথা জানায়। এ সত্যতা নির্ণয়ে অপর এক প্রশ্নোত্তরে জানা যায় শতকরা ৩৫ ভাগ পরিবার প্রতিবেশির কাছ থেকে খাদ্য সহায়তা পেয়েছে। অবশিষ্ট ৬২ ভাগ পরিবারের অপরকে খাদ্য বা অন্যকিছু দিয়ে সাহায্য করার মত পরিস্থিতি ছিল না। সমীক্ষায় দেখা যায় খানাপ্রধানের শতকরা ৪১ ভাগ প্রতিবেশীদের সাথে অতি সুসম্পর্ক, ২৭ ভাগ সুসম্পর্ক, ৩০ ভাগ মোটামুটি সম্পর্ক এবং মাত্র ২ ভাগ খারাপ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে। পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের গতি ত্বরান্বিত করে এবং পরিস্থিতির দুর্দশাসমূহ উত্তরণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এর ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে দ্রুত অভিযোজন সম্ভবপর হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে প্রশমিত হয়।

ঙ. খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন

উপকূলীয় চরাঞ্চলের অধিকাংশ লোকজন নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র শ্রেণীর হওয়ায়, এই দরিদ্র শ্রেণীর প্রায় শতভাগ পরিবারকে দুর্যোগ কালীন সময়ে অনাহারে বা অর্ধাহারে দিনযাপন করতে হয়। সমীক্ষাকৃত মোট খানাসমূহের মধ্যে শতকরা ৮১ ভাগ পরিবার সিডর প্রলয়ের পরবর্তী কমপক্ষে ৩ থেকে ৭ দিন, কোন প্রকার ত্রাণ সামগ্রী হাতে না পাওয়া পর্যন্ত অনাহারে বা অর্ধাহারে কাটিয়েছে। এরপর ত্রাণ সামগ্রী বিশেষ করে খাদ্য সাহায্য এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্যে কর্মসূচির মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পুনর্গঠন কাজ পাওয়ার পরে, পরিবারগুলেতে খাদ্য সংকটগত এই দুরবস্থা অনেকাংশে লাঘব হয়। সিডর উপদ্রুত এলাকার খাদ্যাভাস পর্যালোচনা করে জানা যায়, মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত ও মাছ। বহু পরিবার রয়েছে যাদের অনেক সময় তিন বেলা খাদ্য যোগাড় করতে হিমশিম খেতে হয়। এখনও শতকরা ৪৯ ভাগ পরিবার তিনবেলা পূর্ণভাবে খাবার খেতে পারে না। শতকরা ৬৯ভাগ পরিবার তাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভাস নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা সকলেই এরূপ দুরবস্থার উন্নতি কামনা করে। খাদ্যগ্রহণের সময় লোকজন বেশি পরিমাণে ভাত খায় এবং অনেক সময় শুধু ভাতের সাথে সামান্য দু-এক প্রকারের সবজি থাকে। জেলে সম্প্রদায় পেশাগত উপযোগের কারণে সপ্তাহে ৪ থেকে ৫ দিন মাছ খেয়ে থাকে। লোকজন আলুকে কখনোই ভাতের বিকল্প হিসেবে মনে করে না। তারা সপ্তাহে দু-এক দিন আলু খায়, তাও সবজি বা ভর্তা হিসেবে। অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যাভাস যেমন: শাক-সবজি, ফলমূল, দুধ, ডিম প্রভৃতি সাগর পারে প্রায় অপ্রতুল এবং এ ধরনের সুষম পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে অপুষ্টি হয় - এ বিষয়ে শতকরা ৯১ ভাগ পরিবারই অসচেতন। গৃহে উৎপাদিত শিম, লাউ জাতীয় সবজি, প্রতিপালিত হাঁস-মুরগির ডিম শতকরা ৮৬ ভাগ পরিবার বাড়তি আয়ের আশায় ও ক্ষুদ্র ঋণের সাপ্তাহিক কিস্তি জোগাড়ের জন্য, নিজেরা না খেয়ে বাজারে বিক্রয় করে। খানার ০ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের ওজন ও উচ্চতা পরীক্ষা করে পূর্ণমাত্রায় অপুষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ অঞ্চলে শতকরা ৯৪ ভাগ শিশুই অপুষ্ট এবং ১৪ থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত বয়সী মায়েদের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৯ ভাগ অপুষ্টি পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া জরিপের ফলাফলে দেখা যায় শতকরা ১১ ভাগ মা কোন না কোন সময়ে মৃত সন্তান প্রসব করে অথবা শিশুটি জন্মের ৫ বছরের মধ্যে মারা গেছে।

চ. যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন

আমাদের দেশে এ যাবতকাল দুর্যোগ প্রশমণ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় কিন্তু কিভাবে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায় এবং কিভাবে দুর্যোগকে সামলে নিয়ে জীবন জীবিকা এগিয়ে নেয়া যায় এ নিয়ে নানা ধরনের পরিকল্পনা এবং তার নানামুখী প্রয়োগ এদেশে হয়েছে। বর্তমানে সব ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলায় একটা সামগ্রিক (Holistic) এবং সমন্বিত (Co-ordinated) প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে এগুনোর চিন্তা-ভাবনা হচ্ছে। এটা ঠিক সরকারের একার পক্ষে দুর্যোগের সর্বগ্রাসী থাবাকে সংযত করা সম্ভব নয়। এখানে সরকারী সংস্থা, বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন, বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়, নাগরিক সমাজ, আক্রান্ত জনগোষ্ঠী সকলেরই সামগ্রিক সমন্বয় দরকার (কাদির, ২০০৮)। এলাকার জনগণকে যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের আওতায় আনা অত্যাবশ্যক। এর ফলে অভিযোজন প্রক্রিয়ার কার্মিক উপযোগিতা আরও শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ হবে। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমন সম্পর্কিত সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রকার উদ্যোগ ও পদক্ষেপসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা আবশ্যক। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ক্ষতি পূরণে প্রয়োজন- জনপ্রতিনিধি, সরকারের প্রশাসন ও ভুক্তভোগী জনসাধারণের সততা, সহমর্মিতার সাথে সার্বিক সহযোগিতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সহ সচেতনতা। তাছাড়া আপৎকালীন সময়ের পূর্বে ও পরে ক্ষতি প্রশমন এবং অভিযোজনমূলক লব্ধ জ্ঞানের কার্মিক ফল পেতে এনজিও এবং দেশী বিদেশী সাহায্য সংস্থার প্রশিক্ষণ, সহানুভূতি এবং ত্রাণ তৎপরতা ঘূর্নি দূর্গতদের দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে সাহায্য করে। সমীক্ষা এলাকা সমূহে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও জরিপের মাধ্যমে উপরেল্লিখিত বিষয়সমূহ জানা গেছে। ঘূর্ণিঝড় সংঘটনের সকল সম্ভাব্য এলাকার

প্রতিটি ঘরে বাংলাদেশে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোর সময়পঞ্জি এবং সতর্ক সংকেতের পতাকা উত্তোলন পদ্ধতির দেয়ালচিত্র রাখা অত্যাবশ্যক। এর ফলে প্রতিটি গৃহে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে উঠবে। যা যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমণে কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনতে পারে আশা করা যায়।

ছ. প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনশক্তি গঠন

সমুদ্রোপকূলীয় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সকল প্রকার পেশাজীবীদের ক্ষয়ক্ষতির প্রধান নিয়ামক হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে ফসলের বিনাশ কিংবা কাঠের গাছ ভাঙা বা উপরে যাওয়া প্রভৃতি কারণে খানাসমুহের আয় কাঠামোতে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। একইভাবে জেলে সম্প্রদায়, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে তাদের নৌকা-জাল ও জনবল হারিয়ে মারাত্মক বিপর্যস্ততার শিকার হয়। ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা করলে করে যে কেউ সহজেই অনুধাবন করতে সমর্থ হবেন যে, এর আগ্রাসনে গৃহস্থ কৃষক, জেলে অথবা অন্য যে কোন প্রাথমিক পর্যায়ের পেশাজীবীদের আয়ের উৎসগুলো কতকটা বিপর্যস্ত হয়েছে। এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মোকাবেলা এবং তদীয় অভিযোজনের উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে-- প্রতিটি খানা হতে অন্তত একজন সদস্য নির্বাচন করে, তাকে যে কোন প্রকার কারিগরি ট্রেড বা কুটির শিল্পের উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রশিক্ষণের পর প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে- প্রবাসে রপ্তানি বা দেশেই চাকুরি অথবা ঋণের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা যেতে পারে। এর ফলে দুর্গত এলাকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে পেশার বৈচিত্র্য আরও বৃদ্ধিসহ মাথাপিছু আয় ও দেশজ উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। এছাড়া পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের কাজে উৎসাহিতদের মধ্যে- সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক। একটি দক্ষ হাতকে কাজের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় না। কর্মহীনতা হতেই অপরাধের সূত্রপাত ঘটে। এ কারণে প্রতিটি কর্ম অনুসন্ধানী মানুষের কাজ তথা জীবিকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং কাজের সংস্থান হলে, অর্জিত অর্থানুকূল্যে পারিবারিক অভাব-অনটন বিদূরিত করাসহ বিভিন্ন বিপর্যয়কর পরিস্থিতি দ্রুত কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়।

জ. প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও পুনর্বাসন

সিডর প্রলয়ের শিকার দুর্গত অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী হচ্ছে দরিদ্র। বলা চলে এখানকার প্রায় প্রতিটি পেশাজীবীদের অবস্থান প্রান্তিক পর্যায় ও ঝুঁকির মধ্যে। পরিবারগুলোর নিম্ন আয় ও তেমন সঞ্চয় না থাকায় এদের মধ্যে, ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী বিভিন্ন প্রতিকূলতা দূরীকরণে প্রধান অবলম্বন হিসেবে কাজ করে - 'বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম'। বিপর্যস্ততার মুখোমুখি দরিদ্র মানুষগুলোর অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বিভিন্ন প্রকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। এসব কার্যক্রমে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও (যেমন: হীড বাংলাদেশ, সেভ দ্যা চিলড্রেন, অক্সফাম, হেলথ কেয়ার, সেইপ, ব্রাক, সংগ্রাম, কোডেক, আহসানিয়া মিশন প্রভৃতি), বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য (উদাহরণস্বরূপ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, জাপান, মালায়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য), আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থাগুলো সিডর পরবর্তী আর্থ-সামাজিক সংকট ও বিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনরুদ্ধারে ব্যাপক অবদান রেখেছে। ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পটুয়াখালীর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় ৫০০টি পাওয়ার টিলার, ৮০০টি হস্তচালিত সেচ পাম্প, ২০০টি শক্তিচালিত সেচ পাম্প, ৫০০ ফুট পাম্প, ১০০০টি প্যাডেল থ্রেসার, ৫০০টি সেচ পাম্পের চাহিদাপত্র পাঠিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে।

সারণি ১ : সিডর পরবর্তী পটুয়াখালী জেলা পরিষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের বিবরণ	অর্থ বরাদ্দ (টাকা)
০১	দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ	সিডর ক্ষতিগ্রস্ত সকল উপজেলায় তাৎক্ষণিক ত্রাণ হিসেবে ৫০০টি বিছানার চাদর বিতরণ	৬৬,৭০০/- (নিজস্ব তহবিল)
০২	সিডর ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্প	সিডর' কবলিত এলাকাবাসীর বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট নিরসনকল্পে জেলা পরিষদ ৪৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন। এসব গভীর নলকূপ ত্রাণ হিসেবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির জন্য স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাছাইকৃত স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে স্থাপন কাজ সম্পাদন। উপজেলা ভিত্তিক তালিকা: পটুয়াখালী সদর-০৫টি, গলাচিপা-১৫টি, কলাপাড়া-০৬টি, মির্জাগঞ্জ-০৬টি, দুমকি-০৫টি, বাউফল-০৫টি, দশমিনা-০৫টি।	২২,৯৮,০০০/- (এডিপি)
০৩	সিডোরোত্তর উন্নয়ন কার্যক্রম (মেরামত/সংস্কার/পুনঃনির্মাণ/নির্মাণ)	মোট ৪১টি প্রকল্প (বাস্তবায়নাধীন)। (২৮টি প্রকল্প কমিটি এবং ১৩টি টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)।	৩৯,৩০,০০০/- (এডিপি)
০৪	সিডোরোত্তর উন্নয়ন কার্যক্রম (মেরামত/সংস্কার/পুনঃনির্মাণ/নির্মাণ)	মোট ১৪টি প্রকল্প (বাস্তবায়নাধীন)। (প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে)।	৮,০০,০০০/- (জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিল)
		মোট	৭০,৯৪,৭০০ টাকা

উৎস: পটুয়াখালী জেলা পরিষদ, ২০১০।

সারণি ২ : ঘূর্ণিঝড় সিডরে পটুয়াখালী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাপ্ত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ (০৫-০২-০৮ তারিখে প্রাপ্ত তথ্য):

ক্রম	বরাদ্দের খাত	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ব্যয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
০১	বীজ	১৮.৭৫	১৪.৫১
০২	সার	১২.১১	০৪.৯০
০৩	ব্যাগ ও প্যাকেট	০৫.৫০	০১.৮০
০৪	পরিবহন ও আনুষাঙ্গিক	০০.৫৪	০০.২৪

উৎস: পটুয়াখালী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ২০০৮।

নভেম্বর, ২০০৭ সালে সৃষ্ট সিডরকে সকলে একবাক্যে তুলনা করে মহাপ্রলয়ের সাথে। এই প্রাণসংহারী দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে যে মারাত্মক আর্থ-সামাজিক বিপর্যস্ততা নেমে আসে, তার প্রশমন, পুনর্গঠন ও উন্নয়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে সকল প্রকার সরকারি ও বেসরকারি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম। তবে মানুষের জীবিকায়ন সংশ্লিষ্ট খাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সাহায্য-সহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়নি। যতটুকু হয়েছে তা বলা চলে যৎসামান্য। ত্রাণে প্রাপ্ত সামগ্রী ও নগদ অর্থ সাহায্য মানুষ তেমন কোন জীবিকার উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারেনি। প্রথমত ব্যাপক অভাব এবং দ্বিতীয়ত সঞ্চয়ে অসচেতনতা ও স্বল্প পুঁজি থেকে এসমস্যা সৃষ্ট হয়েছে বলা যায়। জীবিকায়ন অনগ্রসর পশ্চাৎপদতা ব্যতিরেকে প্রায় শতভাগ পরিবার তাদের তাৎক্ষণিক সমস্যাসকল উত্তরণে বিশেষ করে খাদ্য সাহায্যের ব্যাপারে সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। যদিও অনেকে এ খাতেও আংশিক সমস্যা ও ক্ষুদ্র মাত্রায় দুর্নীতির উপস্থিতির জানাতে চেষ্টা করে। যা হোক জেলা প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও স্বশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সহযোগিতার ফলে 'বিভিন্ন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম' কে বহুলাংশে সফল বলে স্বীকৃতি দেয়া যায়। সামগ্রিক কার্যক্রমের উপযোগিতার কারণে বর্তমান ২০০৯ সালে এসে দেখা যায়, সিডর প্রলয়ের ক্ষতিগ্রস্ততার শিকার জনপদগুলো বলা যায় উপরে আলোচিত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে বেশ সফলভাবে পুনরাভিযোজিত হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

মানুষ বস্তুত অভিযোজন প্রয়াসী প্রাণী। যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সে তার মনন ও মিথজীবিতা দিয়ে টিকে আছে। বাংলাদেশের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের এই দেশটিতে আশঙ্কা রয়েছে, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনে এর দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল অংশ সমুদ্রবক্ষে নিমজ্জিত হতে পারে। এর ফলে উপকূলীয় এলাকায় উদ্ভূত হবে কোটি কেটি জলাবায়ু উদ্বাস্তু। তাছাড়া এদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা, আর্সেনিক ও লবণাক্ততার প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি। নদীমাতৃক আমাদের দেশটির নদীগুলো ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে কিংবা হারিয়ে ফেলছে নাব্যতা। ক্রমশ জীববৈচিত্র্য শূন্য হতে চলা আমাদের বনাঞ্চলকে রক্ষায় এখনই সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কাজেই সকল প্রকার বিপর্যয় মোকাবেলায়, উচ্চ জনঘনত্বের বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গুরুত্ব দিতে হবে যেটিকে তা হচ্ছে 'অভিযোজন'। একথা সত্যি যে বিশ্বায়নের এই যুগে, প্রশমনের কলকাঠি বাংলাদেশের হাতে নেই, তবে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা ও এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে 'অভিযোজনই হচ্ছে সবোৎকৃষ্ট পন্থা'।

অভিযোজন বলতে যদি বেঁচে থাকাকে বোঝায়, তবে বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। নিজেদের বেঁচে থাকার সংগ্রামে তারা কোনো প্রকার ত্রুটি রাখে না। নিজস্ব মেধা ও আর্থিক সঙ্গতির ভেতরে যা পারা যায়, তারা তাই করেছে। মাত্র কয়েক ঘন্টার সিডর আগ্রাসনের ফলে মানুষ ও গবাদি পশুর অসংখ্য মৃতদেহ এবং ধ্বংসযজ্ঞ জাগ্রত করে গোটা বিশ্ব বিবেকের মানবিক বোধ। এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বরগুনায় স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয় নেমে আসে। এতে করে উৎপাদন ও সরবরাহমুখী শিল্পসমূহ স্থবির হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের পাশাপাশি জেলার টেলিফোন, মোবাইল ও ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থাও মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। এছাড়া সড়ক পথে ব্যাপক বৃক্ষপতনের ফলস্বরূপ সিডর উপদ্রুত বরগুনায়, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে নেমে আসে অচলাবস্থা। সকল বিপর্যয় ও অচলাবস্থা কাটিয়ে বরগুনা জেলার অধিবাসীরা আবার নতুন জীবন শুরু করেছে। বিভিন্ন প্রকার সরকারি-বেসরকারি এবং দেশি-বিদেশি সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতা তাদের এই নতুন জীবন সূচনা করতে যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। তবুও বলা যায় স্থানীয় মানুষের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা এবং লোকায়ত ঐতিহ্য ও জ্ঞান তাদের সামাজিক জীবনের মূল পুঁজি। স্থানীয় মানুষ এত বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরেও কখনও মনে করে না যে, এলাকাটি তাদের বাসের জন্য অনুপযোগী অথবা ছেড়ে যেতে হবে। এর মূল কারণ হচ্ছে সমুদ্রের নৈকট্য বরগুনা জেলাকে সামুদ্রিক সম্পদ, সুলভ নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটন শিল্পের উপযোগিতা দিয়েছে। প্রকৃতির এরূপ দানে জেলার অধিবাসিরা তাই বরং ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত দুর্যোগসমূহ মোকাবেলা করে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে জীবিকা অন্বেষণেই অধিক আগ্রহী।

সম্প্রতি বিভিন্ন সরকারি সংস্থা এবং এনজিওগুলো সিডর দুর্গতদের উদ্ধার ও পুনর্বাসনে এগিয়ে আসলেও তাদের সমস্যার সম্যক উপলব্ধি না করে সাময়িক উপদেশ এবং কিছু সাহায্য দিয়ে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে জনসমক্ষে প্রকাশ করে থাকে। এব্যাপারে জাতীয় দৈনিকগুলো নিজেদের কিছু কর্মকাণ্ড ফলাও করে প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জন্য আরো বৃহৎ পরিসরের সার্বিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। দরিদ্র এই জনগোষ্ঠী আজো সেই আশায় তাকিয়ে আছে। বস্তুত, তারা এক সময় ভুলে যায় যে, তাদের জন্য কেউ এগিয়ে আসবে। তাই তারা নতুন করে, নতুন বছরে, নতুন "সিডর"-এর অপেক্ষা করে, এটাই তাদের নিয়তি এবং সম্ভবত বরগুনা জেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রবলভাবে এই কথাই বিশ্বাস করে। আমাদের করণীয় বাংলাদেশের উপকূলীয় জনপদ, জনগণ ও জীববৈচিত্র্যকে রক্ষায় আরও সচেতন হওয়া। আলোচ্য নিবন্ধে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব পর্যালোচনার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের অভিযোজন পন্থা অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। সিডরের প্রভাবে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা কারও অজানা নয়। আবার ভবিষ্যতে এর অনুরূপ আর একটি ঘূর্ণিঝড়ও আমাদের কাম্য নয়। ভবিষ্যত ক্ষয়ক্ষতির জন্যও আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুত থাকতে হবে, যাতে করে ঘূর্ণিঝড় আসলেও মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি প্রশমিত করা যায়।

গ্রন্থ নির্দেশ

কাদির, আনোয়ারুল, ২০০৮, বাংলাদেশে দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সিডর দুঃসহ স্মৃতির ১ বছর, রূপান্তরঃ খুলনা।

ঘূর্ণিঝড়: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী, ২০০৮, হীড বাংলাদেশঃ মিরপুর, ঢাকা।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ২০১১, ঘূর্ণিঝড় সিডর, দেয়াল প্রকাশনা, বরগুনা।

রহমান, মোঃ মোখলেসুর, ২০০৮, সতর্কবার্তার প্রতি অবহেলাই বিপুল প্রাণহানির জন্য দায়ী। সিডর ২০০৭। পৃষ্ঠাঃ ৪১।

সিডর ২০০৭ ডাটাবেজ, পটুয়াখালী জেলা প্রশাসন, পটুয়াখালী।

হোসেন, সোহরাব, সিডর প্রলয় চোখে দেখা অবিশ্বাস্য দুর্যোগ, সিডর ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ৩৭-৩৯।

সিডর ২০০৭, পটুয়াখালী জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় প্রকাশিত ম্যাগাজিন, বুলবুল প্রিন্টার্সঃঢাকা।

Asian Disaster Reduction Center (ADRC), Country Paper: Bangladesh. 2009, Kobe, Hyogo, Japan. Retrieved from http://www.adrc.asia/countryreport/BGD/BGDeng98/index.html

Bangladesh Bueru of Statistics (BBS), 2001, Population Census Report-2001. Ministry of Finance and Planning, Dhaka: Government of People's Republic of Bangladesh.

Indian Meteorological Department (IMD), 2007, Satellite Images, Proj: Marcator, Sat:Kalpana-1, date-10.11.2007 to 15.11.2007. Retrieved from http://www.imd.gov.in/

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Miami Regional Library At the National Hurricane Center. NOAA Miami Regional Library. 2009. 1401 Constitution Avenue,Washington DC, 20230. Retrieved from http://www.noaa.gov/

Marine Meteorological Division (MMD), 2007, Image of Tropical Cyclone Sidr. Califonia, USA. Retrieved from http://www.wunderground/blog/JeftMasters/comment.html?entrynum=863&tstamp=200711

National Aeronautics ans Space Administration (NASA), 2007, Tropical Cylone Sidr. Washington DC. Retrieved from http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8220

Yamane, Taro Statistics: An Introductory Analysis, 1997, Second edition, harper and Row, New York.

GOB, 2008, 'Super Cyclone Sidr 2007 Impacts and Strategies for Interventions', Ministry of Food and Disaster Management, Dhaka: Government of People's Republic of Bangladesh, retrieved from http://www.cdmp.org.bd/reports/Draft-Sidr-Report.pdf, viewed on 10 October, 2009.

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Images of the Day: November 16, 2007 - Tropical Cylone Sidr. Retrieved from http://modis.gsfc.nasa.gov/gallery/individual.php?db_date=2007-11-16

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজন কৌশল

মু. ইব্রাহীম খলিল*

Abstract: Climate change is considered the root cause of increasing intensity and velocity of cyclone disaster around the world. People living in the coastal areas will be severely affected by the disaster emanated from climate change. In Bangladesh, life and livelihood of the coastal people especially agriculture and people associated with agriculture will be severely affected. As a result, food security of the country will be jeoparadized, and millions of farmers living in the Bangladesh coast will be forced to take shelter in towns and other places loosing livelihood opportunities. Under such circumstances, this article discusses the impact of climate change on the farmers of Bangladesh coast and their coping strategies with the impending adverse affect of climate change.

১. ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বের অস্তিত্বের জন্য একটি গভীর ভাবনার বিষয়। পরিবেশ বিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিদগণ মনে করেন বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বে দুর্যোগের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। বিগত ৩০ বছরে এশীয় অঞ্চলের দুর্যোগের চিত্র বিশ্লেষণ করলে এটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। যেমন: ১৯৭১-৭৫ সময়ে ৭৪টি, ১৯৭৬-৮০ সময়ে ১২৬টি, ১৯৮১-৮৫ সময়ে ১৩৮টি, ১৯৮৬-৯০ সময়ে ১৫৯টি, ১৯৯১-৯৫ সময়ে ১৭৬টি এবং ১৯৯৬-২০০০ এই পাঁচ বছরে ২০৫টি দুর্যোগ আঘাত হেনেছে।[১] দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশকে সবচেয়ে দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC)। বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পড়বে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায়। প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৯,৩৮০ বর্গ কিলোমটার বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বহু সংখ্যক দ্বীপ, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের ফানেলাকার অংশ।[২] এই ফানেল আকৃতির কারণে এখানে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।[৩] বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন এ সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিয়েছে বহুলাংশে। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ই-মেইল: ikhalilso@yahoo.com

[১] দৈনিক *প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১।

[২] বাংলাপিডিয়া, "উপকূলীয় ব্যবস্থাপনা" ভুক্তি।

[3] A. K. Gain and M. A. Bari,"Effect of Environmental Degradation on National Security of Bangladesh," *Asia Pacific Journal on Environment and Development*, vol. 14, no.2[December 2007]:18.

১৫টি জেলার ৫২টি উপজেলায় বাস করে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক।[৪] ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে উপকূলীয় এলাকায় জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতির পাশাপাশি কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মারাত্মকভাবে। কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে এদেশের মানুষের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য-নিরাপত্তা ব্যপকভাবে হুমকির মুখে পতিত হবে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। সুতরাং বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান হুমকির মুখে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের টিকে থাকা ও অভিযোজন কৌশল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গবেষণাকর্ম সম্পাদন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করবে ও উপকূলে বসবাসকারী কৃষকদের vulnerability কমিয়ে এনে একটি স্থিতিস্থাপক কৃষক কমিউনিটি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বর্তমান গবেষণাটি সম্পাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের টিকে থাকা ও অভিযোজন কৌশল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান গবেষণাটির সাধারণ উদ্দেশ্য। তবে বিশেষ উদ্দেশ্য সমূহ হলোঃ

ক) বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের উপর প্রভাব জানা এবং

খ) বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রেক্ষিতে কৃষকদের অভিযোজন কৌশল সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান।

১.৩ গবেষণার পদ্ধতি

উদ্দেশ্যর নিরিখে গবেষণা প্রবন্ধটি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণাত্মক ধরনের। এটি প্রাথমিক (Primary) ও সহায়ক (Secondary) এ দু' ধরনের উপকরণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এজন্য প্রবন্ধের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বই, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন, দৈনিক পত্রিকা এবং সাময়িকী থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে উত্তরদাতা নির্বাচন করে পূর্বেই তৈরিকৃত চেকলিস্টের ভিত্তিতে Informal Interview, Key Informant Interview এবং FGD এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে স্বল্প সময়ে ধারণা লাভের জন্য বাংলাদেশের ৫২টি উপকূলীয় উপজেলা থেকে উপকূলীয় জেলা বরগুনাধীন পাথরঘাটা উপজেলাস্থ পদ্মা গ্রামটি Shoreline এ অবস্থিত হওয়ায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে এটি নির্বাচন করা হয়েছে। উক্ত গ্রামের ৩২ জন কৃষকে নিকট এফজিডি'র মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৫ জন কৃষকের সঙ্গে ইনফরমাল ইন্টারভিউ ও ১০ জন কি ইনফরম্যান্টদের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। সীমিত সম্পদ, সময়ের স্বল্পতা ও গবেষণার আকার ছোটো হওয়ার কারণে এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে গবেষণা এলাকা ও উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণা গ্রামে ৪৪০টি খানায় ২,২৭২ জন লোক রয়েছে। এর মধ্যে ২২৯টি পরিবার ভূমিহীন।[৫] ভূমিহীন পরিবারের সদস্যরা দৈনিক শ্রম অথবা নিকটস্থ সমুদ্রে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। ধনী কৃষক পরিবারের সদস্যগণ একদিকে যেমন বাড়তি উৎপাদনের সুফল ভোগ করেন অন্যদিকে তাঁরা আনুষ্ঠানিক (Formal) কিংবা অনানুষ্ঠানিক (Informal) খাতে চাকুরীতে নিয়োজিত থেকে অর্থোপর্জন করে সমাজে ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। ফলে এ দুটি শ্রেণীর কৃষকদের অভিযোজন কৌশল প্রান্তিক কৃষকদের থেকে ভিন্ন ধরনের। এজন্য এদেরকে বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য অভীষ্ট (Target) জনগোষ্ঠী হিসেবে গণ্য না করে যে সকল মানুষের ০.৫ শতক বা তার বেশি কৃষি জমি রয়েছে ও যারা নিজেরাই কৃষি কাজ করে থাকেন এবং জীবন ধারণের জন্য যারা কেবল কৃষির উপরই নির্ভরশীল অর্থাৎ খানা প্রধানগণ অনানুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক কোন খাতেই কর্মে বা ব্যবসায় নিয়োজিত নন, এমন ৩২ জন কৃষক বাছাই করে ৪টি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের সঙ্গে ১.৩০-২.০০ ঘন্টা ধরে আলোচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে পূর্বেই একটি সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করে

---

[৪] এম. জসিম উদ্দিন, "উপকূলের কোটি মানুষের জীবন ঝুঁকিমুক্ত কবে হবে?," *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ মে ২০০৭, পৃ.১৩।

[5] Bureau of Statistics, *Population Census 2001, Community Series: Zila: Barguna*. Dhaka: BBS, Governmnet of Bangladesh, 2006, 46.

৪টি Focus Group Discussion(FGD) পরিচালনা করা হয়েছে এবং বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন, তাদের এলাকায় এর প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল বিষয়ে কৃষকদের ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

কৃষকদের অভিযোজন কৌশল জানতে হলে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। সেজন্য প্রবন্ধটির প্রথমাংশে বাংলাদেশে বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী অংশে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন কৌশল বিষয়ক গবেষণার মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন: ধারণা ও প্রত্যয়

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রপঞ্চ। সূর্য থেকে যে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসে তা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগে কিছু রশ্মি মহাশূন্যে ফিরেও যায়। যে রশ্মি পৃথিবীতে পৌছে তা কিছু পরিমাণ শোষিত হয়ে তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয় এবং কিছুটা ভূপৃষ্ঠে পৌছে। এ রূপান্তরিত শক্তি বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত জলীয়বাষ্প O_2, NO_2, CH_4, O_3 প্রভৃতি শোষণ করে এবং পৃথিবীকে উষ্ণ বা গরম রাখে। এসব গ্যাসগুলোকে বলা হয় গ্রিনহাউজ গ্যাস। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে বয়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণের পিছনে মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রয়েছে। যেমন : কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ক্ষতিকর গ্রিনহাউজ গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে নির্গত অর্ধেকেরও বেশি কার্বন নির্গম করে পাঁচটি দেশ যেমন: চীন, আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া ও জাপান।

ক্র.নং.	কার্বন নির্গমনকারী দেশ	মোট বাৎসরিক নির্গত কার্বনের পরিমান(মেগাটন)
১	চীন	৯,৪৪১
২	আমেরিকা	৬,৫৩৯
৩	ভারত	২,২৭৫.৪৫
৪	রাশিয়া	১,৯৬৩
৫	জাপান	১,২০৩

উৎস: দি ডেইলি স্টার ডিসেম্বর ৩, ২০১১, পৃ.১ ও ডিসেম্বর ১৪, ২০১১, পৃ.১৪

নির্গমের শীর্ষ তালিকায় পরবর্তী ৫টি দেশ হচ্ছে ব্রাজিল (১,১৪৪ মেগাটন), জার্মানী, কানাডা, মেক্সিকো ও ইরান। বৃটেন ভিত্তিক ফার্ম ম্যাপলক্রফট এর মতে, উল্লিখিত ১০টি দেশ বিশ্বে মোট কার্বন নির্গমনের দুই তৃতীয়াংশ কার্বন বায়ুমণ্ডলে নির্গমনের জন্য দায়ী। চীন কয়েক বছর আগেই আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যায়। যদিও চীন ও ভারতে মাথাপিছু নির্গমন অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু এ দু'টি দেশে সামগ্রিক জ্বালানী চাহিদা অনেক বেশি। ব্রাজিলের নির্গমন আরো বেশি হবে যদি বনউজার বিবেচনায় আনা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে রাশিয়ার নির্গমন কমে যায় কিন্তু বর্তমানে নির্গমন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে।[৬] ১৯৯৭ সালে যখন কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয় তখন ৩৭টি দেশ যারা মোট নির্গমনের পরিমান ছিল ৬০ শতাংশ। বিগত দেড় দশকে চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল থেকে কার্বন নির্গমনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার উক্ত ৩৭টি দেশের অংশ ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে।[৭] বিশ্বব্যাপী গড় মাথাপিছু কার্বন নির্গমনের পরিমান ২ টন এর বিপরীতে আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপরিয়ান ইউনিয়নের অবদান যথাক্রমে ২০ টন, ১৬.৪ টন ও গড়পরতা ১০-১২ টন। ভারত নির্গমন করে ১.৩ টন। কার্বন নির্গমনের বিচারে বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবদান মাথা পিছু প্রতি বছর মাত্র ০.৩ টন। কিন্তু কার্বন নির্গমনকারী দেশসমূহের ভোগবিলাসিতার জন্য আমাদের দেশকে প্রতিবছর জীবনহানি ও সম্পদ ক্ষতির ক্ষেত্রে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।[৮]

---

[৬] দি ডেইলি স্টার, ডিসেম্বর ৩, ২০১১, পৃ.১

[৭] দি ডেইলি স্টার নভেম্বর ৩০, ২০১১ পৃ.১।

[৮] Asadullah Khan, "Our vulnerability to Climate Change,"Dhaka: *The Daily Star*, November 26, 2011.

জলবায়ুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষনের জন্য ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের Inter Govermnetal Panel on Climate Change(IPCC) গঠন করা হয়। IPCC ২০০৭ সালের ৬ এপ্রিল আন্তঃ সরকার জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ৪র্থ প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে কেউ এ নিয়ে ভাবেননি। রিপোর্ট প্রকাশের পর এ নিয়ে সারা বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। জাতিসংঘের আন্ত রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (IPCC) এর তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫-২.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (২.৭-৪.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট) বৃদ্ধি পেলে প্রাণী ও উদ্ভিদের এক তৃতীয়াংশ প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন হবে। তা ছাড়া এশিয়ার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের একশ কোটিরও বেশি লোক ২০৫০ সালের মধ্যে ব্যাপক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেবে। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো তলিয়ে যেতে পারে। আফ্রিকার সাব সাহারা অঞ্চলের খরা আরও বাড়বে। রিপোর্টে বলা হয় বিশ্বের তাপমাত্রা ২১০০ সালের মধ্যে ১.১ ডিগ্রি থেকে ৬.৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়তে পারে।[৯] গ্রিনহাউজ গ্যাসের স্তর বাড়ার ফলে ফলে পৃথিবী হচ্ছে উষ্ণ থেকে উষ্ণতর। যাকে বলা হয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং। এর ফলে বিশ্বজলবায়ুতে পরিবর্তন হচ্ছে যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি সৃষ্টি করছে।

৩. বাংলাদেশে বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

বৈশ্বিক এ জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি হবে ঘনবসতির বাংলাদেশ। এ দেশের দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে আছে বঙ্গোপসাগর। উজান থেকে নেমে আসা অসংখ্য নদ-নদী জালের মত বিছিয়ে আছে পুরো দেশটিতে। এ নদীগুলো তাদের মোহনায় মিলেছে বঙ্গোপসাগরে। এ দেশের প্রকৃতি, জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ সাগর। এটি কাজ করছে দেশের সংকট ও সম্ভাবনার উৎস হিসাবে। বঙ্গোপসাগর মূল ভূখণ্ডের দিকে ফানেলের মতো মুখ করে আছে। ফানেলের মতো মুখ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গত ১৮০ বছরে ৫৭টি বড় ধরনের সামুদ্রিক ঝূর্ণিঝড় বাংলাদেশের ওপর আঘাত হেনেছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হার ও মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস বৃদ্ধির পাশাপাশি সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতাও বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘের আন্ত রাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল (IPCC) এর তৃতীয় সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১১ শতাংশ ভূখণ্ড সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হবে। IPCC এর গবেষণা মতে, কার্বন নির্গমনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২১০০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১৮ সেন্টিমিটার হতে ৫৯ সেন্টিমিটার এ উন্নীত হবে। Institute for Water Modelling এর গবেষণা প্রতিবেদনে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৩২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়লে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের ৮৪ শতাংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হয়েছে।[১০]

যে হারে বর্তমানে উষ্ণতা বাড়ছে তাতে IPCC এর হিসাব অনুযায়ী উষ্ণতা আরো বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের আবাদি জমি নষ্ট হবে প্রায় ১৪ শতাংশ এবং ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ বনভূমি ধবংস হতে পারে, জলমগ্ন হতে পারে আরও প্রায় ১৫.৮ শতাংশ জমি। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলার ৬৫, বরিশালের ৯৯, পটুয়াখালীর ১০০, নোয়াখালীর ৪৪ এবং ফরিদপুরের ১২ শতাংশ এলাকা ডুবে যেতে পারে। অর্থাৎ দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৩টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষকে উদ্বাস্তু হয়ে নিাপদ আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে দেশের উঁচু ও শহরাঞ্চলে পাড়ি জমাতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে তা গত ১০ বছর ধরে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। বর্ষার সময় বৃষ্টিপাত কম হওয়া, সঠিক সময়ে শীত শুরু না হওয়া, প্রতি বছর তাপমাত্রা অল্প অল্প করে বৃদ্ধি পাওয়া ও কালবৈশাখী ঝড়ের সংখ্যা কমে যাওয়াকে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের লক্ষণ হিসেবে বিচেনা করা হয়ে থাকে। ২০০৬ সালে বর্ষার সময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগ বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। ভরা মৌসুমে বৃষ্টি না হয়ে দেশের অনেক স্থানে অসময়ে নেমেছে প্রবল বৃষ্টি।[১১] ২০০৪ সালের জুলাই মাসের শুরুথেকেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে এবং উজানে এই বৃষ্টিপাত ২০০৪ সালের জুলাই মাসের শুরুতে ব্যাপক বন্যার কারণ হয়েছে। ২০০৩ সালে ভরা বর্ষার কয়েক মাসসহ সাত মাসই বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিকের তুলনায় কম। এ মাসগুলো

---

[৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯*, ঢাকা : অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, ২০১০, পৃ. ২১৭।

[১০] তদেব।

[১১] *দৈনিক সমকাল*, ৭ এপ্রিল ২০০৭, পৃ. ১।

হলো-জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল, মে, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর। অপরদিকে মার্চ ও জুলাই মাসে বৃষ্টি হয়েছে অস্বাভাবিক রকম বেশি। মার্চ মাসে হয়েছে স্বাভাবিকের প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৯৩ শতাংশ। আর জুন মাসে হয়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হওয়ার কথা জুলাই মাসে। কিন্তু ২০০৩ সালে বৃষ্টি হয়েছে স্বাভাকির তুলনায় ২৯ শতাংশ কম। বৃষ্টিপাত ছাড়াও ২০০৩ সালের শুরুথেকেই ছিল অস্বাভাবিকতা। শীত খুব ঝেঁকে বসতে না বসতেই আঘাত হানে দুটি শৈত্য প্রবাহ। এ দুটিই ছিল এমন প্রবল যে, তাপমাত্রা ২০০৩ সালের পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে নেমে যায়। দুবারই মৌসুমের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধানও কমে যায়। এর আগে এমনটি কখনও দেখা যায়নি।

প্রাক মৌসুম পূর্বে (বর্ষার আগে) এ অঞ্চলের স্বাভাবিক কালবৈশাখী, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড়ের পরিবর্তে বেশি হয়েছে বজ্রপাত। টর্নেডো প্রায় হয়নি; হয়নি ঘূর্ণিঝড়ও। তবে একাধিক নিম্নচাপ হয়েছিল এবং সে ক্ষেত্রেও অস্বাভাবিকতা ছিল। এর পরে গ্রীষ্মে ছিল শীতের মতো অস্বাভাবিকতা প্রথমত, গ্রীষ্মের তীব্রতা ছিল বেশি। তারপর একাধিক 'হিট ওয়েব'। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড যদিও অতিক্রম করেনি। এ ধরনের 'হিট ওয়েব' আসার কথা মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ থেকে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে। কিন্তু এসেছে অনেক পরে। আবহাওয়ার এসব অস্বাভাবিকতা একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার ফল, অন্যদিকে তেমনি এসব অস্বাভাবিকতা আবার পরিবেশকে বেশি করে বিঘ্নিত করে। ফলে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে দুর্যোগ।[১২] যেমন : ঘূর্ণিঘড় ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকা ডুবে গেলে দেশের নিম্নাঞ্চলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে। পানি নিচের দিকে সরে যাওয়ার সুযোগ না থাকার ফলে সে সব এলাকা আটকে পড়া পানিতে ডুবে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে নদীগুলোর পানির উচ্চতাও বাড়বে। ফলে নদী উপচে যাওয়া পানিতে দু'তীরের বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে যাবে। বাড়বে বন্যার ব্যাপকতা এবং স্থায়িত্ব। উজান থেকে আসা নদীর পানি ও অতিবর্ষণ এবং সাগরের জোয়ারের পানি সব মিলে এক দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি করবে।[১৩] বিশেষ করে কৃষিখাত মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।

৪. বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত হওয়া প্রভাবিত হচ্ছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে ২০৩০ সাল নাগাদ মৌসুমী বৃষ্টিপাত বেড়ে যাবে ১০-১৫ শতাংশ এবং শীতকালীন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫-১০ শতাংশের বেশি। এতে শস্য উৎপাদন বা কৃষি পদ্ধতিতে পরিবর্তন দেখা দেবে। জলবায়ুর পরিবর্তন ও তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে খরাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এতে করে বাধাগ্রস্ত হবে কৃষি উৎপাদন, কৃষি নির্ভর সমাজে জীবন ও জীবিকার ধরন যাবে পাল্টে। উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে গ্রীষ্ম ও বর্ষার ফসল হিসেবে আউশ ও আমন জাতীয় ধানের ফলন বাড়বে, কিন্তু কমবে উষ্ণ মৌসুমের গম, আলু ও ডাল জাতীয় রবি শস্যের ফলন। একই সঙ্গে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতিকর পোকামাকড়, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বংশ বৃদ্ধি এসব ফসলের ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে।[১৪] শস্য বীজ সঠিক উৎপাদন দিবে না, জমি হারিয়ে ফেলবে স্বাভাবিক ক্ষমতা, জৈব সার তার স্বাভাবিক তেজ হারিয়ে ফেলবে, জলসেচে দেখা দিবে চরম সংকট।

দেশে প্রতিনিয়ত কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই বাড়িঘর নির্মাণ, কৃষিজমিতে কারখানা গড়ে উঠা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিন ২২০ হেক্টর কৃষিজমি বিনষ্ট হচ্ছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ কৃষিজমি কমে যাবে। আবহাওয়ার উষ্ণায়ন বাড়তে থাকলে কৃষি জমি ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার পরিমাণ বাড়বে। প্রতিবছর নদী ভাঙন এর ফলে ১০,০০০ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।[১৫] জলবায়ু পবির্তনের ফলে কৃষি

---

[১২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১।

[১৩] ধীরাজ কুমার নাথ, "বায়ু পরিবর্তন ও কৃষি উৎপাদন", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত '*জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*' গ্রন্থে সংকলিত, (ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯), ৮৬-৮৭

[১৪] মাহফুজ উল্লাহ, "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত '*জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ*' গ্রন্থে সংকলিত, (ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯), ২৭৪-৭৬।

[১৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১।

জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার হার আরও বাড়বে। এতে উপকূলে বসবাসকারি অনেক কৃষক উদ্ভাস্ত হয়ে পড়বে। ফলে প্রান্তিক চাষিদের জীবন ও জীবিকা হবে বিপন্ন।

তিবক্ষত, ভুটান, ভারত ও নেপাল থেকে নেমে আসা বরফগলা পানির কারণে প্রতিবছরই সাগরের পানি বেড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্ফীত হচ্ছে।[১৬] ইতোমধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) এর গবেষণা মতে, উপকূলীয় ও তীরবর্তী ১৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার মাটি জলোচ্ছাসজনিত কারণে লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি আরো ১৫ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে আরো ১৬ হাজার বর্গকিলোমিটার উপকূলীয় ভূমি তলিয়ে যাবে ও লবণাক্ততা আরও ভেতরে আসবে। এ লবণাক্ততার কারণে কেবল চাষাবাদই নয় বরং খাদ্যের অভাবে গবাদি পশুর সংখ্যাও আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পাচ্ছে।[১৭] বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর কৃষি বর্তমানে গবাদী পশুর পরিবর্তে যন্ত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এতে একদিকে যেমন বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাস যুক্ত হচ্ছে অন্যদিকে কৃষি জমি জৈব সার থেকে বঞ্চিত হয়ে রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। রাসায়নিক সার ব্যবহারে কৃষকদের পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে রাসায়নিক সারের যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে। উপকূলীয় ১০-১৫ বছর পূর্বে এলাকায় যে সব ফসল চাষ হতো বিশেষ করে ধানের যে সব জাত চাষ হতো (যেমন : রাজা শাইল, গিরমি, হাইট্রা, দুধকলম, ইত্যাদি) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সেগুলো চাষ করা এখন আর লাভজনক হচ্ছে না। তাছাড়া, নতুন জাতের ধানে পোকার উপদ্রব বেশি হওয়ার কারনে এবং কীটনাশক ব্যবহারে কৃষকদের পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কারণে কীটনাশকেরও যথেচ্ছা ব্যবহার হচ্ছে যা মানব শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে এবং রোগ-ব্যধি বেড়ে চলেছে। গ্রামীন গ্রোথ সেন্টারগুলোতে ঔষধের দোকানের আধিক্য লক্ষ্য করলে বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায়।

৫. উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজন কৌশল

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় আজ পৃথিবীজুড়ে বিজ্ঞানীরা অভিজোজন বা খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশলের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার নাম অভিযোজন। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতি যতবেশি খাপ খাইয়ে নিতে পারবে ততই তা সকলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে।[১৮] এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষকরা তাদের ঘরবাড়ি অপেক্ষাকৃত উচুঁ স্থানে তৈরি করছে। ঘরবাড়ি তৈরির সময় তারা ঘরের উচ্চতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখছেন। ঘরের উচ্চতা এমন ভাবে দিচ্ছেন যাতে ঘূর্ণিঝড়ের সময় বয়ে যাওয়া বাতাস যেন তাদের ঘরে বেশি না লাগে; আবার এমন নিচু নয় যে জলোচ্ছাস তাদেরকে সহজেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এজন্য ঘরের পিড়ার (Plinth) উচ্চতা ৩-৪ ফুট এবং ঘরের উচ্চতা ২০-২৫ ফুট পর্যন্ত দিয়ে থাকেন। শক্ত ভিত্তির উপর নির্মিত চৌচালা ঘর অনেকটা ঝড় সহনীয় বলে ফোকাস দল আলোচনায় কৃষকরা জানান। কি ইনফরম্যান্টরগণও বিষয়টি সমর্থন করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে জমিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক মিঠাপনির জলাধার ও চারণভূমি কমে গিয়েছে বহুলাংশে। যে কারণে দরিদ্র জনগণের অর্থ উপার্জনের কর্মকাণ্ড হিসেবে গবাদিপশু বিশেষ করে গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন অসম্ভব হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আয়ের পথ অর্থাৎ স্থানীয় নদী-নালাগুলোতে মাছের ছোট ছোট পোনা ধরাকে বেছে নেয়।[১৯] কিন্তু এগুলো ধরতে গিয়ে তারা আরো অসংখ্য মাছের পোনা নষ্ট করে ফেলে, যা মৎস্য ও জীববৈচিত্র্য ধক্ষংস করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। কৃষিকাজের জন্য একদা বহুল ব্যবহৃত মহিষ এখন বিলুপ্ত প্রায়। লবনাক্ততা বৃদ্ধি ও উপযুক্ত চারণভূমির অভাবে গবেষণা এলাকা বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার পদ্মা গ্রামের কোনো কৃষক পরিবারই এখন আর মহিষ পালন করেন না বলে কৃষকরা জানান। এক যুগপূর্বেও প্রতি কৃষক পরিবারেই পাবিারিক দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য

---

[১৬] গাজী তানজিয়া, "জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘণ্টাধ্বনি, পৃ. ১৭।

[১৭] তদেব।

[১৮] মাহফুজ উল্লাহ, "জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত *'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ'* গ্রন্থে সংকলিত, (ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯), ২৭৪-৭৬।

[১৯] মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং সুরাইয়া বেগম,"বাংলাদেশে অভ্যন্ড়রীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ" *সমাজ নিরীক্ষণ*, নং ৯৬ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬।

গাভী পালন করা হতো। বর্তমানে লবণাক্ততার কারণে ও পশুচারণ ভূমির অভাবে তারা গাভী পালন তো দূরের কথা চাষের জন্য ব্যবহৃত গরুপালন করতেও পারছেন না। ইনফরমাল ইন্টারভিউ ও ফোকাস দল আলোচনায় কৃষকগণ জানান যে, এখন তারা কৃষি কাজের জন্য যান্ত্রিক উপায়ের উপরই বেশি নির্ভরশীল। কৃষকরা জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে দিন দিন যান্ত্রিক চাষাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, যা প্রকারান্তরে পরিবেশ দূষিত করছে। বর্তমান গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০০৭ সালের সুপার সাইক্লোন সিডরের পর প্রায় সকল কৃষকই (৯১.১৫%) ট্রাক্টর ভাড়া নিয়ে জমি চাষাবাদ করেছেন। ফোকাস দল আলোচনায় কৃষকরা আরও জানান যে, বর্তমানে জমিতে অধিক আগাছা দেখা দিচ্ছে। এতে ফলন কমে গিয়ে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। ফলে অনেকেই কৃষি পেশায় নিরুৎসাহিত হয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়েছেন। তাদের গ্রামে এরকম ২০-২৫ জন কৃষক কৃষি পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশা বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসা, রিক্সা ভ্যান এবং দেশীয় যন্ত্রচালিত যানবাহন চালানোর মাধ্যমে মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন বলে কৃষকরা জানান।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে কৃষকরা জানান যে, জলবায়ু পরিবর্তন তারা বোঝেন না। তবে, আবহাওয়া যে আগের মতো নেই সেটা বুঝতে পারেন। শীতকালের স্থায়িত্ব কম হচ্ছে। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড তাপদাহের সৃষ্টি হচ্ছে। ধান চাষের জন্য যখন বৃষ্টির প্রয়োজন তখন সেটা না হয়ে বৃষ্টি বিলম্বিত হচ্ছে। আবার কখনও কখনও অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়ে ফসল ডুবে যাচ্ছে। কৃষকরা জানান যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা নেই। তবে তারা লক্ষ্য করছেন যে, নদীতে জোয়ারের পানি আগের তুলনায় বেশি হচ্ছে এবং নদী ও সাগরে পানির চাপ বেশি। এজন্য বেড়ি বাধের বাইরে কোন শস্য চাষ করলে তা যে কোন সময়ে তলিয়ে যায়। যেটা কিনা ১০-১৫ বছরের আগেও হতো না। এজন্য কৃষকরা ঐসব এলাকার জমি চাষাবাদ না করে জমি পতিত রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। যা সামগ্রিকভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদনে প্রভাব ফেলছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে কৃষকদের নিকট একটি বিরাট অবলম্বন। কাছাকাছি (দুই কিলোমিটারের মধ্যে) আশ্রয় কেন্দ্র না থাকলে, ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে প্রান্তিক কৃষকরা উঁচু রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। অবস্থাপন্ন কৃষকেরা নিজ শক্ত বাসস্থান কিংবা শহরে বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার মাত্রা বেশি হওয়ার কারনে অনেকেই নিজেদের বাসস্থান ছেড়ে শহরে বসতি স্থাপন করার চিন্তা-ভাবনাও করছেন। ঘূর্ণি উপদ্রুত এলাকার কৃষকদের সাথে আলাপকালে তারা জানান যে, ঘূর্ণিঝড়ের সময় তারা উঁচু ও নিরাপদ আশ্রয় খোঁজেন। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর অবস্থান তাদের বাড়ির ৫-৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হওয়ায় অধিকাংশ সময় তারা সেখানে যেতে চাইলেও যানবাহন ও রাস্তাঘাটের অভাবে যেতে পারেন না। তারা বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রগুলো জনবসতির ১-২ কিলোমিটারের মধ্যে নির্মাণ করা উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষকরা অভিযোগ করে বলেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে উক্ত পদ্মা গ্রামে বেসরকারী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় বলেশ্বর নদী ও বঙ্গোপসাগর মোহনা থেকে মাত্র ৫০ গজ দূরত্বে একটি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে যেটি অব্যাহত ভাঙনের মুখে যে কোনো সময়ে নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। কৃষকরা আরও মত প্রকাশ করেন যে, ঘূর্ণিঝড় শুরুহলে মানুষ সাগরের দিকে না যেয়ে বরং মূল ভূখণ্ডে আশ্রয় খুঁজবে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে সাগর পাড়ে ফলে এখানে আশ্রয়ের জন্য এখানে যেতে মানুষ আগ্রহী হচ্ছে না। উপরন্তু এটি অব্যাহত ভাঙনের মুখে পড়ে নদীগর্ভে বিলীন হতে চলেছে। উপকূলীয় এলাকায় এ ধরনের আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে এ বিষয়গুলো ভেবে দেখা দরকার বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। নইলে সম্পদের অপচয় হবে এবং আশ্রয়কেন্দ্র থাকা সত্ত্বেও উপদ্রুত এলাকার মানুষ ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিপদের মধ্যেই থেকে যাবেন। মানুষের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির পাশপাশি গবাদিপশুর উপযোগী আশ্রয় কেন্দ্র বা কেল্লা তৈরি করাও প্রয়োজন বলে কৃষকরা মন্তব্য করেন। কেননা অনেক কৃষক গবাদি পশু ও অন্যান্য জিনিসপত্র ছেড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চান না। ফলে তারা বিপদের সম্মুখীন হন এবং জীবন ও সম্পত্তি হারান।

ঘূর্ণিঝড় ও তৎপরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা পাওয়া গেলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে তারা মত প্রকাশ করেন। উপরন্তু বিতরণ প্রক্রিয়াও অনেক সময়ই স্বচ্ছ থাকে না ফলে প্রকৃত প্রয়োজন যাদের তারা না পেয়ে অপেক্ষাকৃত সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এসব সহায়তা পেয়ে থাকেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা পেলেও তারা নিজেরাই গ্রামবাসীদের সহায়তায় ও ধার করে টাকা জোগাড় করে বাড়িঘর মেরামত ও জরুরি প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তীতে কৃষিকাজ পুনরায় শুরুকরা একটি বিরাট সমস্যা। জমিতে লবনের আস্তরণ সরানো কৃষকদের জন্য দুরূহ ব্যাপার। এছাড়া, চাষের জন্য বলদ সংগ্রহ করা ও শস্যের বীজ প্রাপ্তিও সহজসাধ্য নয় বলে তারা উল্লেখ করেন। বর্তমানে এলাকায় লোনা পানি ঢুকে যাওয়ার কারনে লোনা পানির উপযোগী

শস্য এবং পরিবর্তিত পরিবেশে যে সব খাদ্য-শস্য ফলে সেগুলো চাষ করে নিজেদের টিকিয়ে রাখা চেষ্টা করছেন। যেমন-আগে যে জমিতে ধান চাষ করা হতো এখন সেখানে তরমুজ চাষ করছেন।

২০০৭ সালে আঘাতকৃত সুপার সাইক্লোন সিডরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন কৃষক বলেন যে, বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত আবহাওয়ার সংবাদ এখনও অধিকাংশ কৃষকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। তারা মনে করেন, ঘূর্ণিঝড়ের সময় আবহাওয়ার সংবাদ স্থানীয় জনগণের নিকট বোধগম্য ভাষায় প্রচার করা উচিত। কেননা এখনও বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের পরিবারসহ অধিকাংশ কৃষক পরিবারগুলোর সদস্যগণ অশিক্ষিত। তাদের অনেকেরই এখনও সংবাদ মাধ্যমের সুযোগ নেই। আর থাকলেও তারা বোঝেন না ৫-১০ ফুট উচ্চতার পানি এবং ১৪০-১৮০ কিলোমিটার বেগে আসা ঝড় কতটুক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এ বিষয়ে স্থানীয় ভাষায় সংবাদ মাধ্যমগুলোতে ক্ষয়-ক্ষতির ধরন উল্লেখসহ আবহাওয়ার সতর্কবাণী প্রচার করা উচিৎ বলে কৃষকরা মন্তব্য করেন। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই মোবাইল ফোন রয়েছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপযোগী করে ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংকেত প্রদান করা হলে তা সহজেই সকলের নিকট পৌঁছে যাবে। অভিযোজন প্রক্রিয়া সহজতর করতে কৃষকরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ করেন। ১) উপকূলীয় এলাকায় যেসব এলকায় বাধ নেই সে সব এলাকায় বাধ নির্মাণ এবং বাধ থাকলে তা রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ; ২) নারী-পুরুষদের জন্য অলাদা উপযুক্ত সুবিধাসহ সুবিধাজনক স্থানে পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান; ৩) লবনাক্ততা সহনীয় ফসলের জাত উদ্ভাবনে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ; ৪) হাঁস পালনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সরকারি-বেসরকারি সহায়তাদান; ৫) বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে অবকাঠামো নির্মাণে কৃষক পরিবারগুলোকে সহায়তা প্রদান; ৬) লবনাক্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহকরণ অথবা প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি হস্তান্তরে সহায়তা প্রদান; ৭) ঘূর্ণিঝড় সহনীয় বাড়ি তৈরিতে ঋণ বা আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় এনে মঞ্জুরি সহায়তা প্রদান। উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সরকারি-বেসরকারি সহায়তা নিশ্চিত করা হলে উপকূলীয় কৃষকদের জীবনাযাত্রা সহনীয় হবে বলে কৃষকরা মনে করেন।

৬. উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজনে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

১৯৬০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ উপকূলীয় এলাকাকে জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় এবং লোনা পানি প্রবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য বেশ কিছু বড় আকারের পোল্ডার এবং এমব্যাঙ্কমেন্ট নির্মান করেণ।[২০] ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে প্রতিবেদনটি তৈরি করে, তাতে খাপ খাওয়ানোর জন্য বেড়িবাঁধ ও পোল্ডার নির্মাণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বেড়িবাঁধ ও পোল্ডার উপকূলীয় এলাকার মানুষকে জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে বটে তবে সেগুলো যথাযথভাবে পরিচর্যা করা প্রয়োজন বলে কৃষকগণ মনে করেন। পদ্মা গ্রামের পশ্চিম দিকের বেড়িবাঁধটি সংস্কার না করার কারেনে সিডরের সময় সহসাই পানি ঢুকে পুরো গ্রামকে তলিয়ে দেয়। এতে শত শত মানুষের বসতবাড়ি জীবন ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি সাধন হয় বলে কৃষকরা জানান।

১৯৯১ সালে ২৯ এপ্রিলের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরে অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে আহবায়ক করে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রতিবেদন মোতাবেক দেশের ১৫টি উপকূলীয় জেলার ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকায় ১ কোটি ২০ লাখ লোক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করে। সে অনুযায়ী দুর্যোগের সময়ে উক্ত এলাকার লোকজনের নিরাপদ আশ্রয়ের নিশ্চিত করতে ৩২ হাজার ৬০০টি আশ্রয় কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে মাত্র দুই হাজারের মত।[২১] যা এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। উপরন্তু রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় এগুলো প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এছাড়া, মহিলাদের জন্য আলাদা স্যানিটারি ব্যবস্থা না থাকায় মহিলারা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে উৎসাহ বোধ করেন না। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে মহিলাদের জন্য আলাদা স্যানিটারি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এগুলো রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে কৃষকরা মনে করেন। অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্রে স্যানিটারি ব্যবস্থা থাকে নীচতলায় যেটি ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে সাধারণত তলিয়ে যায়। এক্ষেত্রে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের পূর্বে নকশায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে কৃষকরা মনে করেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় তালায়ই এসব সুযোগ-সুবিধা রাখা প্রয়োজন বলে তারা মতামত ব্যক্ত করেন।

---

[20]Sam Jenkins, Alamgir Chowdhury & Mahbub Hossain,"Impact of Small Sacle Coastal Embankment: A Case study of LGED Polder," *The Journal of Rural Development*, vol.34, no.2[July 2007]:56.

[21]*দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০০৪, পৃ. ১।

৭. উপসংহার

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে একটি দুর্যোগ-প্রবণ এলাকা। বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে এ দুর্যোগের হার ও মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে এদেশের উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী বিশাল জনগোষ্ঠীর উপর। জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতিগস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। কেননা. উপকূলে বসবাসকারি অধিকাংশ মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষি। বিশ্ব জলায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বন নির্গমনে বাংলাদেশের ভূমিকা খুবই নগণ্য হলেও বাংলাদেশের মানুষকে বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকার মানুষকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা অব্যাহত থাকলেও এ উদ্যোগ কার্যত সফল না হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি হচ্ছে। বর্তমান দশকে বাংলাদেশে যে কয়টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে তা ঘটার সময়ের ব্যবধান ও বেগের দিক থেকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি। এক দশক পূর্বেও আবহাওয়ায় এত বৈচিত্র্য দেখা যায়নি এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশে এত বেশি দুর্যোগ আঘাত হানেনি। এতে বাংলাদেশের মানুষের বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। অনেকেই জীবিকা হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়েছেন; আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। কিন্তু তারা জানেন না তাদের এ দুর্দশার কারণ যে উন্নত দেশগুলোর বিলাসী জীবন যাত্রা। উপকূলীয় মানুষদের বাঁচাতে কার্বন নির্গমন ইপ্সিত মাত্রায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সমন্বিত ও কার্যকর ব্যবস্থা প্রয়োজন। কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনার পাশাপাশি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশকে খাদ্য নিরাপত্তা ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে কৃষক সম্প্রদায়ের অভিযোজন কৌশলে সহায়ক আধুনিক কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। অন্যথায় বাংলাদেশের উপকূলীয় এলকার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে কৃষিজীবি মানুষ প্রকৃতির নির্মম রুদ্ররোষের কবলে পড়ে জীবন-জীবিকা হারিয়ে বাস্তুচ্যুত হবে। শহরগুলোতে গড়ে উঠবে অপরিকল্পিত বস্তি, বৃদ্ধি পাবে অপরাধ প্রবনতা এবং সামাজিক নৈরাজ্যের ফল হিসেবে সৃষ্টি হবে নতুন নতুন সামাজিক সমস্যা। পাশাপাশি দেশ সম্মুখীন হবে খাদ্য সংকটের এবং দেখা দিবে চরম মানবিক বিপর্যয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগই বাংলাদেশের কৃষকদের জীবন ও জীবিকা এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা পালন করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

Abrar, Chowdhury R and S Nurullah Azad ed., *Coping with Displacement: Riverbank Erosion in North-West Bangladesh*, Dhaka: RMMRU and RDRS Bangladesh/ North Bengal Institute, 2004

Ahmed, A.U. æAdaptability of Bangladesh's Crop Agriculture to Climate Change: Possibilities and Limitations." *Asia Pacific Journal on Environment and Development* 7, no. 1 (2000): 71-93.

Alam, Edris. æCoping with Cyclone: An Occupational Group Perspective." *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh Humanities* 48, no.2 (Dec. 2003): 59-74.

Chowdhury, M. I. æShape of Bangladesh through Ages". *Journal of Bangladesh National Geographical Association* 2, no.1 and 2 (1974): 1-12.

Gain, A. K. & M. A. Bari,"Effect of Environmental Degradation on National Security of Bangladesh," *Asia Pacific Journal on Environment and Development*, vol. 14, no.2, December 2007.

Hossain, Hameeda, C.P Dodge and F.H Bed, ed. *From Crisis to Development: Coping With Disasters in Bangladesh*. Dhaka: UPL, 1992.

Islam, Md. Rafiqul, *Where Land Meets the Sea: A Profile of Coastal Zones of Bangladesh*. Dhaka: UPL, 2004.

Jenkins, Sam; Alamgir Chowdhury & Mahbub Hossain,"Impact of Small Sacle Coastal Embankment: A Case study of LGED Polder," *The Journal of Rural Development*, vol.34, no.2, July 2007.

Talukder, Joyotimoy, Gauranga Deb Roy & Mohiuddin Ahmad, *Living with Cyclone: Study on Storm Surge Prediction and Disaster Preparedness*, Dhaka: Community Development Library, 1993.

গাজী তানজিয়া, "জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের ঘন্টাধ্বনি," *দৈনিক যায় যায় দিন*, ১৩ জুন ২০০৮, পৃ. ১৭।

জসিম উদ্দিন, এম. "উপকূলের কোটি মানুষের জীবন ঝুঁকিমুক্ত কবে হবে?," *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ মে ২০০৭, পৃ.১৩।

ধীরাজ কুমার নাথ, "বায়ু পরিবর্তন ও কৃষি উৎপাদন", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত *'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ'* গ্রন্থে সংকলিত, ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯। ৮৫-৮৮।

মাহফুজ উল্লাহ,"জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত *'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ'* গ্রন্থে সংকলিত, ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯। ২৭৩-৭৬।

মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং সুরাইয়া বেগম, "বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ" *সমাজ নিরীক্ষণ*, নং ৯৬ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬।

মোর্শেদ, এস. এম. "বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন কৌশল", আহমেদ তাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত *'জলবায়ু পরিবর্তন ও তার প্রভাব: প্রসঙ্গ বাংলাদেশ'* গ্রন্থে সংকলিত, ঢাকা: গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, ২০০৯। ২৮৭-৯০।

বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯*, ঢাকা: অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, ২০১০।

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ১৯, ১৪১৮

নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক

সিরাজুম মুনীরা*

Abstract: Dowry is one of the major factors, which is mainly responsible for women oppression in our country. This article is a survey research with a view to identifying the relationship between dowry and women oppression in Rajshahi City Corporation. It shows that there is an acute effect of dowry system among women oppression.

ক. ভূমিকা

প্রতিটি মানুষ তার স্বকীয় সত্তায় সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠে। তাই সমাজ ও সংস্কৃতির বন্ধনে মানুষ যতটা স্বাধীন ততটাই শৃঙ্খল। আবহমান কাল থেকেই মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির আবহে সমাজ, গোষ্ঠী বা গোত্রে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে গড়ে তুলেছে সভ্যতার চরম শিখরে। ভিন্ন ভিন্ন ভূ-খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি-কালচার বিরাজমান। তাই বলে সে সব কালচারের ভিতরের সকল রীতি-নীতিই সুন্দর ও মানবীয় তা নয়। আধুনিক বিশ্বের সকল সংস্কৃতির মূল শ্লোগানই হচ্ছে মানবতাবাদ। কারণ প্রতিটি দেশেই সমাজ ব্যবস্থা পরিচালিত হয় তার সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। আর এজন্যই মানুষ কখনও কখনও সেসব সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতির নামে সংস্কারের বন্দিদশায় অসহায় হয়ে পড়েছিল। যেমন সনাতন হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা সংস্কারের যূপকাষ্ঠে বিধবা নারীদের জীবন বলি দিতে হতো।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাতেও নারীর দুর্দশার তেমন কোনো উন্নতি ঘটেনি। সতীদাহ প্রথা না থাকলেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের তিলে তিলে নিঃশেষ করার অনেক রীতি-নীতিই সক্রিয় রয়েছে। আর তার মধ্যে অন্যতম হল যৌতুক প্রথা। প্রতিনিয়তই যৌতুক প্রথার করাল গ্রাসের শিকার হচ্ছে অসংখ্য নারী এবং অসহায়ত্বের কারণে তাদের জীবনও দিতে হচ্ছে অকাতরে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে যৌতুক প্রথা একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি, যা থেকে জাতিকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়ে আসা জরুরি। সেই উত্তরণের পথ খুঁজতে আজ সবাই যেন "যৌতুককে না বলুন" শ্লোগানে দীপ্তকণ্ঠ। নারীকে শুধুই কাব্যময় স্তুতিবাক্যে বন্দি করে রাখলে চলবে না, তাকে কাজী নজরুলের সেই বিখ্যাত বাণী- "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"[১]- বাস্তবে রূপ দিতে আন্দোলনে নামতে হবে। তবেই সার্থক হবে মানবতাবাদী চেতনা।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদেরই সোচ্চার হতে হবে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের বিশাল সংগ্রামী চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হতে হবে, নইলে ধাপে ধাপে নারীকে নির্যাতিত হতে হবে যৌতুকের মতো নানা কুসংস্কারের বেড়াজালে।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যার হার প্রায় ৫০ শতাংশ।[২] তাই দেশ গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও অপরিসীম। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি নারীরা প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো ভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ কর্তৃক ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের দ্বারাও নির্যাতিত হয়ে থাকে। পরিবারের ভাঙন, অপরাধ প্রবণতা, পতিতাবৃত্তি, আত্মহত্যা, সামাজিক অনাচার, নৈতিক অবক্ষয়সহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির পেছনে যৌতুক প্রথা অন্যতম।

---

* এম. ফিল. গবেষক, আইবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] "সাম্যবাদী" *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ২৪১।

[২] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৭* (ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০০৭), পৃ. ২০৬।

নারী নির্যাতন একদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ, অন্যদিকে নারীর স্বাভাবিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করে। যৌতুকের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে বাংলাদেশের অসংখ্য নারী স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও ননদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। স্বামীপক্ষ কর্তৃক বিয়ের সময় দাবিকৃত যৌতুকের টাকা স্ত্রীপক্ষ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে স্ত্রীর উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। যৌতুক প্রতিরোধে পূর্বকাল থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের আইন যেমন– যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৫০, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৯৫, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) ইত্যাদি প্রচলিত থাকলেও এসকল আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাবে একদিকে যেমন যৌতুক নামক ব্যাধিকে সমাজ থেকে দূর করা সম্ভব হচ্ছে না, অন্যদিকে নারী নির্যাতনের হার ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

খ.গবেষণার উদ্দেশ্য

নির্যাতিত নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও নির্যাতনের কারণ অনুসন্ধান করা, নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক নিরূপণ করা, তাদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদা নিরূপণের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

গ.গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৩০নং ওয়ার্ডে বসবাসরত নির্যাতিত নারীদের লক্ষ্যদল হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণায় মূলত সামাজিক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্যও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যাবলী রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের ৩০নং ওয়ার্ড থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত ৫০ জন যৌতুকের কারণে নির্যাতিত নারীর নিকট থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপ্রত্র, সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং বেশ কিছুদিন অবলোকন ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন প্রতিবেদন, সাময়িকী, স্মরণিকা ও বই-পুস্তক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ঘ. বাংলাদেশে যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতনের প্রাসঙ্গিক চিত্র

পুলিশের বার্ষিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে যে, ১৯৯৮ সালে সারাদেশে যৌতুকের কারণে মৃত্যু ঘটে ৮৩ জন মহিলার। ২০০১ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১১১জনে।[৩] বিশেষজ্ঞ মহলের মতে দেশে শতকরা ৮৫ ভাগ মহিলা যৌতুকের কারণে বিভিন্ন মাত্রায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন।[৪] অন্য এক তথ্যে দেখা যায়, ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়কালে ১৫১৬ জন নারী যৌতুকের জন্য নিগৃহীত ও খুন হয়। এ সময়ে আত্মহত্যা করে ১৮,১৯৯ জন এবং দৈহিক নির্যাতনের শিকার হয় ১১,৮৪৬ জন।[৫] ২০০৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে যৌতুক সংক্রান্ত ঘটনায় ১ হাজার ২৩৫টি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, এর মধ্যে ১ হাজার ৩ জন নারী বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে, আহত হয়েছে ৪২৮ জন এবং নিহত হয়েছে ৫০৫ জন।[৬] সম্প্রতি যৌতুকের কারণে দরিদ্র কৃষক আবুল কালাম তার দুই মেয়ে সুরমা বেগম (১৩) ও পারভিন আক্তার (৬)-কে 'দা' দিয়ে জবাই করে হত্যা করেছে বলে জানা যায় ।[৭]

যৌতুকের কারণে নারীরা যে সমস্ত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে সেগুলো হলো: মারধর, গলাটিপে হত্যা, পিটিয়ে হত্যা, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে বিষ খাইয়ে হত্যা, ছুরিকাঘাত করা, এসিড নিক্ষেপে ঝলসে দেওয়া, কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারা, বিষজ ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলা, শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থান ঝলসে দেওয়া, অনাহারে রাখা, শারীরিক-মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া, বাবার বাড়ি থেকে টাকা না আনতে পারলে টাকার জন্য স্ত্রীকে তার বন্ধুদের দিয়ে ধর্ষণ করানো, দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা, স্ত্রীর কাঁধে হালের লাঙল-জোয়াল তুলে দিয়ে জমি চাষ করানো, ক্ষেত থেকে স্ত্রীকে দিয়ে ফসল

---

[৩] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪।

[৪] *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১ জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪।

[৫] ইয়াসমিন সুলতানা, "দেশে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও নারী নির্যাতন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে, জরুরী প্রতিকার প্রয়োজন," *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ মে ২০০১, পৃ. ৫।

[৬] *সংবাদপত্র পরিবীক্ষণ– ২০০৫*, পৃ. ৯।

[৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ এপ্রিল ২০০৮, পৃ. ৩।

বহন, রাতে গোয়াল ঘরে বন্দি করে রেখে গরুর সাথে বিনিদ্র রাত কাটাতে বাধ্য করা, ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করা, পায়ে শেকল বেঁধে মারধর করা, খেজুর কাঁটা দিয়ে চোখ উঠিয়ে ফেলা, গরম ডাল দিয়ে শরীর ঝলসে দেওয়া, স্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা, ব্লেড দিয়ে শরীর রক্তাক্ত করা, ক্যাসেট প্লেয়ার চালিয়ে নির্যাতন করা যাতে বাইরে থেকে লোকে না শোনে, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নির্যাতেন করে মৃত সন্তান প্রসব করানো, গর্ভের সন্তান নষ্ট করা, তালাক দেওয়া, গোপনাঙ্গ পুড়িয়ে ফেলা, স্ত্রীর বাবা-মাকে মারধর করা, সর্বহারার নাম করে টাকা চেয়ে চিঠি পাঠানো, স্তন কেটে ফেলা, পরিবারের সকলে মিলে পিটিয়ে মেরে ফেলা, মেয়ের বাবার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সালিশের মাধ্যমে দোর্‌রা মারা, উলঙ্গ করে পেটানো, জিহ্বা কেটে দেওয়া, আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা, জীবন্ত কবর দেওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

যৌতুকের কারণে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন সংঘটিত হলেও এর পেছনে রয়েছে অনেকগুলো কারণ– নারীর পরনির্ভরশীলতা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, দরিদ্রতা, শিক্ষার অভাব, সচেতনতার অভাব, সামাজিক রেওয়াজ, পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের অভাব, নারীর প্রতি সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং পুরুষের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি।

৬. গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষণার প্রতিটি প্রশ্নপত্রে ৩৩টি প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো নির্যাতিত নারীদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অবস্থান, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও যৌতুক সংশ্লিষ্ট। প্রাপ্ত তথ্যগুলো প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত লক্ষ্যদলের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণার কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তথ্যের যে সারণিসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তার কোনোটি এক চলক বিশিষ্ট আবার কোনোটি দ্বিচলক বিশিষ্ট।

৬.১. বয়স

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে লক্ষ্য করা যায়, ৬০% নারী, যাদের বয়স ২০-২৫ বছর এবং ২০% নারী যাদের বয় ২৫-৩০ বছরের মধ্যে সব থেকে বেশি নির্যাতনের শিকার। লক্ষ্য করা যায়, ১৫-৩০ বছর বয়স হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করার, নিজেকে তৈরি করা, যে কোনো উন্নতি, অগ্রগতি ও উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার গুরুত্বপূর্ণ সময়। অথচ এই বসয়-সীমায় বাংলাদেশের বেশিরভাগ নারী জটিল সংসারিক পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হয়ে যৌতুক আর নির্যাতনের বলিতে পরিণত হয়।

৬.২. ধর্ম

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে লক্ষ্য করা যায় যে, উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই ইসলাম ধর্মাবলম্বী, যার শতকরা হার ৭০। তবে ৩০ শতাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীও রয়েছে। 'যৌতুক' ধারণাটি এসেছে হিন্দু ধর্ম থেকে। হিন্দু ধর্মে পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের কোনো অধিকার না থাকায় বিয়ের সময়ে তাদেরকে বরপণ হিসেবে যৌতুক প্রদান করা হয়। কিন্তু এই পণ প্রথা এখন আর শুধু হিন্দু ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং তা হিন্দু-মুসলিমসহ সকল ধর্মের মানুষের মধ্যেই মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, যার অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে নারী নির্যাতন।

৬.৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিবাহকালীন বয়স

বর্তমান গবেষণায় নির্বাচিত লক্ষ্যদলের প্রত্যেকেই ৩০নং ওয়ার্ডের অধিবাসী, যাদের অধিকাংশই অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন এবং তাদের বিবাহকালীন বয়স ১০-১৪ বছরের মধ্যে; যার হার প্রায় ৫৪ শতাংশ। স্বল্প শিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে সাধারণত তাদের খুব অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়

৬.৪. উত্তরদাতাদের স্বামীর পেশা

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতাদের স্বামীদের বেশিরভাগের পেশা ব্যবসা, যার শতকরা হার প্রায় ৪২ শতাংশ। এক দিকে দারিদ্রের কষাঘাত, আর অন্য দিকে শিক্ষার অভাবে তারা পেশা হিসেবে বিভিন্ন ছোট-খাট ব্যবসাকে বেছে নিয়েছে। তবে ৩০ শতাংশ কৃষি কাজ, ১৬ শতাংশ শ্রমিক, ৪ শতাংশ দিনমজুর এবং ৮ শতাংশ চাকুরিজীবীর কথাও উঠে আসে গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে।

৬.৫. উত্তরদাতাদের স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মাসিক আয়

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে লক্ষ্য করা যায়, বেশিরভাগ উত্তরদাতাদের স্বামীর শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম এবং তাদের মাসিক আয়ও পর্যাপ্ত নয়। তাদের সর্বোচ্চ ২৬ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত যাদের মাসিক আয় মাত্রা ১০০০-৫০০০ টাকার আয় মধ্যে এবং প্রায় ২৪ শতাংশ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষায় শিক্ষিত যাদের মাসিক আয় মাত্রা ১০০০-৫০০০ টাকার মধ্যে। তবে মাত্র ১০ শতাংশের আয় অবশ্য ৫০০০-৯০০০ টাকা পর্যন্ত। অপরদিকে, সর্বোচ্চ, ২২ শতাংশ উত্তরদাতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ এবং এবং তাদের মাসিক আয় ৫০০০-৯০০০ টাকা পর্যন্ত। সুতরাং উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায়, যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম তাদের মাসিক আয়ও কম এবং যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বেশি তাদের মাসিক আয়ও বেশি।

৬.৬. উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরন

গবেষণালব্ধ ফলাফলে লক্ষ্য করা যায় যে, উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই যৌথ পরিবারে বসবাস করে যার শতকরা হার ৭০। আর মাত্র ৩০ শতাংশ বাস করে একক পরিবারে। যৌথ পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি থাকে বিধায় মাত্র দু'একজন সদস্যের স্বল্প আয়ে অধিক লোকের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করা অনেক ক্ষেত্রেই কষ্টকর হয়ে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে যৌতুক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৬.৭. উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে লক্ষ্য করা যায়, উত্তরদাতাদের অধিকাংশেরই সন্তান সংখ্যা ১-২ জন, যার শতকরা হার প্রায় ৭৪। সন্তান সংখ্যা কম হলেও নিচু মনমানসিকতা, আয়ের স্বল্পতা, নিত্ত প্রয়োজনীয় জিনিসত্রের দাম এবং যৌথ পরিবারে একত্রে বসবাস করার ফলে তারা কখনোই দরিদ্রতার মত অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়না। যার ফলশ্রুতিতে যৌতুক প্রবণতা দেখা দেয় ও নারী নির্যাতনের হার বৃদ্ধি পায়।

চ. যৌতুক ও নির্যাতন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা

চ.১. নারী নির্যাতন

ইসলাম সর্বপ্রথম নারীকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করলেও অশিক্ষা, কুসংস্কার আর জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বর্তমান উন্নয়ন-প্রযুক্তির যুগে এসেও নারী নির্যাতনের মত জঘন্য অপরাধের মাত্রা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। গবেষণার ফলাফলে লক্ষ্য করা যায় যে, নারী নির্যাতন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা কিরূপ এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতাই 'যে কোন ধরনের নির্যাতন যার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে নারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়' বলে জানিয়েছেন, যার হার প্রায় ৭৪ শতাংশ (সারণি ১)।

সারণি ১ : নারী নির্যাতন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা

নারী নির্যাতন সম্পর্কে ধারণা	সংখ্যা(%)
শারীরিক নির্যাতন	৭(১৪%)
মানসিক নির্যাতন	৪(৮%)
অর্থনৈতিক নির্যাতন	২(৪%)
যে কোনো ধরনের নির্যাতন যার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে নারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়	৩৭(৭৪%)
মোট	৫০(১০০%)

সূত্রঃ মাঠ জরিপ।

চ. ২. যৌতুক

পাত্র-পাত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সময় পাত্র বা পাত্রীর অভিভাবকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপহার-উপঢৌকন যৌতুক নামে পরিচিত। তবে আমাদের দেশে সাধারণত কন্যাপক্ষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বর পক্ষকে যৌতুক দেওয়া হয়। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতারা তাদের মেয়েদের ভাল জায়গায় পাত্রস্থ করার জন্য এবং তাদের সুখের কথা বিবেচনা করে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে আবার কখনও বাধ্য হয়ে যৌতুক দিয়ে থাকে। বর্তমানে অবশ্য যৌতুক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। কখনও পারিবারিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে আধুনিকতার নামে উভয়পক্ষের দরকষাকষির মাধ্যমে বর পক্ষকে মোটা অংকের অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী যৌতুক হিসেবে প্রদান

করা হয়। আবার কখনও উচ্চবিত্ত সচ্ছল পরিবারগুলোতে মেয়ের বিয়েতে কন্যাপক্ষ কর্তৃক খুশি হয়ে বরপক্ষকে ইচ্ছাকৃতভাবে মোটা অংকের অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী উপহার-উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করা হয়, যা প্রকারান্তরে যৌতুকেরই নামান্তর।

বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, যৌতুক সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা জানতে চাইলে তাদের প্রায় ৩০ শতাংশ জানিয়েছেন, 'বিয়ের সময় বর পক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রদানকৃত উপঢৌকনের' কথা। তবে সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ উত্তরদাতার কাছ থেকে যৌতুক সম্পর্কে শুধু বিয়েতেই নয়, বিয়ের পর যে কোন সময় কন্যা পক্ষের কাছে বর পক্ষের যে কোন দাবির বিষয়টি উঠে আসে (সারণি ২)।

সারণি ২ : যৌতুক সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা

যৌতুক সম্পর্কে ধারণা	সংখ্যা(%)
বিয়ের সময় বরপক্ষকে দেয়া ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত উপঢৌকন	১৫(৩০%)
বিয়ের পরেও যে কোন সময় কন্যা পক্ষের কাছে যে কোন দাবী	৩৫(৭০%)
মোট	৫০(১০০%)

সূত্রঃ মাঠ জরিপ।

চ. ৩. নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক কিরূপ এ প্রশ্নের উত্তরে সকল উত্তরদাতাই যৌতুক নিজেই একটি নির্যাতন বলে জানিয়েছেন (সারণি ৩)।

সারণি ৩ : নারী নির্যাতনের সঙ্গে যৌতুকের সম্পর্ক

নারী নির্যাতনের সঙ্গে যৌতুকের সম্পর্ক	সংখ্যা (%)
যৌতুক নিজেই একটি নির্যাতন	৫০ (১০০%)
মোট	৫০ (১০০%)

সূত্রঃ মাঠ জরিপ।

চ. ৪. যৌতুকের কারণ

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। যদিও যৌতুক ধারণাটি এসেছে মূলত হিন্দু ধর্ম থেকে তবে বর্তমানে এটি সকল ধর্মেই ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। যদিও আইনের দৃষ্টিতে যৌতুক দেওয়া এবং নেওয়া দুটোই সমান অপরাধ কিন্তু আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে যৌতুকের দৌরাত্ম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। তবে শহরের তুলনায় গ্রামে যৌতুক গ্রহণের প্রবণতা বেশি। আর এর পেছনে প্রধান কারণ হিসেবে অধিকাংশ উত্তরদাতাই দরিদ্রতাকে দায়ী করেছেন, যার হার প্রায় ৬০ শতাংশ। তবে অনেকে আবার 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতার মানসিকতা' (১০ শতাংশ) এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকেও' (৬ শতাংশ) যৌতুকের প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করেছে। যদিও ১০ শতাংশ উত্তরদাতার আলোচনা থেকে ধর্মীয় প্রভাবের কথা উঠে আসে, তবে ১৪ শতাংশ অবশ্য উপরোক্ত একাধিক ধারণাকে যৌতুকের জন্য দায়ী করেছেন।

চ. ৫. উত্তরদাতাদের বিয়েতে যৌতুক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

বর্তমান সময়ের বিয়েতে যৌতুক আদান প্রদান একটি Traditicon-এ পরিণত হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের চরম দরিদ্র কৃষকের পরিবার থেকে শুরু করে দেশের বড় বড় শহরের বিত্তবানদের পরিবার পর্যন্ত সর্বত্রই কম বেশি যৌতুক গ্রহণের প্রবণতা চরম মাত্রায় বিদ্যামান। আর এই যৌতুক নামক বলির নির্মম শিকার হচ্ছে গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারগুলো।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে লক্ষ্য করা যায়, বিয়েতে যৌতুক লেনদেন হয়েছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তাদের বিয়েতে কম বেশি যৌতুক আদান প্রদান হয়েছে। তবে ৬

শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের বিয়ের সময় কোন রকম যৌতুক লেনদেন না হলেও বর্তমানে তাদেরকে স্বামী পরিবার থেকে যৌতুক প্রদানের জন্য ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে।

চ. ৬. যৌতুকের পরিমাণ

গবেষণায় লক্ষ্য করা যায়, উত্তরাদাতাদের বিয়েতে কি পরিমাণ যৌতুক লেনদেন হয়েছে এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে। অর্থাৎ মোটা অঙ্কের অর্থ প্রদানের পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণ, দামী আসবাবপত্র ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও তাদেরকে যৌতুক হিসেবে প্রদান করতে হয়েছে। ৪৪.৭৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন ৫০০০-৪৭০০০ টাকা নগদ অর্থ প্রদানের পাশাপাশি তাদেরকে আট আনা থেকে পাঁচ ভরি পর্যন্ত স্বর্ণ, ঘড়ি, শেলাই মেশিন, বাই-সাইকেল, মটর-সাইকেল, সাদা-কালো টেলিভিশন ইত্যাদিও যৌতুক দিতে হয়েছে। ২২.৩৬ শতাংশ উত্তরদাতাকে আটআনা থেকে শুরু করে পাঁচ ভরি পর্যন্ত স্বর্ণ প্রদানের পাশাপাশি ৫০০০-১০০০০০ টাকা পর্যন্ত যৌতুক প্রদান করতে হয়েছে। অপরদিকে, প্রায় ১৭.১০ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের বিয়েতে ৪৭৫০০ টাকা থেকে ১০০০০০ টাকা নগদ অর্থসহ স্বর্ণ এবং কেউ কেউ এর সাথে বাড়ির জমি, ফার্নিচার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, মটর-সাইকেল ইত্যাদিও যৌতুক প্রদান করেছেন (সারণি ৮)।

সারণি ৪ : যৌতুকের পরিমাণ

যৌতুকের পরিমাণ	সংখ্যা(%)
(টাকা) ৫০০০-৪৭৫০০	৩৪(৪৪.৭৩%)
৪৭৫০০-১০০০০০	১৩(১৭.১০%)
(দ্রব্যসামগ্রী) সোনা, (৮ আনা-৫ ভরি)	১৭(২২.৩৬%)
বাই-সাইকেল	১(১.৩১%)
মোটর-সাইকেল	১(১.৩১%)
মোটর-সাইকেল	১(১.৩১%)
শেলাই মেশিন	২২.৬৩%)
ঘড়ি	১(১.৩১%)
জমি	১(১.৩১%)
টেলিভিশন	৪(৫.২৬%)
ফার্নিচার	১(১.৩১%)
ফ্রিজ	১(১.৩১%)
মোট	*৭৬(১০০%)

* একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে।
সূত্রঃ মাঠ জরিপ।

চ. ৭. যৌতুকের কারণে উত্তরদাতাদের নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য

যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি যার ভয়াবহ পরিণতি হচ্ছে নারী নির্যাতন। বরপক্ষ কর্তৃক দাবিকৃত যৌতুক প্রদানে ব্যর্থ হলে বা বিলম্ব হলে বরের পবিবারের সদস্যগণ কর্তৃক উত্তরদাতাদের উপর নানা ধরনের নির্যাতন চালানো হয় যা মারাত্মক সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

সাধারণত কারা বা কাদের দ্বারা নির্যাতিত হন এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হন বলে জানিয়েছেন। আবার ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা শাশুড়ী ও ননদ কর্তৃক, ৬ শতাংশ উত্তরদাতা শশুর কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হন বলে জানিয়েছেন। তবে সর্বোচ্চ ৪২ শতাংশ উত্তরদাতা এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, ননদ সকলের দ্বারাই নির্যাতিত হন। আর এক্ষেত্রে শ্বাশুড়ি এবং ননদের প্ররোচণায় সব থেকে বেশি দায়ী।

চ. ৮. নির্যাতনের ধরন

যৌতুকের কারণে সাধারণত কি ধরনের নির্যাতনের শিকার হন এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে গবেষণায় ব্যবহৃত উত্তরদাতাদের বেশির ভাগই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের কথা জানান,

যার মোট শতকরা হার প্রায় (৪৩.১০+৪৩.১০) ৮৬.২। তবে তাদের আলোচনা থেকে অর্থনৈতিক নির্যাতন (৫.১৭ শতাংশ) এবং যৌন নির্যাতনের (৮.২৫ শতাংশ) কথাও উঠে আসে (সারণি ৫)।

সারণি ৯ : নির্যাতনের ধরন

নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা(%)
শারীরিক	২৫(৪৩.১০%)
মানসিক	২৫(৪৩.১০%)
অর্থনৈতিক	৩(৫.১৭%)
যৌন	৫(৮.৫২%)
মোট	*৫৮(১০০%)

*একাধিক উত্তর পাওয়া গেছে। সূত্রঃ মাঠ জরিপ।

চ. ৯. উত্তরদাতাদের যৌতুক সম্পর্কিত সচেতনামূলক অনুষ্ঠান দেখা সংক্রান্ত তথ্য

পূর্বের তুলনায় বর্তমান সময়ে যৌতুক প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজের উপরেও নির্যাতনের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই ভয়াবহ অবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রচার মাধ্যমগুলোতে যৌতুক ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার ও লেখনী প্রকাশ করা হচ্ছে। যৌতুক সম্পর্কে রেডিও, টেলিভিশনে কোন অনুষ্ঠান দেখেছেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতাই ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন, যার শতকরা হার প্রায় ৮৪। তবে আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত, অজ্ঞ, অসচেতন, নিতান্ত হতদরিদ্র, প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসরত ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা এ প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা একদিকে যেমন যৌতুক ও এর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, অন্যদিকে যৌতুক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার ও বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়েও তেমন কিছুই জানে না।

চ. ১০. ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের ধারণা

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে বহু প্রাচীন কাল থেকে বিদ্যমান। তাই যৌতুকের মত মারাত্মক ব্যাধিকে সমাজদেহ থেকে দূর করার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে সরকারি উদ্যোগে একটি আইন প্রণয়ন করা হয় যা '১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন' নামে পরিচিত। বর্তমানে এ আইনের তেমন কোন কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। এই যৌতুক নিরোধ আইন সম্পর্কে কিছু জানেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। তবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতা অবশ্য নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা যৌতুক নিরোধ আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তবে যারা ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন তারা আইনের নামটি ছাড়া এ সম্পর্কে আর তেমন কিছুই জানেন না। অনেকে আবার আইনের নামটিও ঠিকমত বলতে পারেন না।

চ. ১১. যৌতুক প্রতিরোধে উত্তরদাতাদের গৃহীত পদক্ষেপ

যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। সমাজ থেকে এই সমস্যা দূর করা না গেলে একদিকে যেমন নারী নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যাবে, অন্যদিকে যৌতুকের প্রভাবে অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে, সমাজে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা দেখা দিবে এবং নিত্য নতুন অপরাধের জন্ম হবে। তাই যতদ্রুত সম্ভব যৌতুক প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। আর যৌতুক প্রতিরোধে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন এ প্রশ্নের উত্তরে অধিকাংশ উত্তরদাতাই কঠোর আইন প্রয়োগের কথা বলেন, যার হার প্রায় ৫৪ শতাংশ। অনেকে আবার জনসচেতনতা সৃষ্টি (৮ শতাংশ), উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১৪ শতাংশ) এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধিকেও (১০ শতাংশ) যৌতুক প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে এ ব্যাপারে ১২ শতাংশ উত্তরাদাতা উপরোক্ত একাধিক উত্তরে প্রদান করেছেন।

ছ. উপসংহার

যে কোনো গবেষণার বৈশিষ্ট্য হলো নতুন নতুন সমস্যার উদ্ঘাটন করা এবং একাধিক গবেষণার দ্বার উন্মোচন করা। আলোচ্য গবেষণাটি সম্পূর্ণ একটি নতুন গবেষণা। গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে নির্যাতিত

মহিলাদের সার্বিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাদের সমস্যা এবং নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন–

- প্রচলিত আইনের সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পাশাপাশি যুগোপযোগী নতুন আইন প্রনয়ণ করা এবং সমাজের সর্বত্রই কঠোর আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা।
- যৌতুকের কারণে স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি ও ননদ কর্তৃক শারীরিক-মানসিকভাবে নির্যাতিত, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারীদের আইনি সহায়তা লাভে সার্বিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা, আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যাপক ক্ষমতায়ন ঘটানোর মাধ্যমে তাদের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করা।
- দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে নারীদের আরো বেশি শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা রোধ ও বিবাহ নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা।
- দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে যৌতুক ও এর ভয়াবহ পরিণতি, নারী নির্যাতন, এবং এ থেকে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করা। আর এ লক্ষ্যে প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভা ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা, সর্বস্তরের পাঠ্যপুস্তকে যৌতুক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করা, রেডিও টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করা এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো।
- নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠের মত। তাই যৌতুক ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রোড শো, র‍্যালী, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যেমন- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যৌতুক প্রতিরোধ দিবস ইত্যাদি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে সমন্বিত আন্দোলন পরিচালনা করা।
- নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতাকে অবশ্যই মূল্যায়ন করা এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে উৎসাহিত করে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। যাতে তারা তাদের চাহিদাগুলো পূরণের পাশাপাশি আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পরিবারে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। সেই সাথে পুরুষদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, পাশাপাশি যৌথ পরিবারের বয়স্ক ও নির্ভরশীলদের বিভিন্ন ধরনের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- সর্বোপরি, নির্যাতিত মহিলাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের উদাসীন মনোভাব পরিবর্তন করে তাদের প্রতি সার্বিক সহানুভূতির মনোভাব পোষণ করা আবশ্যক। এছাড়াও তাদের ইচ্ছ-অনিচ্ছা, সমস্যা, চাহিদা, ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারী নির্যাতনে চরম প্রভাব বিস্তারকারী 'যৌতুক' নামক সামাজিক ব্যধিটিকে সমাজদেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা।

গ্রন্থপঞ্জি

রহমান, গাজী সামছুর। *নারী প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইনের ভাষ্য*। ঢাকা: আশা প্রকাশনী, ২০০৫।

শওকতুজ্জামান, সৈয়দ। *মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমাজকল্যাণ*। ঢাকা: রোহেলা পাবলিকেশন্স, ২০০৫।

উন্নয়ন পদক্ষেপ (বিশেষ সংখ্যা), এপ্রিল ২০০২।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৭।

সংবাদপত্র পরিবীক্ষণ- ২০০৫।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬ মে ২০০১।

দৈনিক ইনকিলাব, ১ জানুয়ারি ২০০২।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ জানুয়ারি ২০০২।

দৈনিক প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০০৮।

IBS PUBLICATIONS

1976 The *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,*
i) English volums.1–33 (1976–2010) and
ii) Bangla volums 1–18 (1993–2011)

1977 David Kopf & S. Joarder, eds. *Reflections on Bengal Renaissance* (Seminar Volume 1).

১৯৭৯ এম.এস. কোরেশী, সম্পা.। *ঐতিহ্য সংস্কৃতি-সাহিত্য* (সেমিনার ভলিউম ৩).

1981 Enayetur Rahim. *Provincial Autonomy in Bengal (1937–1943).*

1981 M.K.U.Molla. *The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905–1911).*

1981 S.A.Akanda, ed. *Studies in Modern Bengal* (Seminar Volume 2).

1983 S.A.Akanda, ed. *The District of Rajshahi : Its Past and Present* (Seminar Volume 4).

1984 M.S. Qureshi, ed. *Tribal Cultures in Bangladesh* (Seminar Volume 5).

১৯৮৫ আমানুল্লাহ আহমদ। *বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা* (সেমিনার ভলিউম ৬).

1991 Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period,* Vol 1.

1991 S.A.Akanda & M. Aminul Islam. *Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh.* (Seminar Volume 8).

১৯৯১ এস.এ. আকন্দ, সম্পা.। *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (সেমিনার ভলিউম ৭).

১৯৯২ আবদুল করিম। বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড।

1993 Md. Shahjahan Rarhi. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An Up-to-date Index.*

1995 Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period,* Vol 2.

১৯৯৭ এম.এস. কোরেশী, সম্পা.। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা* (সেমিনার ভলিউম ৯)।

2002 Md. Shahjahan Rarhi. *Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses.*

2004 Pritikumar Mitra & Jakir Hossain (eds.). *Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm.*

2004 The Institute of Bangladesh Studies: An Introduction.

২০০৯ মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*

২০১০ মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *বিশ শতকের বাংলা* (সেমিনার ভলিউম ১০)

2010 Md. Shahjahan Rarhi. *Annotated Bibliography of PhD Theses: Produced in the Institute of Bangladesh Studies, 1976–2010.*

2010 Md. Shahjahan Rarhi. *Index to the Journal of The Institute of Bangladesh Studies: Volume 1-32 (1976-2009)*

2011 Shahanara Husain. *Hisrtory of Ancient Bengal: Selected Essays on State, Society and Culture*

২০১২ মো. মাহবুবর রহমান, সম্পা. *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*, ১ম খণ্ড (সেমিনার ভলিউম ১১)

২০১২ মো. মাহবুবর রহমান, সম্পা. *রাজশাহী মহানগরী: অতীত ও বর্তমান*, ২য় খণ্ড(সেমিনার ভলিউম ১১)

২০১২ শাহানারা হোসেন. প্রাচীন বাংলার ইতিহাস

অষ্টাদশ সংখ্যার সূচিপত্র

স্বরোচিষ সরকার	# সর্বস্তরে বাংলা ভাষা: আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা	৭
ইমতিয়াজ আহমেদ	# সুলতানি যুগে ভারতের বাণিজ্য: গতি ও প্রকৃতি	৩৭
মোহাম্মদ মাহবুবুল হক	# মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ভূমিকা	৫১
মো. আনোয়ারুল হক	# ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন ও 'দৈনিক ইত্তেফাক'	৬১
এস.এম. এক্রাম উল্যাহ ও মো. সুলতান মাহমুদ	# বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বৈধতার স্বরূপ সন্ধান	৭১
মামুন সিদ্দিকী	# কুমিল্লার সাময়িকপত্রে রাষ্ট্রভাষা-চিন্তা	৮৯
মলয় কুমার ভৌমিক	# বাংলাদেশে নাট্য-ব্যবস্থাপনা: সাংগঠনিক কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন	৯৯
মোঃ আমিরুল ইসলাম	# সুন্দরবন অঞ্চলের গাজির গান: একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা	১০৯
ইয়াসমিন আরা সাথী	# মেহেরপুর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি: লোক-কারুশিল্প ও লোকছড়া	১১৯
মোছাম্মৎ ফাতেমা জোহরা বেগম	# উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানে নারীর আর্তি	১২৫
শামীমা সুলতানা	# মঙ্গলকাব্যে পতিনিন্দা	১৩১
মো. আতাউর রহমান	# মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জননী': বাঙালি নারীর চিরন্তন মাতৃরূপ	১৩৯
বিদ্যুৎ জ্যোতি সেন শর্মা	# শিল্পী এস.এম. সুলতান: বাঙালিত্বের চেতনাধারী চিত্র লেখক	১৪৫
অনুপম হাসান	# সেলিম আল দীন-এর নাটক 'কেরামতমঙ্গল'	১৬১
মোঃ ওসমান গনী	# বাংলাদেশে শেখ সাদীর কাব্যচর্চা: একটি পর্যালোচনা	১৭১
বিপুল কুমার বিশ্বাস	# সংস্কৃত প্রকরণ কাব্যের উদ্ভব ও উপযোগিতা	১৮১
মো. নূরুল ইসলাম	# গ্রামীণ শ্রমজীবী নারীর পারিবারিক ক্ষমতায়ন: একটি ইউনিয়ন ভিত্তিক সমীক্ষা	১৯৩
মোঃ জাহাঙ্গীর কবির	# বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রম শোষণের প্রকৃতি: মেঘনা পাড়ের ইলিশ আহরণকারী জেলেদের উপর সমীক্ষা	২১৩